শ্রেষ্ঠ গল্প

ভগীরথ মিশ্র

মৌসুমী সাহিত্য-মন্দির
১৫/বি, টেমার লেন, কলিকাতা—৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : মে ১৯৬৫

প্রকাশক : প্রশান্ত তালুকদার
মৌসুমী সাহিত্য-মন্দির
১৫/বি, টেমার লেন
কলিকাতা –৭০০০০৯

মুদ্রক : প্রশান্ত তালুকদার
গদাধর প্রিণ্টার্স
৪১/।ড/১০৩ মুরারিপুকুর রোড
কলিকাতা-৬৭

শ্রীঅজিতেশ ভট্টাচার্য
বন্ধুবরেষু

সূচি

মিড ফিল্ডার

দীঘির জলে সহসা একখানা ছোট্ট ঢিল। ঢিল ছুঁড়েছে ঘোতন সান্যাল। সঙ্গে সঙ্গে তরঙ্গ উঠেছে দীঘি জুড়ে, বৃত্তাকারে—এক থেকে একাধিক বৃত্ত, ক্রমশ পরিধিতে বাড়তে বাড়তে দীঘির পাড় ছুঁয়ে ফেলে। দীঘির সীমাবদ্ধ ভৌগোলিক দূরত্বকে অতিক্রম করে যাওয়ার বাসনা। অথচ ঘোতন সান্যাল গুমটিতে দিনভর আসনপিঁড়ি, পান-সিগারেট বেচে আর পুরোনো খবরের কাগজ চিবিয়ে খায়। যদিও ফুটবল খেলত এককালে, মিড-ফিল্ডের তুখোড় খেলোয়াড় ছিল, প্রবল ঘেন্নায় ছেড়েছে সেই খেলা, আর, তার পোশাকি নাম যে মণিশঙ্কর সান্যাল সেটাই বা জানত, বুঝত ক'জনা! ঢিলটা ছুঁড়ল বলেই না বোঝা গেল। সাধারণত আজকাল কেউ ঢিল ছোঁড়ে না কোনও দীঘিতে, সাহসে কুলোয় না, ক্ষমতায়ও নয়, ঘোতন সান্যাল নেহাতই পান বেচত, আর সেই কিনা ছুঁড়ে মারল ঢিলখানা। আর, তাতেই বোঝা গেল দিনভর পানের গুমটিতে আসনপিঁড়ি বসে বসেও তার নিম্নাঙ্গ হয় নি অসাড়, হাত ঘুরিয়ে কিছু ছুঁড়ে মারবার মতো পর্যাপ্ত শক্তি আর সাহসও তার বাহুতে। অধিকাংশ মানুষই পিপীলিকাভুক, মাটির সঙ্গে মুখ মিশিয়ে পিঁপড়ে খুঁটে খুঁটে খেতে খেতেই খুইয়ে ফেলে কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব। দীঘির বুকে একখানা ঢিল ছুঁড়লে তারা বিব্রত, বিরক্ত হয়, তাদের মনঃসংযোগে ছেদ পড়ে, মুখ তুলে তাকাতে হয়, সেই ফাঁকে সদ্য আবিষ্কৃত পিপীলিকাটি উধাও হয়ে যায়। তবুও তাদের মুখ তুলে তাকাতেই হয়, সৌজন্যবশত, তারা তো আর সত্যি সত্যিই নিজেদের পিপীলিকাভুক বলে মনে করে না, তারা যে মানুষ, এটাও তো কখনও কখনও তাদের মনে পড়ে যায়। তাই, সেই কারণে, তারা মুখ তোলে, হাসে, বিস্ময় প্রকাশ করে, উচ্ছ্বসিত হয়, আবার কুঁজো হয়ে মুখখানি নামিয়ে আনে মাটিতে, প্রবল তাড়নায় খুঁজে বেড়ায় ক্ষণিকের অন্যমনস্কতায় হারিয়ে ফেলা পিপীলিকাটিকে। আর, সেই তরঙ্গসৃষ্টির রূপকার ঘোতন, যার পোশাকি নাম মণিশঙ্কর সান্যাল, তার পাঁচ-এগারোর শরীরটাকে এমনই টানটান করে ঘুরে বেড়ায় পাড়াময়, যেন তার মুণ্ডুখানি আর একটু হলেই ঠেকে যাবে মধ্যাহ্নসূর্যের শরীরে। এমন সুখী সুখী ভাব করে বেড়ায়, যেন ছুটির দিনে, সকাল থেকে ঝরঝরে বর্ষা, আর, সে ঘরে নিয়ে এল রাজপুত্তুরের মতো রুপোলি ইলিশ। লম্বায় পাঁচ-এগারো ঘোতন সান্যাল মাঝেমাঝেই হা-হুতাশ করে, ইস রে, ভগবান আর একটি ইঞ্চি বারাইয়া দিলে সিক্স-ফুটার হয়্যা যাইতাম। একেই কি বলে বড় হওয়ার স্বপ্ন, যা মারাদোনা-সহ দুনিয়ার সমস্ত মিড-ফিল্ডারের মনের মধ্যে রমণীর মা হওয়ার অস্ফুট স্বপ্নের মতো গোপন ঘরকন্না সাজিয়ে বসে থাকে আজীবনকাল! ঘোতন সান্যাল চিরকাল এতটাই লম্বা, আর লম্বা শরীরের একটা ট্রাজিক দিক হল, কাঠামোতে পর্যাপ্ত পরিমাণে

মাংস না জমলে বড়ই লিকলিকে দেখায়। মেদ-মাংসহীন লিকলিকে শরীরটা প্রবল মাধ্যকর্ষণেও সোজা থাকতে পারে না। মাগুর মাছের মতো পলকা শিরদাঁড়াটি বয়স না গড়াতেই সামনের দিকে বাঁক নেয়। তখন তাকে শক্তপোক্ত ভূমি না পেয়েও লম্বায় খুব বেড়ে যাওয়া তালগাছের মতো সামান্য হেলানো দেখায়। কিংবা এমনই এক বিশালাকায় ধনুক যার শরীর থেকে জ্যা খুলে ঢিলে করে দেওয়া হয়েছে। আর, স্বপ্নভারাক্রান্ত হয়ে যদি বা সৃষ্টি হয় কোনও মানুষের শরীরের মধ্যে তেমন বাঁক, নিছক সফল মিড-ফিল্ডার হওয়ার স্বপ্ন, তো তখন তাকে বলা যায় রোগাটে গাছের লিকলিকে ডালের ডগায় এক থোকা ফুটন্ত, আধ ফুটন্ত ফুল, বর্ষার জলে ভিজে ভারি হয়ে ঝুলে পড়েছে মাটির দিকে। অধোঃগামী স্বপ্নই তখন ঐ একথোকা ভেজা ফুটন্ত ফুল। ফুটন্ত ফুল তো আর কোনও অর্থেই পুরোপুরি প্রস্ফুটিত নয়, ফুটন্ত মানে যা ফুটছে, ফুটতে চাইছে, না পারলেও ফুল তো চাইতে পারে প্রস্ফুটিত হতে। অর্থাৎ কিনা ফুটতে চাওয়া আর পুরোপুরি ফুটে ওঠার মধ্যবর্তী পর্যায়টাই সেই ফুটন্ত পর্যায়। যখন বৃষ্টির জলে ভিজে গেলে কিংবা কাকজাতীয় বেয়াড়া ভারী পাখি লিকলিকে ডালে বসলেই থোকা শুদ্ধ ফুলগুলি মাটির দিকে অধঃপতিত প্রায়।

এলাকার এককালের তুখোড় ফুটবলার ঘোতন চিরকালই মিড-ফিল্ডার। বলে, মিড-ফিল্ডারের শরীরের আপার পোরশন খানিকটা সামনের লগে ঝুঁক্‌বই। সুদীপ চ্যাটার্জিরে দেইখ্যা বুঝতে পার না? এককালে মনে মনে সুদীপ চ্যাটার্জি হওয়ার স্বপ্ন দেখত ঘোতন। বলত, মিড-ফিল্ডারের মগজটাই আসল। মগজটাই আগে দৌরায়। পা দুইখানি পিছে পিছে। সেই ঘোতন একদিন তার প্রাণের অধিক প্রিয় ফুটবল খেলাটাই ছেড়ে দিল। চারপাশের ক্লাবগুলোর মাথায় বাড়ি। কিন্তু ঘোতনকে আর মাঠে ফেরানো যায় নি। আচমকা খেলাটা ছেড়ে দেবার কারণটা বোধগম্য হয় নি কারো। বারংবার শুধিয়েও কোনও যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা পাওয়া যায় নি ঘোতনের থেকে। বলেছে, কী হইবো ফুটবলে? ফুটবল আমারে স্বর্গে লইয়া যাইব? শোনা যায়, অনেক পীড়াপীড়ির পর খুব অন্তরঙ্গ মহলে নাকি একটা একান্ত ব্যাখ্যা দিয়েছিল। বিড়বিড় করে বলেছিল, ঐ যে, মারাদোনা, অর তরেই ত খেলাটা ছারতে হল। বলাই বাহুল্য, এমন ব্যাখ্যা ব্যাখ্যাহীনতার চেয়েও রহস্যময়। দুর্জ্ঞেয়।

ফুটবল খেলার সুবাদে অ্যাণ্ডারসন জুটমিলে একটা চাকরি পেয়েছিল ঘোতন। জুটমিলের ফুটবল টিমের সে ছিল ক্যাপ্টেন। মিড-ফিল্ডারের পায়ে ফুটবল থাকলে তার সামনে নাকি ঈশ্বরও নতজানু, আর, পা থেকে ফুটবল চলে গেলে তাকে দুনিয়ার সমস্ত ঈশ্বর, যথা জেনারেল ম্যানেজার মিঃ কেশোরাম, প্রোডাকশন ম্যানেজার মিঃ বর্ধন, এবং নীলাচল দাস নামক লোক্যাল কাউন্সিলর, সবাইয়ের সামনে নতজানু হতে হয়। ফুটবল খেলাটা ছেড়ে দেবার পর তার চাকরিটাও গেল। মিল মানেই মাঝেমাঝেই ছাঁটাই হবে। কে ছাঁটাই হবে, সেটা নির্ভর করে অনেক দৃশ্য ও অদৃশ্য কার্যকারণ সম্পর্কের ওপর। মিলের প্রোডাকশন সুপার ভাইজার অরবিন্দ রায় যদি যুগপৎ ইউনিয়নের নেতৃত্ব দেয় এবং রাতের আঁধারে প্রোডাকশন সেকশন থেকে নিয়মিত মাল পাচারে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে, তবে তাকে কিঞ্চিৎ উচিত-শিক্ষা দেওয়ার অবশ্যই প্রয়োজন হয়। সে ব্যাপারে বোড়ের ঘুঁটি হিসেবে যদি ঘোতন সান্যালই প্রোডাকশন ম্যানেজার মিঃ বর্ধনের পছন্দের তালিকায় থাকে, কিন্তু ফুটবল খেলা ছেড়ে দেবার পর মিলে

তার কানাকড়ি দাম না থাকা সত্ত্বেও সে যদি 'মিথ্যা সাক্ষী দিয়া সৎ মাইন্‌ষের প্যাটে পা দিমু না' বলে গোঁ ধরে বসে থাকে, তবে পরবর্তী ছাঁটাইয়ের তালিকায় যে তার নামটিই শীর্ষে থাকবে এতে আর অবাক হওয়ার কী আছে! ফুটবলখানা ঘোতনের পায়ে থাকলে তাও একটা কথা ছিল। কিন্তু ফুটবলহীন মিড-ফিল্ডার দুনিয়ার কোন্‌ কাজে লাগে যে মিঃ বর্ধন ছাঁটাইয়ের তালিকায় এক নম্বরে ঘোতনের নাম রাখলে জি-এম মিঃ কেশোরাম ওটা নিজের হাতে কেটে দিয়ে বলবেন, নো, নো, আফটার-অল হি ইজ আওয়ার ক্যাপ্টেন। কিংবা নীলাচল দাস আগের মতো রাস্তার মাঝখানে আগ বাড়িয়ে ডেকে বলবে, এলাকার ব্যাপারে তোমার সঙ্গে কিছু জরুরি আলোচনা আছে। একদিন বসব। তখন তো ঘোতন সান্যালের কথায় এলাকার প্রতিটি স্পোর্টস-ক্লাবের ছোকরারা জান কুরবানি দিতেও তৈরি, পৌরসভা নির্বাচনের সময় পাড়ায় পাড়ায় ক্যাম্পেন করবার সময় ঘোতন, শুধু 'এলাকার খেলাধুলার উন্নতির স্বার্থে আমরা নীলাচলদাকেই চাই' গোছের একটা আওয়াজ দিলে বিরোধী দলের অনেক মহীরুহ মড়মড়িয়ে ভেঙে পড়ত তৎক্ষণাৎ।

ছাঁটাই হওয়ার পর প্রথম বছরটা হামলে বেড়ায় সবাই। 'কী করি, কোথা যাই' গোছের ভাব করে দৌড়ে বেড়ায় পাগলের মতো। এলাকার যে-সব রথী-মহারথীরা এতকাল 'আমরা থাকতে তোমার চিন্তা কি' নামক সর্বার্থসাধক বটিকাটি পাইকারি হারে বিতরণ করে এসেছে, তারা মুখে যথাসাধ্য গাম্ভীর্য এনে, কপালের তাবৎ বলিরেখায় ঘোতনের জন্য 'ডিপ-কনসার্ন' ফুটিয়ে এক হপ্তা পরে খোঁজ নেবার পরামর্শ দেবেনই। এবং এক হপ্তা পরে বাড়ি বয়ে গিয়ে দেখা করলে আধঘন্টা বসিয়ে রেখে অবশেষে একটা চিঠি লিখে দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন অন্য এক মিড-ফিল্ডারের পায়ে। তিনি পাশ দেবেন অন্য এক মিড-ফিল্ডারের দিকে। ঘোতনই তো এলাকার জুনিয়রদের কোচ করতে গিয়ে কতবার বলেছে, মিড-ফিল্ডার কখ্খনো নিজের পায়ে বল জমাবে না। তার পায়ে বল থাকা মানে পুরো মাঠ ফ্রিজ হয়ে যাওয়া। মিড-ফিল্ডার বল পাওয়া মাত্রই ওয়ান-টাচে পাশ করে দেবে অন্যকে। মাস ছয়েক এলাকার তুখোড় ফুটবলারদের পায়ে পায়ে ফুটবলের মতো গড়িয়ে বেড়ালো ঘোতন। তারা ওকে পাওয়া মাত্র ওয়ান-টাচে পাঠিয়ে দিল অন্য খেলোয়াড়ের দিকে। সে-ও ওয়ান টাচে অন্যকে। সেও ওয়ান-টাচে....। কোনও কোনও ফুটবলার তাদের রাজনৈতিক ফুটবল ক্লাবের কোচিং ক্যাম্পে ঘোতনকে তৎক্ষণাৎ ভর্তি করে নিতে চেয়েছিল। কেউ বা তার হাতে ধরিয়ে দিতে চেয়েছিল একখানা সাদা কাগজে মোড়া এবং ওপরে বড় সাইজের একটাকা অবধি গলে যাওয়ার মতো লম্বাটে ফুটোযুক্ত কৌটো, যার ওপর গাঢ় লাল কালিতে লেখা, 'ছাঁটাই হওয়া সংগ্রামী শ্রমিক পরিবারকে মুক্ত হস্তে দান করুন।' কিন্তু মিড-ফিল্ডার কখনো কারুর কাছে ভিক্ষে চায় না কদাচ, বরং তার কাছেই ভিক্ষে চেয়ে থাকে দলের বাকি খেলোয়াড়েরা, চিরকাল। ঘোতনদা, আজ আমাকে একখানা ভাল দেখে দিও। একেবারে বানিয়ে দিও। যেন মাথা ছোঁয়ালেই গো-ল। ঘোতনদা যাকে দিয়ে গোল করাতে চাইবে, তার গোল না করে উপায় থাকে না। বলের গায়ে একেবারে ঠিকানা, মায় পিন-কোড অবধি লিখে দেয় সে। অবশেষে সবাইয়েব সব প্রস্তাবকে ডজ করতে করতে ঘোতন সান্যাল এমন এক কাণ্ড করে বসল যা মিড-ফিল্ডারকে মোটেই মানায় না। দুনিয়ার কোনও মিড-ফিল্ডার কস্মিনকালেও করেনি তেমন কাজ। মোড়ের মাথায় একখানা পান-সিগারেটের গুমটি

বানিয়ে বসে গেল সে। বিক্রিবাটা তেমন হয় না, তবে নীলাচল দাসের কোচিং-ক্যাম্পে ভর্তি হওয়ার চেয়ে এ ঢের ভালো। সারাদিন থিতু হয়ে বসে থাকতে পারলে পনের-বিশ টাকা এসে যায়। তবে ঐ যে, ঘোতনের পক্ষে এক ঠাঁই থিতু হয়ে বসে থাকাটাই এক বিষম বিড়ম্বনা। প্রায় মৃত্যুদণ্ডের সামিল। তার দু'পায়ের তলায় একজোড়া চাকা লাগানো। দিনভর দৌড়ে বেড়িয়েই আনন্দ। তাই নিয়ে তার দেমাক, স্ফুর্তি। বলে, মিড-ফিল্ডাররা কখনও বসে থাকতে পারে না। তারা সারা মাঠ জুড়ে সর্বক্ষণ দৌড়বেই। মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত দৌড়নোই তাদের নিয়তি। ভবিতব্য।

কারখানায় বহাল থাকাকালীন একটা দৌড়ের মধ্যে ছিল ঘোতন। অনেক কারণেই সেখানে অনবরত দৌড়ে বেড়ানোর ব্যাপার ছিল। প্র্যাকটিশ করতে হত, ম্যাচ থাকলে খেলতে হত, সে এক দৌড়। মিটিং-মিছিলে সামিল হতে হত, সে এক দৌড়। স্টেশনে, বাসস্ট্যাণ্ডে ইউনিয়নের কৌটো ঝাঁকানো, সে এক দৌড়। কিন্তু পানের গুমটিতে অপরিসর একচিলতে জায়গায় সারাক্ষণ আসনপিঁড়ি বসে থাকা, ঘোতনের মনে হয়, বুঝি বসে বসে শব জাগছে নিঝুম রাতে। মনে হয়, দু'খানি পা হাঁটু থেকে কেটে বাদ দেওয়া এক খঞ্জকে বুঝি রাস্তার ধারে চট বিছিয়ে বসিয়ে দিয়ে গেছে তার মালিক। সন্ধেবেলায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু উপায় নেই। সংসারেব মুখ চেয়ে ঘোতনকে এই স্থবির জীবন বেছে নিতে হয়েছে। মিড-ফিল্ডারদের বসে থাকতে বেজায় কষ্ট। গাঁটে খিল ধরে, পা ঝিনঝিন করে, অল্পেতেই অসাড় হয়ে আসে, হাই ওঠে, ঘুম পায়...। বাধ্য হয়ে, এক রকম প্রাণের দায়ে, একটা পথ খুঁজে বের করেছে ঘোতন। ঘুম তাড়াবার ওষুধ।

দুই

ইদানীং ঘোতনের কপালখানাকে খুব চওড়া মনে হলেও, সেটা মানুষের ক্ষণিকের বিভ্রম। পরমুহূর্তে বোঝা যায় ওটা 'টাক' উপন্যাসের প্রথম খণ্ড। কোন্ এক রহস্যময় কারণে, তিরিশ না ছুঁতেই টাক পড়তে শুরু করেছে ঘোতনের মাথায়। পর্বটা শুরু হয়েছে কপালের দিক থেকে। শুরু হয়েই থেমে নেই। 'প্রশস্ত-ললাট মার্কা' টাক দিয়ে শুরু করে সেটা ক্রমশ আগ্রাসী সমুদ্রের মতোই খেয়ে নিচ্ছে, পরিপাটি করে গড়ে তোলা দীঘাভূমির পাড়। খেয়ে নিচ্ছে যাবতীয় ঘন কালচে ঠাসবুনোট ঝাউবন। যে এলাকাগুলি আগ্রাসী সমুদ্রের কবলে পড়েছে কিন্তু এখনও পুরোপুরি সাফ হয়ে যায় নি, সেখানেও চুল অনেকখানি পাতলা হয়ে এসেছে। চুল ঝরছে ঘোতনের। অস্বাভাবিক দ্রুতহারে ঝরছে। মানুষের হাতে জঙ্গল নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার চেয়েও দ্রুতগতিতে। চুল ওঠা নাকি কোনও রোগ নয়। রোগের উপসর্গ মাত্র। এই পর্যন্ত বলেই ক্ষান্ত হয়েছেন কবি, আর্ণিকাপ্লাস ও ট্রায়োফারের রচয়িতা। কোন্ রোগের উপসর্গ, সেটা আর খোলসা করে বলেন নি। কাজেই ঘোতন ঠিক কোন্ রোগের শিকার, যার পরিণতিতে তার মাথায় এমন বিদ্যাসাগরী টাক, তা বোধগম্য হয় না সোদপুরের রেলওয়ে পার্কের বাসিন্দাদের। তবে একটা ব্যাপারে তারা নিশ্চিত যে ফুটবল খেলাটা ছেড়ে দেবার পর থেকেই তার কেশপতন প্রায় মহামারীর রূপ নেয়। ফুটবলটা ঘোতনের প্রাণ ছিল। অনেককাল আগে,

তখনও ঘোতন জুট মিলে চাকরি পায় নি, তখন শুধু পাড়া দাপিয়ে খেলছে, একদিন ওদের পাড়ার ওয়ার্ড কমিশনার নীলাচল দাস ওকে নিয়ে গেলেন মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের কাছে। বললেন, দেখেন তো, পুরসভায় ঘোতনটার জন্য একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারেন কিনা। ঘোতন আমাদের খুবই ভাল ছেলে। সৎ, পরোপকারী, কর্মঠ, মিষ্টভাষী, আমাদের পাটির এক নিষ্ঠাবান কর্মী...। (শেষেরটুকুই কেবল বানিয়ে বলেছিলেন নীলাচল দাস। সেটা আসলে ছিল তাঁর আগাম স্বপ্নমালার অংশবিশেষ।) নীলাচল দাস ঘোতনের হরেক গুণের একটা তালিকা পেশ করেছিলেন চেয়ারম্যানের কাছে। সবশেষে বলেছিলেন, শুধু তাই নয়, ঘোতন আমাদের ফুটবল খেলাতেও সিদ্ধহস্ত। চেয়ারম্যান খুবই ব্যস্ত ছিলেন, কথাটাকে তলিয়ে দেখেন নি, বিড়বিড় করে বলেছিলেন, বাহ্, বাহ্, বেশ। ঘোতনই একগাল হেসে বলেছিল, বিশ্বাস করবেন না নীলাচলদার কথা। ফুটবল খেলায় আমি মোটেই সিদ্ধহস্ত নই। ফুটবল খেলায় সিদ্ধহস্ত হওন যায় না। ফুটবলে হাত দিলেই হ্যাণ্ডবল হয়্যা যাইব গা। 'আরে, হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিকই তো....।' খুবই অন্যমনস্ক ছিলেন চেয়ারমম্যান, টুকটাক কাজ করছিলেন, এটা-ওটা খুটখাট নাড়াচাড়া করছিলেন, মাঝে মধ্যে খুচরো ফোন-টোন, বাঁ হাতের কড়ে আঙুল দিয়ে কান চুলকোনো, রুমালের কোণা নাকে ঢুকিয়ে হাঁচি বানাবার চেষ্টা, অল্পস্বল্প ফাইল সই, খিদে না থাকলে অনেক পদ নিয়ে খেতে বসে যেমনটা করে মানুষ, এটা মুখে দিচ্ছে, ওটা চাখছে, সেটা খাবলাচ্ছে, কিন্তু মন নেই কোনটাতেই। পরেও দু'চার বার আশায় আশায় চেয়ারম্যানের কাছে গিয়েছে ঘোতন। দেখেছে, সারাক্ষণ অন্যমনস্ক থাকাটা তাঁর অভ্যেস। অমন থাকতেই ভালবাসেন তিনি। ওটাই ওঁর স্টাইল। বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিকই তো। যায় নাকি? হাতে ফুটবল খেলা?' শুনেই নীলাচলদার মুখখানা পলকের মধ্যে শুকিয়ে আমচুর। পরমুহূর্তে এমনভাবে হো-হো করে হেসে উঠলেন, যেন এমন একটা জোক শুনলেন এই মাত্তর, যা শুনলে পেটের নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আসবে রামগরুড়ের ছানাদেরও। হাসতে হাসতেই বলেন, ভাল, ভাল। বাইরে বেরিয়ে এসে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতেই ক্রমশ গম্ভীর হতে থাকেন তিনি। একতলায় নেমে, সামনের চাতালে পা দিয়েই বলে ওঠেন, কথাটা তোমার ওখানে না বললেই চলছিল না?

—কোন কথাডা?

—ঐ যে, ফুটবলে সিদ্ধহস্ত হওয়া যায় না। চেয়ারম্যান কী ভাবলেন?

—কী আবার ভাববেন?

—ভাবতে পাবেন, আমি সিদ্ধহস্তের মানে জানি নে। কোনও একটি বিশেষ কাজে সিদ্ধ হইয়াছে হস্ত যাহার, বহুব্রীহি সমাস, না জানার কী আছে? তবে, এমনিতেই তো অনেক শব্দ লুজ্‌লি ব্যবহার করে মানুষ, যেমন ধর না ফলশ্রুতি, মানে জান?

ঘোতন মাথা নাড়ে।

—জেনে তোমার কাজ নেই। সব ব্যাপারে বড়দের দোষ ধরা একটা বদভ্যাস।

সেদিন যে রোষটাকে মনের মধ্যে পত্তন করেছিলেন নীলাচল দাস, ওটাকে আর কোনোদিনই তাড়ান নি বুকের আশ্রয় থেকে। ফলশ্রুতি এই, পুবসভায় ঘোতনের কাজটা হয় নি।

ফলশ্রুতির মানেটা অনেকেই জানে না, ঘোতন পরীক্ষা করে দেখেছে, সবাই একটা

'পরিণতি, পরিণতি' গোছের অর্থ বাতলায়। হিটলারের নাৎসী বাহিনী জার্মানীতে ক্রমশই নিরঙ্কুশ হতে লাগল, আর তারই ফলশ্রুতি হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ...। আসলে 'ফলশ্রুতি' হল পুরাণাদি শ্রবণের পুণ্যফল। একদল লিখেছে, একদল পাঠ করছে, একদল তা শুনে শুনেই পুণ্য অর্জন করছে। শব্দটাকে ভারি রহস্যময় লাগে ঘোতনের। মনের সঙ্গে একান্ত বোঝাপড়ার মুহূর্তে ঘোতন উপলব্ধি করেছে, সে কিংবা তারা এই দুনিয়ায় কোনও পুরাণের রচিয়তাও নয়, শ্রোতাও নয়। কাজেই, সব দিক থেকেই তার জীবনের ফলশ্রুতি একটি গোলাকার শূন্য বিশেষ। মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করবার জন্য চাই রমণযোগ্য গোপন ও একান্ত নিঃসঙ্গতা। সেটা বড়ই দুর্লভ। যখন আশেপাশে কেউ নেই, তখনও রয়েছে অজস্র আগড়ুম-বাগড়ুম ভাবনা। ঢেউ সরে গেলেও সমুদ্র-সৈকতে পড়ে থাকে জমাট ফেণা। সুস্মৃতি, দুস্মৃতি, এখানে চিনচিন, ওখানে ঝিনঝিন, শরীরের কোন না কোনও সুগভীর প্রত্যঙ্গে অতি ব্যক্তিগত ও একান্ত প্রদাহগুলি,—চেনা, আধচেনা, অচেনা...। ঘোতন তাই যদিও বা অনেক বিষয়ে সিদ্ধহস্ত, নীলাচল দাসের মুখখানি মনের আয়নায় ভাসিয়ে রেখে 'সিদ্ধহস্ত'র রহস্যটাকে সামান্য অতিক্রম করতে পারে যদিও, কিন্তু 'ফলশ্রুতি' তার কাছে অধরাই থেকে যায়।

ঘোতন চিরকালই মারাদোনার অন্ধ ভক্ত। মারাদোনাও যে মিড-ফিল্ডার। মারাদোনার খেলা থাকলে সে পাগল হয়ে যেত। কাজে কামাই দিত, নাওয়া-খাওয়া ভুলত, রাত জাগত, মারাদোনার খেলা দেখবার জন্য সে জান কুরবানি দিতে রাজি ছিল। গলায় বেশ গুমোর ফুটিয়েই বলত, মারাদোনা হইল গিয়া মিড্-ফিল্ডারদের আল্লা-ভগবান-যীশু। কিন্তু যেদিন মারাদোনা ঈশ্বরের হাত দিয়ে গোল দিল, সারা দুনিয়া 'ছি-ছি' করতে লাগল, মারাদোনার নিজের ঐ ধিক্কার কেমন লেগেছিল তা সম্যক জানা নেই কারোর, কিন্তু সোদপুর রেলওয়ে পার্কের ঘোতন সান্যালের মুখখানা মরা কাতলার মতো ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল। ক'দিন একেবারে মুষড়ে রইল সে। লুকিয়ে বেড়ালো। কারও সঙ্গে ই কথা বলে না, কারোর দিকেই মুখ তুলে তাকাতে পারে না, খাবার-খাদ্য গলা দিয়ে নামতে চায় না, সর্বদাই চোখে-মুখে এক ধরনের 'চোর-চোর' ভাব। যেন পাশের বাড়ির কুমারী মেয়েটিকে ধর্ষণ করতে গিয়ে ধরা পড়েছে হাতে নাতে। অমন ফুর্তিবাজ ছোকরা, দেখতে দেখতে পোড়া কাঠের মতো বিবর্ণ হয়ে গেল। ফুটবল নিয়ে কথা উঠলেই সিঁটিয়ে যায়। মারাদোনার প্রসঙ্গ উঠলেই নিঃশব্দে সরে পড়ে। একটু একটু করে বুড়িয়ে যেতে লাগল সে। চোখের কোণে কালি জমল, গায়ের চামড়া ফ্যাকাসে হয়ে গেল, মাথার চুল পড়তে শুরু করল, সামনের দিকে অনেকখানি ঝুঁকে পড়ল শরীর, সহসা বেখাপ্পা রকমের কুঁজো দেখালো ওকে। প্রাণের বন্ধুরা চেপে ধরে, কী হয়েছে, বল্? ঘোতন খোলসা করে কিছুই বলে না। বড় জোর বলে, মনডা ভাল নাই রে। সদা সর্বদা বমি পায়। হিক্কা। বন্ধুরা ওর পিছু ছাড়ে না। দিনরাত পীড়াপীড়ি করে, আমাদের খুলে বল্। একদিন, অবশেষে, একান্ত অন্তরঙ্গদের কাছে নিজেকে মেলে ধরে ঘোতন। খুলে দেখায় বুকের মধ্যেকার একান্ত ক্ষতটি। বলে, মারাদোনা যা একখান কাণ্ড করল, এর পর আর ফুটবলার হিসেবে মুখ দেখানোই দায়। নিজেকে মিড-ফিল্ডার ভাবতে লজ্জা হয়! বন্ধুরা খানিকক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। তারপর হো-হো করে হেসে ওঠে। পাগল আর কাকে বলে! মারাদোনা হাত দিয়ে গোল করেছে, সেই কারণে সোদপুরের রেলওয়ে পার্কের ঘোতন সান্যাল মুখ দেখাতে পারছে না,

খেলা ছেড়ে দিয়েছে, রোগা হয়ে যাচ্ছে! ছোট-কেলো বলে ওঠে, আর কইয়ো না গুরু, ঘোড়ায় হাসব। নাটক-পাগল সত্যবান ভাদুড়ি খ্যা-খ্যা করে শকুনির হাসি হেসে ওঠে, লঙ্কায় রাবণ মল, বেহুলা সতী রাঁঢ়ী হল, সীতার শোকে কাঁদে দুর্যোধন...। ঘোতনদা গো, তোমারও সেই অবস্থা। ঘোতন ঘনঘন মাথা নাড়ে নিঃশব্দে। নিজের সঙ্গে বিড়বিড়িয়ে কথা কয়। বন্ধুদের বোঝাবার চেষ্টা করে। বলে, বুঝিস না ক্যান? এমন কাজ যেই করুক, মিড-ফিল্ডার কর্‌সে। যে দেশেরই হোক, ফুটবলের মিড-ফিল্ডার সে। সারা মাঠের মস্তিষ্ক। বিবেক। বন্ধুরা হেসে কুটিকুটি হয়। ক্ষ্যাপা কি আর গাছে ফলে? ওদের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকে ঘোতন। এক সময় বিড়বিড়িয়ে বলে, তরা এসব বুঝবি নে।

—বুঝে আমাদের কাজ নেই। আমরা এখনও পাগল হই নি।

বন্ধুরা কেটে পড়ে। ঘোতন ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে। সত্যি, বন্ধুদের সে বোঝাতে পারে না তার মনের অবস্থাখানা। বোঝাতে পারে না যে, আজ যদি নীলাচল দাস আবার ঘোতনের সুখ্যাতি করতে গিয়ে বলে ওঠে,' ঘোতন আমাদের ফুটবল খেলায় সিদ্ধহস্ত, তেমন তীব্র প্রতিবাদ করে উঠতে পারবে কি ঘোতন?

বন্ধুরা কেউই তার দগদগে ক্ষতস্থানটিকে পরখ করে দেখল না বটে, কিন্তু লজ্জায়, অপমানে, ঘেন্নায়, ফুটবল খেলাটাই ছেড়ে দিল সে। আর, মারাদোনার ম্যাচ থাকলে টিভির ধারে-কাছেও ঘেঁসে না। এমনকি রেডিওতেও শোনে না সেই খেলার ধারাবিবরণী।

তিন

পানের গুমটিতে দিনভর বসে বসে পঙ্গুত্বের স্বাদ নিতে থাকে ঘোতন। সারাক্ষণ সেবন করে ঘুম তাড়াবার ওষুধ। ওষুধের নাম, খবরের কাগজ। সারাক্ষণ খবরের কাগজে ডুবে থাকে ঘোতন।

এর দ্বারা ব্যাপারটা কিছুই বোঝানো গেল না। আসলে, ঘোতনের খবরের কাগজ পড়া নিয়ে সারা পাড়া জুড়ে হরেক কিসিমের গল্প-গাথার জন্ম। চারপাশের সম্পন্ন মানুষজনের বাড়ি থেকে আগের দিনের বাসি খবরের কাগজগুলো সে চেয়ে নিয়ে আসে। বিক্রিবাটার ফাঁকে ফাঁকে দিনভর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে। বিক্রিবাটা সামান্যই হয়। সারাদিনের অঢেল সময়খানি ঘোতন ফোঁটা ফোঁটা ফেলতে থাকে খবরের কাগজের পাতায়। বড় খবর, মেজো খবর, ছোট খবর, রাঘববোয়াল, চুনোপুঁটি খবর, এমন কি বিজ্ঞাপনগুলোও বাদ দেয় না। আর, তার কাগজ পড়বার তরিকাই আলাদা। ঘোতন আসলে খবর পড়ে না। খবর খায়। গোগ্রাসে গিলে নয়, চিবিয়ে চিবিয়ে, তারিয়ে তারিয়ে খায়। পায়রাদের, ক্ষিদের সময় নয়, অবসর সময়ের দানা খুঁটে খাওয়ার সঙ্গেই তুলনীয় সেটা। প্রতিটি বাক্যকে, বাক্য থেকে প্রতিটি শব্দকে খুঁটে খুঁটে খায় ঘোতন। এইভাবে সে তার দৌড়ে বেড়ানো প্রবৃত্তির মুখে লাগাম পরায়। এমনি করেই অপরিসর গুমটির মধ্যে সকাল আটটা থেকে রাত দশটা অবধি বন্দী রাখে নিজেকে। এমনি করেই সে তার স্থবির জীবনটাকে কিঞ্চিৎ সহনীয় করে তোলে।

খবরের কাগজের পাতা থেকে খবরগুলো খুঁটে খেতে খেতে ঘোতন সান্যালই একদিন নজর করে ছোট্ট খবরটা। আর তৎক্ষণাৎ সে ঢিল ছোঁড়ে রেলওয়ে পার্কের নিস্তরঙ্গ দীঘিতে। চেল্লাতে শুরু করে, অরে, দ্যাখ দ্যাখ, আমাগো পাড়ার পোলা কী এক জব্বর কাম কর্‌সে।

এমন কথায় গুমটির সুমুখে দাঁড়িয়ে থাকা দু'-একজন উৎকর্ণ হয়। ঘোতন সান্যাল তর্জনী বিঁধিয়ে দেয় চারপাশে বর্ডার দেওয়া একটুকরো খবরের ওপর। সকলের কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে চৌকোণো খাঁচার মধ্যেকার কালো কালো অক্ষরগুলো একঝাঁক বদরি পাখির মতো অস্থির কলরব তোলে। এবং সবাই জানতে পারে, সোদপুরের রেলওয়ে পার্কের অম্বরীশ নাগবিশ্বাস নামে এক যুবক এমন একটি জব্বর কাজ করে ফেলেছে যে খবরের কাগজে নাম উঠেছে ওর। বজবজ-ব্যারাকপুর লোক্যালের একটি কামরায় একটি সোনার পুঁটিলি কুড়িয়ে পেয়ে মালিককে খুঁজে বের করে ফেরত দিয়েছে তাবৎ মাল। খবর-কাগজে তাই সাতকাহন করে লিখেছে।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই প্রায় সারা রেলওয়ে পার্ক এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে খবরটি। পাড়ার মোড়ে মোড়ে, চায়ের দোকানে, বাস স্ট্যান্ডে, সোদপুর প্লাটফর্মে, এবং রকে রকে তাই নিয়ে চলে তুমুল আলোচনা। একটিমাত্র যুবকের জন্য পুরো রেলওয়ে পার্ক এলাকা আজ খবরের কাগজে উঠে এসেছে। যুবকটি তার এলাকার মুখ উজ্জ্বল করেছে। এমনি করে সকাল কাটে, দুপুর, বিকেল কাটে, সন্ধের মুখে ফিরে আসে সরকারি অফিসের চাকুরেরা, একটু সন্ধে গড়িয়ে ফেরে বেসরকারি ফার্মের চাকুরেরা, তারাও শোনে। এবং 'বল কি! প্রায় ষাট হাজার টাকার গহনা? বড়ই নির্লোভ ছোকরা তো! অত গহনা পুঁটলিতে বেঁধে ঘোরে কারা? চোরাই নয় তো?' ইত্যাদি বলে-টলে যে যার নিজস্ব স্বরচিত খোপে ঢুকে পড়বার আগে কিঞ্চিৎ কৌতূহলমুখর হয়ে পড়ে। আর, তখনই প্রশ্ন ওঠে, ছেলেটা কে? ঐ অম্বরীশ নাগবিশ্বাস? কাদের বাড়ির ছেলে?

এতক্ষণে সবার বুঝি হুঁশ হয়। সত্যিই তো, যাকে নিয়ে সারা রেলওয়ে পার্কের দেমাকে পা পড়ছে না, সেটি কাদের বাড়ির ছেলে? অম্বরীশ নামে কোন্ ছেলেটি রেলওয়ে পার্কের মুখোজ্জ্বল করল আজ? বাড়ি-বাড়ি জনে-জনে মনে-মনে সার্ভে চলে। দীঘির পুব পাড়ের একতলা বাড়িটার ঐ ডাকাবুকো ছেলেটা কি? ধুশ, তার নাম তো অমলেশ। তবে কি দক্ষিণ পাড়ের দোতলা বাড়ির ছেলেটা? নাকি, পার্টি অফিসের উল্টোদিকের বাড়িটাতে যে নতুন ভাড়াটে এসেছে ওদের বাড়ির রোগাপানা ছেলেটা? কী যেন নাম ওর?

দিনভর রাতভর গবেষণার পর কে যেন সহসা আবিষ্কার করে বসে, ছেলেটা আর কেউ নয়, আমাদের রাজু। ওরই নাম অম্বরীশ। তাই নাকি? কী কাণ্ড! রাজুর নামই অম্বরীশ? ততক্ষণে পাড়ার লোকের খোঁজ পড়েছে রাজুকে। কোথায় রাজু, ডাকো তাকে, দেখি একবার। যারা রাজুকে চেনে, তারা তো বটেই, যারা তেমন করে চেনে না তারাও ওকে একটিবার দেখবার জন্য হাঁকুপাকু করে। এবং রাজুকে নিয়ে নতুন করে গবেষণা শুরু হয়।

গবেষণার ফলাফল এই রকম : রাজু নামের ছেলেটি বি-কম পাশ করেছে। কম্প্যুটার ট্রেনিং নিয়েছে। মাউথ অরগান বাজায়। কুটুম-কাটাম করে। স্থানীয় ক্লাবে নাটক করে। উন্মেষ সাংস্কৃতিক সংস্থায় গণসংগীত গায়। খড়দহ রিলিফ সোসাইটির রক্তদান শিবিরে

ঘনঘন রক্ত দেয়। আর্ন্তজাতিক আই ব্যাঙ্কের হয়ে চক্ষুদাতা সংগ্রহ করে। মড়া পোড়ায়, সাপ মারে, রাস্তাঘাটের অসুস্থ রোগীকে বাড়ি পৌঁছে দেয়। কন্যাদায়গ্রস্ত বাবার হয়ে চাঁদা তোলে। রাতপাহারা দেয়। সখের সাংবাদিকতা করে...। শুনে চোখ কপালে উঠে যায় পাড়ার প্রবীণদের। ছেলেটা ঘুরে বেড়ায় পাড়াময়, এটা ওটা করে, কিন্তু তার যে কীর্তির তালিকাটি এত দীর্ঘ সেটা তো তেমন করে খেয়াল করে নি কেউ। আসলে, এ দুনিয়ার জানা-চেনা, সব কিছুই, সব বন্ধুত্বই ওপর ওপর, পাঁচিলের গায়ে শ্যাওলার মতো। আমবা কেউ কাউকে তেমন একটা চিনি নে।

একটা বাস পড়ে গেছে নয়ানজুলিতে, একটা মানুষ আচমকা রেলে কাটা পড়েছে, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাও বিপুল চুরির দায়ে ধরা পড়েছেন, কিন্তু কিছুতেই আদালতে বিচারযোগ্য হতে চান না। এবং প্রাক্তন মন্ত্রী সুখরামের দুর্নীতির খবর পাওয়া মাত্রই দলে ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সুখরামজীকে সাসপেন্ড করেছেন। এসব খবরে যেমন তাৎক্ষণিক উদ্বেল হয় মানুষ, কলরবপ্রবণ, অম্বরীশের কীর্তির কথা শুনে মানুষজন ঠিক তেমনিভাবেই তাৎক্ষণিকভাবে গদগদ হয়। এক সময় থিতিয়ে গিয়ে কৃমিবৎ যে যার নিজের বিষ্ঠায় ডুবে যায়। অথবা যে-যার নিজস্ব পিঁপড়েটিকে খোঁজাখুঁজি শুরু করে। এই গদগদ ভাবখানিও যে-বুকের কোনও সুগভীর প্রদেশ থেকে উঠে আসে তা নয়। যন্ত্র-মানুষ যান্ত্রিকভাবেই গদগদ হয়, যেন গদগদ হওয়াটা এক ধরনের কতর্ব্য সম্পাদন। আসলে, তারা যে মানুষ, পিপীলিকাভুক নয়, এটা তো তাদের মাঝে মাঝে মনে পড়ে যায়। ঘোতন কিন্তু তার গুমটির মধ্যে থিতু থাকতে পারে না। ঢিলটি ছুঁড়েই সে সোজা চলে যায় অম্বরীশের বাড়িতে। বলে, ঘরের মধ্যে বইস্যা আছস্ ক্যান? চল্, তবে লৈয়া পাড়াটা একবার ঘুরি।

অম্বরীশ লজ্জায় লাল হয়, কেন?

—কেন কী রে? তুই অমন একখান কাম কর্‌ছস, পাড়ার লোক তবে দেখতে চায় না?

প্রায় জোর করে অম্বরীশকে ঘর থেকে বের করে ঘোতন। রাস্তা ধরে সদর্পে হাঁটতে থাকে। বাছাবাছা ঘরে ঢুকে পড়ে। ও কাকীমা, ও নস্করদা, ও মালতী বৌদি, দেখ, এই হইল আমাগো অম্বরীশ। রাজু। সোনার গহনা কুড়াইয়া ফেরৎ দিবার লগে অরই নাম উঠসে পেপারে। গেরস্থ মানুষগুলো খুব বিস্ময়ভবা চোখে দেখতে থাকে অম্বরীশকে। দু' চোখে ছলকে পড়ে চাপা প্রশংসা। দেখতে দেখতে ঘোতনের সারা মুখ চওড়া হাসিতে ভরে যায়। বলে, দ্যাখেন তালে, আমাগো সোদপুরেও অমন পোলাপান রইসে। এ্যাই, চল্, চল্, এখনো পুরো এলাকাটা বাকি পইরা রইসে।

অম্বরীশকে নিয়ে পরপর তিনদিন সকাল-বিকেল পুরো এলাকাটা চষে বেড়ায় ঘোতন। রাস্তায়-ঘাটে যত মানুষজনের সঙ্গে দেখা হয়, চেনা, আধচেনা, মুখচেনা, সবাইয়ের সামনে এগিয়ে দেয় অম্বরশীকে। সাতকাহন করে শোনায়, কী এক কাণ্ড করেছে সোদপুরের পোলা। এইসব করতে গিয়ে পাক্কা তিনদিন পানের গুমটি খোলাই হয়ে ওঠে না। খবরের কাগজগুলোও ক্রমশ আরও বাসি হতে থাকে। ওয়ার্ড কমিশনার নীলাচল দাসের বাড়ি বয়ে গিয়ে বায়না ধরে, রাজুরে একটা সম্বর্ধনা দ্যান পৌরসভা থেকে। এলাকার সব্বাইরে ডাকেন। সবাই জানুক, সোদপুরের পোলা কী এক দারুণ কাম করসে। নীলাচল দাস মিনমিন করতে থাকেন। হ্যাঁ, তাই তো, দেওয়াই তো উচিত,

দেখি, কী করা যায়...।

—দেখি মানে? ঘোতন ক্ষেপে ওঠে। মনের মধ্যে মিড-ফিল্ডারি গোঁ চাগিয়ে ওঠে। দেখাদেখির কী আছে অত? সারা দ্যাশখানা যখন চোর-ছ্যাঁচোরে ভইরা গ্যাসে গা, মন্ত্রী, মন্ত্রীর পোলা, শালা, ভাইপো, ভাইগনা—সব্বাই যখন লুট করসে দ্যাশখান, তিহার জেলে একটা ক্যাবিনেট-সেল খোলার দরকার হয়্যা পর্‌সে, তখন আমাগো পাড়ার এক পোলাপান একতাল সোনার গহনা পাইয়াও ফেরৎ দিল, অরে তো এক্ষুনি প্রাইম-মিনিস্টারের পোস্টে বসানো উচিত। সামান্য সম্বর্ধনা দিতেও...।

নীলাচল দাস এটা-ওটা বলে এক সময় কেটে পড়ে।

পাড়ার মানুষ একটু একটু করে ভুলে যায়। যে-যার কাজেকামে ডুবে যায়। যে-যার নিজস্ব পিঁপড়েটিতে মতি রেখে বুঁদ হয়ে যায়। কেবল ঘোতনই ভোলে না। সে পুরো ব্যাপারটার মধ্যে আকণ্ঠ ডুবে থাকে। গুমটির সামনে খদ্দেরদের জটলা হয়, ঘোতন পান বানাবার ফাঁকে ফাঁকে অনর্গল বলে চলে এই পাড়ার একটি অতি সাধারণ ছেলের অসাধারণ কীর্তির কথা।

পৃথিবীর যে কাজটি কেউই করতে চায় না, এমনকি রাষ্ট্রও নয়, সেই কাজ মিড-ফিল্ডাররাই ঘাড়ে তুলে নেয়, এমন কোনও তাগিদ থেকেই মোড়ের মাথার চিলতে মাঠে ঘোতন আয়োজিত যে বৈকালিক সম্বর্ধনা-সভায় নীলাচল দাস সততা ও আত্মত্যাগের সপক্ষে ফাটিয়ে সভাপতির ভাষণ দিল, সে সভার মাথায় ছিল দেবদারু গাছের ঝাঁকড়া আচ্ছাদন, ফলে এলাকার আবালবৃদ্ধবনিতাকে রোদ্দুরের শোকতাপ সইতে হয় নি। আর, সামনে যেহেতু পৌর নির্বাচন, নীলাচল দাসের উচ্চারিত প্রতিটি বাক্য ছিল ওজস্বিনী রসে জারিত এবং অবশ্যই স্বপ্নিল। অম্বরীশের কীর্তিমালার সঙ্গে নীলাচলের নিজস্ব নির্বাচনোত্তর স্বপ্নমালা মিলেমিশে একাকার হয়ে একটি সুবর্ণপ্রসবিনী অপরাহ্ন উপহার দেওয়া হল 'জনগণ'-কে। আর, যদিও সেই সম্বর্ধনা-সভার আয়োজক ঘোতন সান্যাল পাক্কা দু'দিন মিনতি জানিয়ে দুয়োরে দুয়োরে ঘুরেছিল, লোক সমাগম আশানুরূপ হয় নি। এক অংশ নিজস্ব পিপীলিকাটি পালিয়ে যাবে, এমন আশঙ্কায় মাটি থেকে মুখই তোলে নি। এক অংশ, এটা ঘোতন সান্যালের পাকামো, ভেবে এড়িয়ে গেছে। কেবল নীলাচল দাস, যিনি কোথাও কোনও কারণে জনগণের জমায়েত দেখলেই সেটাকে একটি প্রাকনির্বাচনী প্রচারমঞ্চ ভেবে নেন, এসেছিলেন সামান্য আগেভাগেই। এসেই ঘোতনের কানে কানে শুধিয়েছিলেন, সভাপতি কাকে করবে বলে ভেবেছ? এটা যে একখান্ লিডিং কোয়েশ্চান, ঘোতনের বুঝতে অসুবিধে হয় নি। কিন্তু যখন নিজস্ব গৌরচন্দ্রিকায় ঘোতন বলল, 'রাজুরে ত কর্তৃপক্ষের ময়দানে লইয়া গিয়া সম্বর্ধনা দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু দ্যাশটার নাম কি? না, ইন্ডিয়া। এখানে চোর-ছ্যাঁচরদেরই কদর। সৎ মাইন্‌ষের ভাত নাই। দ্যাখেন না, কতকগুলো পাক্কা চোরকে কম্যান্ডো পাহারায় নিরাপদে, নির্বিঘ্নে লুটপাট কইরবার লাইসেন্স দিচ্ছি আমরা। নীলাচল নিজের নামটিকে ঐ কর্তৃপক্ষের তালিকার বাইরে রেখে সাফাই গাওয়ার ভঙ্গিতে বলল, ঘোতনের বক্তব্য একশ ভাগই সঠিক এবং কর্তৃপক্ষের এই অবহেলা, উদাসীনতার উপযুক্ত জবাব আগামী নির্বাচনে জনগণই দেবেন। পরিশেষে, ঘোতন তার দোকানের এক বাক্স সস্তা চকোলেট, একটি লাইফবয়-প্লাস এবং গত পুজোয় বৌদির বাপের বাড়ি থেকে পাওয়া সার্টের পিসখানা যখন তুলে দিল অম্বরীশের হাতে, তখন জনতা ধন্য ধন্য করে উঠল। অম্বরীশ

যখন কিছুতেই নিতে চাইছিল না ওগুলো, ঘোতন ওকে এক ধমক দিয়ে বলেছিল,তরে নয়, নিজেরে পুরস্কৃত করত্যাছি আমি। সভার শেষে, মূল্যায়ন পর্বে, নীলাচল দাস একান্তে বলেছিল, একটা উদ্বোধনী সঙ্গীত রাখতে পারতে। আমার ছোট মেয়েটা, তোমার ভাইঝি, তাকে তো তুমি দেখেইছ, ভালই গায়, পূর্বা দামের কাছে শিখছে।

চার

কথটা প্রথম বয়ে নিয়ে আসে সত্যদীপ। অম্বরীশ শোনামাত্তর থ হয়ে যায়। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে সত্যদীপের দিকে। বলে, যাহ্। তাই আবার হয় নাকি? ঘোতনদার কি মাথা খারাপ হয়েছে? সত্যদীপ তিন দিব্যি করে।

আসলে, সত্যদীপ পাড়ার যত স্কুপ-নিউজ বয়ে বেড়ায়। এক ধরনের মেয়েলি ব্যাপার আছে ওর মধ্যে। আড়ি পেতে কথা শোনায় ওস্তাদ। আর, পেটে কথা রাখতে পারে না একতিল। বন্ধুরা কেউ বিশ্বাস করে কিছুই বলে না ওকে। তাও যেন ও কীকরে সবাইয়ের হাঁড়ির খবর জেনে যায়। সত্যদীপের সঙ্গে হপ্তাটাক দেখা হয় নি অম্বরীশের। তাতে অম্বরীশের কোনও ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। কিন্তু সত্যদীপের যে ছিল তা দেখা হওয়া মাত্রই বোঝা গেল। দূর থেকে অম্বরীশকে দেখে প্রায় হামলে দৌড়ে আসে সত্যদীপ, রাজু, তোর সঙ্গে জরুরি কথা আছে।

কাছে এসে বলে, ওদিকে খবর শুনেছিস?

—কী খবর? কোন্ খবর?

—ঘোতনদা সব্বাইকে কী সব বলছে, শুনিস নি?

—কী ব্যাপারে?

—তোর ঐ গহনার পুঁটলি কুড়োনোর ব্যাপারে?

—কী বলছে?

—বলছে, গহনার পুঁটলিখানা নাকি ঘোতনদাই কুড়িয়েছিল।

অম্বরীশ চমকে তাকায়। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। দু' চোখ দিয়ে অবিশ্বাস ঝরে ঝরে পড়ে। বলে, যাহ্, কী আলফাল বকছিস।

—মা কালী। সত্যদীপ লম্বা করে জিভ কাটে, আমি নিজের কানে শুনেছি। সত্যদীপ পুরো ঘটনাটা খোলসা করে বলে।

একজন ভদ্রলোক, অন্য পাড়ার, পান কিনছিলেন ঘোতনদার দোকানে। পানের খিলিখানা মুখে পুরে শুধোলেন, আচ্ছা দাদা, এই পাড়ার একটা ছেলে নাকি একগাদা সোনার গহনা কুড়িয়ে ফেরৎ দিয়েছে?

ঘোতন খুব নিরাসক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে লোকটির দিকে, আপনি জানলেন কী কইর‍্যা?

—পেপারে পড়েছিলুম।

ঘোতন একটুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে। দৃষ্টি দিয়ে আকাশের বুকে আঁকিবুকি আঁকে। চারপাশে বারকয় চোখ চারিয়ে নেয়। তারপর খুব অস্বাভাবিক নিরুত্তাপ গলায় বলে, 'হ, আমিই। আমিই অটা পাইসিলাম।'

—আপনি! ভদ্রলোক প্রায় ফিল্মস্টার দেখবার ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকেন ঘোতনের

দিকে। চোখমুখ দিয়ে ঝরে পড়ে বিস্ময়, প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা জাতীয় অভিব্যক্তিগুলি।

বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দুলতে দুলতে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে অম্বরীশ। সত্যদীপের সারা মুখ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জরিপ করতে থাকে। একসময় বলে, ঘোতনদা নির্ঘাৎ ইয়ার্কি মেরেছে।

কিন্তু এখানেই শেষ হয় না ব্যাপারখানা। একই কথা এর-ওর মুখে বয়ে বারংবার আসতে থাকে অম্বরীশের কানে। ঘোতন নাকি জনে জনে সব্বাইকে বলে বেড়াচ্ছে, গহনার পুঁটলিখানা ও-ই কুড়িয়েছে। কোথায় কুড়োলো, কেমন করে কুড়োলো, তারপর কী কী করল, তার পুরো ছবিখানা অনুপুঙ্খ সহকারে এঁকে চলেছে এর-ওর কাছে। অম্বরীশ তাজ্জব বনে যায়। ঘোতনের প্রতি তার তিলতিল যাবতীয় শ্রদ্ধা একটু একটু করে পাতলা হতে থাকে।

একদিন আর নিজেকে চেপে রাখতে পারে না অম্বরীশ। দ্রুতপায়ে চলে যায় ঘোতনের গুমটিতে। সরাসরি ওর চোখে চোখ রাখে। বলে, ঘোতনদা, তুমি নাকি সব্বাইকে বলছ, তুমিই গয়নার পুঁটলিখানা কুড়িয়েছ?

ততক্ষণে দেবদারু গাছের বিশাল ছায়াখানি ঢেকে ফেলেছে ওর গুমটিটাকে, প্রায় গিলে ফেলেছে। ঘোতন জাঁতি দিয়ে সুপুরি কুচো করছিল। অম্বরীশের কথায় হাতের যান্ত্রিক ওঠানামা থেমে যায় এক লহমার জন্য। পুনরায় কচকচিয়ে চলতে থাকে জাঁতি। খুব নিরাসক্ত গলায় ঘোতন বলে, কেডা কইল তরে?

—সব্বাই বলছে। জনেজনে শুধোচ্ছে আমায়।

ঘোতন কয়েক মুহূর্ত আকাশের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে। ঠোঁটের কোণে শিশুর হাসি খেলে যায়। বলে, অত লোকের কথা কি মিছা হইতে পারে?

—প্যাঁচ দিয়ে কথা বোল না। এমন কথা তুমি বলেছ কিনা সাফ-সাফ জানতে চাইছি।

থিরপলকে অম্বরীশের দিকে তাকিয়ে থেকে মিটিমিটি হাসতে থাকে ঘোতন, যদি বইলাই থাকি, তব বক্তব্যডা কি?

—বক্তব্য হল, কেন বলে বেড়াচ্ছ অমন কথা? কী লাভ এতে? গহনার পুঁটলিটা কি তুমি কুড়িয়েছিলে? বলতে বলতে অম্বরীশের চোখের জমিতে রক্তাভ শিরাগুলি প্রকট হয়ে ওঠে।

—কুরাইয়েসিলামই তো।

—ছি, ছি, ঘোতনদা—, অম্বরীশের ঠোঁটজোড়ায় তীব্র ভাঙচুর হতে থাকে, তুমি কুড়িয়েছিলে ওটা? বুকে হাত দিয়ে বল তো, আমি ওটা কুড়োই নি?

মিটমিটি হাসিখানা লেগেছিল ঘোতনের ঠোঁটে। জাঁতিসহ হাত-দু'খানা যন্ত্রের গতিতে চলছিল। খুব সাবলীল গলায় বলে, তুইও কুরায়েসিস্। আম্মো। মিড-ফিল্ডাররা আর ক'খান গোল নিজেরা করে? সবই তো অন্যারে দিয়া করায়।

এমন কথায় অম্বরীশ আচমকা উত্তেজিত হয়ে ওঠে, দ্যাখ ঘোতনদা, রহস্য আমার একদম ভাল লাগে না।

—রহস্যের কিডা দেখলি?

—পুঁটলিখানা আমিও কুড়িয়েছি, তুমিও কুড়িয়েছ?

—হ। ভারি নিস্পৃহ কণ্ঠ ঘোতনের. অমনডা হইতে পারে না?

—পারে?

—একশ বার পারে। হাজার বার পারে। ঘোতনের গলায় এক ধরনের অবিচলতা,

ধর্, ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান খেলা হইত্যাসে। তুইও দেখলি, আমিও দেখলাম। হইতে পারে না? কিম্বা ধর্, পটলার বিয়াঘর, তুইও বরযাত্রী গেলি, আম্মো। হইতে পারে না? কিম্বা ধর, তুই আড্ডা মারছিস সাধনপল্লীর মোড়ে, আমি গুমটির তরে মাল কিন্যা ফিরত্যাসি বাজারের দিক থেকে। আচমকা বৃষ্টি নামল, তুইও ভিজলি, আম্মো ভিজলাম। হইতে পারে না? বলতে বলতে ঘোতনের সারা মুখে ফুটে ওঠে আচমকা একখানা-মাত্র বোড়ে ঠেলে দিয়ে রাজাকে মাৎ করে দেবার উদ্ধত তৃপ্তি। বলে, বল্, পারে না? বল্?

অম্বরীশ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে ঘোতনের মুখের দিকে। এতক্ষণে ভ্রূ-সঙ্গমে ঈষৎ ভাঁজ পড়ে তার। ঘোতনের সারা মুখমণ্ডল জুড়ে চরে বেড়ায় তার দু' চোখের মণিদুটো। কত কিছু আতিপাতি খুঁজে বেড়ায় সেখানে। কেমন যেন অস্বাভাবিক লাগছে ঘোতনের মুখখানা। দৃষ্টিতে সামান্য অপ্রকৃতিস্থতা। ঠোঁটের ওপর ঝুলে থাকা মিটমিটে হাসিটা নাগাড়ে দেখলে গা যেন কেমন শিরশির করে ওঠে।

ভেতরে ভেতরে কেমন ভয় করে অম্বরীশের। গলার পর্দা অনেকখানি নেমে যায়। বলে, এসব কী বলছ ঘোতনদা? কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা করছ? বৃষ্টি একসঙ্গে অনেকের গায়ে পড়তে পারে, খেলা একসঙ্গে অনেক মানুষ দেখতে পারে, কিন্তু একটা মাত্তর সামগ্রী, তুমি এবং আমি দুজনেই কুড়োবো কেমন করে? একি কখনও সম্ভব?

—সম্ভব নয়? আচমকা ঘোতনের হাতের জাঁতি থেমে যায়। ডান হাতের আঙুলগুলো আলগা হয়ে যায় জাঁতির গায়ে। সামনের আকাশে বিঁধে যায় দৃষ্টি। বিঁধে থাকে। ঠোঁটের ওপর ঝুলে থাকা মিটমিটে হাসিখানা খসে পড়ে মাটিতে। এক্কেবারে নিজের সঙ্গে কথা বলবার ভঙ্গিতে বলে ওঁঠে ঘোতন, তাইলে আর মারাদোনা হাত দিয়া গোল করায় আমি খেলাডা ছারলাম্ ক্যান? বল্, ক্যান ছারলাম খেলাডা? বলতে বলতে ঘোতনের চোখদুটো ডিমের কুসুমের মতো হরিদ্রাভ হয়ে ওঠে। মুখের যাবতীয় রেখা জুড়ে ফুটে ওঠে এক ম্রিয়মান ধ্বস্ত মানুষের ছবি। ফিসফিস করে, প্রায় নিজের সঙ্গে কথা বলবার ভঙ্গিতে বলতে থাকে, খেলাডা ছারার লগে আমার চাকরিডা গেল, পা দুইখান কাটা গেল, মাথার বেবাক চুল খইস্যা পরল..., বলতে বলতে আচমকা দপ করে জ্বলে ওঠে ঘোতনের চোখদুটি। ধাঁ করে অম্বরীশের দিকে মুখ ফেরায়। ঠোঁটদুটোকে প্রাণপণে ভাঙতে ভাঙতে বলে ওঠে, শুধু তুই কুরায়েছিস? শুধু তুই? সেলফিস জায়েন্ট কোথাকার! ঘোতনের সারা মুখ সহসা খুব হিংস্র হয়ে ওঠে। মুখের প্রতিটি রেখাকে অচেনা লাগে অম্বরীশের। তার মনে হয়, যে কোনও মুহূর্তে গুমটি থেকে লম্ফ দিয়ে নেমে পড়তে পারে ঘোতনদা, লেজখানা কুণ্ডলি পাকিয়ে, তার ওপর বসে, উঠে যেতে পারে মাঝ-আকাশে। সেখানে থেকে, রাবণের মাথা থেকে মুকুট কেড়ে নেওয়া অঙ্গদের ভঙ্গিতে, সে অম্বরীশের কাছে কৈফয়ত তলব করে বসতে পারে। মারাদোনার হাত দিয়ে গোল করবার যাবতীয় দায় অবলীলায় চাপিয়ে দিতে পারে অম্বরীশের মাথায়। বলতে পারে, শুধু তুই একলাই যদি কুরায়ে থাকিস গহনার পুঁটলিখানা, তবে আমার চাকরিডা ফিরায়ে দে। আমার ফুটবলখান ফিরায়ে দে। আমার পা' দুইখান ফিরায়ে দে। দে, দে, দে।

অনুষ্টুপ, ১৯৯৬

অভিমন্যু

কিছু কিছু মানুষ আছে যাদের দেখা মাত্রই সারা মন এক ধরনের অপ্রসন্নতায় ভরে যায়। প্লাটফর্মের যাত্রীদের মধ্যে ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে থাকা লোকটিকে দেখতে দেখতে বৈরাগ্যর মনে তেমনই এক অনুভূতি। না, লোকটা যে কোনো আদেখলাপনা করছে, তা নয়। কাউকে যে অকারণে বিরক্ত করছে, তাও নয়। তবুও লোকটিকে দেখতে দেখতে বৈরাগ্যর মধ্যে এক ধরনের অপ্রসন্নতা দানা বাঁধছিল। ক্যাটকেটে ফরসা, বেঁটে, হোঁদল-কুতকুত চেহারা, ফোলাফোলা গাল, থ্যাবড়ানো নাক, জোঁকের মতো পুরু ঠোঁট, গোল-গোল চোখদুটিতে বোকাবোকা চাউনি। লোকটি প্ল্যাটফর্মের একাংশ জুড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল অকারণে।

প্রথমে মনে হয়েছিল, জনারণ্যে কাউকে খুঁজছে বুঝি। কিন্তু খানিকবাদে বৈরাগ্য নিশ্চিত হয়, সম্পূর্ণ অকারণে ঘুরে বেড়াচ্ছে লোকটা। খদ্দরের একখানি ধুতি লুঙ্গির মতো করে পরেছে। গায়ে খদ্দরের আধ-ময়লা হাঁটু অবধি ঝোলা জামা। কপালে লাল রঙের তিলক। কাঁধে একখানা কাপড়ের ঝোলা। চোখেমুখে এক ধরনের হাবাগোবা ভাব। ঘুরে বেড়ানোর ধরনটিও খুব এলোমোলো ও উদ্দেশ্যহীন। কেন অমন করে ঘুরে বেড়াচ্ছে লোকটি? কাউকে ফলো করছে? কারোর ওপর নজরদারি করছে কৌশলে? লোকটাকে একটুক্ষণ লক্ষ করবার পর বৈরাগ্য নিশ্চিন্ত হয়, ব্যাপারটা তেমনও নয়। কারোর প্রতি কোনও বিশেষ মনোযোগ নেই ওর। শুধু ইতস্তত ঘুরে বেড়ানো ছাড়া লোকটির মধ্যে সন্দেহজনক কিছুই পায় না বৈরাগ্য। তবুও কেন লোকটাকে দেখতে দেখতে ওর সারা মন অপ্রসন্ন হয়ে উঠছে তার কারণটা বিশ্লেষণ করতে থাকে মনে মনে। এবং খানিকবাদে ওর মনে হয়, লোকটা উপস্থিত যাত্রীকুলের মধ্যে নিতান্তই বেমানান। গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেসের যাত্রী সবাই। ঝকঝকে পোশাক, চকচকে মুখ, ফ্যাশন-দুরস্ত বেশবাস, দামি দামি ভি-আই-পি লাগেজ, প্রজাপতির মতো বিচিত্র বর্ণের পোশাক পরা ছেলেমেয়ে, সব মিলিয়ে এক ধরনের বর্ণাঢ্য জৌলুসের সমাবেশ। ওদের মধ্যে একটা বদখত চেহারার মানুষ, রুচিবিরুদ্ধ পোশাক পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে অবিরাম...একদল পেখম তোলা ময়ূরের মধ্যে একটা দাঁড়কাক, সাদা চোখে দৃশ্যখানা বড়ই পীড়াদায়ক। হয়ত এটাই বৈরাগ্যর অন্তর্নিহিত অপ্রসন্নতার মূল কারণ।

ট্রেনের জন্য প্লাটফর্মে অপেক্ষা করবার বেলায় অতখানি নজর করবার মতো মানসিক অবস্থা থাকে না ইদানীং। আজকাল জার্নি মানেই আগাগোড়া ধারাবাহিক টেনশন। নিজেকে নিয়ে এতখানি বিব্রত ও উৎকণ্ঠিত থাকতে হয়, কী করে উঠব, কোথায় বসব, অন্যের দিকে দৃষ্টিপাত করবার ফুরসতই মেলে না। কিন্তু এই মুহূর্তে বৈরাগ্যর তেমন কোনো তাড়া নেই। কারণ, গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেস এখনও অবধি প্লাটফর্মে লাগেই নি। আজ যে কী হয়েছে গীতাঞ্জলির! ট্রেনটা ছাড়বার কথা ছিল দুপুর একটা দশ-

এ, কিন্তু প্রায় আড়াইটে বাজতে চলল, এখনও অবধি ট্রেন প্লাটফর্মে লাগলই না। ফলে, যাত্রীরা দাঁড়িয়ে-বসে অলস সময় যাপন করছে। প্রতীক্ষা করছে তীর্থের কাকের মতো।

বৈরাগ্য যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই নাকি ছ'নম্বর কোচখানা পড়বে। নিশ্চিত হওয়ার জন্য আশপাশের দু-চারজনকে জিজ্ঞেস করে নিয়েছে, ওরাও ছ'নম্বর কোচের যাত্রী কি না।

সকাল থেকে বৈরাগ্যর বুকের মধ্যে চিনচিনে ব্যথার মতো এক ধরনের অস্বস্তি। ইদানিং ট্রেনে-বাসে চড়ে দূরে কোথাও রওনা দেওয়ার প্রাক্কালে এমনটা হয় বৈরাগ্যের। ইদানিং জার্নিটা বড় ঝঞ্ঝাটের, ভয়ের, বিশেষ করে রাতের ট্রেন বা বাস জার্নিতে। অনেক কারণেই ভয়। প্রথম কারণ, ডাকাতি। আজকাল আকছার ডাকাতি হচ্ছে ট্রেনে। যাত্রী সেজে ডাকাতরা বসে থাকে কামরাতেই। কিংবা মাঝরাতে কোনও স্টেশনে যাত্রী সেজে উঠে পড়ে। এ ছাড়া ও রয়েছে, ট্রেনে-ট্রেনে মুখোমুখি সংঘর্ষ। ঘুমের মধ্যেই শরীরখানা তালগোল পাকিয়ে যাবে। ট্রেনের কামরায় আগুনও লেগে যায় হরবখত। যাত্রীদের সিগারেট থেকে, চা-ওয়ালার স্টোভ থেকে। এক কামরায় বিপদ হলে অন্য কামরায় চলে যাওয়ার জন্য ভেস্টিব্ল্ অবশ্য রয়েছে। কিন্তু রাতের বেলায় তো ওগুলো বন্ধ থাকে। আর, দুর্ঘটনাগুলো কেন জানি বেশিরভাগই ঘটে রাতের বেলায়, যখন কিনা চোদ্দআনা যাত্রী ঘুমিয়ে কাদা। ঘুমের কাছে মানুষ বড় অসহায়। ঘুমের মধ্যেও।

এই মুহূর্তে প্ল্যাটফর্মে গিজগিজ করছে মানুষজন। বৈরাগ্য ওদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে। এলেবেলে যাত্রীর সংখ্যা নিতান্তই কম। গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেসের যাত্রী বলে কথা! চেহারায়, বেশবাসে, ফ্যাশনে, চাউনিতে একটু তো স্বতন্ত্র হবেই। বৈরাগ্য লক্ষ করে জমায়েতে সব রকমের মানুষজনই রয়েছে। লেটেস্ট মডেলের বেশভূষার যুবক-যুবতী, ফিটফাট সাহেব-মেম, প্রজাপতির মতো বর্ণাঢ্য হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওদের ছেলেমেয়েরা। কুটকুট করে ইংরাজি বলছে নিজেদের মধ্যে। বেলবটস্, জিনস্, ঢোলা গেঞ্জি, শালোয়ার-কুর্তা, মিডিফ্রক, বারমুডা....। এত রঙের যে ক্যারিব্যাগ, ব্রিফকেস, স্যুটকেস, লাগেজ হয়, লাল টুকটুকে, ঘন নীল, চাকা লাগানো, ফিতে পরানো,....না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। একটা রেলওয়ে স্টেশন নাকি একটা পুরো দেশের অণু-ছবি। পুরো দেশটাকে এক নজরে দেখে ফেলা যায়। প্রত্যক্ষ করা যায় দেশটার অগ্রগতির স্বরূপ, তার বদলে যাওয়ার ধরনটা। বৈরাগ্যর মনে হয়, বিশ-পঁচিশ বছর আগে, এ দেশের প্ল্যাটফর্মের মানুষজন, তাদের বেশভূষা, আচার-আচরণ, ট্রেনের আকার-অবয়ব, দৌড়বার ধরন, এমনকি সিটি মারবার আওয়াজের সঙ্গে এখনকার প্ল্যাটফর্ম, ট্রেন ও যাত্রীদের কী বিপুল ফারাক! কতখানি স্মার্ট হয়ে উঠেছে আজকের মানুষ! কী পরিমাণ মর্ডান হয়েছে! বৈরাগ্য লক্ষ করে, চারপাশের যাত্রীদের মধ্যে খুব বেশি হলে কুড়ি পার্সেন্ট মানুষ ধুতি-শার্ট পরেছেন। আশিভাগই প্যান্ট-শার্ট। প্যান্ট-শার্টের ধরনও কত বদলেছে! মেয়েদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক শাড়ি। বাকিরা শালোয়ার-কুর্তা, বেলবটস্,জিন্স্, নয়ত মিডি-ফ্রক। বৈরাগ্য দেখে, বিশ-পঁচিশ বছরে প্রায় কোনও মেয়েই শাড়ি পরেনি। বিবাহিতা হলেও নয়। ওদের সবারই চুল ঘাড় অবধি ছোট করে ছাঁটা। দু'হাতের নখ লম্বা, সুচলো, রঙিন। ঠোঁটে চড়া লিপস্টিক। ভুরু কামানো। মুখে উগ্র প্রসাধন। সারা শরীর জুড়ে ভুরভুরে গন্ধ, এবং প্রত্যেকেরই কথার মধ্যে অন্তত ষাট ভাগ ইংরেজি শব্দ অথবা শব্দগুচ্ছ। ইংরাজি এবং নিজের মাতৃভাষাকে মিশিয়ে ককটেল বানিয়ে, এক

উদ্ভট ভাষা বানিয়ে নিয়েছে প্রায় সকলেই। ওই ভাষায় অবিরাম কথা বলে চলেছে অবলীলায়। গীতাঞ্জলির যাত্রী এরা সবাই। বম্বে অথবা তার আশেপাশে চলেছে। মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্তরাই সংখ্যায় বেশি। পরিবর্তনটা এদের মধ্যেই বেশি এসেছে বিগত দু'তিন দশকে। তলার মানুষ কমবেশি সনাতনী ধারাটাকে আঁকড়ে রাখবার চেষ্টা করছে, যদিও ওদের ছেলেমেয়েরা ওপরতলাকে অনুকরণ করতে চাইছে সস্তাভাবে।

দেখতে দেখতে প্ল্যাটফর্মেই ভাব জমে গেল অনেকেব সঙ্গে। হাতে অফুরন্ত সময় থাকলে যা হয়। ডাঃ মণীন্দ্র চন্দ্র। প্রতিষ্ঠিত সার্জন। সঙ্গে সুন্দরী বিদুষী স্ত্রী অরুন্ধতী। দাদা থাকেন বম্বেতে। স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে চলেছেন দাদার কাছে। ফিজিক্স-এর নামী গবেষক ডঃ গোলকপতি পালধি, স্যুট-বুট-টাই-পাইপে পাক্কা সাহেব, সস্ত্রীক চলেছেন বিজ্ঞানের একটি সেমিনারে যোগ দিতে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক কল্যাণ সান্যাল চলেছেন অজন্তা-ইলোরা দেখতে। সঙ্গে অসম্ভব সুন্দরী প্রায়-যুবতী মেয়ে মনীষা। রাজীব তরফদার নববধূ নিয়ে গোয়ায় চলেছেন হনিমুনে। চলেছেন স্টেট সার্ভিসের অফিসার স্বপন ঘোষ, স্বরাজ বটব্যাল এবং প্রশান্ত বাগচি। সবাই মধ্যবিত্ত চাকুরে যুবক। টগবগে। গিয়াসুদ্দিন সাহেব, দেখলেই মালুম হয় রইস আদিম, সঙ্গে বেগমসাহেবা, মুখভর্তি জর্দাপান, ভুরভুরে গন্ধ ছেড়েছে। ওমপ্রকাশ আগরওয়াল, গারমেন্টেস বিজনেসম্যান, ব্রেবোন-রোতে বিশাল শো-রুম। পবনকুমার শর্মা, ভুঁড়িওয়ালা দশাসই মানুষ, পরনে দামি ধুতি, সিল্কের শার্ট, দামি কোট, গলায় সোনার চেন, দু'হাতে পাঁচ-ছটা বহুমূল্য পাথরখচিত আংটি। বউটির গায়ের রঙ কাঁচা সোনার মতো। এককালে ডাকসাইটে সুন্দরী ছিলেন বোঝা যায়। এখন ফুলতে ফুলতে কোলা-ব্যাঙ। চোখের কোলে পুরু মেদ, চিবুক-ঠোঁট মিলেমিশে একাকার। ভুরুজোড়া, ওজন বৃদ্ধির ফলে, নাচতে চায় না সহজে। ভারি বিছেহার গলায়। সারা মুখে একটি মাত্র লক্ষণীয় বস্তু হলো নাকের পাটায় বসানো হীরের নাকছাবিটি। এই নভেম্বরের বিকেলেও গলগলিয়ে ঘামছেন। ছোট ছেলে দীপকুমার শর্মা। আই-আই-টি থেকে ইলেকট্রনিক-ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে আমেরিকা যাচ্ছে উচ্চশিক্ষা নিতে। পাসপোর্ট তৈরি। বছর চব্বিশ-পঁচিশের ঝকঝকে যুবক। সারা মুখে বুদ্ধি ও মেধার ছাপ।

পৃথিবীটা যে সবদিক থেকে গোল, মাঝে মাঝে তেমন প্রমাণ হাতেনাতে পাওয়া যায়। নইলে, প্ল্যাটফর্মের জনারণ্যে আচমকা স্কুল ও কলেজের দু'জন সহপাঠীর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে কেন! যা হয়, প্রথমে একটুখানি 'চিনি চিনি' গোছের ভাব, পরমুহূর্তেই 'হা-ই সুপ্রভাত। হোয়াট আ প্লেজ্যান্ট সারপ্রাইজ!' গোছের তূরীয়ানন্দতে পৌঁছে যাওয়া।

—আমাকে তোর মনে আছে, বৈরাগ্য?

—মনে নেই? তোর ডাকনাম তো বেণু। রাইট?

—আরে, কেশব যে! তুই কদ্দুর। ইস্ কী ভালো যে লাগছে!

বেণু কলেজের বন্ধু। খুবই দহরম-মহরম ছিল দু'জনায়। কিন্তু বেশি বয়েসের বন্ধুত্ব তো, সিমেন্ট-বালির অনুপাত এক-পাঁচ দিলেও ঠিকঠাক জমে না। সেই অনুপাতে কেশবের সঙ্গে প্রাণের যোগটা অনেক বেশি অনুভব করে বৈরাগ্য। কারণ কেশব ওর স্কুল জীবনের বন্ধু। ফাইভ থেকে ইলেভেন। হস্টেলেও রুমমেট। তিন বন্ধুতে সময় কেটে যায় তরতরিয়ে। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের খোঁজখবর নেয়। তিনজনেই প্রতিষ্ঠিত। প্রাইভেট ফার্মে ভালো পদে। বেণু চলেছে, বদলির অর্ডার পেয়ে, বোম্বাইতে, নতুন

কর্মস্থলটা চাক্ষুষ দেখে আসতে। কেশব চলেছে কোম্পানির কাজে। প্রাইভেট কোম্পানির বড় একজিকিউটিভ সে। এই মধ্য-চল্লিশে তার কপাল-লাগোয়া মসৃণ টাক। সারা মুখে পদমর্যাদার পুরু মাখন-প্রলেপ। কথাবার্তায় বেরিয়ে এলো আরও একজন পরিচিত মানুষ। কমলাক্ষ সরকার। থাকেন চক্রবেড়িয়ার যে বাড়িতে, তার পরের বাড়িতেই বৈরাগ্যরা ভাড়া ছিল বেশ কিছুদিন। কথায় কথায় পাড়ার এর-ওর প্রসঙ্গ ওঠে। কেউ মরে গিয়েছে, কেউ বেঁচে রয়েছে, কেউ উন্নতি করেছে, কেউ তলিয়ে গিয়েছে...। কমলাক্ষর বড় মেয়ে কস্তুরী বৈরাগ্যের এক প্রিয়জনের বড় মেয়ের বন্ধু। ওঁর ছোট মেয়ে রিয়া, বৈরাগ্যের কোন্ এক প্রাক্তন প্রতিবেশিনীর বাবার কাছে কোচিং নেয়। ধীরে ধীরে কমলাক্ষবাবু সপরিবারে নিতান্তই পরিচিত বলে গণ্য হয়ে যান বৈরাগ্যর কাছে। ছেলে নীলাদ্রি বিশ-বাইশ বছরের যুবক। বি-টেক-এর ছাত্র। ওর বন্ধু তিলকেশ ল' পড়ে হাজরা ল' কলেজে। দু'জনের মধ্যে গলায় গলায় ভাব। বৈরাগ্য দেখল।

দূর দেশে রওনা দিতে গিয়ে প্লাটফর্মেই যদি দু-দুজন সহপাঠী এবং একজন প্রাক্তন পাড়াতুতোকে সহযাত্রী হিসেবে পাওয়া যায়, তবে ট্রেনটাকে আর তেমন অপরিচয়ের রাজ্য বলে মনে হয় না। তখন মনে এক ধরনের সাহস জন্মায়। আত্মবিশ্বাসটা ফিরে আসে। মনে হয়, একেবারে তেপান্তরে পড়ে নেই আমি। পরিচিতদের মধ্যেই রয়েছি, আপনজনদের বেষ্টনীর মধ্যেই। একা মানুষ সবতাতেই ভয় পায়। একা মানুষ প্রয়োজনের মুহূর্তে বড়ই অসহায়। মানুষের মনে সাহস ফিরে আসে, যখন সে দাঁড়ায় মানুষের পাশে। যখন তার চারপাশের দলবদ্ধ মানুষ সম্প্রীতির শেকল বানায়। যখন দু'জন মানুষ দু'দিক থেকে হাত রাখে কাঁধে। বৈরাগ্যের মনে স্বস্তি নেমে আসে। সকাল থেকে একটু একটু করে বাড়তে থাকা বুকের মধ্যেকার চিনচিনে ব্যথাটা কখন যেন উধাও হয়ে যায়। সে এখন একা নয়। বন্ধু, বন্ধুপ্রতিম এবং সুজন মানুষজনের সাহচর্যেই থাকছে সে। বৈরাগ্যর খুব নিরাপদ মনে হয় নিজেকে।

কেবল ওই ইতস্তত ঘুরতে থাকা লোকটা। ওকে দেখতে দেখতেই বৈরাগ্যর মনে যা একটুখানি অস্বস্তিকর অনুভূতি। কেবল ও-ই নয়, বৈরাগ্যর নজরে পড়েছে, সমগোত্রীয় আরও একজনকে। সে-ও ওই একই ধরনের পোশাক পরে দাঁড়িয়ে রয়েছে একপাশে। তার সামনে ঝোলা-ঝুলি, বোঁচকা-বুঁচকি ডাঁই করে রাখা। লোকটার বয়েস পঞ্চাশের ওপর। রোগা, ঢ্যাঙা, পাকানো-চিমসানো শরীর। শুকনো হরতকির মতো লম্বাটে মুখ। খাড়াই নাক। লম্বা সরু গলা। শরীরটা সোজা হয়ে ঝুঁকে পড়েছে সামনে। প্রথম দর্শনেই বৈরাগ্যর মনে হয়, একটা ধনেশ পাখি। লোকটিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নজর করতে থাকে বৈরাগ্য। লোকটির দৃষ্টি শীতল। সামনের দিকে স্থির। বৈরাগ্যর মনে হয়, ওরা দু'জন পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। সম্ভবত একসঙ্গেই চলেছে। একজন স্থির, শীতল, অনড়। অন্যজন অকারণে ঘুরে বেড়াচ্ছে যাত্রীদের মধ্যে। দাঁড়িয়ে থাকা লোকটিকে দেখতে দেখতে কেন জানি এক ধরনের চাপা অস্বস্তি জাগে মনে। তবে এতগুলি পরিচিত মানুষের উষ্ণতায় সে অস্বস্তি স্থায়ী হয় না।

দুই

এমন একদল সুজন সহযাত্রীর সঙ্গে ট্রেনজার্নির একটা সুবিধাজনক দিক হলো, সবাই খুব মার্জিত, সুশৃঙ্খল। ট্রেনের কামরায় উঠতে গিয়ে তাই ঠেলাঠেলি ধস্তাধস্তি হলো না বললেই চলে। স্যুটকেস-ব্যাগ ইত্যাদি রাখা নিয়ে কোনো তিক্ত কাজিয়াও নয়। ওঠা, বসা, মালপত্তর রাখা সবকিছুতেই সফেস্টিকেশন। মসৃণতা। বৈরাগ্য বিবেচনা করে যে এবারের ট্রেনজার্নিতে সে ট্রেনের এমন একখানি কামরা পেয়ে গেছে, যেখানে অধিকাংশই শিক্ষিত-মার্জিত, ভদ্র-সজ্জন ব্যক্তি। ধনেশ পাখি এবং তার সাকরেদ ছাড়াও দু'চারজন দেহাতি গোছের লোক অবশ্যই উঠেছে। গোটা-দুই কুৎসিতদর্শন মস্তান চেহারার যুবকও। একটা খনখনে বুড়ো। জনাকয় পাতি-গেরস্ত গোছের মানুষ। কিন্তু পুরো কামরার অনুপাতে ওদের সংখ্যা বেশ কম। সাধারণত এমনটা দেখা যায় না যে একটা কামরার বারোআনা শিক্ষিত-মার্জিত, জ্ঞানী-গুণী, ভদ্রমানুষ। বরং আজকাল ট্রেনে-বাসে উঠলেই বৈরাগ্য সুজন মানুষের নিদারুণ অভাব বোধ করে। মনে হয়, দুনিয়ার যত রূঢ়ভাষী, অভদ্র, স্বার্থপর, উচ্ছৃঙ্খল এবং সুযোগ-সন্ধানী ধান্দাবাজ মানুষগুলি বুঝি একসঙ্গে শলাপরামর্শ করেই উঠে পড়েছে ট্রেনের কামরায়। ট্রেনে ওঠা থেকে নামা অবধি পুরোটা সময় শুধুই নিজের কোলে ঝোল টানবার দৃষ্টিকটু প্রতিযোগিতা। কেউ কাউকে এক ইঞ্চি জমি বিনা যুদ্ধে ছেড়ে দেবে না। সামান্য ব্যাপারে রেগেমেগে কাঁই। চিল্লিয়ে মাত করে দেবে পুরো কামরা। মানুষ যে সারভাইভাল অব্ দা ফিটেস্ট থিয়োরিতে বেড়ে উঠেছে, আজকাল ট্রেনে-বাসে উঠলেই তা হাড়ে হাড়ে বোঝা যায়। আর মানুষ যে কত অপরিচ্ছন্ন জীব, সেটাও মালুম হয় হাড়ে হাড়ে, যখন সিগারেটের খালি প্যাকেট, টুকরো, কমলালেবুর খোসা, খাবারের প্যাকেট ইত্যাদি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আধঘণ্টার মধ্যেই পুরো কামরাটাকে নরক বানিয়ে ফেলে। ট্রেনে দূরপাল্লার জার্নি আজকাল তাই বিরক্তিকর, বিপজ্জনক, আতঙ্ককর হয়ে উঠেছে বৈরাগ্যর কাছে। আজই হঠাৎ কোনো এক অলৌকিক জাদুতে একটি কামরার বারোআনা মানুষই ভদ্র-সুজন, জ্ঞানী-গুণী, বন্ধুপ্রতিম এবং সহৃদয় সামাজিক হয়ে উঠেছে। ভাগ্যে বিশ্বাস করে না বৈরাগ্য, নইলে নির্ঘাত বলত, আজ ওর কপালখানা খুব ভালো।

ইতিমধ্যেই কামরার মধ্যে নিজেদের গুছিয়ে-গাছিয়ে নিয়েছে সবাই। এবং কী আশ্চর্য, সিট-নম্বর একটু-আধটু এলোমেলো অসুবিধেজনক যা ছিল, নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ঠিকঠাকও করে নিয়েছে। কমলাক্ষ সরকারের কিশোরী মেয়ে রিয়াকে জানলার পাশের সিটখানা ছেড়ে দিয়েছেন স্বপন ঘোষ। নিজেরা প্যাসেজের দিকে সরে গিয়ে রাজীব তরফদারকে তাঁর নববধূর কাছটিতে বসবার সুযোগ করে দিয়েছেন গিয়াসুদ্দিনসাহেব। ডঃ পালধির ওয়াটার বটলে জল ভরে এনে দিল কমলাক্ষবাবুর ছেলে নীলাদ্রি। রাতেরবেলায় কোন্ বার্থে কে শোবে, বয়স ও শারীরিক সামর্থ্য বিবেচনা করে সে ব্যাপারেও একটা সুবিধাজনক বিলিব্যবস্থা করা গেছে, টিকিটের গায়ে চাপানো বার্থনম্বরগুলিকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে। এমনকি সন্ধের আগে আগে গিয়াসুদ্দিনসাহেবকে নমাজ পড়বার সুযোগ করে দিতে অন্যরা খোপ থেকে বেরিয়ে গিয়ে প্যাসেজে ঘোরাঘুরি করেছেন। বহুদিন বাদে একটা পারিবারিক স্বাদ পাচ্ছে বৈরাগ্য, যা ট্রেনের কামরায় ইদানীং আর স্বপ্নেও আশা করা যায় না। ক্রমশ বৈরাগ্যর বিশ্বাসটা

দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছিল, বহুদিন বাদে একটা মনোরম ট্রেনজার্নি হবে।

ছ'টি বার্থ নিয়ে এক-একটি খোপ। কমলাক্ষরা ছ'জন। পাঁচজন রয়েছেন একটি খোপে। ষষ্ঠ বৈরাগ্য। অন্যদিকে নীলাদ্রির বন্ধু তিলকেশ পড়ে গিয়েছে পাশের খোপে। বন্ধুবিচ্ছেদে মনমরা। বৈরাগ্য হাসিমুখে তিলককে ছেড়ে দিয়েছে নিজের সিটখানা। নিজে চলে গিয়েছে পাশের খোপে। ওদিকে' অধ্যাপক কল্যাণ সান্যাল ও তাঁর মেয়েকে পাশের খোপের জানলার ধারের সিট ছেড়ে দিয়ে কেশব আর বেণু চলে এসেছে বৈরাগ্যর কাছে। বৈরাগ্যদের খোপে বৈরাগ্যরা তিনজন ছাড়াও রয়েছেন সস্ত্রীক ডঃ পালধি এবং প্রশান্ত বাগচি। ধনেশ পাখি সাকরেদসহ ঠাঁই নিয়েছে প্যাসেঞ্জের উল্টোদিকে লম্বালম্বি দু'বার্থওয়ালা সিটদুটোতে। ওপরের বার্থখানাতে মালপত্তর রেখেছে। নিচের সিটদুটোকে জোড়া দিয়ে বার্থ বানিয়ে মুখোমুখি বসেছে দু'জন। বারোআনা দখল করেছে ধনেশ পাখি, চারআনা পেয়েছে সাকরেদ। নিজেদের জায়গায় বসা ইস্তক বিড়বিড় করে কী সব বকে চলেছে সাকরেদ। ধনেশ পাখি, সিলিং ফ্যানের ওপর দৃষ্টি স্থির রেখে, ব্যাক-সিটে শরীরখানা ঠেসিয়ে বসে রয়েছে ভাবলেশহীন।

ট্রেন ছাড়বার পর শুরু হয়ে যায় যে-যার মতো করে সময় কাটানোর খেলা। গল্পগুজব, আড্ডা-গসিপ...। 'ক'টায় ছাড়বার কথা, ক'টায় ছাড়ল' দিয়ে শুরু করে, তা থেকে ক্রমশ রেল দপ্তরের অপদার্থতা, দুর্নীতি, তা থেকে বোফর্স, হাওলা, হর্ষদ মেহতা, সুরেশ জৈন, নির্বাচনে কংগ্রেসের ভরাডুবি, বি-জে-পি-র উত্থান, ভারতের হিন্দুত্ব, তা থেকে মৌলবাদ, কুসংস্কার...কোথা থেকে যে কোথায় চলে যাচ্ছে আলোচনা! কোনও খোপের আলোচনা হয়ত-বা ততক্ষণে পৌঁছে গিয়েছে খাদ্যসমস্যা, অবাধ অর্থনীতি, পারমাণবিক বোমা, মহাকাশ বিজ্ঞানে ভারতের সাফল্য ইত্যাদি আধুনিক বিষয়ে। ডঃ পালধি বেশ সিরিয়াস ভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করছিলেন পদার্থবিদ্যার উন্নতির খতিয়ান। বিজ্ঞান, বিশেষ করে ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং যে আগামী দিনে পৃথিবীতে কী অসম্ভব ব্যাপার ঘটিয়ে দিতে পারে, তার একটা তালিকা পেশ করছিলেন। এবং তাঁর বক্তব্য মতে, এ বিষয়ে ভারতও প্রথম সারিতেই থাকবে। কারণ, অত্যন্ত গোপনে ভারত বিজ্ঞানের কয়েকটি অত্যাধুনিক শাখায় ভেতরে ভেতরে নাকি এতটাই উন্নতি করেছে, যা পশ্চিমের দেশগুলো কল্পনাও কবতে পারে না। আলোচনা চলছে সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে, উগ্রপন্থা নিয়ে, নেতাদের ভণ্ডামি নিয়ে। মূলত বড়রাই মেতে গিয়েছে এমনতর আলোচনায়। এরই মধ্যে ছেলেমেয়েরা কলকল করছে নিজেদের মধ্যে। বেশ জড়ানো জড়ানো আদুরে ইংরেজি। এলভিস প্রিসলে, মাইকেল জ্যাকসন, বেন জনসনরা আনাগোনা করছেন ঘন ঘন। আলোচনায় এসে যাচ্ছে এ দেশীয় লিয়েন্ডার পেজ এবং অক্শয়রা। গুনগুন করে গান করছে কেউ ওপরের বার্থে শুয়ে শুয়ে। কমলাক্ষর স্মার্ট মেয়ে রিয়া কানে ইয়ারফোন লাগিয়ে গান শুনছে মগ্ন হয়ে। গানের তালে তালে পা দিয়ে মৃদু তাল ঠুকছে মেঝের ওপর। পাশের খোপ থেকে নীলাদ্রি মাঝে মাঝেই বৈরাগ্যর উদ্দেশে বলে উঠছে, আংকেল, কিছু দরকার হলে বলবেন। জনে জনে পেঁড়া বিলোচ্ছেন পবনকুমার শর্মা। দক্ষিণেশ্বররের কালী মাঈয়ের প্রসাদ। পুত্র দীপকুমারের উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশযাত্রা উপলক্ষ্যে পুজো দিয়েছিলেন মা'কে। এ তো ভারি সুখের কথা, আনন্দের কথা, এমন ছেলের বাপ হিসেবে আপনার গর্বিত হওয়া উচিত,—বলতে বলতে জনে জনে হাত পেতে নেয় মায়ের প্রসাদ। বলে, সব্বাইকে

বিলোতে গেলে ফুরিয়ে যাবে যে। বাড়ি অবধি পৌঁছুবে না। পবনকুমার কর্ণপাত করেন না এমন কথায়। প্রসাদ কখনও শেষ হয় না।

বৈরাগ্য খুব বিনীত ভঙ্গিতে বলে, আমি কিন্তু ঠাকুর-দেবতা মানি নে। প্রসাদ-টসাদও খাই নে তাই। তবে, একটা শুভ উপলক্ষ্যে মিষ্টি বিতরণ করছেন আপনি, রিফিউজও করতে পারছি না তাই। বলতে বলতে সসঙ্কোচে হাত পাতে বৈরাগ্য, আপনি প্রসাদ হিসেবে দিলেন, আমি মিষ্টি ভেবে খেলাম।

—সে আপনি যো ভেবেই খান, কাম যা হবার হবেই। ইলেকট্রিকের তার, মামুলি তার ভেবে ছুঁলেও শক মারবে, রস্‌গুল্লা ভেবে ছুঁলেও শক মারবে। পবনকুমারজি অমায়িক হাসেন।

কমলাক্ষবাবুর বড় মেয়ে কস্তুরীর পেছনে লেগেছে নীলাদ্রি আর তিলকেশ। কী একটা ব্যাপার নিয়ে অনবরত খ্যাপাচ্ছে ওকে। কস্তুরী ভয়ানক রেগে যাচ্ছে। বৈরাগ্যকে কথাটা বলতে যেতেই আরও খেপে যায় কস্তুরী। নীলাদ্রি বলে, জান বৈরাগ্য আংকল্‌, কস্তুরীর খুব ভূতের ভয়। ট্রেনের কামরায়ও ভূত থাকতে পারে, এমন ভয় পাচ্ছে ও। কস্তুরী এতটাই রেগে যায় যে, উঠে এসে দাদার পিঠে দুমদুম কিল বসিয়ে দেয়।

মস্তান গোছের ছোকরাদুটো বসেছে দু'তিনটে খোপ পরে। মাঝে মাঝে পর্যায়ক্রমে প্যাসেজ দিয়ে হাঁটাহাঁটি করছে। চোরা চাউনি হানছে সুন্দরী মেয়েগুলোর শরীরে। বৈরাগ্য লক্ষ করে, ছোকরাদুটোর বয়েস তিরিশের মধ্যে। একটার গায়ের রঙ ঘোর কালো। মুখে পুরনো বসন্তের গভীর দাগ। অন্যটার রঙ কটা। চোখের মণি, মাথার চুল, ভুরু, এমনকি গায়ের রোম অবধি লালচে। কালোটা লম্বায় একটু খাটো। কটাটার চোখদুটো সামান্য ট্যারা। বেশ পেটাই শরীর দু'জনেরই। কালোটার গলায় চাকতিসহ রুপোলি চেন। কটাটার হাতে স্টিলের বালা। কালোটার চোখের মণিতে হিংস্রতা, গোঁয়ার্তুমি। কটাটার চোখে শেয়ালের ধূর্ততা। নিজেদের সিটে থিতু হয়ে বসছিল না ছোকরাদুটো। খালি একা-একা কিংবা জোড়ায় কামরাময় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কখনও দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেটের ধোঁয়া দিয়ে রিংয়ের পর রিং বানিয়ে চলেছে। কখনও বাথরুমে ঢুকছে। কখনও বাথরুম সংলগ্ন বেসিনের ওপরে বসানো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পরিপাটি করে চুল আঁচড়াচ্ছে। আঁচড়িয়েই চলেছে। বৈরাগ্যের সন্দেহ হয়, চুল আঁচড়ানোটা বাহানা, সম্ভবত আয়নার ভেতর দিয়ে কোনো সুন্দরী মেয়ের প্রতিবিম্বখানা দেখছে। বৈরাগ্যর এমনটা মনে হওয়ার কারণ আছে। একটু আগে চুল আঁচড়াতে দেখল কটাকে। কটা ফিরে যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কেলো এসে একই ভঙ্গিমায় চুল আঁচড়াতে লাগল অনেকক্ষণ ধরে। ছোকরাদুটোর শরীরে অনিয়ম আর উচ্ছৃঙ্খলতার ছাপ সুস্পষ্ট। খালি উসখুস করছে তখন থেকে। এক ধরনের অস্থিরতা ছোকরাদুটোকে নিজেদের সিটে কিছুতেই স্থির হয়ে বসে থাকতে দিচ্ছে না। প্লাটফর্মেই দেখেছিল, ট্রেনে ওঠারপরও দেখছে, খুব বেশি মালপত্তর নেই ছোকরাদুটোর। একটা করে সাইড ব্যাগ, তাও মাঝারি আকারের, সস্তা রেক্‌সিন দিয়ে তৈরি।

এইমাত্র বৈরাগ্যর সামনে দিয়ে মৃদু শিস দিতে দিতে চলে গেল কটা। যেতে যেতে ঝলকে ঝলকে চোরা চাউনি ছুঁড়তে লাগল খোপগুলোর মধ্যে। বৈরাগ্য জানে, এরাই একটু পরে শের বনে যায় প্রতিটি কামরায়। মদ খায়, হুল্লোড় করে, চিৎকার করে গান গায়, মেয়েদের প্রতি অশালীন আচরণ করে। কামরার অন্য যাত্রীদের সুবিধে-

অসুবিধের তিলমাত্র তোয়াক্কা না করে এরা যা খুশি তাই করে। সাধারণ যাত্রীরা, যাঁরা কনিষ্ঠজনকে অন্যায়ের প্রতিবাদ করবার পরামর্শ দিলেও নিজেরা 'পথিমধ্যে উটকো ঝামেলা' পছন্দ করেন না, সহনশীলতার বিনিময়ে শান্তি ক্রয় করেন।

কটা এগিয়ে চলেছে বাথরুমের দিকে। উল্টোদিকের দরজায় দাঁড়িয়ে খুব হেঁড়ে গলায় ওকে কী একটা নির্দেশ দিল কেলো। বৈরাগ্য বুঝতে পারে না কথাগুলো। তবে ও নিশ্চিত, আজকে ট্রেনের কামরার পরিবেশটাই এমন, এরা খুব সুবিধে করতে পারবে ন। ঝকঝকে জায়গায় যেমন মাছি বসতে পারে না, পিছলে যায়, এদের অবস্থাও তেমনই।

ট্রেন ছাড়বার পর থেকেই ধনেশ পাখি আসনপিঁড়ি বসে শিরদাঁড়া টানটান করে চোখ বুঁজে ছিল। এখনও অবধি তার ওই মুদ্রা অব্যাহত রয়েছে। সাকরেদটা বসে বসে এলোমেলো তাকাচ্ছে এদিক-ওদিক। কামরার প্রায় সবাই প্রথম থেকেই খুব তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখছিল ওদের। কারও কারও চোখে ছিল চাপা সন্দেহ। এরা হল মিচকে শয়তান, এমন সুন্দর স্বাস্থ্যকর পরিবেশে যাকে বলে কাবাব মে হাড্ডি। পোশাক-আশাকে মেলে না, আচার-আচরণে মেলে না, কেমন একটা চোর-চোর লম্পট-লম্পট ভাব।

ডঃ পালধি একসময় চাপা গলায় বলেন, হাইলি সাসপিসিয়াস। দেখলেই মনে হয় খারাপ মতলবে রয়েছে।

মিসেস পালধি সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন, এরাই তো দূরপাল্লার ট্রেনে নানান ধরনের কাণ্ড ঘটায়। যাত্রী সেজে উঠল, তারপর কামরার সবাই যখন ঘুমল, অমনি শুরু হল আসল খেল। ট্রেনে-বাসে তো আজকাল এমনি করেই চুরি-ডাকাতিগুলো হয়।

কেশব বলে, হয়ত এরা দু'জন নয়। হয়ত এই কামরাতেই ওদের আরও সাকরেদ বসে রয়েছে যাত্রী সেজে। যথা সময়ে নিজমূর্তি ধরবে।

বেণু বলে, আমার কিন্তু ওই গুন্ডা গোছের লোকদুটোকেও খুবই সন্দেহ হচ্ছে।

নীলাদ্রি একফাঁকে এসে বৈরাগ্যর কানে কানে বলে যায়, আংকেল, বাবা বলল, সাইড-বার্থের দুজনকে সুবিধের ঠেকছে না। মালপত্তর সাবধান।

তিন

খড়গপুরে সামান্য সময় দাঁড়িয়েছিল গাড়ি। তার পরে জোর স্পিড নিয়েছে।

একমনে পাজ্‌ল খেলছে কস্তুরী। পাশের খোপে মনীষা সান্যাল একখানা সিনেমা-ম্যাগাজিনের মধ্যে ডুবে রয়েছে। পাশ থেকে ঝুঁকে পড়ে রগরগে ছবিগুলো দেখে নিচ্ছেন ডাঃ মণীন্দ্র চন্দ্রর স্ত্রী অরুন্ধতী। কানে অডিও-ফোন নিয়ে এখনও বুঁদ হয়ে রয়েছে রিয়া। মেঝেতে পা ঠুকেঠুকে তাল দেওয়া দেখে মালুম হলো পপ-টপ গোছের কিছু বাজছে। রিয়ার সারা শরীর তালে তালে দুলছে। মনে হয়, পারলে ও উঠে দাঁড়িয়ে নাচতে শুরু করে। নাচছে না, কিন্তু চোখের তারায় ঝিলিক মারছে গানের সুর, পাতলা ঠোঁটে জমছে তার যাবতীয় মদালসা আবেদন। গাঢ় নেশায় বুঁদ হয়ে রয়েছে রিয়া। সারা মুখে উগ্র তৃপ্তির ছাপ।

গুনগুন করে গল্প জুড়েছে বৈরাগ্যরা তিনজন। নিজেদের ব্যক্তিগত সুখদুঃখের কথা বলছে।

নিজের কথা বলতে গিয়ে বেণুর গলায় হতাশা। বলে, কী আর হলো বল্, জীবনে? পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করলাম, কিন্তু দ্যাখ্, কোথাও তেমন সাইন করতে পারলাম না। আমার ভাগ্যটাই খারাপ।

আধুনিক শিক্ষিত ছেলে, কথায় কথায় ভাগ্যের দোহাই দিলে আগে খুব রাগ হয়ে যেত বৈরাগ্যর। এখন আর ততখানি খেপে ওঠে না। বরং হাল্কা শ্লেষের মাধ্যমে খোঁচা মারবার চেষ্টা করে। বেণুর কথায় গলায় কপট গাম্ভীর্য এনে বলে, ভাগ্য-টাগ্য বাজে কথা, আসল কথা হলো, লাক।

—ইয়ার্কি নয়। বেণুর গলায় আরও হতাশা, লাকটা একটুখানি ফেভার করলে আমি আজ কোথায় উঠে যেতাম।

—তো বসে রয়েছিস কেন? কেশবের চোখের কোণে ঝিলিক মারে হাসি, হাত-টাত দেখা, কোনও জ্যোতিষার্ণবের কাছে গিয়ে পাথর-টাথর পর্।

—তুই এক কাজ কর্। কেশবের মুখের কথা কেড়ে নেয় বৈরাগ্য, তুই বাবা তারকনাথের মাথায় জল ঢাল্। বাঁকে করে জল নিয়ে পায়ে হেঁটে যাবি কিন্তু। শুনেছি, চৌষট্টি রোগ ভালো হয়। এছাড়া, মামলায় জয়, কন্যার বিবাহ, চাকুরিলাভ, পদোন্নতি, শত্রুবিনাশ, প্রেমে সাফল্য,—খুব ওয়াইড রেঞ্জে কাজ করে বাবার আর্শীবাদ।

তেরচা চোখে তাকায় বেণু। বলে, ধর্মকে নিয়ে টিটকিরি করার অভ্যেসটা তোর যায়নি দেখছি। এখনও নাস্তিক রয়ে গেলি। কেশব আর বৈরাগ্য পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করে। মুখ টিপে হাসে।

কেশব বলে, তোর মনে আছে বৈরাগ্য? সেই স্কুল হস্টেলে, মুরারি না কী যেন ছেলেটার নাম, ওই যে মৃগী সারাতে সারাক্ষণ মাদুলি পরে থাকত গলায়?

মনে নেই আবার! বৈরাগ্য হাসে। বেণুকে শোনায় ঘটনাটা।

স্কুল হস্টেলে ওদের সঙ্গে মুরারি বলে একটা ছেলে থাকত। ছেলেটার মৃগী ছিল। হোমিওপ্যাথি, অ্যালোপ্যাথি অনেক কিছু করেছে। শেষে কোন সাধু যেন ওকে একটা মাদুলি দিল। কালো সুতোয় বেঁধে পরে থাকতে হবে গলায়। মাদুলিটা পরবার পর থেকে মুরারির মৃগীর টানটা আর হচ্ছিল না। আগে হস্টেলের পুকুরে চান করতে নামত না, ধীরে ধীরে সাহসটা ফিরে আসতেই নামতে লাগল জলে। কিন্তু সাঁতার কাটতে গিয়ে, ডুব দিতে গিয়ে, পাছে মাদুলিটা খুলে পড়ে গলা থেকে, সেই ভয়ে ওটা বৈরাগ্যদের কারও কাছে জমা রেখে যেত। বৈরাগ্যরা ওটা পকেটে পুরে রাখত। ওই অবস্থায় আমগাছে-জামগাছে চড়ে ফল-পাকুড় পাড়ত, নিজেদের মধ্যে কুস্তি-মারামারি চালাত। একদিন কোন ফাঁকে মাদুলিটা পড়ে গেল বৈরাগ্যর পকেট থেকে। যখন খেয়াল হলো সেটা, মুরারি তখন মাঝ-পুকুরে মনের আনন্দে হুটোপুটি করছে বন্ধুদের সঙ্গে। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে বৈরাগ্যর। কেশবকে চুপিচুপি ব্যাপারটা বলে। দু'জনে মিলে খানিকক্ষণ আঁতিপাতি খোঁজে। কিন্তু ওই ঝোপঝাড়ের মধ্যে কোথায় পাবে ওইটুকু মাদুলি! ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল বৈরাগ্য। মাথাটা ঠিকঠাক কাজ করছিল না ওর। অবশেষে মুশকিল আসান করল কেশবই। এক দৌড়ে জ্ঞানবাবুর বিশ্বকর্মা ভাণ্ডার থেকে একেবারে একই রকম দেখতে একখানা মাদুলি কালো সুতোয় বেঁধে নিয়ে ফিরে এল পুকুরঘাটে। কাদামাটিতে ঘসে ঘসে ময়লা মতো করে নিল, তারপর এগিয়ে দিল বৈরাগ্যর দিকে।

—তারপর? বিস্ফারিত চোখে তাকায় বেণু।

—তারপর আর কি? মুরারিকে যথাসময়ে ফেরত দিয়ে দিলাম মাদুলি। ও গলায় পরে দিব্যি ঘুরতে লাগল।

—মৃগীর টান আবার শুরু হলো না?

—পাগল! ওটার জন্যই বন্ধ ছিল নাকি? ওগুলো সব বুজরুকি।

—বুজরুকি তো বটেই। কত লোক ওই সব নিয়ে করে খাচ্ছে। স্বীকার করে বেণু, তবে মনে হয়, এগুলোর একটা সাইকো-এফেক্ট রয়েছে। মনেই তো অধিকাংশ রোগের সৃষ্টি। মনটাকে কোনও গতিকে স্ট্রং করে দিতে পারলে রোগীর আত্মবিশ্বাস ফিরে আসে। সে তখন অটো-সাজেশন নিতে শুরু করে। পজিটিভ অটো-সাজেশন। রোগটা অনেক সময় তাতেই সেরে যায়।

বৈরাগ্য ফ্যালফ্যাল কবে তাকিয়েছিল বেণুর দিকে। দু'চোখ বড়বড় করে শুধোয়, অটো-সাজেশনটা কী বস্তু, ব্রাদার?

—অটো-সাজেশন জানিস নে? বেণু যেন অবাক হয়,—নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়া, ধমক দেওয়া, পরামর্শ দেওয়া, সাহস দেওয়া, ভয় দেখানো. ...। যেমন ধব্, আমি আর কিছুতেই বাঁচব না, আমি নির্ঘাত মরে যাব, এমন রোগে কেউ বাঁচে না, এগুলো হলো নেগেটিভ অটো-সাজেশন, নার্ভকে দুর্বল করে দেয়। আবার, আমার কিস্যু হবে না, এই তো বেশ ভালোই আছি, আমি সুস্থ হয়ে উঠবই, এগুলো পজেটিভ অটো-সাজেশন। নার্ভকে সবল করে তোলে। ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ-কবচ ঠিকমত দিতে পারলে মানুষের মনে এই পজিটিভ অটো-সাজেশন প্রক্রিয়াটি শুরু হয়।

বৈরাগ্য বেশ খানিকক্ষণ গুম মেরে থাকে। একসময় বলে, তুই তো, যদ্দূর মনে পড়ে, কলেজ-লাইফে অন্যরকম ছিলি। ঠাকুর দেবতা, ঝাড়-ফুঁক, কবচ-মাদুলি বড় একটা মানতিস নে।

—এখনও যে মানি, তা নয়।

—মনে আছে? হস্টেলের সরস্বতী পুজোয় প্রতিমার পেছন থেকে দৈববাণী শুনিয়েছিলাম সেকেন্ড ইয়ারের জয়দীপকে।

—ঠাকুর দেবতা আমি এখনও মানিনে। বেণুর গলায় আপসের সুর, —তবে ইদানীং মনে হয়, একটা পাওয়ার গোছের কিছু আছে। মানুষের জীবনকে সব দিক থেকে কন্ট্রোল করছে সেই পাওয়ার। আর লাক-টাক বলে যতটা ঠাট্টা করি, ব্যাপারটাকে এই বয়েসে এসে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। চারপাশের কতজন কতকিছু কত সহজে পেয়ে যাচ্ছে। অথচ আমার বেলায়...। চেষ্টা তো কিছু কম কবিনি আমিও...। বলতে বলতে কেমন ম্রিয়মাণ হয়ে যায় বেণু। একটু একটু করে নিজের মধ্যে ডুবে যেতে থাকে।

ওদিকে, পাশের খোপে একই বিষয় নিয়ে তুমুল তর্কে মেতেছে নীলাদ্রি আর তিলকেশ। নিজেদের আলোচনা থেমে যেতেই বৈরাগ্যদের কানে আসে ওদের বিতর্ক।

তিলকেশ বুঝি বলেছিল, ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের কোনো সংঘাত নেই। বরং একটি অন্যটির পরিপূরক। শুনে নীলাদ্রি খেপে লাল। বলে, শোন্, ধর্মের বইতে কী লেখা রয়েছে জানিনে, কিন্তু এখন ধর্মচর্চা মানেই বান্ডিল অব কন্ট্রডিকশন্‌স্', সুপারস্টিশন্‌স্ এবং ধোঁকাবাজি অব সাম ধান্দাবাজ আদমি ওভার মিলিয়নস অব বুরবক কমন পিপ্‌ল।

অ্যান্ড ফুলফিলমেন্ট অব পলিটিক্যাল অ্যামবিশনস অব আ ফিউ স্কাউন্ড্র্যালস উইথ দ্য হেলপ অব সাম ব্ল্যাক বিজিনেসম্যান, ভণ্ড বাবাজী..., কেউ হাত ঘুরিয়ে রসগোল্লা বের করছে, কেউ গণেশ ঠাকুরকে দুধ খাওয়াচ্ছে, কেউ যাগযজ্ঞ করে, এ-তীর্থে ও-তীর্থে মাথা মুড়িয়ে, নিজের গদি শক্তপোক্ত করছে। কেউ নিজের ছেলেমেয়েকে আমেরিকায় পাঠিয়ে দিয়ে নিজে এদেশে হিন্দুত্ব ফলাচ্ছে, হিন্দু-সংস্কৃতি মারাচ্ছে। এরা সব ধোঁকাবাজ, পাওয়ার-হান্টারস। এরা সবাই। ওয়ান অ্যান্ড অল।

বলতে বলতে নীলাদ্রি বেশ অ্যাগ্রেসিভ হয়ে উঠেছিল। তিলকেশ সে তুলনায় বেশ নরম, স্মিত। মৃদু হেসে বলে, কিন্তু ধর্মের সবটাই তো আর খারাপ নয়।

—সবটাই খারাপ। নীলাদ্রি নিজের উরুতে চাপড় মারে, অ্যা কমপ্লিট নুইসেন্স।

—তাও কি হয়? কোনো কিছুরই সবটাই খারাপ হতে পাবে না। তেমন ভাবনাই অবৈজ্ঞানিক। দ্যাখ্, সাপের বিষ, তারও একটা উপকারী ভূমিকা আছে। কত ওষুধ তৈরি হয়।

—ধর্মের কোনটা তোর মতে বেনেভোলেন্ট?

—ধর্মের যে সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা এবং নীতি প্রণয়নের ভূমিকা, দুটোই প্রাচীন যুগে খুব পজিটিভ রোল প্লে করেছে। দ্যাখ, তখন তো এত পুলিস-মিলিটারি ছিল না, দু'হাত অন্তর থানা ফাঁড়ি ছিল না, আর-টি-সেট, কাঁদানে-গ্যাস, লাঠি-গুলি, জলকামান, কিছুই ছিল না। এমন জবরদস্ত ছাপানো সংবিধান, আই-পি-সি, সি-আর-পি-সি, জজ-ম্যাজিস্ট্রেট, আদালত-জেলখানা, এমন পরিণত বুরোক্রেসি—এসব কিছুই ছিল না। তখন মানুষের পাশবিক সত্তাগুলি আরও ক্রিয়াশীল ছিল। সেইসব দিনে বলগাহীন মানুষের অপরাধপ্রবণতা কমাতে, নীতিবোধ বাড়াতে ধর্মই বিভিন্ন গল্পগাথা ফেঁদে, ঠাকুর-দেবতার আমদানি করে, পাপ-পুণ্যের ফারাক করে, স্বর্গের স্বপ্ন, নরকের ভয় দেখিয়ে মানুষকে সংযত রেখেছে। মানুষের মধ্যে নীতিবোধের উন্মেষ ঘটিয়েছে। কালক্রমে অবশ্য এই ফিল্ড-এ ধান্দাবাজরা ঢুকেছে। তারা মানুষের অখণ্ড বিশ্বাসের ফায়দা লুটেছে।

—কার লেখা, তিলকেশ? এ-খোপ থেকে বৈরাগ্য বলে ওঠে।

—কি? তিলকেশ সহসা কথার খেই ধরতে পারে না।

—কার লেখা বই থেকে বললে এতক্ষণ? বৈরাগ্যর কথায় মৃদু খোঁচা, ল' কোর্সে কি ধর্মও পড়ানো হয় নাকি আজকাল?

—হিন্দু ল, মুসলিম ল, রিলিজিয়াস কোডস্—এসব তো পড়ানো হযই, কিন্তু সেজন্য নয় আংকেল, আমি বলছি আমার কনভিকশন থেকে।

একটা সায়েন্স ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাচ্ছিলেন ডঃ পালধি, তিলকেশের কথাগুলোও কানে আসছিল বুঝি। বললেন, খুব লজিক্যালি বলল তো ছেলেটা!

—হবু উকিল যে। পাশের খোপ থেকে চেঁচিয়ে বলে ওঠে নীলাদ্রি, গুছিয়ে বলাটা রপ্ত করছে আজ থেকে। বক্তৃতায় দিনকে রাত করতে না পারলে একহাজার-এক টাকা ফি চাইবে কী করে?

—ডঃ পালধি এ-ব্যাপারে কী বলেন? বৈরাগ্য শুধোয়।

ডঃ পালধি বুঝি সামান্য সময়ের জন্য ডুবে গিয়েছিলেন সায়েন্স-ম্যাগাজিনের পাতায়। চমকে তাকান বৈরাগ্যর কথায়। বলেন, কী ব্যাপারে, বলুন তো?

—ওই যে, ঠাকুব-দেবতা, ধর্মবিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান, কুসংস্কার....।

—এই যে ভাগ্য-টাগ্য, নিয়তি-অদৃষ্ট, জন্মান্তরবাদ....। কেশব পাদপূরণ করে।

বৈরাগ্য বলে, আপনি তো বিজ্ঞানের খ্যাতিমান গবেষক। এ ব্যাপারে কী বলে আপনাদের বিজ্ঞান?

—বিজ্ঞান এ ব্যাপারে কিছুই বলে না। ডঃ পালধি অমায়িক হাসেন,—ফিজিক্স-এ ধর্মের কিংবা ভগবানের ওপর কোনো চ্যাপ্টার নেই।

রসিকতাটা উপভোগ করে বৈরাগ্য। বলে, আপনি ব্যক্তিগতভাবে কী ভাবেন?

ডঃ পালধি গম্ভীর হয়ে যান। সায়েন্স-ম্যাগাজিনখানা বন্ধ করে সরিয়ে রাখেন পাশে। বলেন, দেখুন, সো লং আই অ্যাম আ প্রফেসর অব ফিজিক্স, বলতে পারি, বিজ্ঞানের আঙিনায় ভগবান, ঈশ্বর এদের কোনও অস্তিত্বই নেই। আসলে, মানুষ এই ভাস্ট্ নেচাবকে দেখে ভয় পেয়েছে। ভয় থেকে ভক্তি। আর, তার থেকেই পুজো, আরাধনা.....। এই ভাস্ট্ নেচারকেই মানুষ ভেঙে ভেঙে, টুকরো টুকরো কবে ঠাকুব-দেবতা বানিয়েছে। তবে, কুসংস্কারের কথা যা বললেন, ওগুলো স্রেফ ইগ্‌নোরেন্স থেকে। প্রপার এডুকেশন পেলে আস্তে আস্তে কেটে যাবে।

চার

বাইবে সাঁ সাঁ কবছে বাত ট্রেনখানা উদ্দাম বেগে ছুটছে। কামরার সবাইয়েব রাতেব খাওয়া প্রায় সাবা। সবাই যে-যাব মতো শোবার বন্দোবস্ত করছে। কেউ কেউ শুয়ে পড়েছে ওপরের বার্থে। বাকিবা বালিশ-টালিশ ফোলাচ্ছে। বৈরাগ্য লক্ষ করে, কেবল ধনেশ পাখি আর ওর স্যাকরেদই কিছু খেল না।

এতক্ষণ লোকটা একটা কথাও বলে নি। কারোব দিকে তেমন করে তাকায়ই নি। কেবল ওর সাকরেদটা মাঝে মাঝে বিড়বিড় কবেছে। কিন্তু তার কোনও কথাব বিন্দু-বিসর্গও বুঝতে পাবেনি বৈরাগ্য। কেলো আর কটা বারকয় হাঁটাহাঁটি করে ঝিমিয়ে পড়েছে। নিজেদের সিটে চুপচাপ বসে রয়েছে দুজনায়। সম্ভবত ওরা বুঝতে পেরেছে, এ কামরায় বেশি খাপ খোলা যাবে না।

প্রশান্ত বাগচি ওঠে ওপরের বাঙ্কে। বেণুও। মিসেস পালধি নিচেব বার্থে পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়েছেন। সায়েন্স ম্যাগাজিনটায় এতক্ষণ মুখ ডুবিয়ে বসেছিলেন ডঃ পালধি। একমনে পাইপ টানছিলেন। এক সময় পাইপ সরিয়ে লম্বা করে হাই তুললেন। বললেন, বাত হলো। এবার ঘুমিয়ে পড়লে হয়।

ঠিক এমনি সময়ে ওর দিকে সরাসরি তাকায় ধনেশ পাখি। বলে, বেটা, এক থেকে দশের মধ্যে একটা সংখ্যা বল তো।

ডঃ পালধি এমন আচমকা প্রশ্নে হকচকিয়ে যান। সামান্য বিরক্তি মেশানো গলায় বলেন, কেন?

—আহ্, বল না। —সাত। —বেশ। এবার একটা ফুলের নাম বল্ দেখি।
—গোলাপ।

এক চিলতে রহস্যময় হাসি চকিতের জন্য খেলে যায় ধনেশ পাখিব ঠোঁটের কোণায়। ঝোলার ভেতর হাত ঢুকিয়ে বের করে আনে একখানা চিরকুট। এগিয়ে দেয় ডঃ পালধিব দিকে। কেশব বৈরাগ্যর হাত হয়ে ওটা পৌঁছে যায় ডঃ পালধির হাতে। ডঃ পালধি

আধা-তাচ্ছিল্যে, আধা-কৌতূহলে খোলেন চিরকুটখানা। ভ্রূ কুঁচকে পড়েন। ধীরে ধীরে ভুরুর ভাঁজ থেকে যাবতীয় বিরক্তি অদৃশ্য হয়ে যায়। তার বদলে একটু একটু করে জমতে থাকে বিস্ময়। যখন চিরকুট থেকে মুখ তোলেন, ধনেশ পাখির দিকে তাকান, তখন তাঁর চোখের তারায় এক ধরনের আপ্লুতভাব। সারা মুখের পেশিতে কমনীয়তা। টানটান শুয়েছিলেন মিসেস পালধি। স্বামীর চোখ-মুখের ভাষা পড়তে পড়তে সামান্য কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। পালধি চিরকুটখানা এগিয়ে দেন স্ত্রীর দিকে। তাঁর দু'চোখে তখন সীমাহীন বিস্ময়। মিসেস পালধি চিরকুটটাতে একঝলক চোখ বোলাতে না বোলাতেই তাঁর চোখদুটিও ডিমে তা দিতে থাকা মুরগীর মতো তদ্গত হয়ে আসে। স্বামীর দিকে সবিস্ময় দৃষ্টি বিনিময় করেন তিনি। উঠে বসেন। অবাক চোখে তাকিয়ে থাকেন ধনেশ পাখির দিকে।

ডঃ পালধি খুব কাঁপা কাঁপা হাতে চিরকুটখানা এগিয়ে দেন বৈরাগ্যর দিকে।

বৈরাগ্য এবং কেশব একসঙ্গে পড়ে নেয় তা। ওপরের বার্থে শুয়ে শুয়ে বেণুও লক্ষ করছিল পুরো ব্যাপারটা। বার্থ থেকে ঝুঁকে পড়ে সেও চোখ বোঁধায় চিরকুটটার ওপর।

—আপনি জানলেন কী করে? খুব গদগদ গলায় ধনেশ পাখিকে শুধোন ডঃ পালধি।

মিটিমিটি হাসছিল ধনেশ পাখি। সাকরেদটির মুখেও ফেনিয়ে উঠছিল গদগদ হাসি।

ডঃ পালধি শুধোন, কখন লিখলেন ওটা?

—কখন? আজ সকালে!

—সকালে? ডঃ পালধির চোখদুটো গোলাকার হয়ে আসে, সকালে আপনি আমার নাম জানলেন কী করে?

—কী করে জানলাম বল্ তো? মুচকি মুচকি হাসতে থাকে ধনেশ পাখি, তোর নাম তো এখনও বলিসনি আমাকে। এই কামরায় তো কোনো প্রসঙ্গে কেউই তোর পুরো নামটা উচ্চারণ করেনি এখনও অবধি। করেছে কী?

বিহ্বল ডঃ পালধি পেন্ডুলামের মতো ধীরে ধীরে মাথা নাড়াতে থাকেন।

ইতিমধ্যে পাশের খোপের যাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ব্যাপারটা। নীলাদ্রি চিরকুটখানা হাত বাড়িয়ে নিয়েছে। হাতে হাতে ঘুরছে ওটা। প্যাসেজ দিয়ে বাথরুমের দিকে যাচ্ছিলেন ডাঃ মণীন্দ্র চন্দ্র। কথাবার্তা শুনে থমকে দাঁড়ান।—কী ব্যাপার?

নীলাদ্রি চিরকুটখানা এগিয়ে দেয় ওঁর দিকে। ঘটনাটা সংক্ষেপে বলে। পুরু লেন্সের চশমার সামনে চিরকুটখানা মেলে ধরেন ডাঃ চন্দ্র। বিড়বিড় করে পড়তে থাকেন। ডঃ গোলকপতি পালধি, ৩৬/১, একডালিয়া পার্ক, বালিগঞ্জ, কলিকাতা-২৯। প্রিয় সংখ্যা—৭, প্রিয় ফুল—গোলাপ। তারপর আরও কী সব হিজিবিজি লেখা।

ডাঃ চন্দ্র খুব বিস্ময় মাখানো দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন ধনেশ পাখির দিকে। ইতিমধ্যে আরও দু'চারজন এসে দাঁড়িয়েছে আশপাশে। চিরকুটখানা ঘন ঘন হাত বদলাতে থাকে। পাক দিয়ে বেড়ায় কামরাময়। নিমেষের মধ্যে কথাটা রটে যায় পুরো কামরায়। সবাইয়ের মধ্যে একটা ঘুম-ঘুম ভাব এসেছিল, কিন্তু একটা চিরকুট নিমেষের মধ্যে সবাইকে চাঙ্গা করে দেয়। যেন একটা নিস্তরঙ্গ দিঘির মধ্যিখানে একখানা ছোট্ট ঢিল। গুঞ্জন শুরু হয়ে যায় কামরা জুড়ে। নিমেষের মধ্যে ধনেশ পাখি সারা কামরার মানুষের মনোযোগের কেন্দ্রভূমিতে পৌঁছে যায়। শুরু হয়ে যায় এদেশের মুণি-ঋষি, সাধু-সন্তদের

অপার বিভূতির কথা। তাঁদের ক্ষমতা ও মহিমা নিয়ে তুমুল আলোচনা শুরু হয়। 'ভারতের সাধক' সিরিজের সমস্ত মহাত্মাগণ একে একে উঠে আসেন বিশ্বাসী মানুষের জিভের ডগায়। এছাড়াও, প্রায় প্রত্যেকেই নিজেদের স্মৃতি থেকে অন্তত একজন ক্ষমতাবান সাধুর অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের কাহিনী উপহার দেন এবং কাহিনীটি তাঁর চাক্ষুষ দেখা বলে দাবি করেন।

পুরো দৃশ্যখানা দেখতে দেখতে বৈরাগ্য কেমন থতমত খেয়ে গেছে। একটা মানুষকে নিয়ে যে সারা কামরা অকস্মাৎ এমন পাগলামো শুরু করতে পারে, এমনটা সে মোটেই প্রত্যাশা করেনি। তাও কিনা এমন একটা ব্যাপার নিয়ে, যা নিতান্তই সাদামাটা, অতি সাধারণ পর্যায়ের চাতুরি। কলেজে কতবার বৈরাগ্য কতজনকে যে ওই করে বোকা বানিয়েছে! আসলে, পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, একটু সাদাসিধে গোছের মানুষকে আচমকা জিজ্ঞেস করলে, সে এক থেকে দশের মধ্যে সাত কিংবা নয় সংখ্যাটাই বলে। ফুলের নামও বলে, গোলাপ। আগে থেকে টার্গেট করে লিখে রাখলে ওটি দেখামাত্তর লোকটি চমকে যাবেই। আর, বাংলা সাত এবং ইংরেজি নয় সংখ্যাটি যেহেতু একই আদলের, সাত সংখ্যাটিকে তলার দিকে সামান্য বাঁকিয়ে দিলেই প্রয়োজনে সেটাকে ইংরেজি নয় সংখ্যা বলে দিব্যি চালিয়ে দেওয়া যায়। এই চিরকুটখানাতেও বৈরাগ্য লক্ষ করেছে, ধনেশ পাখিও একই পদ্ধতি নিয়েছে। সাত সংখ্যাটা তলার দিকে একটুখানি বাঁকিয়ে লিখেছে।

ডঃ পালধি একেবারে হতভম্ব হয়ে গিয়েছেন। ধনেশ পাখির থেকে কিছুতেই চোখ সরাতে পারছেন না উনি। জ্বলন্ত পাইপখানা কখন জানি নিভিয়ে রেখে দিয়েছেন ব্যাগের মধ্যে। একসময় হ্যামলে' পড়ে বলে ওঠেন, কে আপনি, কী পরিচয়?

ধনেশ পাখির চোখের কোণে চাপা কৌতুক। বলে, আন্দাজ কর্ বেটা।

দু'চোখ দিয়ে ধনেশ পাখিকে আগাপাশতলা জরিপ করতে থাকেন ডঃ পালধি। বিড়বিড় করে বলেন, কোনো উচ্চমার্গের মানুষ তো বটেনই। কিন্তু সঠিক পরিচয়টা কী?

চারপাশে যারা ঘিরে দাঁড়িয়েছে তাদেরও চোখেমুখে ব্যাকুলতা। মানুষটির পরিচয় জানার জন্য উদ্গ্রীব সকলেই। ধনেশ পাখি একঝলক দেখে নেয় সবাইকে। তারপর মিটিমিটি হাসতে থাকে নিঃশব্দে। বলে, আমার পরিচয় জানার জন্য এত উতলা কেন রে? আমি তো তোর কাছে কিছু চাইনি। চেয়েছি?

ডঃ পালধি বিহ্বল চোখে ধীরে ধীরে মাথা নাড়েন।

—বলেছি কী, আমাকে পাঁচ টাকা, দশ টাক দে? জলপানি খাব। বলেছি?

ডঃ পালধির মুণ্ডুখানি পুনরায় পেন্ডুলামের মতো দুলতে থাকে দু'দিকে।

—তবে? ধনেশ পাখি এবার সামান্য গম্ভীর। মানুষের কাছে কিছু চাইতে নেই, বুঝলি। দেবার মতো কী আছে মানুষের? মানুষ তো নিজেই এক নিঃস্ব জীব। ঠিক কিনা?

ডঃ পালধিই শুধু নয়, চারপাশের অন্যান্যরাও ওপরে নিচে মাথা দুলিয়ে সায় দেয় নিঃশব্দে।

—চাইতে হলে চাইবি তাঁর কাছে, যাঁর কিছু দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। আর, চাইলে, টাকা-পয়সা, ধন-দৌলতের মতো ঝুটা চিজ নয়, আসল জিনিসটাই চাইবি।

ডঃ পালধির উদ্দেশে যদিও বলে চলেছে ধনেশ পাখি, কিন্তু চারপাশের বার্থগুলো থেকে সবাই গোগ্রাসে গিলছে কথাগুলো। যারা চারপাশে এসে ভিড় করেছে, তারাও মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছে। অবাক বিস্ময়ে দেখছে লোকটিকে। সকলের চোখে বিস্ময় দেখতে দেখতে একসময় চোখ বোজে ধনেশ পাখি। সিটের গায়ে হেলান দিয়ে স্থির হয়ে যায়।

সারা কামরা জুড়ে অস্পষ্ট গুঞ্জন। নীলাদ্রি পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে ডঃ পালধির কাছে। বলে, জেঠু, লোকটিকে আপনি আগে থেকে চিনতেন? আলাপ-টালাপ হয়েছিল কোনোদিন?

ডঃ পালধি ধীরে ধীরে মাথা নাড়েন।

—আগে কোথাও দেখেছেন ওকে? জেঠিমা? জেঠুর অ্যাবসেন্সে কখনও লোকটা গিয়েছিল আপনাদের বাড়িতে? মনে করে দেখুন তো। বিস্ফারিত দুটি চোখ নীলাদ্রির দিকে মেলে ধরেন মিসেস পালধি। বিহ্বল ভাবখানা এখন অবধি কাটেনি তাঁরও। ধীর গলায় বলেন, না, বাবা, এই প্রথম দেখলুম।

—আজ প্ল্যাটফর্মে ওর সঙ্গে কোনো কথাবার্তা হয়েছিল?

—নাহ্। জোরে জোরে মাথা দোলাতে থাকেন ডঃ পালধি। ঈষৎ বিরক্তি মেশানো গলায় বলে ওঠেন, যদি কোনো সূত্রে আমার নাম-ঠিকানা জেনেও থাকে, সংখ্যা আর ফুলের নামটা জানল কী করে?

—স্ট্রেঞ্জ! নীলাদ্রির দু'চোখে যুগপৎ বিস্ময় ও অবিশ্বাস।

ডাঃ চন্দ্র আগ বাড়িয়ে বলেন, কিন্তু সাত এবং গোলাপ তো এমনি এমনি নয়, একটা সিগনিফিক্যান্স রয়েছে নিশ্চয়ই। কিছু বললেন, আপনাকে?

ডঃ পালধি ফের মাথা নাড়েন।

—সেইটেই তো আসল। জেনে নিলেন না কেন? সাত এবং গোলাপ বলাতে ব্যাপারটা দাঁড়াল কী?

—হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করে নাও ওঁকে। মিসেস পালধি তাড়া লাগাল স্বামীকে।

—আসল কথাটাই তো জিজ্ঞেস করলে না। ঠিক সময়ে ঠিক কথাটি যদি মাথায় খেলে তোমার! চিরকাল তো দেখছি—।

স্ত্রীর তাড়নায় ধনেশ পাখির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করতে উদ্যত হতেই নিজের ঠোঁটে তর্জনী ঠেকিয়ে বাধা দেয় সাকরেদটি। এতক্ষণ সে একটি কথাও বলেনি। শুধু ধনেশ পাখির কথাবার্তা এবং চারপাশের মানুষজনের সীমাহীন বিস্ময়টাকে উপভোগ করছিল আর নিঃশব্দে মিটিমিটি হাসছিল। এবার সে ফিসফিসিয়ে বলে, বাবা ইখন কুনো কথারই জবাব দিবেন নাই।

—কেন?

—তিনি ইখেনে নাই।

লোকটার কথার ধরনে গ্রাম্য টান। বৈরাগ্য লক্ষ করে, চোখেমুখেও এক ধরনের চোয়াড়ে সেয়ানাপনা।

—ডাঃ চন্দ্র বলে ওঠেন, নেই মানে?

—ইখন উয়ার কেবল দেহটাই রয়েছে। উনি নাই।

—উনি তবে কোথায়?

—কুথা কুথা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কেদার, বদ্রী, গোমুখ, তিরুপতি, রামেশ্বর ধাম, কিম্বা কামরূপ-কামাখ্যা.....।

এতটা হজম করতে পারে না কামরার অনেকেই। নীলাদ্রি বলে ওঠে, ওই তো নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস চলছে।

—উটা ত দেহের কাজ। খুব নির্বিকায় গলায় বলে সাকরেদটি— দেহের কাজ দেহ কচ্ছে, আত্মার কাজ আত্মা কচ্ছে।

পুরো ব্যাপারটা একটু একটু করে অসহ্য লাগছিল বৈরাগ্যর। প্রায় ধমকে বলে ওঠে, বাজে বকো না তো। ও ঘুমোচ্ছে। এক ঠেলা দিলে এক্ষুনি জেগে উঠবে।

চারপাশের মানুষজন আধা-বিশ্বাসে, আধা-সন্দেহে পরখ করতে থাকে, সত্যি এটা নিপাট ঘুম কিনা। অনেকে সামান্য ঝুঁকে পড়ে দেখতে থাকে ধনেশ পাখির মুখখানা।

বৈরাগ্য বলে, দিন না অল্প ঠেলা। দিন।

কেউ সাহস করে এগোয় না।

কমলাক্ষ সরকার একটা যুক্তির অবতারণা করতে চান। বলেন, ঘুমোচ্ছেন নাকি টহল দিয়ে বেড়াচ্ছেন, বলা মুশকিল। কিন্তু ওই যে সাত আর গোলাপের ব্যাপারটা—।

—আমি বলছি। আমি জানি। বৈরাগ্য টানটান হয়ে বসে,—ওই সাত আর গোলাপের ব্যাপারটা হলো—।

ঠিক সেই মুহূর্তে সহসা সোজা হয়ে উঠে বসে ধনেশ পাখি। লম্বা করে হাই তোলে। এবং সেই ফাঁকে, ট্রেনের স্বল্প আলোয় একজন দেখে ফেলে, লোকটার মুখের মধ্যে জিভখানা নেই। এমনকি ওপরের বার্থ থেকে বেণুও সেটা প্রত্যক্ষ করে। শুরু হয়ে যায় তুমুল কানাঘুষো। বিস্ময়ে গোলাকার হয়ে ওঠে সবকটি প্রত্যক্ষদর্শী চোখ। কিছু মানুষ, যারা দৃশ্যটা দেখেনি, গাঢ় সন্দেহ জমে তাদের চোখে।

—জিভ নেই মানে? লোকটা এক্ষুনি লকলকিয়ে কথা বলল।

—বলছি, নেই। স্পষ্ট দেখলুম।

—ঠিক দেখেছেন তো? চোখের ভুলওতো হতে পারে।

—কখ্খনো না। শুধু আমি নাকি? আরও কেউ কেউ দেখেছে।

তখন অনেকেই তাৎক্ষণিক সাক্ষ্য দেয়। তারাও দেখেছে জিভহীন মুখ গহ্বর। বৈরাগ্যর দিকে মুখ ঝুঁকিয়ে বেণু বলে, আমি স্পষ্ট দেখলুম, ভাই। জিভখানা নেই।

ডাঃ চন্দ্র বললেন, একসঙ্গে এতগুলো লোকের চোখের ভুল হতে পারে না।

—হতেও পারে। বৈরাগ্য প্রতিবাদ করে ওঠে, চোখের ভুল মারাত্মক বস্তু। রজ্জুকেও সাপ বলে মনে হয়। একটা ঘটনা বলছি—।

এমনি সময়ে ধনেশ পাখি চোখ খোলে। পিটপিট করে তাকায় বৈরাগ্যর দিকে। চোখের কোণে চাপা রোষ। আচমকা হাঁ করে মুখখানাই মেলে ধরে ওপরের দিকে। সবাইকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাতে থাকে হাঁ করা মুখ। এবং সকলেই নজর করে, লোকটার মুখের মধ্যে জিভের লেশমাত্র নেই।

নীলাদ্রি টর্চটা এনে লোকটার মুখগহ্বর নিশানা করে আলো ফেলে। এবার সবাই ষোলআনা নিশ্চিত হয়, জিভখানা মুখগহ্বর থেকে বেমালুম উধাও।

কথাটা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে কামরাময়। মুহূর্তে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। যারা বার্থে শুয়ে পড়েছিল, তড়াক করে নেমে আসে। ধনেশ পাখি সবাইকে জনে জনে দেখবার

সুযোগ দেয়। সবাইয়ের দেখা শেষ হলে পরে আস্তে আস্তে বন্ধ করে মুখ।
বলে, যাহ্, এবার শুয়ে পড় সব। রাত হলো।
কারোর কানেই ঢোকে না সে কথা। হরেক প্রশ্নের জোয়ার বয়ে যায়।
—আপনার জিভ রয়েছে?
—নইলে কথা বলছি কেমন করে? এই দ্যাখ্। ডাক্তারকে জিভ দেখাবার ভঙ্গিতে লম্বা করে জিভ বের করে ধনেশ পাখি।
এক্কেবারে দমে গিয়েছেন ডাঃ চন্দ্র। বলেন, একটু আগে যে দেখলুম, নেই?
—ঠিক দেখেছিস। তখন ছিল না। ধনেশ পাখি অমায়িক হাসে, যখন কথা বলতে ইচ্ছে করে না, তখন ওটাকে ছুটি দিই। ও একটুখানি ঘুরেফিরে আসে।
—কোথায় গিয়েছিল আপনার জিভ? নীলাদ্রি শুধোয়। নীলাদ্রির দিকে কটমট করে তাকায় ধনেশ পাখি। বলে, তোকে বলব কেন? বললে তুই বিশ্বাস করবি? এই দ্যাখ্ না, তোদের দেখতে ইচ্ছে করছে না আমার। তাই চোখের মণিকে পাঠিয়ে দিলাম হেমকুণ্ডর কাছাকাছি। সেখানে কত ব্রহ্মকমল ফুটে রয়েছে চতুর্দিকে! ইস্! এবং সবাই সবিস্ময়ে দেখে, ধনেশ পাখির চোখদুটো খোলা। কিন্তু তাতে মণিদুটোর লেশমাত্র নেই। সারা চোখ জুড়ে কেবল সাদা জমি।
একটু বাদে মণিদুটোকে সস্থানে ফিরিয়ে আনে ধনেশ পাখি। বলে, যাহ্ যাহ্ শুয়ে পড়।
কেউ শুয়ে পড়ে না। বরং যারা শুয়ে পড়েছিল, উঠে বসে। একে একে ভিড় জমায় ধনেশ পাখির আশেপাশে।
বৈরাগ্য বিড়বিড় করে বলতে থাকে, জিভখানা কিংবা চোখের মণিদুটো লুকিয়ে রাখতেও পারে। কোনো কৌশল-টৌশল—ভালোভাবে রপ্ত করলে—।
—দূর মশাই! এবার সরাসরি খিঁচিয়ে ওঠেন ডাঃ চন্দ্র, জিভ কী বাঁধানো দাঁত নাকি যে খুলে নিয়ে পকেটে পুরে রাখবে! কী যে বলেন আপনি! মনে রাখবেন, আই অ্যাম আ ডক্টর। অ্যানাটমিটা ভালোই পড়া আছে। মুখের মধ্যে জিভ লুকিয়ে রাখা আর চোখ থেকে মণি উধাও করে দেওয়া সম্ভব কিনা আমি জানি।
ঠিক সেই মুহূর্তে বৈরাগ্য দেখতে পায়, কেলো এবং কটা কখন যেন এসে দাঁড়িয়েছে জমায়েতের পেছনে। পরিস্থিতিটা বোঝবার চেষ্টা করছে ওরা।

পাঁচ

অধ্যাপক কল্যাণ সান্যাল বলেন, শুনেছি হটযোগের দ্বারা নাকি এমনটা করা সম্ভব।
ফলত, সারা কামরা জুড়ে হটযোগ নিয়ে তুমুল গবেষণা চলতে থাকে। হটযোগের মাধ্যমে শূন্যে ভেসে থাকা, মাটির তলায় কুম্ভক হয়ে থাকা, জলের ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া, আরও কী কী অসম্ভব ক্রিয়াকলাপ করা সম্ভব, তার একখানা তালিকা তৈরি হয়ে যায় মুখে মুখে। 'হটযোগ-দীপিকা' নামে একখানা প্রাচীন বইয়ের রেফারেন্সও দিয়ে বসেন কমলাক্ষবাবু। রিয়া ফিসফিস করে কস্তুরীকে বলে, মাস্ট্ বি আ গ্রেট ইযোগি। মাস্ট্ বি ভেরি পাওয়ারফুল।
—ইয়াহ্। কাঁধ ঝাঁকিয়ে জবাব দেয় কস্তুরী, ইন্ডিয়ান ইয়োগিজ ক্যান ডু অ্যান্ড আন্-

ডু এভরিথিং।

বৈরাগ্য আর কেশবের মধ্যে ঘনঘন দৃষ্টি বিনিময় চলতে থাকে। কেশব একান্তে বলে, দুনিয়ার প্রতিটি বিষয়ে মানুষের কেমন প্রগাঢ় জ্ঞান দেখেছিস!

—বিশেষ করে আধ্যাত্মিক ব্যাপারে কোনো ইন্ডিয়ানই এক ইঞ্চিও পিছু হটবে না। তেতো গলায় বলতে থাকে বৈরাগ্য।

—আমার ঠাকুরমার তো রামায়ণ, মহাভারত আর ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ কণ্ঠস্থ ছিল। ওপর থেকে বেণু যোগ করে।

—এর দ্বারা কী প্রমাণ হলো?

—না, মানে ইন্ডিয়ানদের রিলিজিয়াস অ্যাপ্‌টিচিউড্‌টাই বলতে চাইছি।

—মুখে জিভ না থাকবার সঙ্গে রিলিজিয়নের সম্পর্ক কী? বৈরাগ্যর হয়ে কেশবই জেরা শুরু করে এবার।

—এটাও তো রিলিজিয়নেরই একটা অংশ। বেণুর মধ্যে য়্যুনিভার্সিটির ডিবেট-চ্যাম্পিয়ন মানুষটি প্রকট হয়,—মানুষ ঈশ্বরকে পাওয়ার হরেক প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেছে। তন্ত্র, যোগ ইত্যাদি হলো তেমনই সব প্রক্রিয়া।

—আমি বলছি। পাশের খোপ থেকে নীলাদ্রি একলাফে চলে আসে কাছে, —আমার দাদুর কথা কোট করছি। দাদু বলেন, যোগ চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ। চিত্তের বৃত্তি অর্থাৎ ক্রিয়াকলাপগুলোকে সংযত করে যোগ।

নীলাদ্রি দাদুর রেফারেন্স দেওয়া ইস্তক উৎকর্ণ ছিলেন কমলাক্ষ। বাবাকে বরাবরই খুব শ্রদ্ধা করেন তিনি। ভয় ছিল, নীলাদ্রি দাদুর মুখনিঃসৃত বাণীগুলি বলবার বেলায় যদি ঠিক ঠিক কম্যুনিকেট করতে না পারে, এতগুলি মানুষের সামনে বাবা তাহলে মিস্-রিপ্রেজেন্টেড হয়ে যাবেন। এই আশঙ্কা থেকেই মাঝপথে নীলাদ্রিকে থামিয়ে দেন কমলাক্ষ। বলেন, ধরুন, আপনার জিভখানা সর্বদা খলবলাতে চায়, সর্বদাই ভালোমন্দ খেতে চায়। জিহ্বার, অতিরিক্ত লিপ্সা ও চাঞ্চল্য মানুষকে বাচাল করে তোলে, ভোজনরসিক করে তোলে। অধিক বাচালতায় শরীরের শক্তিক্ষয় হয়। বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে যায়। অধিক ভোজনের ফলে পাকযন্ত্র ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তাছাড়া, ভালোমন্দ খাদ্যগুলি নিয়মিত সংগ্রহ করতে গিয়ে মানুষ অসততার আশ্রয় নেয়। তার চরিত্রহানি ঘটে। আপনি ধরুন আপনার জিভখানাকে সংযত করলেন অভ্যাসের মাধ্যমে। আপনি বাঁচলেন। এইভাবে আপনার শরীরের ইন্দ্রিয়গুলোর হাজারো দাপাদাপি আপনি থামিয়ে দিতে পারেন নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় নিয়মিত যোগ অভ্যাসের মাধ্যমে। ইন্দ্রিয়গুলিকে বলা হয়েছে রিপু। নিবৃত্ত, নিদেন সংযত না করলে তারা প্রতি মুহূর্তে আপনার সঙ্গে শত্রুতা করবে। আপনার লাইফ হেল করে দেবে। বাবা বলেন, চিত্ত হলো দীপশিখা। বাড়লে যেমন দীপশিখাটি অস্থিরভাবে দাপাদাপি শুরু করে, নিভেও যেতে পারে অকালে, তেমনই ইন্দ্রিয়ের অস্থির দাপাদাপিতে চিত্তের চাঞ্চল্য ও উন্মত্ততা বেড়ে যায়। আর উন্মত্ত হয়ে ছুটতে থাকা পশুর পিঠে যেমন কোনও সওয়ারই থিতু থাকতে পারে না, ঠিক তেমনই উন্মত্ত চিত্তের আধারে কোনো মহৎ ভাবনাই স্থিত হয় না। চিত্তরূপ দীপশিখাটিকে অকম্পমান রাখতে হলে শরীররূপ ঘরের বায়ুকে স্থির, সংযত রাখতে হবে। এবং একমাত্র যোগের মাধ্যমেই তা সম্ভব। শ্রদ্ধেয় পিতৃদেবকে ঠিক-ঠিকভবে রিপ্রেজেন্ট করতে পেরেছেন এমন বিশ্বাসে খানিকটা আত্মপ্রসাদ জন্মে কমলাক্ষবাবুর সারা মুখে।

বৈরাগ্য ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিল কমলাক্ষর দিকে। বিস্ময়ে তার বাকরুদ্ধ অবস্থা। তাও কমলাক্ষর দিকে তাকিয়ে বলে, জিভ লুকিয়ে ফেলে খাওয়ার ইচ্ছে দূর করা, চোখ থেকে মণি উধাও করে খারাপ দৃশ্য দেখবার লোভ সংবরণ করা, জননেন্দ্রিয়ে শেকল পরিয়ে কাম প্রশমন করা, এগুলো একধরনের সাপ্রেশন, কমলাক্ষদা। এর থেকেই আসে যাবতীয় বিকৃতি। টোট্যালি র‍্যাশনালাইজেশন ছাড়া অপরিমিত ভোগবাসনা কমানো সম্ভব নয়। আর, তার জন্য চাই সোস্যাল কনসাস্‌নেস্‌।

—কিন্তু বৈরাগ্য আংকল, তুমি কি জান, ইন্ডিয়ান স্পিরিচুয়েলিজম নিয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে পড়াশুনো, গবেষণা শুরু হয়েছে? তিলকেশ তার স্বভাবসিদ্ধ নরম গলায় বলে ওঠে, আমেরিকায় তো প্যারাসাইকোলজি নামে একটা ডিপার্টমেন্ট খুলেছে য়্যুনিভার্সিটিতে। ডিপার্টেড সোল-এর বিহেভিয়ার‍্যাল প্যাটার্ন নিয়ে গবেষণা চলছে সেখানে।

—ডিপার্টেড সোল? নীলাদ্রি সম্ভবত তিলকেশের একটুখানি পিছে লাগতে চায়,—মানে, ভূত তো? ভূতেদের কথাই বলছিস তো?

—ধর যদি বলিই, তোর আপত্তি আছে? তুই ভূত মানিস নে? গোস্ট?

—ধুস! ভূত বলে কিছু আছে নাকি?

—কী গাঁইয়া রে! গোস্ট্‌ মানে না! তিলকেশ নীলাদ্রিকে দুয়ো দেয়,—ডিপার্টেড সোলকে তুই অস্বীকার করতে পারিস?

নীলাদ্রি হো-হো করে হেসে ওঠে, তুই ল' কলেজে, নাকি ওঝাদের ইস্কুলে পড়িস রে? মহাকাশে মানুষ যাচ্ছে, জিনের হেরফের ঘটিয়ে পুরুষকে মেয়ে বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে, টেস্টটিউবে বাচ্চা হচ্ছে, আর তুই কিনা এখনও ভূতের যুগে পড়ে রয়েছিস?

এমন কথায় তিলকেশ সামান্য উত্তেজিত হয়ে ওঠে। বলে, গলাবাজিতে কিছু হয় না। এটা বিশ্বাসের ব্যাপার। কনভিক্‌শান। এদেশের কোটিকোটি মানুষ যা যুগ যুগ ধরে বিশ্বাস করে আসছে, সবই ভুল? কোটি কোটি মানুষ একই ভুল করে কখনও?

সবাই মনে দিয়ে শুনছিল ওদের ডিবেট। তিলকেশের শেষ কথাগুলি শুনে সোজা হয়ে বসে বৈরাগ্য। বলে, আচ্ছা, এখন বাদ দাও এসব আলোচনা। যোগ নিয়ে যথেষ্ট হলো। এখন মুখে মুখে একখানা যোগ করে দাও দেখি। সবাই একসঙ্গে করবে কিন্তু। রিয়া, কস্তুরী, নীলাদ্রি, তিলকেশ। কমলাক্ষদা, বৌদি, আপনারাও করতে পারেন। অন্যরাও করতে পারেন। শুরু করছি। হাজার কুড়ির সঙ্গে হাজার কুড়ি। কত হলো?

—দু'হাজার চল্লিশ। সবাই চেঁচিয়ে ওঠে।

—বেশ। তার সঙ্গে যোগ কর আরও চল্লিশ। কত হল?

—দু'হাজার আশি।

—রাইট। তার সঙ্গে আরও দশ।

—দু'হাজার নব্বই।

—ঠিক। তার সঙ্গে আরও দশ।

—তিন হাজার।

বৈরাগ্য একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ছেলেমেয়েগুলোর দিকে। বলে, তিন হাজার হলো কি? ঠিক করে যোগ কর।

মুখে মুখে আবার যোগ করে প্রত্যেকেই। বলে, তিনহাজারই হয়।

মিটিমিটি হাসতে থাকে বৈরাগ্য। বলে, তাহলে আমি যদি তোমাদের দু'হাজার

নব্বই টাকার পর আরও দশটাকা দিই, তোমরা আমাকে তিন হাজার টাকা ফেরত দেবে তো?

—দাঁড়াও দাঁড়াও। নীলাদ্রি যেন এতক্ষণে একটা কুইজের গন্ধ পেয়েছে। মনে মনে খানিক হিসেব করে লম্বা করে জিভ কাটে সে।

—না, দু'হাজার একশ হবে! ইস!

সঠিক হিসেবটা বুঝতে পেরে ততক্ষণে মাথার চুল ছিঁড়ছে সবাই।

মুচকি হেসে বৈরাগ্য বলে, তাহলে, সবাই একসঙ্গে বিশ্বাস করলেই সেটা সঠিক হয় না, কী বল?

ডাঃ চন্দ্র এবার সরাসরি আক্রমণ করেন বৈরাগ্যকে, আপনি কি বলতে চান, স্পষ্ট করে বলুন তো! তখন থেকে সব ব্যাপারেই আপনি ফুট কাটছেন। আপনি কি বলতে চান, ঠাকুর-দেবতা বলে কিছুই নেই। এদেশে কোনও অবতারই জন্মাননি?

—দেখুন, বৈরাগ্য যদ্দুর সম্ভব মাথা ঠান্ডা রেখে জবাব দেয়,—ঠাকুর-দেবতা সম্পর্কে আমার নিজস্ব বিশ্বাস-অবিশ্বাস আমার কাছেই থাকুক। কিন্তু গুরু, বাবা, অবতার সেজে এদেশে যা-সব করছে তা কি আপনি সমর্থন করেন? একদল ভণ্ড সাধু সেজে যা তা করে চলেছে.....।

—বৈরাগ্যবাবু, বি লজিক্যাল। বি রিজনেব্‌ল।

—আমি তো লজিক্যালিই বলছি

—না। আপনার কথার মধ্যে কোনও রিজন নেই। কোনও লজিক নেই। কেউ কেউ ভণ্ডামি করছে বলে, সবাই ভণ্ড? কেউ কেউ ঘুষ খায় বলে সবাই ঘুষখোর? বাজারে ভেজাল ঘি বিক্রি হয়, তাই বলে আসল ঘি হয়ই না? বৈরাগ্যবাবু আপনি একজন এডুকেটেড ম্যান, আপনার কাছ থেকে আমরা রিজ্‌নেব্‌ল কথাবার্তা আশা করি।

তর্কটা ডাঃ চন্দ্রর সঙ্গে হচ্ছে বটে, কিন্তু বৈবাগ্য লক্ষ করে, কামরাব প্রতিটি মানুযের মুখে ডাঃ চন্দ্রের প্রতি নীরব সমর্থন স্পষ্ট। পেছন থেকে কেউ কেউ গজগজ করতে থাকে, শিক্ষিত মানুষ হয়ে যদি যুক্তিপূর্ণ কথা না বলে, তবে তো তার শিক্ষাটাই বৃথা। এমন শিক্ষার মূল্য কী!

এতক্ষণ চোখ মুদে দু'পক্ষের কথা নিঃশব্দে শুনছিল ধনেশ পাখি। একসময় ধীরে ধীরে চোখ খোলে। হাত তুলে ইঙ্গিতে থামিয়ে দেয় ডাঃ চন্দ্রকে। বলে, বৈঠ্ যা, বেটা, বৈঠ্ যা। বলতে বলতে ডাঃ পালধির দিকে তাকায় ধনেশ পাখি। বলে, তোর জলের বোতলটা একটু দিবি? ডঃ পালধি ওয়াটার-বট্‌লখানা নিয়ে ঠেলে ঠুলে এগিয়ে যান। ঝুলি থেকে একটা ছোট্ট কাচের গেলাস বের করে ধনেশ পাখি। পেতে দেয় ওযাটার বটলের মুখে, একটুখানি জল দে'তো রে।

জলটুকু নিয়ে ধনেশ পাখি একটুক্ষণ তাকায় নীলাদ্রির দিকে, গেলাসটা এগিয়ে দিয়ে বলে, নে, খা। নীলাদ্রি সামান্য ইতস্তত করছিল। তাই দেখে ধনেশ পাখি বলে, খা, খা। গোলকপতির বোতলের জল, ভয় নেই, খা। গেলাসে পরপর দু'বার চুমুক দিয়ে মুখখানা বিকৃত হয়ে ওঠে নীলাদ্রির। ধনেশ পাখি বলে, কী হলো? নীলাদ্রি বলে, বেজায় টক।

—টক! ধনেশ পাখি যেন অবাক, কী যা-তা বলছিস? জলে কি তেঁতুল মিশিয়েছিস রে, গোলকপতি?

ডঃ পালধি এতটাই হতচকিত যে ধনেশ পাখির কথার জবাবটাও দিয়ে উঠতে পারেন না। ততক্ষণে ধনেশ পাখি ঝুলি থেকে বের করে ফেলেছে আরও একখানা গেলাস। সামান্য জল ঢেলে নিয়ে গোলসটা এগিয়ে দেয় কমলাক্ষ সরকারের দিকে। কমলাক্ষবাবু পরপর দু'এক চুমুক দিতে না দিতেই তাঁর সারা মুখে জমাট বাঁধে বিস্ময়। বলেন, মিষ্টি লাগছে।

—মিষ্টি লাগছে? বলিস কী! ধনেশ পাখি ভুরু কোচঁকায়, রেলের ট্যাপের জলে কি চিনি মেশাচ্ছে নাকি আজকাল? বলতে বলতে তৃতীয় গেলাসটাতে জল ভরে এগিয়ে দেয় বৈরাগ্যর দিকে। মিষ্টি হেসে বলে, এটা তুই খা।

—অন্যকে দিন। বৈরাগ্যর গলায় তীব্র রোষ, আমি ব্যাপারটা জানি।

—তুই তো সবই জানিস। অনেক কথাই তো বলছিস তখন থেকে। স্মিত হাসিতে ভরে যায় ধনেশ পাখির মুখখানি। বলে, ক্ষতি তো নেই, আরে ভয় নেই বিষ দিচ্ছিনে তোকে।

পেছন থেকে পবনকুমার শর্মা বলে ওঠেন, হাঁ, হাঁ, পরীক্‌সা তো কিজিয়ে।

অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও গেলাসখানা নেয় বৈরাগ্য। এক চুমুক মেরেই বিকৃত করে মুখখানা। বলে, তেতো, হালকুচ তেতো।

—তেতো? এবার ওয়াটার-বট্‌ল্‌খানা ডঃ পালধিকে ফেরত দিতে দিতে ধনেশ পাখি বলে, কেমন জল ভরেছিস রে, গোলক? কেউ বলে টক, কেউ বলে মিঠে, কেউ বলে তেতো....। তুই নিজে একটুখানি খেয়ে দেখ তো।

ডঃ পালধি একঢোক জল নিয়ে মুখের মধ্যে খেলাতে থাকেন। স্বাদ বোঝার চেষ্টা করেন। ঢোক গিলে বলেন, কিছুই তো লাগল না, প্লেন ওয়াটারের টেস্ট।

হা-হা করে হেসে ওঠে ধনেশ পাখি। বলে, এক বোতলের জল, কারও লাগছে তেতো; কারও মিষ্টি, কারও বা টক। একই বস্তু মানুষ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ। যার যেমন জিহ্বা। জলের তো গন্ধ নেই, নিজস্ব কোনো স্বাদ নেই। তোদের জিভের গুণে অথবা দোষে স্বাদের হেরফের। একই বস্তু, কেউ দেখছে রজ্জু, কেউ দেখছে সাপ। কেউ দেখছে ঠাকুর, কেউ দেখছে কুকুর। বলতে বলতে নীলাদ্রির দিকে তাকায় ধনেশ পাখি। বলে, ওই যে, একটু আগে টেপে গাইছিল তোদের গাইয়ে,—লোক জিসে পাত্থর কহতেঁ হ্যায়, ম্যায়নে উসকো ফুল কহা/জিস্‌নে য্যায়সা শোচা উসকো, ওইসি খুশবু আতি হ্যায়...।

—বাহ্, বাহ্, চমৎকার একজামপ্‌ল্‌। একযোগে সাধুবাদ জানায় জনাকয়।

বৈরাগ্য বুঝতে পারছিল, এই মুহূর্তে চারপাশের মানুষগুলি যেন বশীভূত সাপ। আর ধনেশ পাখি যেন এক দক্ষ সাপুড়ে। ওর মোহনবাঁশি বাজছে, বাঁশি দুলছে, বাঁশি-উঠছে, বাঁশি নামছে, আর তার পাশের মানুষগুলো সেই অনুসারে হেলছে, দুলছে, হাসছে, অবাক হচ্ছে। বাঁশিতে জ্ঞানী সুর বাজলে গম্ভীর হচ্ছে, ভক্তি সুর বাজলে গদগদ হচ্ছে, মজাদার সুর বাজলে মিটিমিটি হাসছে, যাকে যা করতে বলছে ধনেশ পাখি, তাই করছে সবাই। ওই একটা লোকের ওপরই এই মুহূর্তে এতগুলি চোখের মণি স্থির হয়ে রয়েছে। ধনেশ পাখির ইচ্ছের রশিতে একেবারে কব্জা হয়ে গিয়েছে মানুষগুলো। নিজস্ব ইচ্ছে-অনিচ্ছে সব লোপ পেয়েছে যেন। সকলের চোখে-মুখে এক ধরনের অলৌকিক ঘোর। কেশবের দিকে ঘন হয়ে আসে বৈরাগ্য। ফিসফিস করে বলে, একটা কথা বলছি তোকে।

ধনেশ পাখি যে জলটা খেতে দিল, তাতে ওষুধের গন্ধ। শোনামাত্র কেশবের ভুরুতে ভাঁজ পড়ে।—ঘুমের ওষুধ-টষুধ নয়ত? বৈরাগ্য চমকে ওঠে। বলে, হতে পারে। কিছুই অসম্ভব নয়। বৈরাগ্য ইঙ্গিতে নীলাদ্রিকে কাছে ডাকে। ওর কানের কাছে মুখ এনে বলে, লোকটা যে জল দিল, তাতে ওষুধের গন্ধ পেয়েছিলে?

—ওষুধের গন্ধ? কই, না তো, মনে পড়ছে না।

—ছিল। তুমি খেয়াল করনি। আমি পেয়েছি।

—তো? নীলাদ্রি জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে থাকে।

বৈরাগ্য চাপা গলায় বলে, ঘুমের ওষুধ হতে পারে। একটু সতর্ক থেকো। মালপত্তরগুলোর দিকে নজর রেখো।

বলতে বলতে সহসা মুখ তোলে বৈরাগ্য। আর তখনই দেখতে পায়, কেলো এবং কটা, যারা কিছুক্ষণ ধরে জমায়েতের মধ্যে দাঁড়িয়ে ধনেশ পাখির কেরামতি দেখছিল, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে বৈরাগ্যর দিকে। ওদের দু'চোখে হিংস্র রোষ।

ছয়

সামান্যক্ষণের জন্য বুঝি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল ধনেশ পাখি, সাকরেদটি ঝুঁকে পড়ে ওর দিকে। অতিশয় মধুর স্বরে বলে, বাবা, রাত অনেক হলো।

ধনেশ পাখি চমকে তাকায়। অ্যাঁ? কিছু বলছিস?

—বলছি, রাত অনেক হলো।

ধনেশ পাখি কিছুক্ষণ স্থিরপলকে তাকিয়ে থাকে সাকরেদের দিকে। দু'চোখের মণিতে ভর্ৎসনা। বলে, তুই পুনরায় পূর্ব-সংসারে ফিরে যা ষড়ানন। এ পথ তোর জন্য নয়। সেকথায় ষড়াননের চোখে-মুখে চোর-চোর ভাব। বলে, কেন বাবা?

ধনেশ পাখি সহসা তেতে ওঠে, কেন কী রে? রাত-দিন বলে কিছু আছে নাকি? ও তো মায়াবদ্ধ মানুষের বিভ্রম। রাত, দিন, এসব হলো অখণ্ড সময়ের টুকরো টুকরো মায়া। সেই মায়াজালে তুইও পড়বি?

ষড়ানন যার-পর-নাই লজ্জিত, অনুতপ্ত। বলে, আমি উটা বলতে চাইনি বাবা। বলছি, এবার কিছু মুখে দিন। শরীরটাকেও তো বাঁচিয়ে রাখতে হবেক।

ধনেশ পাখি অল্পক্ষণ গুম মেরে বসে থাকে। তারপর আপন মনে বলতে থাকে, হ্যাঁ, শরীরটাকে তো বাঁচিয়ে রাখতে হবেই। ওটাই তো আধার। বলতে বলতে ঝুলি হাতড়ে একটা ময়লা রঙের কালীমূর্তি বের করে আনে। বলে, মাকে না খাইয়ে কী করে খাই? মূর্তিটিকে নিজের কোলের ওপরে বসায় ধনেশ পাখি। ঝুলি থেকে বের করে একখানা দুধভর্তি ফিডিং বোতল। বোতলখানা মূর্তির মুখে চেপে ধরে বলে। 'খা বেটি, খা। এসব ভিড়-ভাট্টায় তোর কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।' এবং চারপাশের জমায়েত বিস্ফারিত চোখে দেখতে থাকে, ফিডিং-বোতলের দুধ একটু একটু করে কমে যাচ্ছে। নিমেষের মধ্যে কথাটা ছড়িয়ে পড়ে কামরাময়। হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। এমন অলৌকিক দৃশ্য স্বচক্ষে দেখবার জন্য পুরো কামরা ধনেশ পাখির চারপাশে ভিড় জমাতে চায়। শুরু হয় ঠেলাঠেলি, ধস্তাধস্তি।

একসময় মূর্তির মুখ থেকে ফিডিং-বোতলখানা সরিয়ে নেয় ধনেশ পাখি। নিজের

ডানহাতের ওপর উপুড় করে ধরে। চা-চামচের এক চামচ মতো দুধ ঝরে পড়ে তার হাতের তেলোতে। দুধটুকু ভক্তি ভরে পান করে ডান হাতখানি মুছে নেয় মাথার চুলে।

জমায়েত বাকরুদ্ধ হয়ে দেখছিল সেই দৃশ্য। আচমকা এগিয়ে যায় কেলো। ঝপ করে হাত পেতে দেয় ধনেশ পাখির সামনে। ঘাড় তুলে লোকটার মুখের ওপর সামান্যক্ষণ দৃষ্টি স্থির রাখে ধনেশ পাখি। কেলোর দৃষ্টিতে ততক্ষণে ফুটে উঠেছে অনুগ্রহ ভিক্ষার আকুতি। ধনেশ পাখির অনুকরণে নিজের বাবরি চুলে হাত মুছে নেয় কেলো।

ব্যাপারটি তৎক্ষণাৎ সংক্রামক রূপ নেয়। কেলোর দেখাদেখি চারপাশ থেকে হাত পেতে দিতে থাকে অন্যেরাও। একজন, দু'জন তিনজন........। দেখতে দেখতে পুরো কামরা দুধ-প্রসাদের জন্য পাগল হয়ে ওঠে। ধনেশ পাখির তিনদিক থেকে ডজন ডজন হাত ভিক্ষা চাওয়ার মুদ্রায় অস্থির।

ধনেশ পাখি হাসে। বড় ম্লান, অপ্রস্তুত হাসি। বলে, সামান্য দুধ, তোরা এতগুলো মানুষ, কী করে বিলি করি, বল্ তো। এমন কথায় অস্থিরতা বেড়ে যায় মানুষগুলোর মধ্যে। গৃহীসুলভ চাতুরি জেগে ওঠে। বাজারে কোনো সামগ্রী আচমকা আক্রা হলে যেমন করে মরিয়া হয়ে ওঠে, তেমনি মরিয়া হয়ে উঠেছে মানুষগুলো। মুহূর্তে ঠেলাঠেলি, ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায়। চলতে থাকে নিজেদের মধ্যে অনর্গল কথা কাটাকাটি।

ধনেশ পাখি অবোধ শিশুকে বোঝানোর ভঙ্গিতে বলতে থাকে, এভাবে নয়। এত রোষ, কলহ.......। ঠাকুরের প্রসাদ কি এভাবে নেয় রে? তোরা লাইনে দাঁড়া। শান্ত হ। পবিত্রতা আন মনে। সবাই পাবি। মনে রাখিস, মদের দোকানে বোতলের জন্য ঝগড়া করছিস নে তোরা, ঠাকুরের প্রসাদ নিচ্ছিস।

নীতিজ্ঞানের চাবুক খেয়ে সামান্য সংযত হয় মানুষগুলো। লাইনে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। কিন্তু আগে-পিছে দাঁড়ানো নিয়ে ঘোর বিপত্তি শুরু হয়। দেখেশুনে বীরদর্পে এগিয়ে আসে কেলো এবং কটা। বাজখাঁই গলায় বলে ওঠে, দেখি, দেখি, সরুন তো, লাইনে ঢুকুন সবাই। তাদের গলায় প্রচ্ছন্ন আদেশ। একে ঠেলে, ওকে সরিয়ে, লাইনটাকে কোনও রকমে বানায় ওরা। পেছনের দিকে কি কারণে যেন হল্লা চলছিল। স্বপন ঘোষের দলটা। সম্ভবত লাইনের পেছন থেকে কেউ ঠেলা মেরেছে ওদের। কেলো সজোরে ধমকে ওঠে, অ্যাই, চোপ্। একটিও কথা নয়।

দীপকুমার শর্মার টাইখানা ঠেলাঠেলিতে ঢিলে হয়ে গিয়েছিল। শক্ত করে নিতে নিতে সেও গলা মেলায়, সাইলেন্স।

ধনেশ পাখি ইতিমধ্যে ঝুলি থেকে বের করে ফেলেছে একটুকরো তুলো। তুলোটা দুধে ভিজিয়ে নেয়, তারপর টিপেটিপে একফোঁটা করে দুধ ফেলতে থাকে প্রত্যেকের হাতের চেটোয়। মুখে অনির্বচনীয় হাসি। প্রসাদ কণিকামাত্র।

একটু একটু করে এগোতে থাকে লাইন। কেলো আর কটা বীরবিক্রমে ম্যানেজ করতে থাকে সবকিছু।

বৈরাগ্য আর কেশব লাইনে দাঁড়ায়নি। গুম মেরে বসে রয়েছে ওরা। দেখছে, সাহেব-মেমের দল গদগদ মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে লাইনে। জিন্‌স্ আর গেঞ্জি পরা বয়কাট রিয়া, শালোয়ার-কূর্তা পরা ববছাঁট কস্তুরী, বারমুডা আর ঢোলা গেঞ্জিতে তোতন, স্টেট সার্ভিসের অফিসারবৃন্দ, একদা নাস্তিক বেণু, আইনের ছাত্র তিলকেশ, এমনকি নীলাদ্রিও বাবার পেছনে। বৈরাগ্য একবার ভাবে, নীলাদ্রিকে ডেকে নেবে। শুনে আঁতকে ওঠে

কেশব। খবরদার! পাবলিক এখন মারমুখী।

পবনকুমার শর্মার এক গা গয়না পরা সুন্দরী গৃহিণী ধনেশ পাখির কাছে পৌঁছুলে পর দেখা গেল, তাঁর বাঁ-হাতে একখানা ঝকঝকে লোটাভর্তি জল। হাত পেতে দুধটুকু নিয়েই তিনি লোটাখানি এগিয়ে ধরেন ধনেশ পাখির পায়ের দিকে। ধনেশ পাখির মুখখানা উদ্ভাসিত হাসিতে ভরে যায়। অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ গলায় বলে, বেটি, তুই বড্ড চালাক। বলতে বলতে ধীরে ধীরে বাঁ পা-টা নামায় ধনেশ পাখি। বুড়ো আঙুলখানা কচ্ছপের মুণ্ডুর মত বার কয়েক নাচায়। তারপর আস্তে আস্তে করে ডুবিয়ে দেয় লোটার জলে।

দৃশ্যখানা দেখতে দেখতে লাইনবন্দী মানুষগুলোর চোখে প্রবল ঈর্ষা জন্মে। কেমন বুদ্ধি করে সংগ্রহ করে নিল চরণামৃত! কারোর মাথাতেই তো আসেনি ব্যাপারটা! কতখানি ধুরন্ধর হলে কাউকে কিছু না জানিয়ে একেবারে নিঃশব্দে কাজ হাশিল করে ফেলতে পারে কিছু মানুষ! লাইনের মধ্যে সহসা চাঞ্চল্য শুরু হয়। কেউ কেউ তাদের লোটা, গেলাস, ওয়াটার বট্‌লগুলো যে-যার জায়গা থেকে নিয়ে আসার জন্য লাইন ভাঙতে চায়। ব্যাপারটা আঁচ করা মাত্রই গর্জন করে ওঠে কেলো এবং কটা। অ্যাই, খবরদার, একবার লাইন থেকে বেরোলে আর ঢুকতে দেব না। ফলে, সারা মুখে একরাশ আশাভঙ্গের বিষাদ জমিয়ে অসহায় দাঁড়িয়ে থাকে মানুষগুলো।

দেখতে দেখতে কেলো আর কটার অন্তরে সামান্য দয়ার সঞ্চার হয় বুঝি। গলায় অনুগ্রহ বিতরণের সুর এনে বলে, চন্নামিত্ত বিতরণের ব্যবস্থাও পৃথকভাবে করা হবে। আবার লাইন বানাব অন্য। সব্বাই পাবেন।

এমন কথায় তখনকার মতো শান্ত হয় মানুষগুলো। লাইন দিতে থাকে।

আচমকা কটা বলে ওঠে, প্রসাদ তো নিচ্ছেন লাইন দিয়ে। চন্নামিত্তও চান। বাবাকে প্রণামী দিতে হবে না? সর্বকিছু মাগনাতে পেতে চান?

মানুষগুলো বুঝি তৈরি ছিল। কারণ, কটার কথা শেষ না হতেই ডজনখানেক মানিব্যাগে আওয়াজ ওঠে। কেলো চোখের পলকে পকেট থেকে রুমালখানি বের করে পেতে দেয় মিসেস পালধির বার্থের ওপরে। ঝনাঝন পয়সা পড়তে থাকে রুমালে। দু'টাকা, পাঁচ টাকাও কিছু কিছু।

ধনেশ পাখির হাতের তুলো মুহূর্তের জন্য থেমে যায়। কেলোর দিকে অল্পক্ষণ তাকিয়ে থাকে সে। চোখের তারায় দুর্ভাবনার মেঘ জমে চকিতের তরে। পরমুহূর্তে হাঁ-হাঁ করে ওঠে ধনেশ পাখি, থাম্‌, থাম্‌। করিস কী তোরা?

পয়সা ফেলতে উদ্যত হাতগুলো থেমে যায়। ধনেশ পাখি সারা মুখে রাজ্যের ঘেন্না জড় করে বলে, কফ-থুতু-সর্দি মোছা রুমাল, প্রণামী দেওয়ার আর জায়গা পেলি নে? এ প্রণামী মা নেবেন? বলতে বলতে ঝুলিতে হাত পুরে বের করে আনে একখণ্ড লাল কাপড়। ছুঁড়ে দেয় সাকরেদের দিকে। সাকরেদটি সঙ্গে সঙ্গে নিজের কোলের ওপর পেতে নেয় কাপড়খানা। পয়সা পড়তে শুরু করে লাল কাপড়ের ওপর।

কেলো আর কটার চোখে স্বপ্নভঙ্গের বেদনা। চাপা রোষও উঁকি মারছিল চকিত বিদ্যুতের মতো। ধনেশ পাখি নরম দৃষ্টিতে তাকায় ওদের দিকে। মোলায়েম গলায় বলে, ওই নোংরা রুমালের পয়সা আর কোন্‌ কাজে লাগবে! তোরাই রেখে দে। তোরাও তো মায়েরই সন্তান। আলগোছে পয়সাসুদ্ধ রুমালখানা তুলে নিয়ে পকেটে পুরে রাখে কটা। বৈরাগ্যর বুঝতে কোনই অসুবিধে হয় না, সেয়ানায় সেয়ানায় কিঞ্চিৎ কোলাকুলি

হয়ে গেল। এবং এ রাউন্ডেও জিতে গেল ধনেশ পাখি। বৈরাগ্য এও বুঝতে পারে, কেলো এবং কটা ধনেশ পাখিদের পূর্বপরিচিত নয়। শুধু হঠাৎ এসে যাওয়া একটা মওকার সদ্ব্যবহার করতে চাইছিল ওরা।

কাজকামের মধ্যেও কেলো আর কটা অনেকক্ষণ ধরে আড়চোখে দেখছিল কেশব আর বৈরাগ্যকে। একসময় এসে মুখোমুখি দাঁড়ায়। কটা বলে ওঠে, আপনারা বসে রয়েছেন যে? প্রসাদ নেবেন না?

—নাহ। বৈরাগ্য অন্যদিকে মুখ ফেরায়।

এর মধ্যে কখন যেন দু'ঢোক গিলে এসেছে কেলোরা। মুখ থেকে ভকভকিয়ে গন্ধ বেরোচ্ছে। বৈরাগ্যর কথা শুনে ওদের চোখদুটো ধ্বক করে জ্বলে ওঠে। বলে, কেন? নেবেন না কেন?

—আমার এসবে বিশ্বাস নেই।

—কীসবে বিশ্বাস নেই?

—এইসব বুজরুকিতে বিশ্বাস নেই আমার।

লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন যাঁরা, তাঁরা স্পষ্টতই অপমানিত বোধ করেন। কামরা জুড়ে শুরু হয় তিক্ত গুঞ্জন। ডঃ চন্দ্র বলে ওঠেন, দিস ইজ টু মাচ! ইট ইজ অ্যান ইনসাল্ট টু অল অব্ আস।

কেশব বৈরাগ্যর হাতে আলতো চাপ দেয়। খুব নিচু গলায় বলে, আহ্, বৈরাগ্য, চুপ কর্। মুখে কাষ্ঠ হাসি ফুটিয়ে বলে, লাইনটা একটু পাতলা হলেই দাঁড়াব, দাদা।

বৈরাগ্য দু'চোখে আগুন জ্বেলে তাকায় কেশবের দিকে। কেলো আর কটা দু'পা এগিয়ে আসে। একেবারে বৈরাগ্যর গা ঘেঁসে দাঁড়ায়। কটা সরাসরি বৈরাগ্যর চোখে চোখ রাখে, বুজরুকিকাকে বলছেন? কেলো সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, বুজরুকির কী দেখলেন? লাইনের মধ্যে গুঞ্জনটা বাড়তে থাকে। ইতিমধ্যে কেলো-কটার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে দীপকুমার শর্মা। আচমকা চেঁচিয়ে ওঠে সে, প্রুভ করতে পারবেন, এটা বুজরুকি? ক্যান য়্যু প্রুভ ইট?

এমন প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও বৈরাগ্যকে মনে মনে স্বীকার করতে হয়, দীপকুমারের ইংরেজি উচ্চারণটা ভালো। বেশ ভালো।

দীপকুমারের চিৎকারকে তিলমাত্র পাত্তা না দিয়ে কটা ঝানু উকিলের ভঙ্গিতে তর্জনী তাক করে বৈরাগ্যর দিকে। বলে, আপনি না হয় নাস্তিক, ঠাকুর-দ্যাবতা নিয়ে বিলা করেন, নিজের বাপকেও স্বীকার করেন না, কিন্তু এতগুলো মানুষের বিশ্বাসকে বুজরুকি বলেন কোন সাহসে?

—রাইট। কামরার সমস্ত মানুষকে ইনসাল্ট করবার কোনও অধিকার আপনার নেই।

—আপনিই কেবল সবজান্তা? বাকিরা সব বুরবক?

—নিজেকে কী ভাবেন আপনি, অ্যাঁ?

চারপাশ থেকে কটুমন্তব্য অবিরাম ঝরে পড়তে থাকে শিলাবৃষ্টির মতো। এমন কি নীলাদ্রিও বলে ওঠে, সত্যি আংকল্, এটা তোমার খুব অন্যায়। তখন থেকে সবাইয়ের সব অ্যাক্টিভিটিকেই তুমি কন্ট্রাডিক্ট করছ।

সহসা পেছন থেকে চেঁচিয়ে ওঠেন অধ্যাপক কল্যাণ সান্যাল। চেঁচানির চোটে তাঁর অধ্যাপক-সুলভ ভরাট গলা আচমকা ভেঙে যায়। বলেন, আপনি বেমালুম ভুলে গেছেন

যে এভরিবডি হ্যাজ আ রাইট। আপনি বার বার অব্‌লিক রেফারেন্স দিয়ে মানুষের বিশ্বাসের অধিকার কার্ব করতে চাইছেন।

কেলো-কটাকে দু'হাতে সরিয়ে বৈরাগ্যর একেবারে সামনে এসে দাঁড়ায় দীপকুমার। কোমরে দু'হাত রাখে মারমুখী হিরোর ভঙ্গিতে। অত্যন্ত কর্কশ গলায় বলে, আপনি উইথড্র করছেন কিনা?

কেশব আবার বৈরাগ্যর বাঁ-হাতে মৃদু চাপ দেয়। ফিসফিস করে বলে, উইথ্‌ড্র করে নে। গোঁয়ার্তুমি করিসনে। তুই দেখছি আমাকেও বিপদে ফেলবি।

কেলো আর কটা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল বৈরাগ্যর দিকে। ওদের চোখগুলো দপদপিয়ে জ্বলছিল। সহসা কেলো বলে ওঠে, শালাকে জোর করে প্রসাদ খাওয়াব। খাবে না মানে? ইয়ার্কি! সারা কামরা জুড়ো হো-হো গোছের শব্দ ওঠে। যেন ধ্বনিভোটে পাস হয়ে যায় কেলোর প্রস্তাবটা।

এমনি সময়ে উঠে দাঁড়ায় কেশব। কেলোর দিকে তাকিয়ে খুব বন্ধুত্বপূর্ণ হাসে। বলে, আসছি। বাথরুমে। বৈরাগ্য সহসা ভীষণ নিঃসঙ্গ হয়ে যায়। চারপাশ থেকে ডজনখানেক জ্বলন্ত চোখ তার সারা মুখ পুড়িয়ে দিচ্ছে। চারপাশ থেকে ধেয়ে আসছে তীক্ষ্ণ চোরামন্তব্য। দীপকুমার পুনরায় চেঁচিয়ে ওঠে, কী আশ্চর্য, এখনও কোথাটা উইথড্র করলেন না আপনি?

বৈরাগ্য খুব সংযত গলায় জবাব দেয়, আপনারা বিশ্বাস করছেন, করুন। আমি যদি না করি, তাতে কী-ই বা আসে যায়?

—আসে যায়। ঠেলেঠুলে এগিয়ে আসেন অধ্যাপক কল্যাণ সান্যাল, আপনি একা না বিশ্বাস করলে, ব্যাপারটাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করলে, সারা কামরার মানুষের খুবই এসে যায়। আপনার এই গোঁয়ার্তুমিতে যদি উনি রুষ্ট হন, তো যে-কোনো মুহূর্তে কিছু একটা ঘটিয়ে দিতে পারেন। যতটুকু দেখলাম, ওঁর সে ক্ষমতা রয়েছে।

—তখন সামলাবে কে?

—আপনি?

কথাটা মুহূর্তের মধ্যে সংক্রামিত হয় পুরো কামরায়। একের পাপে প্রায় সবাই ধ্বংস হতে বসেছে, এমনই একটা অনুভূতি অতি দ্রুত গ্রাস করে ফেলে সবাইকে। ভয় মানুষকে হিংস্র করে তোলে। সারা কামরার প্রতিটি নিরীহ মুখেও এই মুহূর্তে প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষ আর রোষ দেখতে পায় বৈরাগ্য। মানুষগুলো একটু একটু করে হিংস্র হয়ে উঠছে।

পেছন থেকে স্বপন ঘোষ বলে ওঠেন, আপনি দাদা সত্যি সত্যি হিন্দু তো?

—হিন্দু! হিন্দু হলে এমন কথা বলে?

—দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে কত মোছ্‌লা ইদানীং ঘুরে বেড়াচ্ছে রাস্তাঘাটে।

—অত কথায় কাজ কী? প্যান্ট খুলে দেখে নে না।

বৈরাগ্য স্পষ্টতই বিপন্ন বোধ করে। পুরো ব্যাপারখানা ক্রমে ক্রমে জটিল রূপ নিচ্ছে। কেশবকেও আর দেখতে পাচ্ছে না। হতে পারে বাথরুমেই ঢুকে পড়েছে সে! হতে পারে অন্য কোনো খোপে গিয়ে বসে রয়েছে। লাইনেও দাঁড়িয়ে পড়তে পারে। এখান থেকে লাইনের শেষ প্রান্ত অবধি নজর যায় না বৈরাগ্যর। অকস্মাৎ সে লক্ষ করে, গিয়াসুদ্দিনসাহেব এবং তাঁর স্ত্রী, যাঁরা এতক্ষণ একজোড়া পাথরের মতো নিশ্চল বসেছিলেন নিজেদের সিটে, সন্তর্পণে চলে যাচ্ছেন ভেস্টিবল পেরিয়ে, অন্য কামরার

দিকে।

মানুষগুলোর গনগনে চোখ বৈরাগ্যকে দগ্ধ করছিল অবিরাম। ওদের মুখের প্রতিটি রেখা, ঠোঁট, চিবুক, চোয়াল, ভেঙেচুরে, বেঁকে-দুমড়ে যাচ্ছিল তীব্র অসূয়ায়। বৈরাগ্যর ভয় করছিল। এতগুলি শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান, পরিচিত মানুষের মধ্যে থেকেও নিজেকে নিদারুণ নিঃসঙ্গ, অসহায় লাগছিল। পুরো কামরাটাই যেন এই মুহূর্তে এক শত্রুপুরী। যেন শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য। যেন সারা কামরাজুড়ে আদিমযুগের বদ্ধ, গুমোট বাতাস, অর্ধভুক্ত লাশের পচা গন্ধ। যেন ওকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে জ্ঞানবোধহীন একদল নখদন্তসম্পন্ন মনুষ্যেতর জীব! একদল বিষধর সাপ যেন ফণা তুলে দংশনোদ্যত দাঁড়িয়ে রয়েছে ওর সামনে...।

ধনেশ পাখি মিটিমিটি হাসছিল। তামাশা দেখবার হাসি। পা দুটো আস্তে আস্তে একটা নির্দিষ্ট লয়ে নাচাচ্ছিল। বৈরাগ্যর মনে হয়, এই মুহূর্তে পুরো কামরাটাই লোকটার পুরোপুরি দখলে। একেবারে মুঠোর মধ্যে। লোকটা যদি এই মুহূর্তে বলে ওঠে, এই ছোকরাটা বড়ই নাস্তিক। ঈশ্বর বিরোধী। মা-কালী ওর রক্ত চান। কে এনে দিবি, ওর রক্ত? বৈরাগ্যর কোনোই সন্দেহ নেই, এই সুট-কোট পরা শিক্ষিত আধুনিক মানুষগুলোই মুহূর্তের মধ্যে উন্মাদের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে ওর ওপর। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে ওর শরীরখানা।

বৈরাগ্য এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল। মুক্তির উপায় খুঁজছিল। মুসলমান-দম্পতির মতো সেও ভেস্টিব্‌ল্ পার হয়ে চলে যেতে চাইছিল পাশের কামরায়। কিন্তু তার কোনো উপায় নেই। উন্মত্ত মানুষগুলো তাকে ঘিরে রয়েছে চারপাশ থেকে। ওদের চোখের আগুন গনগনে হচ্ছে ক্রমশ। বৈরাগ্যর চারপাশে ওদের লৌহ বেষ্টনী আরও মজবুত হচ্ছে...।

রাতটা ক্রমশ গভীর হচ্ছে। তীব্র বেগে ছুটে চলেছে ট্রেন। স্টেশন আসতে এখনও অনেক দেরি।

আজকাল, ১৯৯৬

গরু ঘাস খায়

রাত সাড়ে আটটা নাগাদ ঠেক-এ পৌঁছে জগৎ হালদার ও হেরম্ব বোস দেখল, লোকটি বসে পড়েছে তার নির্দিষ্ট জায়গায়, একমনে পান কবে চলেছে। কোনদিকেই ভ্রূক্ষেপ নেই লোকটার।

বাইরে অবিশ্রান্ত বর্ষণ চলছে।. ছাতা বন্ধ করে, জল ঝবিয়ে এক কোণে রাখল ওরা। রুমাল দিয়ে মাথা-মুখ মুছল। তারপর ফের একবার তাকাল লোকটার দিকে। আশ্চর্য! লোকটা আজকের দিনেও নির্দিষ্ট সময়ে!

আজ ঠেক-এ খদ্দেরের সংখ্যা কম। দিনভর যা বৃষ্টি! বিরাম নেই একতিল। কেশব আব ক্ষেত্র বসে বসে উশখুশ করছে হেরম্বদের জন্য। একটু যেন উত্তেজিত লাগছিল ওদের। কারণটা কাছে যেতেই মালুম হয়। ঠেক-এর গা ঘেঁষে কানু গরাইয়ের তেলভাজার দোকানে ফুলুরি-বেগুনি ভাজা চলছে। কালো কুচকুচে কড়াইতে গলায় গলায় ফুটন্ত তেল। তার মধ্যে বেগুনিগুলো ডুবছে, ভাসছে। রেপসীড তেলের ঝাঁঝাল গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে হাওয়ায়। সোঁ-সোঁ ধোঁয়া উর্ধ্বমুখ। এই দিনকয়েক আগেই লোকটার নাম জানা গেছে। কেনারাম। ওর এক পরিচিত জন, যে এই ঠেক-এর খদ্দের নয়, একদিন আচমকা ঢুকে পড়েই চেঁচিয়ে উঠেছিল, কেনারাম যে! তুমি এখানে বস নাকি? কেনারাম নামের মানুষটি ভাবি অবোধ হাসি হেসেছিল। নাম জানত না বটে, তবে কেনাবামকে ভালই চিনত হেরম্ব বোসের দল। এই ঠেক-এ প্রায় বছর দুয়েক নিয়মিত আসছে। নির্বিকার মুখে আসে, পান করে নিঃশব্দে, নির্বিকার মুখে চলে যায়। কারোর সঙ্গে কখনই কোনও বাদ-বিসম্বাদে জড়িয়ে পড়ে নি কেনারাম। তবুও লোকটাকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না হেরম্বরা। তবে ওর একটা জিনিসের ভূয়সী প্রশংসা করে মনে মনে। লোকটার শৃঙ্খলাবোধ, নিয়মানুবর্তিতা এবং সময়জ্ঞান। দু'বছর যাবৎ কেনারাম এই ঠেক-এ বসছে, হেরম্বরা ওকে একটি দিনের জন্যও কামাই দিতে দেখে নি। ঝড়-ঝঞ্ঝা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, এলাকা জুড়ে মাস্তানদের তাণ্ডব, খুনোখুনি, এলাকা শুনশান, কোন কিছুই ওকে নিরস্ত করতে পারে নি একদিনের জন্যও। আর, আসবে ঠিক কাঁটায় কাঁটায় আটটায়, চলে যাবে সওয়া দশটায়। কোনদিনও এই সময়সীমার নড়চড় হয় নি একতিল। যদিও তার হাতে কোনও ঘড়ি বাঁধা থাকে না, তবুও হেরম্বদের মনে হয়, রোজ আটটায় এসে যে কেউ ওকে দেখে ঘড়ি মিলিয়ে নিতে পারে। যে চেয়ারটিতে বসে কেনারাম, সেটা ছাড়া অন্য কোথাও বসবে না সে। অন্য চেয়ার খালি থাকলেও নয়। ওর বসবার চেয়ারটিতে কেউ আগেভাগে এসে বসে পড়লে কেনারাম অপেক্ষা করবে নিঃশব্দে, চেয়ার খালি হলে খুব ধীরগতিতে গিয়ে বসবে, যাতে পূর্ববর্তী চেয়ার-দখলকারী সদ্দেবটির এমন ধারণা না হয় যে কেনারাম ঐ চেয়ারটিতে বসবার জন্য একবারে হেদিয়ে মরছিল। আরও একটা ব্যাপার, কেনারাম রোজ দু'বোতল 'দেশি' খায়।

দু'বোতলই। দেশিই। কোনদিন শরীর-টরীর খারাপ বলে কিংবা পকেটে রেস্ত কম থাকবার অজুহাতে কমও খাবে না, আবার কোনও কারণেই সামান্য বেশিও নয়। মুখ বদলাবার জন্য কোনদিন একটা সস্তা রাম কিংবা হুইস্কি নিতে তাকে কেউ কখনও দেখে নি। তবুও, যেহেতু লোকটাকে হেরম্বরা দু'চক্ষে দেখতে পারে না, কেশব বলে, এই ব্যাপারগুলো পশুদের মধ্যেই থাকে। পশুরা নিজস্ব শিকারক্ষেত্রটিকে অতিক্রম করে না কখনই। জৈবিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে, নিয়মানুবর্তিতায় আর সময়ানুবর্তিতায় তারা মানুষকে সবক্ষেত্রেই টেক্কা দেয়। প্রয়োজনের বেশি ভোগ করাও ওদের রীতিবিরুদ্ধ। মানুষই বরং সুযোগ পেলেই সমস্ত নিয়ম ভেঙে ফেলে। স্থান-কাল-পাত্র বিচারে মানুষ পশুদের চেয়ে নিকৃষ্ট। এই নিয়ে প্রবল তর্ক বেধে যায়। কেশব প্রভূত উদাহরণ সরবরাহ করতে পারে। বলে, পশু তার নিজের জন্য নির্ধারিত খাদ্যবস্তুটি ছাড়া আর কিছুই খায় না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত এক কণাও তাদের খাওয়ানো যায় না। সঙ্গমের ক্ষেত্রে মানুষের তো কোনকালেই স্থান-কাল-পাত্র জ্ঞান নেই, কিন্তু পশুরা, স্রেফ মেটিং টাইম ছাড়া স্ত্রী-দেহ স্পর্শই করে না। লোকটার মধ্যে পশু-প্রবৃত্তি প্রবল।

কেনারামকে যার-পর-নাই অপছন্দ করবার যথার্থ কারণ রয়েছে হেরম্বদের। এই দু'বছরে লোকটাকে দেখতে দেখতে, দু'চারটে কথাবার্তা চালাতে চালাতে ওদের বিশ্বাস জন্মেছে, কেনারাম নামক লোকটি একেবারেই গণ্ডমূর্খ। ভীষণ মাথামোটা। দুনিয়ার কোনও ব্যাপারেই সামান্যতম জ্ঞান নেই তার। এমন কি, যে কথাটা একটা দুধের বাচ্চাও জানে, লোকটা সেসব ব্যাপারেও বিরক্তিকরভাবে অজ্ঞ। হেরম্বদের মনে হয়েছে, দুনিয়ার কোনও ব্যাপারেই লোকটার সামান্যতম আগ্রহ নেই, এমনকি নারীতেও নয়, কেবল ঐ এক মদ খাওয়া ছাড়া। এমন লোককে সহ্য করা মুশকিল। এমন লোককে উপহাস, বিদ্রূপ, অপমানই করা চলে, প্রকাশ্যে অথবা মনে মনে।

কেনারামের পাহাড়-প্রমাণ অজ্ঞতার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল একটি ছোট্ট ঘটনা থেকে। ইন্ডিয়া-অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট ম্যাচ চলছিল। সারা দেশ উত্তেজনায় কাঁপছিল। তেমনই এক সন্ধ্যায় মদের আড্ডায় বসেও মনটা উসখুশ করছিল কেশবের। খেলার সর্বশেষ ফলাফলটা জানা নেই তার। দিনভর ব্যবসার কাজে কলকাতার বাইরে টো-টো করে কাটিয়েছে। বাড়ি ফিরেই সোজা চলে এসেছে ঠেক-এ। আড্ডায় ঢুকেই দেখতে পেয়েছিল, কেনারাম আপন মনে পান করছে। হেরম্বরা তখনও এসে পৌঁছয় নি। কেশব ঘাড় ঘুরিয়ে কেনারামকে শুধিয়েছিল, খেলার রেজাল্টটা জানেন নাকি? কেনারাম প্রথমটা বুঝতেই পারে নি যে তাকেই প্রশ্নটা করা হয়েছে। সে গেলাস থেকে মুখ তুলে খানিক সময় ভাবলেশহীন চোখে তাকিয়েছিল কেশবের দিকে, কিছু বলছেন?

'বলছি, আজকের খেলার রেজাল্টটা জানেন?'

'কোন্ খেলা বলুন তো?'

'ইন্ডিয়া-অস্ট্রেলিয়ার খেলা চলছে না?'

কেনারাম সামান্যক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে, 'কী খেলা?'

'যাব্ বাবা! ক্রিকেট। আপনি দেখি কোনও খোঁজই রাখেন না! আজাহার কত রান করল?'

'রান? রান মানে?'

মহা ফাঁপরে পড়ে গিয়েছিল কেশব। লোকটাকে 'রান' বোঝায় কেমন করে! ক্ষেপে

উঠেছিল মনে মনে। একটা চোস্ত খিস্তি বেরিয়ে এসেছিল গলা অবধি। কেনারাম গা করে নি। কেশবের গনগনে রোষকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে নি সে। ঠোঁটজোড়া ডুবিয়ে দিয়েছিল গেলাসের কানায়। খিস্তি অবশ্যি শেষমেষ মারে নি কেশব। তখনও তার পেটে এক ফোঁটাও পড়ে নি। পড়লে কি হতো বলা যায় না।

সারা মুখের তাবৎ রেখা শক্ত করে বলেছিল, 'আপনি ক্রিকেট-খেলা কখনও দেখেন নি?'

মাথা নাড়ে কেনারাম নিঃশব্দে।

'আজহারের নাম শোনেন নি?'

'উঁহু।'

কেশব দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিল, 'অস্ট্রেলিয়ার নামটা শুনেছেন তো? নাকি— ।'

কেনারাম অবোধ-চোখে তাকিয়েছিল। চোখের কোণায় খুব নির্বিরোধ হাসি ফুটিয়ে এমন একটা মুদ্রা বানিয়েছিল ডান হাতের পাঁচ-আঙুলে, যাকে বাংলায় অনুবাদ করলে দাঁড়ায়, কে জানে! কত জায়গাই তো রয়েছে দুনিয়ায়—।

'আপনি ধুবুলিয়ার নাম শুনেছেন?'

'ধুবুলিয়া?' কেনারাম সরলপানা তাকায়, 'কোথায় বলুন তো?'

সেই সন্ধ্যায় পুরো ব্যাপারটা কেশবকে শুধু ক্ষিপ্তই করে নি, বিস্মিতও করেছিল। পরে, আড্ডার বন্ধুদের বলেছিল, এমন উজবুক মানুষও আছে দুনিয়ায়?

সেই থেকে কেনারাম হয়ে গেল হেরম্বদের দু'চক্ষের বালি। শুধু বালিই নয়, একটু একটু করে সে হয়ে উঠল ওদের 'মুরগি'। মানুষের মধ্যে কোনও বিদঘুটে ব্যাপার দেখলে মানুষ তাকে নিয়ে মজা করতে কখনই ছাড়ে না। এমনি করেই একজন অন্যজনের 'মুরগি' হয়ে ওঠে। কেনারামের পাহাড়-প্রমাণ অজ্ঞতা অতঃপর হেরম্বদের খেলার বিষয় হয়ে ওঠে। হেরম্বরা ওর সঙ্গে যেচেই আলাপ করে, ধীরে ধীরে, একটু একটু করে সেটাকে ঘনিষ্ঠতার পর্যায়ে নিয়ে যায়। লাগাতার কারো পিছে লাগতে গেলে একটা ঠাট্টা-রসিকতার সম্পর্ক গড়ে তুলতে হয় প্রথমে। তারপরে ঐ অম্ল-মধুর খাঁড়াটি দিয়ে মানুষটিকে একটু একটু করে কোপানো যায়। হেরম্বরা ওকে সিগারেট অফার করে। কেনারাম মৃদু হেসে জানায়, সে সিগারেট খায় না।

'সে কি, সিগারেট তো বাচ্চা ছেলেও খায়?'

'আমি মদ ছাড়া কিছুই খাই নে।'

স্রেফ মস্করা করে কেশব শুধিয়েছিল, 'সে কি! চা-ও খান না?'

কী আশ্চর্য, কেনারাম মাথা নেড়ে বলে, 'মদ ছাড়া আমার কোনও নেশাই নেই।'

'পায়ের ধুলো দাও, গুরু।' ক্ষেত্রটাকে দেখলে একটু চ্যাংড়া-চ্যাংড়া ফিচেল-ফিচেল লাগে। গোঁফ নাচিয়ে বলে, 'তুমি তো দেখছি জগৎ-সংসারের সব কিছুই মদের বোতলে বেঁধে ফেলেছ! আর কোনই নেশা নেই তোমার?'

কেনারামের কোনই ভাবান্তর নেই। না কোনও উচ্ছ্বাস, না কোনও আত্মপ্রসাদ। বলে, 'কিচ্ছু না।'

'দেখেছিস?' ক্ষেত্র বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে চোখ নাচায়, 'একেই বলে সংযম। এমন মানুষই কালক্রমে মহাপুরুষ হয়।'

কেনারাম অবোধ চোখে তাকায় ক্ষেত্রর দিকে। ক্ষেত্র বিদ্রূপ করছে কিনা পরখ

করে বুঝি। বুঝতে পারে না। সামান্য ঢুলু ঢুলু হাসে।

'মা কালী।' জিভ কাটে ক্ষেত্র, 'একটুও ঠাট্টা নয়। আপনি মহাপুরুষ, এমনটা বলছি নে, কিন্তু যারা হয়, এমনি করেই হয়। এই চারিত্রিক দৃঢ়তা..., আপনি দাদা আমার নমস্য।'

'এমনি করে চালিয়ে গেলে আপনি নির্ঘাৎ পরমহংসদেব হবেন।' জগৎ হালদার বলে ওঠে।

'পরমহংসদেব কে?'

'রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, আশ্চর্য, নামটা শোনেনেই নি?'

'রামকৃষ্ণ...রামকৃষ্ণ...।' একমনে বিড়বিড় করতে থাকে কেনারাম। তার মুখমণ্ডলে কোনও তাপ-উত্তাপ নেই। সে একনজরে কেশবকে দেখেই ফের গেলাসের সাহচর্যে চলে যায়। তারপর এমনই বুঁদ হয়ে যায়, যেন এতক্ষণ কেউ কিছু বলেইনি ওকে। যেন ওর চারপাশে জনপ্রাণীই নেই।

এরপর, রোজ সন্ধ্যায় মদ খাওয়ার পাশাপাশি এক মজাদার খেলার ফাঁদে একটু একটু করে আটকে যেতে থাকে হেরম্বরা। কেনারামের অজ্ঞতার পরিধিটিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরিমাপ করা, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বের করে আনা, এবং যতদিন যায়, হেরম্বদের বিস্ময়ের পারদখানি ততই চড়তে থাকে উত্তরোত্তর। লোকটা এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কোনও কিছুরই খোঁজ রাখে না। একটা বাচ্চা ছেলেও যে-সব বিষয় বিলক্ষণ জানে, কেনারাম সে সব বিষয়েও সম্পূর্ণ অন্ধকারে। ক্রিকেট, ফুটবল, তাস, দাবা, কোনও খেলারই কোনও খোঁজ রাখে না। রাজনীতির হাল চালও বিন্দুবিসর্গ বোঝে না। ভারতের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীর নাম তো দূরের কথা, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নামটাও তার ঠিকঠাক জানা নেই। সে রুই-মৃগেলের তফাৎ বোঝে না, দুধ থেকে কোন্ কোন্ প্রক্রিয়ায় ছানা তৈরি হয়, তার জানা নেই। রবীন্দ্রনাথ, সত্যজিৎ, রবিশঙ্করের নাম সে কস্মিনকালেও শোনে নি। কলকাতার ট্রাম যে বিদ্যুতে চলে, উত্তমকুমার যে মারা গেছেন, চাঁদে যে মানুষ গিয়েছে, তাজমহল যে আগ্রায়, ম্যালেরিয়া যে মশা কামড়ালে হয়, কাশী আর বেনারস যে একই জায়গায়, কাঁঠাল আর এঁচোড় যে একই ফল, এসব সে জানেও না, এসব নিয়ে মাথাও ঘামায় না। এমনকি, কী দিয়ে ময়দা তৈরি হয়, কোন্ ঋতুতে জাম পাকে, বেসন কী দিয়ে বানায়, পটলের পাতাকেই যে পলতে-পাতা বলে, তাও জানা নেই কেনারামের।

কেশব এক চোখ ছোট করে শুধোয়, 'গরু যে ঘাস খায়, এটা জানেন তো?'

এমন কথায়ও কোনও বিকার ঘটে না কেনারামের। সে বুঝতেই পারে না যে তাকে ঠাট্টা করে বলা হয়েছে কথাটা। বিড়বিড়িয়ে বলে, 'হ্যাঁ, গরু তো ঘাসই খায়।'

একসময় মুখ খোলে হেরম্ব, 'আপনার এডুকেশনটা জানতে পারি?'

কেনারাম হাবার মতো তাকিয়ে থাকে। বলে, 'কী জানতে চাইছেন? ঠিক বুঝতে—।'

'বলছিলুম, আপনার পড়াশুনোটা কদ্দুর?'

আস্তে আস্তে মাথা দোলায় কেনারাম। ডান হাতখানা আস্তে আস্তে নাড়াতে থাকে, 'কিস্যু না, ইস্কুলেই যাই নি।'

'নামটা তো সই করতে পারেন? নাকি তাও—।'

মাথা দোলানো থামে না কেনারামের। ঢুলঢুলু হাসে। বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল কাছিমের মুণ্ডুর মতো শক্ত করে তুলে ধরে বুঝিয়ে দেয়, সে টিপসইয়ের খদ্দের।

দুই

কেশব আর ক্ষেত্র সামান্য আগে পৌঁছেছে। হেরম্বরা ঠেক-এ ঢুকেই বুঝতে পারে, কোনও এক বিষয় নিয়ে ওরা দারুণ উত্তেজিত। টেবিলে গিয়ে বসতেই উত্তেজনার কারণটা বোঝা গেল। আজ উল্টোডাঙা স্টেশনে প্রচুর এলাচ আর লবঙ্গ ধরা পড়েছে।

কেশবই বিতাং করে বলে ঘটনাটা।

নৈহাটি থেকে কেশব ফিরছিল গেদে লোকালে। একটা নিরীহ মতো লোক বসেছিল ওরই সামনের সিটে। পুকপুক করে বিড়ি টানছিল সারাক্ষণ। কেশবের কোনও সন্দেহই হয় নি লোকটাকে। ওদের মাথার ওপরের বাংকে দুটো ঢাউস কাপড়ের থলি ছিল। কেশব তো খেয়ালই করে নি থলিগুলোকে। উল্টোডাঙায় হুড়মুড়িয়ে উঠল জি-আর-পি-র লোকজন। কোনদিকেই না তাকিয়ে সরাসরি চলে এল থলিদুটোর কাছে। বলল, এগুলো কার? কেউই জবাব দেয় না। থলিদুটোকে টিপেটুপে দেখতে থাকে ওরা। বার বার শুধোয়, থলিদুটো কার?

একসময় ঐ চিমসেপানা লোকটা ফিসঁফিস করে বলে, 'আমার।'

'উঠুন।' বলেই থলিদুটোকে নামিয়ে নেয় জি-আর-পি'র লোকগুলো। লোকটাও তাদের পিছু পিছু নেমে যায়। থলিদুটো টানাহেঁচড়া করে করে নামানোর সময় দু'চারটে এলাচ-লবঙ্গ ঝরে পড়ে মাটিতে। ইয়াব্বড়-বড় সাইজ। বেশ পুষ্ট, টসটসে।

'দু' বস্তা লবঙ্গ এলাচ! 'ক্ষেত্র আকাশ থেকে পড়ে, 'কত দাম হবে রে?'

'দাম তো অনেক। কিন্তু আমি ভাবছি, পুলিশগুলো অমন অব্যর্থভাবে বস্তার কাছে পৌঁছে গেল কী করে?'

'ওদের স্পাই থাকে।'এ লাইনে রোজ হাজার কিসিমের চোরাই মাল আসে। পুলিশ সবই জানে। ওদের সঙ্গে রফা থাকে স্মাগলারদের।'

'তবে ধরল কেন? রফাই যদি থাকে—।'

'মাঝে মাঝে ধরতে হয়। কেস দিতে হয়। চাকরি কবছে তো।'

'কোত্থেকে আসছিল কে জানে?'

'বাংলাদেশ থেকে।'

'বাংলাদেশে বুঝি লবঙ্গ-এলাচের চাষ হয়?'

'এগুলো আমেরিকান এলাচ আর জাঞ্জিবার ভ্যারাইটির লবঙ্গ।' আচমকা পাশের টেবিল থেকে বলে ওঠে কেনারাম।

হেরম্বরা চমকে তাকায়। খোসগল্পে এমনই মশগুল ছিল ওরা, কেনারামের উপস্থিতিটা বেমালুম ভুলেই গিয়েছিল। সে যে পাশের টেবিলে বসে নিঃশব্দে পান করে চলেছে সেটা বুঝি মনেই ছিল না ওদের। কেনারামের আচমকা মন্তব্যে ওদের বুঝি বিস্ময়ের ইয়ত্তা থাকে না। প্রথমত, কেনারাম কখনই গায়ে পড়ে কথা বলে না। তাকে রোজ-দিনই খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কথা বলাতে হয়। আজই প্রথম নিজের থেকে লোকটা কেন জানি আচমকা ঢুকে পড়ল এদের আলোচনার মধ্যে! তার চেয়েও বড় কথা, হেরম্বদের বিস্ময়টা যে কারণে গাঢ়তর হয়, লোকটা এতদিন বাদে নিজের থেকে একটা তথ্য পেশ করল। হেরম্বরা মজা পায়। তাও ভালো, অন্তত একটা খবর লোকটা রাখে।

কেশব মজা করবার লোভ সামলাতে পারে না। বলে, 'আপনি লবঙ্গ-এলাচ চেনেন

তাহলে?'

'একটু একটু।' খুব লাজুক হাসি হাসে কেনারাম।

'লবঙ্গ দেখতে কেমন হয় বলুন তো? ক'টা শিং? কতগুলো দাঁত?'

কেনারাম পরপর দু'বার চুমুক মারে গেলাসে। ঢুলুঢুলু তাকায়। বলে, লবঙ্গ তো এক জাতের হয় না, কলম্বো ভ্যারাইটি হলে একরকম দেখতে, জাঞ্জিবার ভ্যারাইটি হলে আর এক রকম। ম্যাডাগাস ভ্যারাইটি, সে আর এক রকম। সবচেয়ে ভালো দেখতে কোচিন ভ্যারাইটি। কিন্তু তা আর পাচ্ছেন কোথায়?'

হেরম্বদের চোখে পলক পড়ছিল না। কেনারামের আজ হলো কি? বলে, 'জাঞ্জিবার ভ্যারাইটি? জাঞ্জিবার কোথায় জানেন?'

'কোথায় আবার, মারিশাসের কাছেই। একটা দ্বীপ।'

হেরম্বরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। এক ধরনের চাপা অবিশ্বাস পাতলা মেঘের মতো জমছে। কেনারামের সেদিকে তিলমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। পুনরায় নিঃশব্দে পান করতে শুরু করে সে।

ধীরে সুস্থে গেলাসটা শেষ করে একসময় উঠে দাঁড়ায় কেনারাম। প্যান্টের ঢোলা-পকেট থেকে একখানি বটুয়া টেনে বের করে। বটুয়ার মধ্যিখানে কাপড় দিয়ে পার্টিশান বানানো। একটি কুঠরিতে হাত ঢুকিয়ে প্রায় আধ মুঠো লবঙ্গ বের করে আনে কেনারাম। মুঠো আলগা করে ঢেলে দেয় টেবিলের ওপর। তারপর দু' আঙুলে চিমটে বানিয়ে একখানি লবঙ্গ তুলে নিয়ে হেরম্বদের মুখের সামনেটিতে ধরে, 'এই দেখুন, এটা হল কলম্বো ভ্যারাইটি। বেঁটে, মাথামোটা, কালচে রঙ...তেমন একটা টেস্টফুলও নয়। এমন মেয়ের বর পাওয়া মুশকিল।'

কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে আসছিল হেরম্বদের বোধবুদ্ধি। আলগোছে বলে ওঠে, 'বর? বর মানে?'

ঢুলু ঢুলু হাসে কেনারাম, 'ঐ একটা কথা। খদ্দের। খদ্দের মেলে না। ভালো দামে বিকোয় না।'

হেরম্বর চোখ কপালে উঠে যায়। বিস্ময়, অতীব বিস্ময়! ঐ অবস্থায় বন্ধুদের সঙ্গে সবিস্ময় চোখাচোখি করে সে। বর! লবঙ্গের বর খদ্দের! কেনারাম ভেতরে ভেতরে কতখানি ছুপা রুস্তম আন্দাজ করবার চেষ্টা করে। ততক্ষণে কেনারাম ঐ লবঙ্গটি সরিয়ে রেখে ডাঁই থেকে তুলে নিয়েছে আর একটি লবঙ্গ, 'এবার এটা দেখুন। ম্যাডাগাস ভ্যারাইটি। দেখতে ভালো নয়, টেস্ট ভালো নয়, বেঁটে, কালচে...খানিকটা কলম্বো ভ্যারাইটির মতোই, তবে তফাৎ রয়েছে।' বলতে বলতে কেনারাম বাঁ হাতের তর্জনী আর বুড়ো আঙুলকে চিমটে বানিয়ে টেবিল থেকে তুলে নেয় প্রথমে বাছা লবঙ্গটিকে। দু'হাতে দু'টো লবঙ্গ ধরে রেখে বোঝাতে থাকে, 'দেখুন। দুটোর দিকে তাকিয়ে দেখুন। তফাৎ রয়েছে না?' হেরম্বরা কোনও তফাতই বুঝতে পারে না। কেশবের মধ্যে চিরকালই একধরনের ওপর-চালাকির ব্যাপার রয়েছে। বলে, 'একটু যেন আলাদা।' সে কথায় হেরম্বরা তো বটেই কেনারামও অবাক চোখে তাকায়। এমন দৃষ্টির সামনে খুব অস্বস্তি হয়। কেশব তার বক্তব্যকে সামান্য সংশোধন করে, 'তবে ধরা বহুৎ মুশকিল।'

দুটো লবঙ্গকে টেবিলের ওপর আলাদা রাখে কেনারাম। ডাঁই থেকে তৃতীয় লবঙ্গটিকে তুলে ধরে বলে, 'এটা হল কোচিন ভ্যারাইটি। লাল টকটকে রঙ, অপূর্ব টেস্ট,

এখন সাপ্লাই খুবই কম।'

'কেন?' ফস করে শুধিয়ে বসে ক্ষেত্র।

' কেন আবার? চাষ কমে গিয়েছে। ফলন ভাল হচ্ছে না।' বলতে বলতে আর একটি লবঙ্গ হাতে তুলে নেয় কেনারাম, 'আর এই হল জাঞ্জিবার ভ্যারাইটি, যা আপনি ট্রেনে দেখেছিলেন। গায়ের রঙ লালচে, বডি লম্বা, মাথাটি মাপসই, শরীরে লালিত্য রয়েছে, গন্ধ, টেস্ট দুটোই ভালো। দেখলেই মনে হয় একটা খাই। ইন্ডিয়াতে এই মালই বারো আনা চলছে।'

'এটা তো আগেরটার মতোই। তফাৎ—।'

'বড় একটা নেই। সেই কারণে অনেকে কোচিন বলে জাঞ্জিবার চালিয়ে দেয়। যারা ঠকবার তারা ঠকে।'

'ঠকলে দোষ দেওয়া চলে না।' হেরম্বর নাচার মুখভঙ্গি, 'আমার তো মনে হচ্ছে দুটো লবঙ্গই এক জাতের।'

'তাও কী হয়?' কেনারাম হাসে, 'তফাৎ তো আছেই। খালি চোখে চেনা যায় না।' লবঙ্গগুলোকে জাত অনুসারে সাজাতে থাকে কেনারাম, 'যেমন ধরুন, অন্য জাতের লোকেদের কাছে সব পাঞ্জাবীই একরকম দেখতে। একমুখ দাড়ি, মাথায় পাগড়ি। কিন্তু সব পাঞ্জাবী কি একরকম দেখতে হয়? তাহলে তো আর ভাবনা ছিল না। ছেলে কাকে বাপ বলে ডাকবে? বউ কাকে রাত্তিরে পাশে শোয়াবে? সে এক বিভ্রাট হতো।'

আরেব্ব্যস্! কেনারামের রসবোধও তো কম নয়! এ ছুপা-রুস্তম নিজেকে এ্যাদ্দিন লুকিয়ে রেখেছিল কী করে? কিন্তু হেরম্বদের বেশি ভাবনা-চিন্তার অবসর দেয় না কেনারাম। বটুয়ার অন্য কুঠরি থেকে বের করে আনে আধ মুঠো মতো ছোট এলাচ। মুঠোখানা খুলে মেলে ধরে হেরম্বদের সামনে, 'দেখুন। এলাচগুলোর মধ্যে কোনও ফারাক দেখতে পাচ্ছেন?'

হেরম্বরা অনিশ্চিত মাথা দোলায়, 'সবই তো একরকম।'

'তাও কি হয়?' কেনারাম ফের হাসে। এবার হাসির মধ্যে সামান্য তাচ্ছিল্য, 'এই দেখুন, এটা ফ্রুট এলাচ, এটা মোরঙ্গ এলাচ, এটা পান এলাচ।' এক-একটি এলাচ হাতে নিয়ে ডেমোনস্ট্রেশনের কায়দায় বোঝাতে থাকে কেনারাম, 'এদের মধ্যে ফ্রুট এলাচই সবচেয়ে ভালো। পুরুষ্টু দানা, খোসার রঙ হালকা হলুদ, মিষ্টি স্বাদ, সুগন্ধও বেশি। এলাচের সাইজগুলো লক্ষ করুন। এটা এইট এম-এম্ বোল্ড। এটা সেভেন পয়েন্ট ফাইভ এম-এম বোল্ড। এটা সিক্স্ পয়েন্ট এইট এম-এম বোল্ড। এটা মিনি বোল্ড। এটা মিডিয়াম। আর এটা হলো গিনি এলাচ। এই এলাচ দিয়েই পান খান আপনারা।'

সবাই কখন যেন মজে গিয়েছে লবঙ্গ-এলাচের রসে। নিষ্ঠাবান ছাত্রের মতো মনোযোগ সহকারে দেখছে, শুনছে।

কেশব বলে, 'কিন্তু ঐ লবঙ্গ-এলাচগুলো আসছিল কোত্থেকে?'

'বাংলাদেশ, আবার কোত্থেকে!'

'বাংলাদেশে এলাচ লবঙ্গের চাষ হয়?'

'ধুস। কী যে বলেন!' কেনারামের চোখে-মুখে পুনরায় তাচ্ছিল্য, 'লবঙ্গগুলো আসছে জাঞ্জিবার থেকে, আর এলাচগুলো আমেরিকা থেকে।'

'আমেরিকাতে বুঝি খুব এলাচের চাষ হয়?'

'আগে হতো না। এলাচ তো ভারতেই ভালো হয়। দক্ষিণ ভারতে, ত্রিবাঙ্কুর, মালাবার এলাকায়। তো, আমেরিকা দু'জন এলাচ-প্ল্যাণ্টার নিয়ে গেল ভারত থেকে। তারা গিয়ে ওদেশে খুব এলাচের চাষ করল। এখন আমেরিকাই আমাদের এলাচ খাওয়ায়। প্রতি বছর শয়ে শয়ে টন এলাচ আসে আমেরিকা থেকে।'

'কোন পথ দিয়ে আসে?'

'কেন? আমেরিকা থেকে প্রথমে সিঙ্গাপুর। সিঙ্গাপুর থেকে চাঁটগা-বক্সবাজার হয়ে ঢুকে পড়ে বাংলাদেশে। আর বাংলাদেশ থেকে ইন্ডিয়াতে ঢোকার তো সহস্র রন্ধ্র! গেদে বর্ডার, বনগাঁ বর্ডার, হিলি বর্ডার, ওদিকে আসামের লাতু বর্ডার, মহিষাসন বর্ডার, কুচবিহারের গীতালদহ, মেঘালয়ের তুরা, ত্রিপুরার কুমারহাট, কমলপুর,...বর্ডারের অভাব কি! শ্রীলঙ্কা থেকে কিছু কলম্বো ভ্যারাইটির লবঙ্গ আসে। ঐ পথেই আসে। কিছু আসে সাউথ-ইন্ডিয়া দিয়ে। সাউথ-ইন্ডিয়া তো লবঙ্গের দেশ, ঝাঁকের কই ঝাঁকে এসে বেমালুম মিশে যায়।'

কেশব অনেকক্ষণ যাবৎ কেবলই ভাবছিল, এই গোমুখ্যু লোকটা এতকিছু জানল কী করে! যে লোকটা আজাহারের নামটাই শোনে নি, অস্ট্রেলিয়ার হদিশ জানে না, সে কিনা গড়গড়িয়ে বলে দিচ্ছে আমেরিকা, জাঞ্জিবার, কলম্বো, সিঙ্গাপুরের নাম! জাঞ্জিবার কিংবা আমেরিকা থেকে ভায়া বাংলাদেশ চোরাচালানের রুটগুলি অবধি তার মুখস্থ! অকস্মাৎ এক ধরনের সম্ভাবনার কথা মনে হয় তার। একচোখ ছোট করে কেনারামের দিকে সামান্য ঝুঁকে পড়ে বলে, 'দাদা, একটা কথা জিজ্ঞেস করব? আপনিও কি ঐ পথের পথিক?'

'কোন পথের বলুন তো?' হাবার মতো তাকায় কেনারাম।

'ঐ যে, সিঙ্গাপুর হয়ে চাটগাঁ-বক্স বাজার দিয়ে বাংলাদেশ। তারপর কোনও একটা বর্ডার দিয়ে—' কেশবের চোখের কোণায় চিকচিক করতে থাকে আলো।

সামান্য হাসে কেনারাম। আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে, 'নাহ্। লবঙ্গ-এলাচের ব্যবসা আছে আমার। বড়বাজারে। ওসব স্মাগলিং-টাগলিং-এ আমি নেই।'

কথা বলছিল কেনারাম। হাত চলছিল যন্ত্রের মতো। লবঙ্গ আর এলাচগুলোকে জাত অনুসারে খুব অবলীলায় আলাদা করে ফেলছিল সে। হেরম্বদের চোখে সব জাতকে একইরকম লাগছিল। বলে, 'আপনি খালি চোখেই এলাচ-লবঙ্গের জাত চিনে ফেলেন?'

কেনারাম হাসে, 'আমি কি আর চিনি? চেনায় এই পেটটাই। ঐ করেই তো ভাত জোটে।'

'লবঙ্গ-এলাচ তো এদেশেও হয়।' হেরম্ব বলে, 'কোয়ালিটিও তো বলছেন ভালোই। তবু কেন চোরাপথে মাল আসে?'

'চোরাপথে কেন মাল আসে, তাও বলে দিতে হবে?' কেনারাম হেরম্বর দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকায়, 'ঐ যে তেলেভাজার দোকানে বাচ্চা ছেলেটা প্লেট ধুচ্ছে, সেও এর জবাবটা জানে।' বলতে বলতে কেনারামের চোখের তারায় ছলকে ওঠে বিদ্রূপের হাসি, 'কাস্টমস্ ডিউটি লাগে না, তাই।'

কেনারামের কণ্ঠস্বরে যদি কিছুমাত্র বিদ্রূপ থাকে তো সে-সব গায়ে মাখে না হেরম্বরা। কেশব বলে, 'ওদেশের চেয়ে আমাদের দেশের মালে, দামে কতখানি ফারাক?'

'অনেক।' চোখ কপালে উঠে যায় কেনারামের, 'ধরুন, এইট এম-এম বোল্ড

আমেরিকান এলাচ, ওদেশে টন পিছু দাম প্রায় এগারো হাজার ডলার। ইন্ডিয়ান মানিতে কত হয়?'

'কত হয়?'

'তেত্রিশ দিয়ে গুণ করুন। কত হয়? তিন লাখ ষাট হাজার মতো। এদেশে ঐ কোয়ালিটির মালের পাইকারি দামই সাড়ে চারলাখ টাকা টন। তাহলে কেজি কত পড়ল?'

হেরম্বদের আচমকা একটি জটিল অঙ্কের গোলকধাঁধায় ঢুকে পড়তে হয়। বিড়বিড় করে হিসেব শুরু করে দেয় ওরা।

'কী হলো?' কেনারাম বুঝি ঈষৎ বিরক্ত, 'একটনে কত কেজি, সেটাই আগে বের করুন না।'

সহসা ভারি ফাঁপরে পড়ে যায় হেরম্বরা। একটন মানে কত কেজি যেন? সাতাশ মণ নাকি ঊনত্রিশ, কত-তে যেন এক টন?

ক্ষেত্র বলে উঠে, 'একশো কুইন্ট্যালে তো একটন, তাই না?'

'আপনার মুণ্ডু!' কেনারামের চোখেমুখে ভর্ৎসনা স্পষ্ট হয়, 'দশ কুইন্ট্যালে একটন। তাহলে কেজি কত পড়ল?'

'কেজি পড়ল, কেজি পড়ল...' মনে মনে হিসেব কষতে থাকে হেরম্বরা। সকলের ঠোঁট একসঙ্গে নড়তে থাকে, একটন মানে...দশ কুইন্ট্যাল...এক কুইন্ট্যাল মানে একশো কেজি...অর্থাৎ...।'

'দুর মশায়।' কেনারাম টিটকিরি দিয়ে ওঠে, 'বাচ্চা ছেলেদের মতো কী অত বিড়বিড় করছেন? সাড়ে চারলাখ টাকা টন হলে কেজি পড়ে সাড়ে চারশো টাকা! সোজা হিসেব।'

হেরম্ববদের চোখমুখ লাল হয়ে উঠেছে অপমানে। কেনারাম নির্বিকার। মুখে মুখে অঙ্কটা কষেই চলে সে। 'মালের দামেই ফারাকটা কত হলো? টন পিছু নব্বই হাজার। এবার ধরুন তিনলাখ ষাটহাজার টাকার মাল আনতে ফর্টি পার্সেন্ট কাস্টমস্ ডিউটি, সেভেন পারসেন্ট সারচার্জ, বেঙ্গলে ঢুকতে এন্ট্রি ট্যাক্স সাড়ে এগারো পারসেন্ট, তার সঙ্গে আরও ধরুন এইট পারসেন্ট সেলস্ ট্যাক্স...কত হলো? বলুন?'

হেরম্বদের স্পষ্টতই বিপন্ন মনে হয়। কেশব আড়চোখে তাকিয়ে নেয় হেরম্বর দিকে। ক্ষেত্র এমনভাবে গেলাসে চুমুক মারতে থাকে, যেন এসব পেটি হিসেব-নিকেশের মধ্যে থেকে সে বহুক্ষণ সরিয়ে নিয়েছে মন। জগৎ হালদার এমন কটমট করে তাকায় যেন বেয়াড়া অঙ্কের মাস্টার সুযোগ পেয়ে লেজে-গোবরে করছে ভোঁদাই ছাত্রকে।

'কী হলো? বলুন? কত হলো?' কেনারাম বাঁকা হাসে 'আপনারা শিক্ষিত ব্যক্তি, এই সামান্য হিসেবটাও যদি না করতে পারেন...! তিনলাখ ষাট হাজারের ফর্টি পারসেন্ট একলাখ চুয়াল্লিশ হাজার। সেভেনপারসেন্ট—পঁচিশ হাজার দু'শো। সাড়ে এগারো পারসেন্ট—একচল্লিশ হাজার চারশো। আর এইট পারসেন্ট হল, আটাশ হাজার আটশো। তাহলে সাকুল্যে দাঁড়াল দু'লাখ ঊনচল্লিশ হাজার চারশো। মালের দাম ধরলে সাকুল্যে দাঁড়ায় পাঁচলাখ নিরানব্বই হাজার চারশো, ধরুন ছ'লাখই। ক্যারিং কস্ট ধরুন টেন পার্সেন্ট, লাভ ধরুন টেন পারসেন্ট। এবার বলুন, কততে বেচবেন? বলুন?'

'রক্ষে করুন মশাই।' দু'হাত জড়ো করে বলে ওঠে হেরম্ব বোস, 'আপনি দেখছি কেশব নাগের জ্যেঠামশাই!'

'কেশব নাগ!' ভুরুজোড়া কুঁচকে ওঠে কেনারামের। স্মৃতিতে প্রাণপণ হাতড়াতে থাকে,

‘সেটা আবার কে? না, মশাই এমন নামে কেউ আমাদের লাইনে নেই।’

‘আপনাদের লাইনে থাকবেন কেন?’ ক্ষেত্র সুযোগ বুঝে পণ্ডিতি ফলাতে যায়, ‘কেশব নাগ একজন মস্ত বড় ম্যাথেমেটিসিয়ান।’

‘কী সিয়ান?’ কেনারাম বোকাবোকা চোখে তাকায়।

‘ম্যাথেমেটিসিয়ান।’ হেরম্ব বোস প্রাঞ্জল করে দেবার চেষ্টা করে, ‘গণিতশাস্ত্রে একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি।’

সামান্যক্ষণ হেরম্বর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে কেনারাম। তারপর চোঁ-চোঁ করে গেলাসের বাকি মালটুকু শেষ করে উঠে দাঁড়ায়।

‘ফুঃ—।’ টেবিলের এলাচ-লবঙ্গগুলো বটুয়ায় পুরতে পুরতে শ্লেষে ভেঙে পড়ে সে, ‘পণ্ডিত ব্যক্তি! আমি ভাবি এলাচ-লবঙ্গের কোনও খানদানি মার্চেন্ট। গরুরা দেখছি ঘাসই খায়!’

বটুয়াখানা পকেটে ঢুকিয়ে নেয় কেনারাম। তারপর ঠোঁটজোড়াকে পিচকিরি বানিয়ে আর এক কিস্তি শ্লেষ মাখানো হাসি হেরম্বদের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে মারতে মারতে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে যায়।

দৃষ্টি

চারপাশে যেন অসংখ্য ঢাকের আওয়াজ। বলির বাজনা কৈলাসের বুকে।

পেছনে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ। খস, খস....। সহসা কানে লাগবার কথা নয়। কিন্তু এ হলো কৈলাস শিকারীর কান। ইদানিং আরও জাগ্রত। সারাক্ষণ নিদারুণ ভয়ে বুকের রক্ত ছলাৎ। কান দুটোই সতর্ক পাহারা দিয়ে বাঁচায়। মরিয়া হয়ে দুর্গ সামলায় দু'টিতে।

খস... খস... আওয়াজটা পেয়েই কানদুটো তা সরাসরি চালান করে দিয়েছে মগজে। আরো উৎকর্ণ হয়ে শোন। বোঝ। কদ্দুরে? ক'জনা? কৈলাস শিকারীর পায়ের গতি শ্লথ হয়। বুকের মধ্যে ভয় নামক জন্তুটা ককিয়ে কাঁদে। লুকোবার জন্য ঝোপ-ঝাড়, খুলিয়া-খোবর খোঁজে। গায়ের রোম ফুলে ফুলে ওঠে। কৈলাস শিকারী আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ে। পা-জোড়া আর এগোতে চাইছে না। 'কে, কে রে? সাড়া দে বইল্‌ছি।' কোনও সাড়া নেই। ভীষণ ক্ষেপে যায় কৈলাস শিকারী। ভয়ে হিংস্র হয়ে ওঠে। 'শালারা, সাড়া দিবার লারছু? বেজন্মা, খালমুয়ার দল!' বলতে বলতে চকিতে হাতের লাঠিগাছা বোঁ করে এক ফের ঘুরিয়ে আনে চৌদিকে। ঠাং করে আওয়াজ হয়। লাঠি বাজে শক্ত গাছের গুঁড়িতে। কৈলাস শিকারী দরদরিয়ে ঘামতে থাকে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁফায়। ফুসফুস ভরে দম নিতে থাকে। আওয়াজটা আর শোনা যাচ্ছে না। তবে কি কানের ভুল? হাঁ রে কান, তুয়ার ভুল? মনের বিভ্রম? হাঁ রে মন, তুয়ার বিভ্রম? কে জানে?

নামোপাড়া আর বাউরিপাড়া পেরিয়ে এসেছে কৈলাস শিকারী, মণ্ডলদের পগারটাও পার হয়েছে খানিক আগে। পায়ের হিশেব ঠিক থাকলে, ইট্যা বটে কুলীনডাঙা। এখান থেকেই একটা সরু রাস্তা ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠেছে। তার মানে, নামহাতাদের পদ্মদিঘি সামনে। দিঘির উত্তরপাড় ধরেই তো রাস্তাটা চলে গেছে সুমুখপানে। মিশেছে বনকাঠির ডাঙায়। ডাঙা পেরোলে হাতিশোলের জঙ্গল। জঙ্গলের ওপারে কোচডিহি, পলাশপাথর, পচাপানি গাঁ। অন্ধ হলেও হিশেবে ভুল নেই কৈলাসের। ভেতর-চোখের ছবি এসব, চর্মচক্ষুর বাড়া। কৈলাস বোঝে, সে এখন পদ্মদিঘির থেকে হাত দশেক তফাতে। তার বাঁ-দিকে একটা প্রাচীন নিম। এই মাত্তর কৈলাসের লাঠির এক ঘা খেল বেচারা। আহা রে, তুয়ার কি দোষ! বৃক্ষ তুই, দবতুল্য। ইস্‌রে, সেই শরীলে দিল্যাম কিনা লাঠির ঘা! আসলে, ভয়ে-তাড়াসে জ্ঞানগম্যি হারায় কত মহামান্যি মানুষ। কৈলাস শিকারী ত' কুন ছার!

আর নড়তে চায় না কৈলাসের পা দুটো। অনাগত বিপদের সোঁদা গন্ধ। শালারা ফের আজ পিছু নিয়েছে। ভাবতে গিয়ে ভয়কে অতিক্রম করে চাগিয়ে ওঠে চণ্ডাল-রাগ। এ জায়গাটা বড় খাঁ-খাঁ। বাউরিপাড়া অনেক পেছনে। সামনে দিঘি, ডাঙা, জঙ্গল। এখন, এই ভরদুপুরে, ধারে-পাশে জনপ্রাণী নেই। হাঁকডাক দিয়েও ফল হবে

না। দেখেশুনে এই জায়গাটিকেই বেছেছে পীর-পাজির দল। দিন দিন ঐ একই পদ্ধতি। প্রথমে, পেছনে অস্পষ্ট আওয়াজ, খস-খস....। নিঃশ্বাসের মৃদু শব্দ। তারপর, একসময়, আচমকা কলরব সহযোগে ঝাঁপিয়ে পড়বে কৈলাসের জীর্ণ শরীরখানার ওপর, একযোগে। কেউ ছেঁতার কাছা খুলে দেবে। কেউ কোমরে বেদম ক্যারেকুটু দেবে। চুল ধরে ঝাঁকুনি মারবে কেউ। কেউবা ভিক্ষের ঝুলিতে হাত সেঁধাবে। কৈলাস নিরুপায়। তার চোখের মধ্যে গর্ভের আঁধার। চারপাশের হানাদারদের দেখবার জো'টি নেই। কোন্‌দিক থেকে খোঁচা বা ঠেলা আসবে, আগাম বোঝা দায়। এই অবস্থায় আতঙ্কটা হু-হু বেড়ে যায়। কৈলাস চরকির মতো পাক খেতে থাকে। কাকুতি-মিনতি জানায়। গলা ফাটিয়ে কাঁদে। চিল-চিৎকার জোড়ে। কাঁচা-কথায় বাখান দেয়। মরিয়া হয়ে লাঠি ঘোরায় এলোপাথাড়ি। একসময় হাত অসাড় হয়ে আসে। খসে পড়ে লাঠি। একঠাঁই দাঁড়িয়ে কুকুরের মতো হাঁফাতে থাকে কৈলাস। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় দ্বিতীয় দফার আক্রমণ। লাঠিহীন কৈলাস প্রবল কাতুকুতু খেয়ে গলা ফাটিয়ে কাঁদতে থাকে। মাটি কামড়ে বসে পড়ে। কাতর গলায় শুধু প্রাণভিক্ষে চাইতে থাকে সে। নিজের 'জন্ম দেওয়া বাপ' বলে ডাকতে থাকে সবাইকে। বজ্জাত ছেলেরা যা প্রস্তাব দেয়, সঙ্গে সঙ্গে মেনে নেয় বিনা বাক্যে। নিজেকে কুকুর-ছাগল-বরা-চোর-লুচ্চা,—সবকিছু বলে স্বীকার করে নেয়। পীড়ন চলতে থাকে, যতক্ষণ না ছোঁড়াগুলোর মজা লোটা সাঙ্গ হয়, অথবা কৈলাস শিকারী আধমরা হয়ে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। ভিক্ষেয় বেরোবার পথে এ হেন জুলুম হলে, সেদিন আর ভিক্ষেয় যাওয়া হয় না। আধমরা শরীরটাকে কোন গতিকে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে কৈলাস ডেরায় ফিরে আসে। ধপাস করে শুয়ে পড়ে মেঝেয়। ছাতির ওপর যেন ঢেঁকির পাড় পড়তে থাকে, হুকুর দুম্‌...হুকুর দুম্‌...। প্রাণটা বেরিয়ে আসতে চায় খাঁচা ছেড়ে। ভিক্ষে সেরে ফিরবার পথে ওদের পাল্লায় পড়লেও ওই একই অবস্থা কৈলাসের। ভিক্ষের চাল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে চারপাশে। ঝুলিখানা ছিঁড়ে ফালা ফালা হয়। চাঁদি বুড়ি এসে, দিনের শেষে, কোন গতিকে চাট্টি ফুটিয়ে দিলেও, উঠে খাওয়ার ক্ষমতা থাকে না দেহে।

এই মুহূর্তে নৈতনের কথা বড্ড মনে পড়ছে। কৈলাসকে বাঁচাবার তরে ভগবানই পাঠিয়েছিলেন ওকে একদিন। সে আজ মাস দু'তিন আগের কথা

কৈলাস রোজদিনের মতো সেদিনও বেরিয়ে ছিল ভিক্ষেয়। তবে, চালু পথে নয়। ছোকরাগুলোর দৃষ্টি এড়ানোর জন্য ভৈরববাঁধের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু ভবি কি ভোলে! লাগের-পুকুরের পাশাপাশি শুরু হলো খস্‌-খস্‌ পায়ের আওয়াজ। গলা চেপে হাসি। খুক-খুকনি কাশি। আতঙ্কে কালো হতে হতে কৈলাস প্রাণপণে ডাকতে লাগল তেত্রিশ কোটি দেবতাকে। বাঁচাও ঠাকুর, প্রাণে বাঁচাও হরি! একটি ঠাকুরও এলেন নাই। ঠাকুরগুলান সব ঢ্যামনার জাত। তো, এলেন এক ঠাগ্‌রানী। ফটাস ফটাস চড়-চাপড়ের আওয়াজ শুনল কৈলাস। তৎসহ মেয়েলি গলার বাখান। ধুপধাপ আওয়াজ উঠল চৌদিকে। বেগতিক দেখে পালিয়ে গেল খালমুয়ার দল। ঠাগ্‌রানী তখন গর্জাচ্ছে, 'কি বজ্জাত সব ছেইলা গ'! কানা মানুষটাকে বাঁধের জলে ফেইল্যে দিবার ফন্দি আঁটছে! যেদি বাঁধের জলে ডুইব্যে যায় লোকটা! যদি মইরে যায়! একটা জীবন দিবার ক্ষ্যামতা নাই, জীবনটা লিত্তে খোব আরাম! এমন গড়ারখো বাছাদ্যার...!' বাঁধের জলে ফেলে দেবার কথা শোনা মাত্তর কৈলাসের সর্ব শরীর কেঁপে কেঁপে উঠল ভয় পাওয়া জন্তুর মতো। পরক্ষণে হাউমাউ করে কেঁদে ফেললো সে। 'কে তুমি মা! সঙ্কটকালে জীবন

বাঁচালে কৈলাস শিকারীর।'

খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে মেয়ে। যেন নিমপাতায় রিন-রিন আওয়াজ ওঠে।

বলে, 'তুমার মা কুথা বটে ইখেনে? আমি বটে লৈতন। বনকাটির ঝড়েশ্বর লুহারের বউ।'

'ঝড়েশ্বর লুহার!' কৈলাস যেন আমসত্ত্ব পুরেছে মুখে, 'উ ত আমার বাইল্য বন্ধু। একসাথে কতদিন গরু চরাইছি ধলকিশোরের পাড়ে। উ ত, শুনি, মস্ত গুনিন ইদানিং!'

কৈলাসকে হাতে ধরে গাছের ছায়ায় এনে বসায় লৈতন। বলে, হাতিশোলের জঙ্গল থিক্যে ফিরবার পথে দেখি লিত্যিদিন। ছগ্‌রাগুলা বড্ড পিছে লাগে তুমার। ভাবি, আহা রে! চক্ষে দেখে না যে, উয়ার সাথ মশকরা! আইজ আর সইতে লারল্যাম্। লাও, টুকচান্ দম লাও। উয়ার পর যাবে কাজে-কামে।'

তখনও হাঁফাচ্ছে কৈলাস শিকারী। পাশাপাশি পরম নিশ্চিন্ততার এক তীব্র স্বস্তিবোধে ভরে যাচ্ছে বুক।

'বাহ্, বাহ্। ভালো, ভালো।' স্তোকবাক্য ঝরে ঝরে পড়ে কৈলাসের মুখ দিয়ে, 'গুণিনের বউ তুমি। গুণবতী, রূপবতী।'

আবার খিলখিলিয়ে হাসে লৈতন। 'রূপবতীটা বুঝ্‌ছ ক্যামুন কইরে? তুমি ত কানা। দু'চক্ষেই কানা।'

কথাটা কৈলাসের বক্ষে শেল হয়ে বাজে, সন্দেহ নাই। প্রকাশ করে না। বরং দ্বিগুণ দৃঢ়তায় বলে, 'বুঝি, বুঝি। রূপ বুইঝতে চখ্ নাই লাগে। তুমি অপার রূপবতী।' ক্রমশ সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে উঠছে কৈলাস। বলে, 'যাব একদিন তুমাদের দোর। ঝড়েশ্বরকে বইলো আমার কথা। বইলো, আমি উয়ার বউকে রূপবতী বল্যেছি।'

মুগ্ধ হয়ে যায় লৈতন, কৈলাসের সরলতায়। বলে, 'তুমি আর উই বাউরিপাড়া হয়ে যায়ো নি। ইদিগ দিয়ে যায়ো। আমিও রোজ কাঠ-পাতা ভাঙত্যে যাই হাতিশোলের জঙ্গলে। আমি থাইক্‌ত্যে পাশে ভিড়বেক নাই ছগ্‌রার দল।'

মনে মনে যেন কৃতার্থ হয়ে যায় কৈলাস শিকারী। বুঁজে থাকা চক্ষের কোটরে অজান্তে রস জমে। অশ্রু।

দুই

শেষবেলায় কাঠের বোঝাটি মাথায় নিয়ে ফিরল লৈতন। মাঝ উঠোনে ঝপ করে ফেলে দিল বোঝা। হাঁফাচ্ছিল। বুকটা পুঁটলিসহ ওঠানামা করছিল সজোরে। ঘামে ভিজে গেছে সারা অঙ্গ। দু'কানের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে দু'টি ক্ষীণস্রোতা নদী। চিবুকের পাশাপাশি গিয়ে মিশেছে দুটি ধারা।

ঝড়েশ্বর শুয়ে রয়েছে দাওয়ায় তালাই পেতে। পড়ন্ত বেলায় মৌ-লালচে রোদ্দুর পড়েছে তার বিছানার ওপর। ঝড়েশ্বরের দু'চোখ রক্তবর্ণ। তার খানিকটে রাগের চোটে, খানিকটে জ্বরের ঘোরে। দিন দিন কেন জানি শরীরখানা ফুলে যাচ্ছে ঝড়েশ্বরের। সারা অঙ্গ যেন কোলা-ব্যাঙের পারা। পায়ের পাতাদুটি যেন মোচার খোল, ওলটানো। মুখমণ্ডল যেন চিতো পিঠা। চোখের পাতনিতে এক জোড়া জোঁক। রাধালগরের গুঁফো ডাক্তারের

সুমুখে লাইন দিয়েছিল। ডাক্তার বলে, কিট্‌নি খতম। শালা, রসের তানে গা ফুলেছে, সিটা বুঝলি নাই ডাক্তারের পো, বলে কিনা, কিট্‌নি খতম!

শুয়ে শুয়ে লৈতনের পানে থিরপলকে তাকিয়েছিল ঝড়েশ্বর। দু'চোখে তীব্র বিষ। গোঙাচ্ছিল।

হিসহিসে গলায় বলল, 'শালি, নাঙ্‌ করা শেষ হইলো ইতক্ষণে?' নজর পড়ে লৈতনের কোঁচড়ের পানে। আধসেরটাক চাল বাঁধা রয়েছে সেখানে। 'শালি, তলপেট ক্যানে উঁচু লাগে রে?' কুতকুত করে দেখতে থাকে ঝড়েশ্বর, 'ফের বাধালি নাকি?'

লৈতন ঠাণ্ডা চোখে তাকাল ঝড়েশ্বরের দিকে। চোখ রাখল ওর চোখের ওপর: চিতো পিঠার তুল্য মুখখানার আড়ালে থিকথিক করছে সন্দেহ। বিষ। প্রশ্নটা শুনে শুনে ইদানিং পুরনো হয়ে গেছে কানে। রোজ অন্তত একটিবার প্রশ্নটার মুখোমুখি হতেই হয় লৈতনকে। অন্তত একটিবার ছোবল খেতেই হয়। শুধু, যখন আঘাটায় বেঘাটায় ঘুরেটুরে বেড়াতে পারে ঝড়েশ্বর, ভাটিখানার খরচটি যখন সহজেই জুটে যায় কোন গতিকে, বিষটা খানিক পাতলা হয়। তখন দিনে-দুফোরে আকণ্ঠ চড়িয়ে মনসার গান ধরে। লৈতনকে দেখে খি-খি হাসে। বলে, বউটি আমার য্যান লিডিকিনিটি। সদা-সর্বদা রসের সায়রে ভাইস্‌ছে। যে দেখে, কপাৎ কইর‍্যে গিলত্যে চায়। ল্যাংড়া বোস, পঞ্চাৎ...সক্কলে। পঞ্চায়েতের প্রধানকেও সে ঐ তালিকায় রাখছে ইদানিং। আগে রাখত না। যেদিন ওকে নিয়ে মিটিন্‌ বসাল পঞ্চাৎ, সব কিসিমের গুণিনবিদ্যা বন্ধ করবার ফরমান জারি করল, সেদিন থেকেই ওর ওপরে রোষ। 'পঞ্চাৎ তুমি, পঞ্চাতের পারা থাক। ঝড়েশ্বর লুহারের পাছায় আছোলা দিবার দরকারটা কি তুমার!'

'দিবেক নাই?' লৈতন বুঝি পঞ্চাতের পক্ষ নেয়, 'তুমি টি-বি রুগী চিনলে নাই। বইলে দিলে, কোউ খাচ্ছে! তুরন্ত্‌ হস্‌পিডালে না দিলে, ছগরা বাঁইচ্‌ত? অঝাগিরি যে কচ্ছিলে, উ মইর‍্লে, তুমি উয়ার দায়ী হইত্তে?'

'টি-বি রোগ।' গজগজ করতে থাকে ঝড়েশ্বর, ক্যানে হইল্যাক উট্যা? কোউ খাচ্ছিল বলেই না! টি-বি হইল্যাক ক্ষয়রোগ। কোউ খেঁইয়ে খেঁইয়ে ক্ষয় কচ্ছিল শরীর। লচেৎ, তুয়ার হইল্যাক নাই, আমার হইল্যাক নাই, দুনিয়ার কারো হইল্যাক নাই, উয়ার ক্যানে? জবাব দাও হে পঞ্চাৎ! রাধালগরের ডাক্তারটি এক চিজ! বলে, বীজাণু সেঁধাইছে শরীলে। কি কথা! সেঁধালেক ত সক্কলের শরীলে সেঁধালেক নাই ক্যানে? বেছ্যে বেছ্যে শুধু বাঁকার শরীলে! বীজাণু কি লম্ফট ল্যাংড়া বোস নাকি যে, বেইছে বেইছে, ঘর দেইখ্যে, সেঁধাবেক! অব্বাক কথা!' ওঝাগিরিটা বন্ধ হওয়ায় ক্ষতি অবশ্য ঝড়েশ্বরের হয়েছেই। একটা চালু ইনকাম্‌ ছিল। গেরস্থ মহলে একটা মান-ইজ্জত। কে যায়? না, গুণিন যায়। ঝড়েশ্বর অঝা। এখন্‌, তন্ত্রসাধনার মূল উপাদান অর্থাৎ কারণ, তার জোগাড় হয় কী করে হে! ঐ থেকে কেমন বদলে গেছে ঝড়েশ্বর। খুব দ্রুত বদলে গেছে। মদ খাওয়ার পয়সা জোগাড় করবার জন্য নানা হীন পন্থা ধরতে হয় তাকে, ইদানিং। লৈতনের ওপর রাগখানাও বেড়েছে। শরীরের যাতনায় একঠাই বন্দী হয়ে গেলেই বিষ জমে বুকে। গাঢ় হয় ক্রমশ। চোখে, জিভে, সর্ব অঙ্গে। আর ঐ সময় যদি কোনও চেলা গুরুভক্তি দেখিয়ে ঘর বয়ে এক-আধ বোতল গিলিয়ে যায় তো আর দেখতে হয় না। তখন, ঝড়েশ্বর হয় বাদশা। প্রথমেই সে ল্যাংড়া বোস আর নিজের একমাত্র সন্তান শুক্‌রাকে নিধন করবার কড়ার করে বসে। এক বাণেই লিধন কইর‍্বো দু'ট্যাকে। দু'টি বাণ

লাইগ্‌বেক নাই। বুকের মধ্যে এখনো যে মানুষটার গুণবিদ্যার গুমোরটুকু বেঁচে আছে, লৈতন তা জানে। মাঝেমধ্যে উঠোনের কয়েত-বেল গাছটার তলায় সশিষ্য বসে ঐ নিয়ে আস্ফালন করে ঝড়েশ্বর। এবং পঞ্চাৎ যে অবিচারটা করেছে ওর ওপর, তার প্রতিফল যে পাবেই, সেটা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করে। প্রতিফলটা কেমন হবে, সেটা বিতাং করে শুনতে চায় চেলারা। সেটা ভেঙে বলে না ঝড়েশ্বর। বলে, 'কি হবেক, সিটা দেখ্‌ত্যে পাবি। ঝড়েশ্বর লুহারের লগার তেজটা বুঝতে পারবি ত্যাখন।' চোলাই খেয়ে হাজার 'আউট' হলেও পঞ্চাতের পরিণতিটা সে কিছুতেই ভেঙে বলে না। শুধু বলে, 'যখন হবেক ত্যাখন দেখবি।'

লৈতন এসব বুজরুকি বোঝে। উনুনের ছাই খালাস করতে করতে সে ফুট কাটে। 'ইখন বলবো নাই! পঞ্চাতের যদি কুনো খ্যারাব হয়, তবে উটি আমি কর্যেছি বইলে নাম লিব!'

লৈতনের কথার হুলে দিকজ্ঞান হারিয়ে ফেলে ঝড়েশ্বর লোহার।

গাছতলা থেকে চিল-চিৎকার জোড়ে, 'তুই মাগি আমার ক্ষ্যামতটা চিরকালই দেইখ্‌তে লারিস? বলি, পচু বোস যে ল্যাংড়া হইল্যাক, উয়াতে ক্যাদ্দানিটা কার বটে?'

'তুমার?' খিলখিলিয়ে হেসে লুটিয়ে পড়ে লৈতন।

'তেবে?' সহসা রোষে দু'চোখ লাল হয়ে ওঠে ঝড়েশ্বরের, 'শালা, আমার বাপকেলিয়া ভিটাটা গাপ কইরে দিল্যাক্ হে! ধর্মজ্ঞান নাই একটা!' দাঁত কিড়মিড় করে ওঠে ঝড়েশ্বরের। তখনই বলে ঐ কথাটা, 'উয়ার আর একটা পা'ও লিব। লির্ঘাৎ লিব।'

'ক্যানে?' লৈতন নিছক মশকরা করতে পিছু ফেরে, 'ভিটার তরে লিলে একটা পা। আর একটা পা কিসের লেগে? দু'টা মাত্তর পা উয়ার!' লৈতন আঁচল দিয়ে হাসি চাপে।

'কিসের লেইগ্যে?' গলার স্বরেই বোঝা যায়, নিজের মধ্যে উত্তেজনার মাত্রাটা বাড়াতে চাচ্ছে ঝড়েশ্বর, 'শালা, মা-মেইগ্যা, আমার আবাদী জমিনটারও দখল লিয়েঁছে! চাষ দিয়েছে উয়াতে! বীজ বুনেছে। ফসল ফইলেছে, শালা লম্ফট!'

হাঁটুর বয়েসী চেলাদের সুমুখে এসব কথা অবলীলায় বলে চলে ঝড়েশ্বর। লজ্জায়, ঘেন্নায়, লৈতন ছাই-মাখা হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলে।

গাছতলা থেকে চিৎকার করে তখন ঐ কথাটাই বলে চলে ঝড়েশ্বর, 'এক বাণেই লিধন কইর্‌ব দু'টাকে।'

লৈতন ঘাম শুকিয়ে থিতু হওয়ার আগেই উঠে বসল ঝড়েশ্বর।

'গৌর মণ্ডল আঁইছিল।'

'ক্যানে?' বেত-লতার মত সপাৎ করে ঘুরে দাঁড়ায় লৈতন।

'তুই উয়াকে ঝাঁটি-কাঠ দিবি বল্যেছিস কবে। দিস নাই।' ঝড়েশ্বর নির্বিষ চোখে তাকায়।

'দিব বলেছিল্যম্, দিই নাই, ফুরাঁই গেল। পইসা ত লিই নাই আগাম।' লৈতন বিনুনি খুলতে থাকে দ্রুত লয়ে, 'লিয়ে লিক, অন্য কারোর থিক্যে।'

'লয়। সে তুয়ার থিক্যেই লিব্যেক্।' ঝড়েশ্বরের পুরু ঠোঁটের আড়ালে আলো-আঁধারি হাসি, 'আবদার ধইরেছে।'

'বল্ল্যম ত।' সহসা রোষে অন্ধ হয়ে ওঠে লৈতন, 'উ কি আগাম দিয়েছে যে অত জোর খাটায়?'

'আমাকে দিয়ে গেঁইছে আগাম।' নির্বিকার গলায় বলে ঝড়েশ্বর।

'কব্বে?' লৈতন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়।

'আজই। দুফোরটাক বেলা ত্যখন।'

'তুমি লিলে ক্যানে?'

'বা রে! অত বড় মনিষ্যি, ঘর বয়ে আইস্যে টাকা বাগাই ধর্ল্যাক, লিব নাই? কি কথা বলু তুই?'

পলকহীন চোখে ওকে দেখছিল লৈতন। বলে 'টাকাগুলা কুথা?'

'টাকা?' ঝড়েশ্বর মুখ ফিরিয়ে নেয় অন্যদিকে। জবাব দেয় না।

'টাকা কুথা, বইল্লে নাই যে?' ঝনঝনিয়ে বেজে ওঠে লৈতন।

'খচ্চা হইয়ে গিছে।' গলা অনেক খাদে নেমে এসেছে ঝড়েশ্বরের, 'কদমা আর কাত্তিক আইল্যাক। দু'বোতল মাল লিমিযে খুয়ার। তা বাদে, তিনপাত্তি খেল্ল্যাম্ তিনজনায় মিলে।' ক্ষয়দাঁত বের করে হাসে ঝড়েশ্বর। প্রশ্রয় চায়।

'সব টাকা মদ খেইয়ে আর জুয়া খেইলে উড়াঁই দিলে তুমি?'

'কইর্বোটা কি?' ঝাঁ করে জ্বলে ওঠে ঝড়েশ্বর, 'তুই শালি দু'পহর বেলা না হইত্যে বারাঁই গেলি নাঙ্ কত্তে! তুই ত ইট্যাই চাউ! বিছ্নায় পড়্যে পড়্যে ঝড়েশ্বর লুহার চোখটি বুঁজল্যে, তুয়ার কত আমোদ! ল্যাংড়া বোস তুয়ার তরে দু'তলা বিল্ডিন্ খাঁচাবেক রাধালগর বাজারে।'

এসব কথার জবাব দিতেও ঘেন্না হয় লৈতনের। ঝগড়া করতেও রুচিতে বাধে। তাও আগে করত, চেঁচাত, কাঁদত, এখন হাল ছেড়ে দিয়েছে।

বলে, 'তুমি আগাম লিছ, তুমি মাল দিবে। আমার ভারি দায়!'

'কথা বাড়াইস নাই।' ঝড়েশ্বর ঠাণ্ডা গলায় বলে, 'গা-হাত ধুইয়েঁ কিছো খেইয়েঁ লে। সাফ-সুতরা কাপড়-চুপড় পর্ একটা। কাঠের বঝাটি মাথায় লিয়ে, চইলে যা মণ্ডলের পাশ। উ বেচারি ক্ষণ গুইন্ছে। তুই কাঠ লিয়ে গেলে চুলা ধরাবেক।'

লৈতন ধপ করে বসে পড়ে দাওয়ায়। খুঁটিতে ঠেস দিয়ে মূর্তি বনে যায়।

সূর্য ডুবে গেছে। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে গাছ-গাছালির পালা-পতরে। আকাশে একটি কি দুটি তারা। এক তারা বুদ্ধিহারা, দুই তারা পাগোলপারা...। ছেলেবেলায় উঠোনে নেচে নেচে লৈতনরা গান ধরত ভাই-বোনদের সঙ্গে, সাঁঝপহরে। অনেকদিন বাদে সেটা মনে পড়ল আজ।

'তুই বইস্যে রইলি যে বড়?'

বার-দুই কথাটা জিজ্ঞেস করতেই লৈতন ফুঁসে ওঠে।

'এই ভর সাঁঝের বেলায় কাঠ লিয়ে তুমি যেত্যে বইল্ছ গৌর মণ্ডলের পাশ।?' ঝরিঝরিয়ে কেঁদে ফেলে লৈতন।

'বলল্যম্ নাই তুয়াকে? তুই কাঠ লিয়ে গেলে উ চুলা ধরাবেক। ঠেকায় না পইড়্লে মাইন্যে দুয়ার যেচ্যে আগাম দিয়ে যায়?'

লৈতন তাও নড়ে না।

লৈতনের ভাবগতিক দেখে অগ্নিবর্ণ ধারণ করে ঝড়েশ্বর। সহসা উঠে বসে বিছানা

থেকে।

'শালি, তুই যাবি কিনা আমি জানত্যে চাই? আমি কথা দিয়েছি মণ্ডলকে, কাঠ তুমার পৌছ্যাবেকই। যত রাইতই হউ। কথাটা কানে সেঁদাচ্ছে নাই তুয়ার? লোকের পাশ কথার খিলাপ করাবি! দুনিয়ার লোক বইল্যে বেড়াবেক, হ্য দ্যাখ, ঝড়েশ্বর অঝাটা লাব্বাক। উয়ার কুনো কথার দাম নাই।' দম নেবার জন্যই একটুক্ষণ থামে ঝড়েশ্বর। লৈতনকে বুঝ দেবার ঢং-এ গলাটা খাদে নামায় সে, 'একদিন কথার খিলাপ কইল্লে, আর কুনো দিনো আইবেক মণ্ডল, আগাম লিয়ে?'

ঝড়েশ্বরের চণ্ডাল রাগখানাকে ভালোই চেনে লৈতন। জ্বাল দেওয়া দুধের মতো উথলে ওঠে যখন, দিকজ্ঞান থাকে না একেবারে। কাজেই, ঝড়েশ্বর লাঠিখানা বাগিয়ে ধরতেই উঠে দাঁড়ায় সে। এক দৌড়ে ছুটে পালায় গিরিবুড়ির পাশ।

তিন

আজ ধারে-কাছে লৈতন নেই, কৈলাস জানে। গতকাল সে গেছে তার মাসির বাড়ি। মাসির নাকি বেজায় অসুখ। বাঁচে কি না বাঁচে। মাসির বাড়ি বাঁকাদহ। আজ আর ফিরতে পারবে না লৈতন। কাজেই এই ধুতমা ডাঙার মধ্যে ছগ্‌রাগুলা ওকে মেরে ফেললেও আজ আর কেউ ওকে বাঁচাতে আসবে না। আজ ভিক্ষেয় না বেরোলেই ভালো ছিল। কৈলাস ভেবেওছিল সেটা। কিন্তু না বেরিয়ে চারা কি! ঘরে যে এক দানাও খাদ্য নাই। পেটটা যে বড্ড জ্বলে। তা বাদে, কৈলাসের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ছোঁড়াগুলো আজ ওকে জ্বালাতে সাহস করবে না। ওরা তো জানে না যে আজ লৈতন নাই। আজ লৈতনকে না দেখলে, কাল থেকে হয়ত শুরু করবে ওদের খেলা। তাব ফাঁকে আজ দিনটা চাট্টি মেগে যেচে এনে, কাল দিনটা ঘরে শুয়ে থাকা যায়। শরীরটা ইদানিং ভারি খারাপ। রাতের বেলায় ঘুসঘুসে জ্বর আসে। সকালবেলায় মুখ তেতো, শরীর দুর্বল। ইচ্ছে করে, শুয়ে থাকে। তাও বেরিয়েছিল কৈলাস। যাওয়ার সময় চলেও গিয়েছিল নির্বিঘ্নে। কিন্তু ভবি ভোলার নয়। ফেরার কালে ঠিক পিছু নিয়েছে খালমুয়ার দল। আজ যেন ওদের আয়োজনটা বেশ মজবুত। মনে মনে যে কী ফন্দি এঁটেছে, ভগমানকে মালুম! এতদিন কৈলাসকে চোখে-চোখে রাখত লৈতন। বিশেষ করে ঐ পদ্মদিঘির খাঁ-খাঁ জায়গাটায়। দিঘির উঁচু পাড়ের আড়ালে দল বেঁধে লুকিয়ে থাকত বজ্জাতগুলো। সুযোগ খুঁজত। কখন লৈতন একটুখানি চোখের আড়াল হয়। লৈতন কিন্তু কিছুতেই নজর সরায় না। কৈলাস নির্বিঘ্নে পদ্মদিঘি পেরিয়ে যায়। বনকাটির ডাঙা পেরিয়ে গিয়ে লৈতন ঢুকে পড়ে হাতিশোলের জঙ্গলে। কৈলাস পা বাড়ায় কোচডিহি, পচাপানির দিকে। দুপুর গড়ালে ফের ফিরে আসে কৈলাস। জঙ্গলের ধারে নির্দিষ্ট জায়গায় অপেক্ষা করে লৈতন। দু'জনে দু'দণ্ড জিরোয় মহুলগাছের তলায়। সুখ-দুঃখের কথা কয়। একসময় কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে উঠে দাঁড়ায় লৈতন। দু'জনে রওনা দেয় গাঁয়ের দিকে। কৈলাসকে বাউরিপাড়া পার করে লোকালয়ে পৌছে দিয়ে লৈতন চলে যায় লোহারপাড়ায়' এতদিন, সেই কারণে, বাউরিপাড়ার ছোঁড়াগুলো ভেতরে ভেতরে ক্ষেপে রয়েছে কৈলাসের ওপর। আজ নির্ঘাৎ সুদে-মূলে উশুল করবার তাল খুঁজছে। বেঘোরে পড়ে ভগবানকে আকুল গলায় ডাকতে থাকে কৈলাস। 'লিয়ে লও

ভগম্যান্, লিত্যিদিন এ দিগদারি আর সইতে লারি!'

লৈতন বলে, 'তুমি পঞ্চাতের পাশ আজ্জি দাও। বিচার নাই দেশে?'

'পঞ্চাতকে বইল্যো কি হব্যেক!' কৈলাসের বুকখানা ফোঁপরা বাঁশের মতো বেজে ওঠে, 'বলেছিল্যম একদিন।'

'কিছু কইর‌্ল্যাক নাই পঞ্চাৎ?' লৈতন যেন আহত হয়।

'কি কইর‌্বেক উয়ারা!' একদিন ডেইক্যে ধমক-ধামাক দিলেক্। চড়-চাপড় মাইর‌্লেক। উয়াতে কি বশ হয় উই বেজম্মার দল! মাঝ থিক্যে আমার হইল্যাক প্রাণসংশয়।

কৈলাস বলতে থাকে পুরো ঘটনাটা।

মারধর খেয়ে দিন-দুই ঠাণ্ডা ছিল ছোকরার দল। তারপর শুরু করল এক ভয়ানক খেলা। নামহাতাদের পদ্মদিঘির পাড় ধরে একদিন ঠুকুর ঠুকুর হেঁটে চলেছে কৈলাস। ওরা লুকিয়েছিল দিঘির পাড়ে। চারপাশ শুনশান। আচমকা ধুপধাপ ছুটে এসে কৈলাসকে ঠেলা মেরে ফেলে দিল দিঘির জলে। পদ্মদিঘিতে থই থই জল। দু'তিন মানুষ গভীর। অন্ধ কৈলাসের বুকে সীমাহীন আতঙ্ক। দিঘির কনকনে জলে থই মেলে না। পদ্মদামে জড়িয়ে যায় পা। তার মধ্যেও বাঁচবার প্রবল তাড়নায় সাঁতরাতে থাকে কৈলাস। চিৎকার করে ডাকতে থাকে মানুষজনকে। সাঁতরে সাঁতরে হাত-পা অবশ হয়ে আসে। কিন্তু পাড়ের হদিশ মেলে না কিছুতেই। মাঝে মাঝে ছোঁড়াগুলো নিজেদের মধ্যে কথা কয়, 'মাঝদিঘির দিকেই যাচ্ছে রে।' শুনে কৈলাস দিক পালটায়। ফের সাঁতরাতে শুরু করে। কিন্তু পাড়ের খোঁজ আর মেলে না। বরং জলকে আরও অথৈ মনে হয়। একনাগাড়ে খানিকক্ষণ সাঁতরানোর পর ফের আশায় আশায় দিক বদলায় কৈলাস। ছোঁড়াগুলো চেঁচিয়ে ওঠে, 'উদিগ্ মাঝদিঘি।' দু'চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়ে কৈলাসের। হাত-পা ক্রমশ নিথর হয়ে আসে। শেষ ঘণ্টা বাজতে থাকে সর্ব ইন্দ্রিয় জুড়ে।

'মর‌্যে যেথ্যম্ উইদিন।' কৈলাস, বলে, 'যেদি না ঠিক উই সময় শালুইপিঁড়ির খুঁয়াড়ওলা যেইত্যো উই পথ দিয়ে।'

শুনে বুকে বড় ব্যথা পায় লৈতন। কৈলাসের দিগ্দারি আর লতি-লাঞ্ছনার কথাগুলো বুকের কোনও অচেনা থানে গিয়ে বাজে।

লৈতন আশ্বাস দিয়েছিল কৈলাসকে, 'ইবার থিক্যে কুনো ডর নাই তুমার। তুমাকে লজর রাইখ্‌বার দায় আমার।'

কৈলাস ভেতরে গলে যেতে থাকে। লৈতনকে কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষাও বুঝি খুঁজে পায় না সে। কেবল, বুঁজে যাওয়া চোখের পাতনিজোড়া তিরতিরিয়ে কাঁপতে থাকে।

পেছন থেকে খসখস আওয়াজটা আসছেই। আওয়াজটা পিছু নিয়েছে সেই কুলীনডাঙা থেকে। পুরো ডাঙা কৈলাসের পিছু পিছু ধাওয়া করেছে। কখনো পাশাপাশি, কখনো তফাতে। মাঝে মধ্যে চাপা গলা-খাঁকারি। পদ্মদিঘির পাড়ের পাশাপাশি পৌঁছে সেই যে দাঁড়িয়ে পড়েছে কৈলাস, কিছুতেই আর সামনের দিকে পা'টি বাড়াচ্ছে না। দিঘির পাড়ে প্রাচীন নিমের গোড়ায় এসে একেবারে নিথর। তা বলে, চারপাশের হাঁটা চলা কিন্তু থামেনি। পায়ের আওয়াজ একবার ডাইনে তো, একবার বাঁয়ে। এই সামনে তো, এই পেছনে। অর্থাৎ মানুষ রয়েছে চারপাশে। সন্দেহ নেই। নিঃশব্দে ঘুরঘুর করছে কৈলাসের চারপাশে। ফন্দী আঁটছে। সুযোগ খুঁজছে। যেকোনও মুহূর্তে খস...খস...

আওয়াজগুলো আচমকা কলরবে ভেঙে পড়তে পারে। শুধু কানজোড়াই নয়, সর্ব ইন্দ্রিয় জানান দিচ্ছে সেটা। সারা শরীরের কোষে কোষে কাঁপন শুরু হয়ে গিয়েছে। এ কি মহাসংকটে ফেইল্ল্যে, হে ভগবান!

লাঠি দিয়ে নিমগাছটাকে ছুঁলো কৈলাস। পায়ে পায়ে গিয়ে গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়। পেছনটা আড়াল হলো তাতে। বাকি রইল তিনদিক। লাঠিখানা দু'হাতে বাগিয়ে সামনের দিকে অর্ধ-চক্রকারে ঘোরাতে থাকে কৈলাস। মাঝে মাঝে থেমে গিয়ে একটুক্ষণ দম নেয়। ফের ঘোরাতে থাকে লাঠি। খরিশ সাপের মতো হিসহিস আওয়াজ তুলে অশ্রাব্য বাখান দেয়। বলে, লিত্যিদিন আমার পিছে ক্যানে লাগিস? ঘরে গিয়্যে বাপের পিছে লাগ্ না। কেউ জবাব দেয় না। কৈলাস হাত আর মুখ চালিয়ে যেতে থাকে সমানে।

খানিকবাদে একেবারে কাহিল হয়ে পড়ল কৈলাস। হাঁফাতে লাগল জিভ বের করে। শরীর বেয়ে ঘাম ঝরছে, যেন মা-গঙ্গার পানি। বুকখানা খেলনা-বাঁদরের মতো তিড়িং-তিড়িং নাচছে। কৈলাস গামছার খুঁট দিয়ে মুখের ঘাম মুছল। দম নিতে লাগল গভীর শ্রান্তিতে, কানদুটোকে পাহারাদার রেখে।

কৈলাসের মনে হলো, অনেকক্ষণ ধরে আওয়াজগুলো আর শুনতে পাচ্ছে না। হাঁ রে কান, শুন্ ত' রে বাপ। নাহ্, শব্দটা সত্যিই নাই। ভালো করে কান খাড়া করে শুনল কৈলাস। শালারা পালিয়েছে। কৈলাসের বিক্রম আর কৌশলের কাছে হার মেনেছে আজ। নিমগাছের গুঁড়ি ঠেসে দাঁড়িয়েই কৈলাস ওদের আসল পথখানা মেরে দিয়েছিল। সুমুন্দিরা চোদ্দ আনা ক্ষেত্রে আক্রমণ করে পিছু থেকে। তোমার কাছে যেটা পেছন দিক, ওদের কাছে ওটাই সদর দরজার তুল্য। ঐ দিকটাই তাদের পছন্দ। আক্রান্ত মানুষেরও চোদ্দ আনা ভয় পেছন দিককে। পেছন থেকে মৃত্যু আসে বড় অসহায়ভাবে। সেই পেছন দিকটা বন্ধ করে দেওয়ায়, বেকায়দায় পড়ে গেছে সুমুন্দিরা। তারপর, সামনের দিকে এগোতে পারেনি কৈলাসের লাঠি ঘোরানোর তোড়ে। বাধ্য হয়ে রণে ভঙ্গ দিয়েছে শেষমেশ। ইস্, পেছনদিকটা আড়াল করবার মোক্ষম বুদ্ধিটা আগে খেলেনি কেন কৈলাসের মাথায়! ভাবতে ভাবতে কৈলাস গাছের গুঁড়িটা ঘেঁসে বসল। আহ্! অনেকক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। ঠিক সেই মুহূর্তে একটি ছোট্ট নুড়ি টুপ করে পড়ল ওর গায়ে। ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মত তড়াক করে উঠে দাঁড়াল কৈলাস। দু'হাত দিয়ে বাগিয়ে ধরল লাঠি। মুখের দরজা খুলে গেল নিমেষে। বন্যার জলের মতো তোড়ে বেরোতে লাগল গালি-গালাজ, হুমকি, গর্জন, কাকুতি-মিনতি, কান্না, একসঙ্গে, যুগপৎ। অর্ধচক্রাকারে লাঠি ঘুরতে লাগল বনবনিয়ে।

খানিক বাদে ফের দু'হাত অসাড় হয়ে এল কৈলাসের। মাথা ঘুরতে লাগল বোঁ বোঁ করে। আর বুঝি দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না সে। জষ্টি মাসের আম-পাকা গরম। তার ওপর তিন চার খেপে লাঠি ঘুরিয়েছে অনেকক্ষণ। এখন, কৈলাস যে-কোন মুহূর্তে পড়ে যেতে পারে মুখ থুবড়ে। কেমন পাগল-পাগল লাগছে নিজেকে। মগজ কাজ করছে না যুক্তিবুদ্ধি সহকারে। বিড়বিড় করে কত কি বকতে লেগেছে কৈলাস। ইবার মোকে ছেইড়ে দে। দে, মোর বাপ সকল। তেত্রিশ কোটি দ্যাবতার কিরা। যা বইল্বি, শুনবো। তুয়ারা আমার আসল বাপ। আসল বাপটা ভুয়া। দে, ছেইড়ে দে। আমি কুত্তা-ছাগল-বরা-চোর-লুচ্চা। দে, ইবার ছাড়। আইজকার মতন রেহাই দে। আজই আমার নৈতন নাই।

সহসা অল্প তফাতে খিলখিলিয়ে হাসি। সে হাসি আর থামতে চায় না।

'লৈতন, তুই!'

'হঁ। মুই।'

'অব্বাক কাণ্ড! তুই মাসির ঘর যাস নাই?'

'গিছল্যম্। মাসি সামল্যে লিয়েছে। তাই জলদি জলদি ফিরে এল্যম্।'

বলতে বলতে কৈলাসের পাশটিতে এসে বসল লৈতন। বলল 'ভাবল্যম, লৈতন যে সাথে নাই আজ, সিট্যা লজর এড়াবেক নাই উয়াদ্যার। লির্ঘাৎ ধইর্‌বেক। মানুষটা লতিছতি হব্যেক বজ্জাতগুলার হাতে। চটজলদি চাট্টি পান্ত-আমানি খেইয়েঁ চইলে এল্যম।'

যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ছে কৈলাসের। বাস্তবিক, কুলকুলিয়ে ঘামছে সে। বুকের প্রবল ওঠা-নামাটা কমে আসছে। ধীরে ধীরে যেন প্রাণ ফিরে আসছে ধড়ে। বল পাচ্ছে বুকে, তারও তলায় উল্লাস।

মুখে চিড়বিড়িয়ে ওঠে কপট রাগ, 'তেবে ক্যানে আমাকে ভয় দেখালি অতক্ষণ?'

লৈতন চিকন হাসে। বলে, 'দেখছিল্যম্, তুমি কী কর। ডরটা যত বাড়ব্যেক, ততই ত মনে পইড়ব্যেক লৈতনকে।'

'যেদি ভয়ে তাড়াসে ফিট হইয়েঁ মইরে যেথ্যম্?'

লৈতন চুপটি করে কি যেন ভাবে খানিক। বলে, 'আমি থাইক্‌ত্যে মরণ তুমার পাশ অত সহজে আইব্যেক নাই। তুমাকে মরত্যে দিলে কি চলে!'

সেদিন আর এগোলো না ওরা। তাল কেটে গিয়েছে। নতুন তাল বাজছে এখন।

নিমগাছের তলায় সারা দিনমান বসে রইল দু'জনে। গল্প-গুজব করল। দুনিয়ার যত আগডুম, বাগডুম কথা। মাথা-মুণ্ডু নেই তার।

একসময গড়িয়ে গেল বিকেল। সুমিষ্ট হাওয়া বইল পদ্মদিঘির দিক থেকে। লালি ধরল রোদের তেজে। একসময় কৈলাস বলল, 'চল্, এবার ঘরে যাই। আজ বড় থইক্যে গেছি।'

'হাঁ, চল।' বলতে বলতে এক সময় লৈতনের চতুর হাতখানি রোজকার মতো ঢুকে পড়ে কৈলাসের ঝুলির মধ্যে। নিপুণ হাতে তুলে নেয় মুঠো মুঠো চাল। ভরে আসে কোঁচড়। তা বলে, মুখ থামে না তিলেকের তরে। আঁচলে গিট দিতে দিতে অনর্গল কথা বলে চলে। আনসান কথায় খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে।

একসময়ে উঠে দাঁড়ায় দু'জনে। মাটি থেকে ভিক্ষের থলিখানি নিয়ে লৈতন ঝুলিয়ে দেয় কৈলাসেব কাঁধে।

ঠুকুর ঠুকুর হাঁটতে থাকে কৈলাস। সামনে সামনে লৈতন।

খুশি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু অত করেও লৈতনের মনে সুখ নেই। সে জানে, ঘরে পৌছুবার সঙ্গে সঙ্গেই ওর ফুলে ওঠা কোঁচড়ের পানে তাকিয়ে ঝড়েশ্বর শুধোবে, 'পেটটা ফুলা লাগে ক্যানে বটে? আবার বাধালি নাকি?'

চার

গিরি বুড়ি লৈতনের মায়ের মতো। বিপদে-আপদে ও-ই ভরসা। যত প্রাণের কথাও ওর কাছে। সে শুনে হাপুস নয়নে কাঁদে। বলে, 'ওঝার পো'র এহেন ব্যাভার তুয়ার

মতো মেয়ার সাথে? তুয়ার চরিত্র লিয়ে সন্দ করে উ? অমন সচ্চরিত্তের মেয়া আছে এ তল্লাটে!' লৈতন যত শোনে, ততই কাঁদে। গিরি বুড়ি বুকের মধ্যে চেপে ধরে ওকে। বুঝ দেয় মায়ের মতন। 'কি করবি মা, তুয়ার কপালের লিখন। লোককে দুইষ্যে কি হব্যেক মা, কপালকে দুষ্।

বলে বটে, কিন্তু লৈতনকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হয় ঝড়েশ্বরের উঠোনে।

ঝড়েশ্বর বসেছিল গাং-দিয়ালীতে। বসে বসে গেঁয়োর তুলছিল। গিরি বুড়িকে দেখে ঈষৎ ত্রস্ত চোখে চাইল। গিরি বুড়িকে ভয় পায় পাড়ার সক্কলে। সে ভালোর ভালো, মন্দের মন্দ। ঝড়েশ্বরও সমঝে চলে ওকে।

ঝড়েশ্বরের মুখোমুখি দাঁড়ায় গিরি বুড়ি, কোমরে দু'হাত দিয়ে।

বলে, 'ঝড়িয়া, এ কি শুনি বাপ? রাইতের বেলায় লিজের বউকে নাঙের দুয়ারে পাঠাচ্ছু তুই?'

'কে বইল্‌ল্যাক?' ঝড়েশ্বর আকাশ থেকে পড়ে, 'লৈতন বল্যেছে, লয়? কাঠ বিক্‌তে পাঠাইছিল্যাম গ' পিসি, বিশ্বাস কর। নাঙের দুয়ার ক্যানে হবেক? খইদ্দারের দুয়ার।'

'আমাকে চোখ ঠারিস নাই ঝড়িয়া—।' গিরি বুড়ি রুদ্ররূপ ধরে, 'আমরা সব পঞ্চজনা বাঁইচ্যে রইত্যে, বউকে বিক্যে মদ-জুয়া কচ্ছু তুই! তুয়ার একটা ব্যাটা আছে। বড় হইয়ে—'

অল্পক্ষণ গুম মেরে বসে থাকে ঝড়েশ্বর। ঢোক গিলে গলাটা সাফ করে নেয়। কেঠো হাসি হেসে বলে, 'মিছা কথা, উট্যা ছিল বটে ঝাঁটিকাঠের আগাম।'

বলে, 'ঢের লিলাজ মরদ দেখেছি, তুয়ার মতন কোউটি লয়। তুয়ার এটা ব্যাটা আছে, বড় হচ্ছে সে। তুয়াকে কী ভাববেক উ?'

'ব্যাটা?' দপ করে জ্বলে ওঠে ঝড়েশ্বরের চোখ, 'আমার ব্যাটা নাকি উ? উ বটে ল্যাংড়া বোসের ব্যাটা।'

গিরি বুড়ির চোখে আঙ্‌রা-জ্বলা রোষ। ঝড়েশ্বরকে পারলে ভস্ম কবে দেয়।

অল্প অস্বস্তিবোধ করে ঝড়েশ্বর। কিন্তু সামলে নেয় ঝটিতি। বলে, 'অত রাগ-অ ক্যানে পিসি গো—, মহারাজ যুধিষ্ঠিরও উয়ার বউকে বাজি রেইখে জুয়া খেলেছিল। উয়ার বেলায় কেউ কিচ্ছোটি বলবে নাই তুম্‌রা। আর ঝড়িয়া ক'টা টাকা কাঠের বাবদে আগাম লিলেই যত দোষ!'

শুনে পিত্তি জ্বলে যায় গিরি-বুড়ির। 'মারি ঝাঁটা তুয়ার মুহে—।' তর্জনী তুলে বলে, 'সাফ সাফ শুইন্যে লে ঝড়িয়া, আর যেদি কুনো দিনো দেখি এমন কম্ম কচ্ছু তুই, লৈতনের হইয়েঁ আমি বিচার দিব পঞ্চাতের পাশ।'

পঞ্চাতের কথায় সহসা তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে ঝড়েশ্বর। বলে, 'যাও, যাও। আর পঞ্চাৎ দেখাবে নাই। তুমার পঞ্চাৎ আমার ছিঁড়ব্যেক।'

আস্ফালন করল বটে, কিন্তু তারপর থেকে আর সরাসরি তেমন কুপ্রস্তাব দেয়নি লৈতনকে। পরোক্ষে ঠেস দিয়ে কথা কয়। ঘুরিয়ে নাক দেখায়। শুকরার জন্ম নিয়ে হীন মন্তব্য করে। ঝড়েশ্বর বিশ্বাস করে, শুকরাটার নির্ঘাৎ ল্যাংড়া বোসের ঔরসে জনম।

লৈতনের মনে তাই ইদানিং সুখ নাই একতিল। নিজের মরদ অহরহ চাচ্ছে, বউ যাক নাঙ্ করতে। এ বিষকাঁটা বক্ষে লিয়ে বাঁচা দায়!

শুকরার মুখখানি সুমুখে ভাসে অহরহ। হায়, সে কি ভাবছে, কে জানে!

মাঝেমধ্যে কাটা পাঁঠার মতো আছড়ে পড়ে লৈতন, 'ক'টা টাকার লোভে ঘরের বউকে অমন কাজে নামাতে ইচ্ছা জাগে তুমার?'

'লয় রে লয়। টাকার কথা হচ্ছে নাই।' ঝড়েশ্বর বেহায়ার মতো হাসে। 'আমি ভাবি অন্য কথা।'

'কি কথা? বলো।' লৈতন মুখ তুলে তাকায়।

'ভাবি, বউয়ের তো টেরেনিং আছে এ কাজে। সতী-সাধ্বী ত লয়। একটা বাচ্চাও পেটে ধরেছে সেই সুবাদে। ত, অভাবের সন্‌সারে উয়ার টেরেনিংটা কাজে লাগু। আমার এই আবেস্তা, ক'দিন যে বাঁচবো তার ঠিক নাই। ত, সোয়ামীর এই আবেস্তায় যেদি বউয়ের টেরেনিংটা কাজে নাই লাইগ্‌ল্যাক—।'

আর শুনতে পারে না লৈতন। ছুটে পালিয়ে যায় আড়ালে। কারণ, তার স্থির বিশ্বাস জন্মেছে, ঝড়েশ্বরের গলায় নিছক হুল নয় এটা। একান্ত বিশ্বাস থেকে কথাগুলো বলছে ও।

আসলে, ল্যাংড়া বোসের বাখুলে এককালে ফাইফরমাস খাটত লৈতন। ওর বউটা ছিল চিররুগ্না। কুটাটি নাড়তে লারত। তার কোমরে, পিঠে বাতের তেল মালিশ করে দিত লৈতন। ল্যাংড়া বোস লোকটার তেমন সুখ্যাতি নাই এ তল্লাটে। হাড়-কিপ্‌পন। মুখটাও খারাপ। তেজারতি, মহাজনি করে ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। তবে লৈতন যে দু' আড়াই বছর ছিল ওর বাখুলে, কোনও বদ্-মতলবই প্রকাশ করেনি ল্যাংড়া বোস। কিন্তু ঝড়েশ্বরকে সেটা বোঝায় কে? তার দু'চোখে থিকথিক করে সন্দেহ। বলে, বউর সুবাদে সুখ নাই ল্যাংড়া বোসের। উ কি তেবে উপাসে গুজরান কচ্ছে দিন? পুরুষমানুষ হইয়েঁ উয়ার ক্ষিদা-তিষ্টা নাই? আর আসবি ত আয়, সেই সময়েই লৈতনের পেটে বাচ্চা এল। যখন সুস্থ ছিল আর ওঝাগিরি চলছিল, তখন বিশ্ব-ভুবন চরকির মতো ঘুরত ঝড়েশ্বর। তখন অত গায়ে মাখেনি ব্যাপারটা। তখন কেবল রঙ-তামাশা করত লৈতনের বাচ্চা হওয়া নিয়ে। কিন্তু ওঝাগিরি চলে যাবার পর এবং শরীরখানি ফুলে যাবার পর, সে যেন লৈতনের ওপর হিংস্র হয়ে উঠছে দিন দিন।

পাঁচ

মহুলগাছের তলায় বসে সুখ-দুঃখের গল্প করে ওরা। বুকের বোঝ হাল্‌কা করে দুজনেই।

দুপুর থেকেই একটু একটু মেঘ করেছে আজ। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। শুকনো পাতা উড়ে যাচ্ছে হাওয়ায়। খসর খসর আওয়াজ ওঠে ডাঙাময়। ক্রমশ হাওয়ার বেগটা বাড়ছে। শনশন রোল ওঠে।

লৈতন বলে, 'মেঘ আইঁছে। আইজ ঝরাব্যেক।'

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে এমনটা মাঝেমধ্যেই ঘটে। বিকেলের দিকে আচমকা ঝড়-বৃষ্টি। গুরুলে ওঠে কালো মেঘ। লৈতন চিন্তিত হয়। ওরা দু'জন যে একেরে খাঁ-খাঁ ডাঙার মধ্যিখানে।

লৈতনের কথায় যেন মধু পায় কৈলাস।

'মেঘ জম্যেছে, লৈতন? সারা আগাশ জুইঁড়্যে?'

'লয়। বায়ু কোণে সামান্য।'

শুনে নিতান্তই হতাশ হয় কৈলাস। 'উ মেঘে ঝরাব্যেক নাই।'

এখন ত দৃষ্টিতে কিছুই ধরা পড়ে না। বোঝে না কিছুই। সাবেক কালের সেই মেঘ কি আজও জমে? সেই আকাশ জুড়ে পাকা জামের মতো কালো তলতলে মেঘ। শন্ শন্ হাওয়া। বগের ঝাঁক প্রাণ হাতে নিয়ে উড়ে চলেছে ডেরার পানে। অকস্মাৎ মেঘের গা গুলোতে শুরু করে। ধুলুণ্ডি ঝড় ওঠে। চড়চড়িয়ে বৃষ্টি নামে। কড়াৎ কড়াৎ বাজ পড়ে। আর হওয়া বয় মাতালের মতো? ইদানিং তেমনটা হয় রে লৈতন? অেমন মেঘ কি জমে এ যুগে? বগাগুলা রয়েছে? না, মইরে ভূত? বৃষ্টি হবে না। বুঝে গেছে কৈলাস। হতাশ হয়। নিশ্চিন্তও। ছুটে দৌড়ে ঘরে ফেরার তাড়া নেই। সাপ বটে, তবে এ সাপে বিষ নেই। কৈলাস পুনরায় ঠেস দিয়ে বসে মহুলগাছের গুঁড়িতে। গল্পগাছায় মেতে যায় ফের।

এটা ওটা হাজার কথা শুধোয় কৈলাস। চারপাশের গাছ-গাছাল, দিঘি-পুষ্করিণী, হাট-ঘাটের খবর নেয়। দৃষ্টি যখন ছিল, তখন যা যা দেখেছে, যা কিছু ভালো লেগেছে, সব কিছুর খোঁজ-খবর নেয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। অযোধ্যা গাঁয়ে বারো-শিবের মন্দির ঘেঁসে যে ন'ডালওয়ালা খেজুরগাছটা ছিল, উট্যা আছে ইখনতক্ক? দ্বারকেশ্বরের পুলটা কেমন হয়্যেঁছে রে? খোব নাকি বড় হয়্যেঁছে? বাস-টেরাক নাকি হুঁকুরে চলে? তেবে, লদীটা ত শুনি শুকাঁই যাচ্ছে দিনকে দিন। তেবে আর পুল হইয়েঁা লাভটা কি? দু'ধারে নাকি বালির চরা, আদিগন্ত! ভর-ভরন্ত বালির লদী! সেকালে দ্বারকেশ্বরে কত জল ছিল! মুরুব্বিরা আদর কইরে ডাইক্ত্য, ধলকিশোর। নৌকা দিয়ে পারাপার হইত্যো মানুষজন। অবন্তিকার ঘাটে কত নৌকা মজুত থাকত্যো সেকালে। তখন কৈলাসের একজোড়া মণি-বাঁধানো চোখ ছিল। সে জায়গায় এখন একজোড়া নিবন্ত উনুন।

'পুল হবার পর, অবন্তিকার ঘাটটা তেবে নাই? আর ঘাটের পাশের ঘরগুলা? তুই যাউ লৈতন, উদ্দিগে?' ক্রমশ আত্মস্থ হতে থাকে কৈলাস। মগ্ন।

'ঘাটের গা' ঘেঁইস্যে একটা টালির ঘর ছিল। ঘরের চালে সবুজ লাউ-ডগা, শাদা শাদা ফুল...। লৈতন, দেখেছু তুই?'

মুখ তুলে তাকায় লৈতন। ভ্রূ-সঙ্গমে ভাঁজ পড়ে। এই প্রসঙ্গটা ইদানিং সুযোগ পেলেই তোলে কৈলাস। অবন্তিকার পুরোনো ঘাটে ঐ টালির ঘরের প্রসঙ্গ। ঘরখানা বুঝি স্মৃতিব জলে খেলে বেড়ায় অহরহ। মাঝে মধ্যেই ঘাই মারে, ওপর জলে। কিন্তু কিছুতেই খুলে বলবে না। লৈতন চাপাচাপি করলে তৎক্ষণাৎ গুটিয়ে নেবে নিজেকে। সেঁধিয়ে যাবে খোলসে।

লৈতন আজ জোর চেপে ধরে, 'লিত্যিদিন একোঁই কথা কও ক্যানে কৈলাসদা? খুইল্যে বইল্ব্যে নাই আমাকে?'

অভিমানে ঠোঁট ফোলায় লৈতন। কৈলাস সেটা দেখতে পায় না। কিন্তু অনুভব করে অন্তরে।

'কি রে গুঁসা কল্লি?'

জবাব দেয় না লৈতন।

হাতড়ে হাতড়ে ওকে ছোঁয় কৈলাস। মাবা-দুধের মতো গাঢ় হয়ে আসে বুক। ধীরে ধীরে মুখ খোলে সে। বিতাং করে শোনায় অবন্তিকার ঘাটে ঐ টালি-ঘরের বিত্তান্ত।

'অবন্তিকার সাবেক ঘাটে উই টালির ঘরটা, উইঘরে পাখি থাইক্ত্য...।' এইভাবে শুরু করে কৈলাস।

'কি পাইখ্?' শুধোয় লৈতন।

কৈলাস একটুক্ষণ মৌন থাকে। ম্লান হাসে। খুব পাতলা গলায় বলে, 'কি পাইখ, সিট্যাই ত বুঝতে লারল্যম। উয়ার আগেই ত বাপ-ভাই মিলে উড়াঁই দিল্যাক আমার পাইখ্‌টাকে।'

লৈতন বুঝতে পারে, পাখি মানে পাখি লয়। নড়েচড়ে বসে।

'উই আমাকে ভালাবাইস্‌ত্যো, আমি কিন্তু পয়লা বাসি নাই। উয়ার বাপ খগেন রক্ষিতের মিঠাইয়ের দোকান ছিল অবন্তিকার ঘাটে। দিনরাত হরদম সেল। বড়ভাইটা ছিল চাবুক-চোদ্দ ছোকরা। রাঁচির দিকে পাথরকলে কামিন খাটানোর চাকরি করত। জাতে উঁচু ছিল তারা। সম্পদেও। ঝড়েশ্বর তদ্দিনে অঝাগিরির পাঠ লিচ্ছে ছিলিমপুরের নন্দ লুহারের পাশ। আমি গরু চরানো ছেড়ে নৌকা চালাই অবন্তিকার ঘাটে। লদীর বুকে লগি ঠেলে দিন কেইট্যে যায় সুখে। জয়কিষ্টোপুর থেকে দুধ লিয়ে দল বেঁধে বিষ্টুপুর যায় মেয়েরা। সকালে যায়, দুফোরে ফিরে। উয়াদ্যার দেখে রঙ-তামাশা করি। উচ্চতানে গান করি : সব সখীকে পার করিতে লিব্ব আনা আনা...। পাখি রোজ শুনত্যো উই গান, উই টালির ঘর থিক্যে। আমি বুঝি নি সিট্যা। বুঝেও পিছ্যাই যেথ্যম্ আমি। কিন্তু উ মেয়া এমন জাপ্‌টান্ জাপট্যাল্যাক, ছাড়াতে লারল্যম্। লৈতন রে, আমার শরীল-স্বাস্থ্য তখন ছিল দেখ্‌বার মতন!'

লৈতন সেটা মনে মনে স্বীকার করে। এখনও ধ্বংসাবশেষ যা রয়েছে, তাতেই মালুম হয়।

কৈলাস বলে, 'কত কইর‍্যে বুঝাল্যম মেয়াকে। তুয়ার সাথ আমার জোট হয় রে, পাখি? কুথা তুই, কুথা আমি! চাঁদে, আর মেনি-বাঁদরের পোঁদে।। তুই হইলি উচ্চ ডালের পাখি। কিন্তু সে মেয়া শুনল্যে ত: সে ত্যাখন কৈলাস শিকারীর লেইগ্যে উন্মাদ! ফলটা যা হবার, তাই হল।' কৈলাস দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ওরা কয়েক পলকের ব্যবধানে মেরে ফেলল, একজোড়া কোটরের মধ্যে যত্নে পোষা কৈলাসের সাধের একজোড়া পাখিকে। দৃষ্টিপাখি।

'ঐ দোষে চখ্ দুট্যাই লিয়ে লিল্যাক!' লৈতন বুঝি চোখের পাতনি ফেলতেও ভুলে যায়।

একটুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে কৈলাস।

বলে, 'পাখির বড়ভাইটা ছিল পিচাশ। রাঁচিতে ছিল ত উ। উ দ্যাশে নাকি ইট্যার ভারি চল্। কথায় কথায় গেরিব মাইন্‌ষের চক্ষের দৃষ্টি কেড়্যে লেয়। অতি সহজে, অতি কঠিন সাজা। একজনা চাইপ্যে বস ছাতির উপর। একজনায় চাইপ্যে ধর পা। দু'চোখের পাতনি অল্প খুইল্যে, ফেল্যে দাও দুটি ফোঁটা আকন্দের আঠা। ব্যস, লিমেষে জগৎ অন্ধকার। মারা নাই, পিটা নাই, হুজ্জুতি নাই। অথচ একটা মাইন্‌ষের সব শেষ হইয়্যে গেল! তখন উয়ার মরা-বাঁচা দুইই সমান।'

বলতে বলতে ভারি হয়ে আসে গলা। বন্ধ কোটরের মধ্যে অজান্তে রস জমে। অশ্রু।

লৈতন যেন বোবা মেরে গেছে। মুখ দিয়ে রা কাড়ে না সে। পরিবেশটা থমথমে হয়ে ওঠে।

একসময় লৈতন শুধোয়, 'অত বড় জুলুমটার কুনো বিচার হল্যাক্ নাই?'

অন্যমনস্ক ছিল কৈলাস। লৈতনের কথায় হুঁশে ফেরে। মিনমিনে গলায় বলে, 'তখন জরুরি আবেস্তা চইল্‌ছে দেশে। যার যা খুশি, তাই কচ্ছে। জুদ্দার, পুলুশ, আর গুণ্ডাদ্যার রাজ তখন। হাতে মাথা কাটে।'

লৈতন চুপ মেরে থাকে। পুরো ব্যাপারটা পরিপাক করতে সময় লাগে তার। একসময় শুধোয়, 'পাখি ইখন কুথায়?'

'দূর হ।' কৈলাসের গলায় রোষ, 'সিট্যা জানল্যে আর তুয়াদ্যার পাশ অত জিগাই ক্যানে লিত্যিদিন? অত সুড়ুকসন্ধান লিই ক্যানে, অবন্তিকার ঘাটের?' বলতে বলতে খাদে নেমে আসে কৈলাসের গলা, 'উদিগে যাই নাই আজ এক যুগ। কুথা উইড়্যে গেল্যাক পাখি, কুন গাছের কুন ডালে গিয়ে থিতু হল্যাক, কে জানে! কে জানে...।' গলার স্বর একেবারে খাদে নামিয়ে যেন নিজের সঙ্গে কথা বলতে থাকে কৈলাস শিকারী।

বেলা চড়ে যায়। গাছ-গাছালির মগডালে রোদ্দুর।

কৈলাস বলে, 'চল, এবার ঘরে ফিরি।'

ধীরে ধীরে সাড় ফিরে আসে লৈতনের। বলে, 'চল।'

শেষমুহূর্তে কৈলাসের ঝুলিতে হাত পুরে দেয় লৈতন। নিঃশব্দে ভরে নেয় কোঁচড়। বলে, 'কই, উঠলে নাই?'

কৈলাস তাও বসে থাকে। উঠে দাঁড়াবার কথাটা যেন সহসা ভুলে যায় সে।

'লৈতন, একটা কথা বইল্‌ব?'

'কি কথা? বলই না।'

কৈলাস চুপটি করে ভাবে। আকাশের দিকে মুখ তার। বলে, 'একটা কথা, বলি-বলি করি, বইল্‌তে লারি।'

লৈতনের দু'চোখে গাঢ় কৌতূহল।

বল, 'বইলে ফেলাও। কথা চাপা পাপ।'

'বলছিল্যাম্ কি—, এক ঝুলির চাল, লিত্যিদিন, দু'ভাগ কর্যে ভিনো হাঁড়িতে রেঁইধে কি লাভ? এক হাঁড়িতে ফুটাল্যে দু'জনেই খাই।'

ভীষণ চমকে ওঠে লৈতন। কোঁচড়ের গিঁটখানা আর কষে বাঁধা হয় না। গলা শুকিয়ে আসে। লজ্জায় মরমে মরে যায় সে।

'কি রে, জবাব দিলি নাই?'

লৈতন সহসা রা কাড়ে না। খানিক বাদে বলে, 'তুমি তেবে রোজই টের পাও?'

কৈলাস ম্লান হাসে। বলে, 'এ বটে অন্ধের কান। একে ফাঁকি দিবা ভারি দুষ্কর। রোজই কানে ঠিকেই বাজে। বাকিটা যাচাই হইয়েঁ যায় ঝুলিটি কাঁধে তুইল্যে। ঝুলি যে হাল্কা লাগে।'

গুম মেরে যায় লৈতন। মুখে কথা জোগায় না সহসা। খানিকবাদে গম্ভীর গলায় বলে, 'টের পাও ত বল নাই ক্যানে অ্যাদ্দিন?'

কৈলাস আবারো হাসে, 'সব চোর যে ধইর্‌বার লয়।' একটুক্ষণ ভাবে কৈলাস। বলে, 'তা বাদে, ধর্, তুই যে আমাকে পাহারা দিস রোজ। অল্প কটি চাল, তুই লয় নিলিই। আমি তুয়াকে খুশি মনেই দিই রোজ।'

আচমকা ধরা পড়ে গিয়ে কেমন বিমর্ষ হয়ে গেছে লৈতন। কেমন ছোট লাগছে নিজেকে। খালি ধিৎকার হচ্ছে নিজের ওপর।

দেখেশুনে প্রমাদ গোনে কৈলাস।
বলে, 'গুঁসা কইর্‌লি লৈতন?'
'লয়।' ফোঁপরা বাঁশের পারা লাগে লৈতনের গলা। হাওয়ায় ক্ষয়ে যায় সে স্বর।
'কাল আইস্‌বি ত?'
লৈতন চুপ করে থাকে। কথা বলতে ভালো লাগে না তার।
ব্যাকুল হয়ে ওঠে কৈলাস, 'বল, লৈতন, আইস্‌বি ত?'
'আইস্‌বো।' নিরুত্তাপ গলায় জবাব সারে লৈতন।
'হঁ, আইস্‌বি। পাশে পাশে থেইক্যে পাহারা দিবি। আর—।' এক চোল মমতা যেন ঝরে পড়ে কৈলাসের গলা থেকে, 'আর, ঝুলির থিক্যে আগের মতন চুরি কইব্‌বি চাল।'
সেদিন আর গল্প-গাছা জমে না। একসময় বাড়ির পথ ধরে দু'জনে।
আজ লৈতন বেশ চুপচাপ। কথা বলছে কম। হুঁ-হাঁ করে কথা বলবার দায় সারছে। আকাশ আজ ভারি নিষ্করুণ। হাওয়া নেই এক তিল। রোদ্দুরে ব্রহ্মতালু ফেটে যায়। পথ হাঁটতে হাঁটতে এটা-ওটা শুধোয় কৈলাস। 'হঁ'রে লৈতন, ভাল্‌ ত বাঁয়ে। কি দেখু? ডাঙার ঈশান কোণে ঠুঁটা ভুঁয়াশ গাছটা আর উয়ার পাশে একটা পাকার মঠ? উটা হইল্যাক গোপী ঘোষের বাপের মঠ। উয়ার গায় দেইখ্‌বি, কতক্‌টা চটানো। কোদালের ভারি ঘা।'
অন্যদিন হলে লৈতন বলতো, 'তুমি ইসব লিজের চখে দেখেছ, লয়?'
'লিজের চখে লয়ত কি?' কৈলাস বলত, 'সবদিন ত আর অন্ধ ছিল্যাম নাই।' বলতে বলতে প্রাণপণে দীর্ঘশ্বাস চাপত।
আজ লৈতন রা কাড়লো না মুখে।
কৈলাস খিক্‌খিক্‌ করে হাসে। পরিবেশটা তরল করতে চায় সে। বলে, 'মঠের গায়ে উ'রম্‌ দাগ কি কইর‍্যে হইল্যাক বল্‌ দিখি?' উত্তরের অপেক্ষা না করে নিজেই জবাব দেয়, 'নিশান বাউরীর কোদালের ঘা উট্যা। গোপী ঘোষের বাপ উয়াকে ভিটা থিক্যে উচ্ছেদ করোছিল ঋণের দায়ে। জীয়ন্তে উয়ার ছিঁড়তে পারে নাই। মরার পর শোধ লিল্যাক্‌। একদিন, ঠায় দুফোরে, রোষে অন্ধ হইয়েঁ সমাধি-মঠের উপর মাইর‍্লেক্‌ কোদালের ঘা।' হেসে আকুল হয় কৈলাস, 'বিচারে পাঁচশো এক টাকা জরিমানা হইল্যাক উয়ার।
লৈতন কথা বলে না। দেখেশুনে কেমন মুষড়ে যায় কৈলাস।
একটু বাদে বলে 'লৈতন, চ, উই ভুঁয়াশ গাছটার তলায় বসি।'
লৈতন ঘুরে দাঁড়ায়, 'ক্যানে? ভুঁয়াশ গাছের তলায় ক্যানে?'
'বাপ্‌রে, এ বড় গুণের বিক্ষো।' কৈলাস গদগদ গলায় বলে, 'এ হইল 'ইচ্ছাপূরণ' গাছ। তুই শুনিস নাই? এ গাছের গোড়ায় বুইস্‌লে মন ভালো হইয়েঁ যায়। ইচ্ছাপূরণ হয় মাইন্‌ষের।'
কৈলাস যে-কোনও গতিকে লৈতনের মনটা ভালো করতে চায়। মন-ভালো করা গাছের তলায় সেই কারণেই সে নিয়ে যেতে চায় লৈতনকে।
লৈতন জানে। গাছেদের হরেক মহিমার বিত্তান্ত। হাতিশোলের জঙ্গলে একটা বাজপড়া কুসুমগাছ আছে। তার তলায় গিয়ে দাঁড়ালে আত্মহত্যার সাধ জাগে মানুষের।

সেই ছেলেবেলা থেকে কথাটা শুনে আসছে লৈতন। নিছক বাজি রেখে পরখ করতে গিয়েও নাকি ঐ গাছের ডালে ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে মানুষ। লৈতনের কিছুদিন ধরে মধ্যে-মধ্যেই ইচ্ছে হচ্ছিল, ঐ গাছের তলায় গিয়ে একটিবার দাঁড়ায়। একবার গিয়েও ছিল গাছটার দশ হাতের মধ্যে। শেষমেশ ফিরে এসেছে।

ফিরে আসার একটাই কারণ। শুকরা। লৈতনের একমাত্র ছেলে। গজ মোড়লের দুয়োরে বাগাল আছে। পেটভাতুয়া। মাঝেমধ্যে ঠা-ঠা দুপুরে ঘরে আসে সে চুপিসারে। ঝড়েশ্বর লুহার সে সময়টা অধিকাংশ দিনই ঘরে থাকে না। লৈতন বেরোবার আগে ঝড়েশ্বরের জন্য মাঢ়-ভাত-ফুটিয়ে রেখে যায়। লৈতন বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই ঝড়েশ্বর তৈরি হয়। ঘরের কোণে ফাটা ঢোলের মধ্যে টিনের কৌটোয় লুকিয়ে রাখা লৈতনের পয়সা থেকে খানিকটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে সে। সোজা চলে যায় অতুলের ভাটিখানায়। সারা দুপুর ভাটিখানায় পড়ে থাকে সে। শুকরা আসে ঐ সময়টায়। সারাঘর আঁতিপাতি খাদ্যের সন্ধান করে। বাপের জন্য রাখা মাঢ়-ভাতটুকু খেয়ে নিয়ে পালায়। ছেলেটা বড় হয়েছে। ওকে নিয়ে ঝড়েশ্বরের মন্তব্যগুলো ওর কানে যায়। শুনতে শুনতে তার কি হয়েছে, কে জানে! ঘরে থাকতে চায় না। মা-কে মা বলে না, বাপকে নয় বাপ। ছেলেটা ওদের থেকে দূরে থেকেই সুখ পায়। মাঝে মধ্যে যে লুকিয়ে চুরিয়ে আসে, সে শুধু খাদ্যের লালসায়। সেটা বুঝতে পেরে লৈতন বেরোবার আগে এটা-ওটা রেখে যায় পাকশালে। ছেইলাটা যদি অন্তত উই টানেও আসে পিত্‌রিপুরুষের ভিটায়।

শুকরার সঙ্গে একটা রেষারেষির সম্পর্ক ঝড়েশ্বরের। কেউ কাউকে দেখতে পারে না। ঝড়েশ্বর ত বিশ্বেসই করে না, ছেলেটা ওরই ঔরসজাত। লৈতন যে ছেলের জন্য এটা-ওটা রেখে যায়, ঝড়েশ্বর তা জানে। সুযোগ পেলেই খুঁজেপেতে খেয়ে ফেলে তা। ছেলেও বাপের খাবার খেয়ে চলে যায়, যাবার সময় আবার চুলা থেকে খানিকটা ছাই ভরে দিয়ে যায় সানকিতে। নেশাভাঙ করে এসে, এহেন দৃশ্য দেখে, চিল-চিৎকার জোড়ে ঝড়েশ্বর। শালা, ল্যাংড়া বোসের ছা! একদিন বাগে পাই, বাপের দশা কইরবো। উয়ারও একটা ঠ্যাং লিবই লিব।

ছেলেটাকে ছেড়ে ওপারে চলে যাওয়ার কথাটা মনে হলেই কান্না পায় লৈতনের। হায় রে, এমন কপাল কর্‍্যে আঁইছে, জন্মাবধি একটা বাপ পাইল্যাক নাই ছা।

ভুঁয়াশ গাছের তলায় গিয়ে বসল দু'জনে। জ্যৈষ্ঠের ঝলা বাতাস বইছে। মুখে চোখে আগুনের হল্‌কা লাগে। লৈতন একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে দিগন্তের দিকে।

উসখুস করছে কৈলাস। লৈতনকে কথাটা বলতে চাইছে অনেকক্ষণ। আটকে যাচ্ছে জিভের ডগায়। লৈতনের জীবনের পুরো উপাখ্যান এই ক'মাসে একটু একটু করে শুনেছে সে। ঝড়েশ্বরের সংসার থেকে মুক্তি পেলেই সে বেঁচে যায়। লুহার, শিকারীদের মধ্যে মেয়েদের দ্বিতীয় সংসার কোনও বড় ব্যাপার নয়। কিন্তু ক'দিন ধরে, কথাটা পাড়লেই, লৈতন কেমন থম্ মেরে যাচ্ছে। এও এক রহস্য।

একসময় কথাটা পাড়ে কৈলাস। বলে, 'লৈতন, আমার কথাটা ভাবলি কিছো?'

লৈতন যেন নতুন শুনলো এমন কথা। বলে, 'কি কথা?'

'আয়, এক হাঁড়িতে খাই। শুকরাটাও থাইক্‌বেক আমাদের পাশ। ধইর্‍্যে লে, উ আমারই ব্যাটা।' একটুখানি ঘনিষ্ঠ হয় কৈলাস, 'কি লাভ উই পাযোগের সন্‌সারে দগ্ধে দগ্ধে—'

লৈতন জবাব দেয় না। দিগন্তের গায়ে চোখ বিঁধিয়ে বসে থাকে।

সহসা কৈলাসের বুকে শাওনের মেঘের মতো গাঢ় অভিমান জমে। গলাখানি খাদে নামিয়ে বলে, 'আমি অন্ধ বইল্যে তুয়ার বড্ড ঘিন্না, লয়? যে মানুষ চখে দেখে না, উয়ার সাথ জীবন জড়াঁই লাভ কি, বল্?' খ্যাপা ষাঁড়ের মতো ফুঁসতে থাকে কৈলাস। তফাৎ থেকেই তার নিঃশ্বাসের উত্তাপ টের পায় লৈতন। কৈলাসের মনের ভেতরটা স্পষ্ট পড়তে পারে সে। নিঃশব্দে চোখ মোছে। কিন্তু কৈলাসের প্রস্তাবে সায় দিতে পারে না কিছুতেই।

কোনও পিছুটান নয়, সংস্কার নয়, লোকলজ্জার ভয়-টয়ও নয়। তার অমতের কারণটা অন্যত্র। সে নিশ্চিন্তভাবেই উপলব্ধি করে, যে বিশ্বাসহীনতায় সে তিলতিল দগ্ধ হচ্ছে, জীবনভর তা থেকে ওর মুক্তি নেই।

ঝড়েশ্বর শুধু দু'চোখ দিয়ে দেখেই সন্দেহ করে। কৈলাসের ঐ চোখদুটো নেই বটে, কিন্তু তার শরীরে চোখের সংখ্যা অনেক বেশি। তার সর্ব অঙ্গে, সর্ব ইন্দ্রিয়ে শত শত চোখ বসানো।

কৈলাসকে, সেই কারণেই, আরো বেশি ভয় লৈতনের।

নৌকাবিলাস

এক

উদ্বোধনী সংগীত গাইলেন তানিয়া সেন। আমাদের অনুষ্ঠানে উনিই উদ্বোধনী সংগীত গান। পদটা তাঁর জন্যই বাঁধা। অন্য মহিলারা, যাঁরা গান-টান করেন, তানিয়া সেনের এমন পৌনঃপুনিক সুযোগপ্রাপ্তিতে ঈর্ষান্বিতা, আড়ালে ভেচিং কাটেন, তানিয়া সেন নয়, সাক্ষাৎ তানসেন (স্ত্রীং)। তানিয়া সেন অবশ্যি এমন দুর্লভ সৌভাগ্যে মোটেই আত্মশ্লাঘা বোধ করেন না। বলেন, দুর, ওই সময় অর্ধেক শ্রোতাই এসে পৌঁছয় না, হলের অর্ধেক চেয়ারই ফাঁকা, বিচ্ছিরি লাগে।

তানিয়া গাইলেন, ওরে ভীরু, তোমার হাতে নাই ভুবনের ভার/হালের কাছে মাঝি আছে, করবে তরী পার/ ওরে ভী—রু...। উচ্চারণে 'ড়' এবং 'র'-এর গোলমাল থাকায় সবগুলো 'র' শোনাল 'ড়'-এর মতো।

গান শেষ হতেই রুদ্র বক্সী বলে উঠলেন, 'বাঁচালে! আমি ভয় পাচ্ছিলাম, বুঝি ওই গানটাই ধরলে।'

—কোন গানটা?

—ওই যে, ওই যে— প্রায় সব সভা-টভায় উদ্বোধনী হিসেবে গায় আজকাল।

—কোনটা? আ—নন্দ লো—কে, মঙ্গলা—লো—কে?

—আরে না, না। ওই যে, ওই গানটা, কী—গাব আমি কী— শোনা —ব আজি আনন্দধা মে-।

হিরন্ময় বটব্যাল হলেন তথ্য-পরিসংখ্যান মাস্টার। যে কোনো বিষয়েই কিছু তথ্য এবং পরিসংখ্যান ওঁর ঠোঁটের ডগায় মজুত। সুধীন সান্যাল জনান্তিকে বলেন, গু-ল, স্রেফ গুল মারে। কোনোটাই ঠিক নয়। জানে তো, চারপাশের কেউ কি-স্যু পড়ে না, গম্ভীর মুখ করে পরিসংখ্যানগুলো আউড়ে গেলে চেপে ধরবার লোক নেই। আমি অবশ্যি পারি, কিন্তু ধরিনে, ছেড়ে দিই। মারছে, মারুক। আমার তো কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। বেচারা ইগো-স্যাটিসফাই করছে, আমি বাদ সাধি কেন!

বটব্যাল, পরিসংখ্যান মাস্টার, বললেন, সত্যি, কবিগুরুর কত্তো গান! কিন্তু কয়েকটাই মাত্তর পেটেন্ট হয়ে রইল। সভা-সমিতিতে 'আনন্দলো—কে' কিংবা 'কী গাব আমি কী শোনা—ব', ফেয়ারওয়েলে, 'ভরা থাক, স্মৃতিসুধায়', মৃত্যুসভায় কিংবা শ্রাদ্ধবাসরে 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন' কিংবা 'আছে দুঃখ আছে মৃত্যু...।'

গোবর্ধন পুততুণ্ড, কবি, কলম-নাম অরিত্র দত্তগুপ্ত, মুড়ি মুড়কির মতো সভা-সমিতি করে বেড়ায়। খোঁজও পায়, যায়ও দূর-দূরান্তরে, সব রকমের সভায়। কোনো বাছ-বিচার নেই, লজ্জা সঙ্কোচও নেই সে জন্যে। বলে, 'আমার ভাই প্ল্যাটফর্ম চাই। কবিতা পড়বার প্ল্যাটফর্ম। যে কোনো বিষয়েই সভা হোক না কেন, আমার কবিতা পড়বার প্ল্যাটফর্মটা পেলেই হল।'

—তা বলে সভা-সমিতির ক্যারেকটারটা দেখবে না?'

—নো। না। দেখব না। নিঃশ্বাস নিতে পারছি কিনা সেটাই বড় কথা। নাকটি দেখতে কেমন তা জেনে আমার লাভ নেই। নাকে কাজ, না নিঃশ্বাসে কাজ? বিশেষ করে যখন আমার, চারপাশ থেকে, দম বন্ধ হয়ে আসছে।

ঘষতে ঘষতে পেতলকেও সোনার মতো চকচকে লাগে, বারবার চোখের সামনে থাকলেই নয়ণের মণি হয়ে ওঠে মানুষ, এই তত্ত্বে বিশ্বাসী অরিত্র আজকাল বেশ ডাকটাক পায়। তার বাহানা কম, তার বাসায় ট্যাক্সি পাঠাতে হয় না, সাজানো ডাকবাংলো দাবি করে না সে, তার মদ্যের কোনো নির্দিষ্ট ব্র্যাণ্ড নেই, পদ্যেরও না, সাম্মানিক দক্ষিণা হিসেবে ছাতা-জুতো, শাল-আলোয়ানের তালিকা চামচে মারফত ধরিয়ে দেয় না কর্মকর্তাদের হাতে।

সবচেয়ে বড় কথা, সে সব জাতেব অনুষ্ঠানেই যায় এবং অনুষ্ঠানের মেজাজ অনুসারে কবিতা পড়ে। তার শুধু কবিতা পড়তে পেলেই হল, বাকি সব, এখনও অবধি, গৌণ। ফলে সব অনুষ্ঠানের কর্মকর্তারাই ওকে বেশ পছন্দ করেন। এবং যে পদ্ধতিতে গৃহিণীদের মুখে মুখে, ঘরে ঘরে, 'রু-আফজা' জাতীয় জটিল নামধারী পানীয়ের নাম, কিংবা চ্যাংড়াদের মুখে মুখে উর্দু-প্রধান হিন্দি গানের কলিগুলোও চালু হয়ে ওঠে, তেমনি ভাবেই অনুষ্ঠান-জগতে অরিত্র দত্তগুপ্তর মতো আপাতজটিল নামটি ইতিমধ্যেই বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

অরিত্র বলল, একবার পশুপালন দপ্তরের একটা 'গো-প্রদর্শনী-কাম-গো-বেবি শো'র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গিয়েছিলুম হবিণঘাটার দিকে। গৌরী, গো-বদ্যি, এমন ধরল—। তো, ওখানে উদ্বোধনী সংগীত যা গাওয়া হল, আমার তো ভিরমি খাওয়ার জোগাড়।

'কোন গানটা অরিত্রদা?' পাখির নীড়ের মতো দু'চোখ ভাসিয়ে বেশ আদুরে গলায় বলে আরতি সোম। সে এখনও অরিত্রর আসল নামটা জানেই না। অনেকেই জানে না।

এই হয়েছে জ্বালা! জীবনানন্দের 'পাখির নীড়ের মতো' পড়বার পর বহু মেয়েরই চোখ দুটোকে ওরকম বানাবার ইচ্ছে, যদিও চোখ দুটিকে ঠিক কেমন করলে তা পাখির নীড়ের মতো দেখাবে, সেটা জানা নেই অনেকেরই।

'পাখির নীড় কিন্তু মোটেই দেখতে ভাল নয়।' প্রবল অ্যান্টি-রোমান্টিক কবি সন্তোষ ভাদুড়ি, এককালে চুটিয়ে নিম-সাহিত্য করতেন, সেবাব্রত চৌধুরীর প্রেমের কবিতাগুলোকে টিটকিরি করে প্রায়ই ছুঁড়ে দিতেন স্বরচিত ব্যঙ্গ-কবিতা, 'তোমার হৃদয়ের সসপ্যানে হাজারটা ডিম ভেজে খেয়েছি—' চোখ নামিয়ে বলেন অক্ষি-বিলাসিনীদের, 'পাখির বাসাগুলো গোল গোল হয় ম্যাডাম। কাঁটা-খোঁচা, খড়-বিচালির গাদা, আর ভেতরে চার-পাঁচটা ডিম। কল্পনা করো, একখানা চোখের মধ্যে পাঁচখানা মণি!'

সন্তোষ ভাদুড়িকে প্রেমিক ও রোমান্টিক কবিরা মনে মনে বড় ভয় পায়! যা দুর্মুখ, আর কথায় যা হুল! দুনিয়ার অনেক ব্যাপারেই তাঁর কট্টর অ্যান্টি-রোমান্টিক সব থিয়োরি রয়েছে।

যেমন, ধরো, একটি সুন্দরী মেয়ের বর্ণনা তুমি কেমন করে দেবে? কোন শব্দ-গুচ্ছ দিয়ে তুলে ধরবে তার রূপ? চাঁদের মতো মুখ, পটল-চেরা চোখ, বাঁশির মতো নাক, আপেলের মতো গাল, দাঁতগুলি যেন ঝিনুকের মধ্যে সাজানো মুক্তো, এটসেট্রা, এটসেট্রা...। এবার বর্ণনা অনুযায়ী এঁকে ফেলো দেখি মেয়েটিকে। চাঁদের মতো গোলাকার মুখে চেরা পটল দু'খানি, তাতে চার-পাঁচটি করে আধ-কাটা বীজ। সরু লম্বাটে নাকে ছ'খানা ফুটো। বাকিটা কল্পনা করতেও গা শিউরে ওঠে। রূপকল্প! ছাতার মাথা!

আরতি সোমের ভাসা ভাসা চোখদুটির দিকে তাকিয়ে অরিত্র বলে, 'আন্দাজ করো দেখি, গানটা কী হতে পারে?'

—দূরদেশী কোনো রাখাল ছেলে?

—উঁ-হুঁ, হল না।

—ওই তো তোমার আলোক ধেনু?

—এবারও হল না! ভাবো।

—তাহলে বাবা আপনিই বলুন।

—গানটা হল, তোমারি গে—হে পালিছ স্নে—হে, তু—মি ধন্য, ধন্য হে—।

শুনে সে কী হাসি বিদগ্ধজনের, এবং এমন করে বলতে পেরে অরিত্রর কী উজ্জ্বল মুখ!

'সত্যি!' সংগীত, বিশেষ করে ফোক-এর তরুণ গবেষক সত্য বাগচি বলেন, 'রবীন্দ্র সংগীতকে ইমপ্রোভাইজ করে কত দিকেই না লাগানো যেতে পারে!'

সেবাব্রত, এই অনুষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তা, অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ করছিলেন, আলোচনাটা ক্রমশ তারল্যের দিকে এগোচ্ছে। ব্যাপারটা খুবই সর্বনাশা এবং সংক্রামক, সব তরল বস্তুই। এমনিতেই আজ যথেষ্ট পরিমাণে তরল বস্তু মজুত রয়েছে। সে সব যথাসময়ে পেটে পড়বে। কিন্তু একেবারে প্রথম পর্বেই অতখানি হতে দেওয়া চলে না। আফটার অল, আজকের এই ওয়ার্কশপের বিষয়টা এমন গভীর, এত প্রাসঙ্গিক, এর ফলাফল এমন সুদূরপ্রসারী! এমন একটি অনুষ্ঠানকে জন্মলগ্নেই তারল্যের নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া যায় না, নিঃশর্তে সঁপে দেওয়া চলে না আড্ডাবাজ ফুর্তিবাজদের হাতে।

সেবাব্রত বার-দুই গলা ঝাড়েন, 'তাহলে, আমরা এবার—' খুক খুক করে কাশেন।

সিনেমা শুরু হওয়ার আগে যেমন ক্রিং ক্রিং... বেল বাজে, অন্ধকার হয়ে আসে হল, তেমনি, সেবাব্রতর কাশি শুনে ফুর্তিবাজ মুখগুলির থেকে ধীরে ধীরে মুছে যায় আলো। বিরক্তিতে কালো হয়ে আসে মুখ, এই এক আঁতেল! সর্বদাই যেন টান-টান ইলাস্টিক! 'এই বুঝি ঝড় শুরু হল, তুফান এল, যুদ্ধ বাধল' গোছের ভাব। দুনিয়ার সেরা জোকটি শুনে মুখখানা বড় জোর মেঘলা দিনের সূয্যিমামা!

সেবাব্রত বলেন, 'তাহলে এবার শুরু করা যাক।'

দুই

দিনটা ভারি মনোরম।

লঞ্চখানাও দুলছে একটা রিদ্‌মে। এমন দুলুনিতে ঘুম আসে, প্রেম আসে, কবিতা আসে, একেবারে নবিশদের, বমি। তারকনাথ, রুদ্র বক্সীর চেলা, খ্যাংরা ঝাঁটার মতো অবয়ব, সরু হাড়গোড় মটমটিয়ে উঠে দাঁড়ায়, 'ছোট-বাইরে'। হাওয়ায় উথাল-পাতাল, যেন নির্মলেন্দুর গান, বুকের কাপড় হাওয়ায় উরাইয়া লইয়া যায়—। লঞ্চের বিশাল ডেক-এ শতরঞ্চি পাতা হয়েছে। ধূপ জ্বলছে। হারমোনিয়াম। প্যাকেটে প্যাকেটে শুকনো ব্রেকফাস্ট, রুটি-কলা-ডিম-কালাকাঁদ...। সাদা প্লাস্টিকের কাপে কফি।

সেবাব্রত বলেন, 'সময় নষ্ট না করে, আসুন শুরু করা যাক। এমনিতেই আমরা লেট-এ চলছি।'

কথা ছিল, সবাই শেয়ালদা স্টেশন চত্বরে আসবে ভোর পাঁচটায়। সেখানেই মিনিবাস। হাসনাবাদ আটটা। ওখানেই লঞ্চ। সাড়ে আটটার মধ্যেই ওয়ার্কশপ শুরু। বাস্তবে হল না. কেউ কেউ, মানে অধিকাংশই স্টেশনে পৌছল পৌনে ছটা নাগাদ। সবাইয়ের বিলম্বের কারণ কিন্তু পৃথক। কোনো ষড়যন্ত্রের লেশ নেই এই বিলম্বে।

—আসলে, ছুটতে ছুটতে আমরা ক্লান্ত। তিন-চার রাউণ্ডের পর স্পিড কমে আসছে। লেট হচ্ছে রাউণ্ড কভার করতে।

—পৃথিবীও নাকি সামান্য স্লো হয়েছে? তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে নাকি আর পাক দিয়ে উঠতে পারে না?

সেবাব্রত বললেন, 'প্রায় এক ঘণ্টা লেট-এ চলছি আমরা। ব্রেক ফাস্ট খেতে খেতে শুরু করা যাক।'

যারা স্বভাব-গম্ভীর, তাদের নিয়ে ভাবনা নেই। ভারি ভারি গোলাকার মুখের অধিকারীরাও সহজে মুখখানাকে গম্ভীর করে ফেলতে পারে। বিপদ হয় কচিকাঁচাদের, জেনুইন ফিচেলদের। আর, কিছু মুখ রয়েছে যাদের সর্বদা মনে হয় বুঝি ঠোটের কোণে মুচকি হাসছে। ওদেরই হয়ে যায় জেনুইন বিপদ। বিশেষ করে, শ্রাদ্ধবাসরে, কনডোলেন্সে আর এই ধরনের গুরুগম্ভীর আলোচনা সভায়, যাকে বলা হয় 'ওয়ার্কশপ।'

বিপদভঞ্জন ভট্টাচার্য, বয়োজ্যেষ্ঠ কবি, প্রাবন্ধিক, গ্রন্থ-সমালোচক এবং আধুনিক গদ্যের গবেষক, সর্বদাই একটা 'সখী, ধরো ধরো' ভাব, মাঝেমধ্যে বিড়ি চেয়ে নিয়ে খান চপলা জুট মিলের যে শ্রমিকটির থেকে, তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল আজ বেরোবার মুখেই। নাইট শিফট সেরে ফিরছিল বেচারা, চোখ লাল, ক্লান্ত, অবসন্ন। তাও, শিক্ষকজ্ঞানে ট্যাক থেকে কৌটো বের করে এগিয়ে দিল বিড়ি, 'কোথায় চললেন এই কাগ-ভোরে?'

'ওয়ার্কশপে যাচ্ছি।' বিপদভঞ্জন বিড়ি ধরাবার ফাঁকে মিষ্টি হাসেন।

'ওয়ার্কশপ!' শ্রমিকটি ঈষৎ বিভ্রান্ত, 'আপনি কলেজে পড়ান না?'

—পড়াই তো। মাঝে মাঝে ওয়ার্কশপেও যাই।

—কেন? পার্ট টাইম?

'আরে না, না।' বিপদবাবু বোঝেন, ভ্রান্তিবিলাস ঘটেছে, 'এ ওয়ার্কশপ সে ওয়ার্কশপ নয়। এ অন্য ওয়ার্কশপ।' (এখানে ভারি ভারি যন্ত্রদানব নেই, ধোঁয়া নেই, দূষণ নেই, রাসায়নিক বিষ নেই, মালিকের ফোঁস নেই, ইউনিয়নবাজদের বার-বিলাসিনী ভাব নেই, সারাদিনের পরিশ্রমের অবসন্নতা নেই...এখানে প্রথম থেকেই ফাণ্টা, কফি, মাটন-স্টিক, সব কিছুই একেবারে ফ্যাণ্টা-স্টিক! ফুল, ধূপ, কিস্তিতে কিস্তিতে চা-কফি-ঠাণ্ডা, দিনে তিনবার গাণ্ডে-পিণ্ডে বুফে, সুদৃশ্য ফোল্ডার, ফোম-লেদারের হ্যাণ্ড-ব্যাগ, আর বিদায়কালে রেভিন্যু স্ট্যাম্পের ওপর সই এবং একটি সুদৃশ্য খাম প্রাপ্তি।) বিপদবাবু হাসেন, 'এ হল, কঠিন কঠিন বিষয় নিয়ে দিনভর রাতভর কঠিন কঠিন গলদঘর্ম আলোচনা, সমস্যা থেকে সমাধানে, উত্তরণে..., জান বেরিয়ে যায়!'

—জান বেরিয়ে যায়? শ্রমিকটির চোখেমুখে কৌতুক উপচে পড়ে।

—যায় না বুঝি? তোমার দশ বছর জেল হোক। বিনাশ্রম কারাবাস। দশ বছর খাবে-দাবে, আর বসে থাকবে ছোট্ট কুঠরিতে। যাবে? বলো?

বিপদবাবু ব্যাপারটাকে আর ইলাবোরেট করবার সময় পান না, শেয়ালদার ট্রাম এসে দাঁড়ায়। বিপদবাবু একলাফে চড়ে বসেন।

সেবাব্রতই শুরু করেন প্রারম্ভিক ভাষণ :

আমরা আজকের এই ভ্রমণের নাম দিয়েছি 'সম্প্রীতি-ভ্রমণ'। সারা দেশ জুড়ে আজ কেবল কালনাগিনীর নিঃশ্বাস। উগ্র সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত ছোবলে আমরা নী—ল হয়ে যাচ্ছি। চারপাশে শুধু হিংসা আর অবিশ্বাসের বাতাবরণ, অশুভ শক্তিগুলোর সুচতুর খেলা। দেশ তথা জাতির এই ঘোর দুর্দিনে আমরা, এ দেশের কবি-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীরা, নীরব দর্শক হয়ে থাকতে পারি না। এই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে আমাদের এক সুমহান ভূমিকা রয়েছে। সেই ভূমিকা পালনের তাগিদেই আজকের এই সম্প্রীতি-ভ্রমণ। এক সুমহান দায়িত্ববোধের দ্বারা তাড়িত হয়েই আজ আমরা ভেসেছি।

প্রশস্ত ডেকের একদিকটাকে মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। অবশিষ্ট পুরো ডেকখানাই অডিটোরিয়াম। সেবাব্রত যেখানে দাঁড়িয়ে বললেন, তাঁর ঠিক পেছনেই একটি সুন্দর পোস্টার; তাতে দুই সম্প্রদায়ের দুটি মানুষের স্কেচ। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দুটি অস্বচ্ছ মানুষ। ওপরে বড় হরফে লেখা : সম্প্রীতি-ভ্রমণ। তলায় ক্যাপশন: সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে চোখের মণির মতো রক্ষা করুন।

—ছবিটা দারুণ হয়েছে।

—হবে না? কে এঁকেছেন! হারুনদা। তবে তলার ক্যাপশনটা অন্য কিছু হলে ভালো হত।

—কেন? এটাই বা মন্দ কী?

—এটাও ভাল, তবে বড্ড চেনা ক্যাপশন। তথ্য-সংস্কৃতি দপ্তর বহুকাল ব্যবহার করছে হোর্ডিং-এ। বহু ব্যবহারে জীর্ণ।

সেবাব্রত বিরক্ত। একটা সভার মধ্যে তিন-চারখানা ছোট ছোট সভা। প্রব্লেম!

যা বলছিলাম, এক সুমহান দায়িত্ববোধের দ্বারা তাড়িত হয়ে, পীড়িত হয়ে, আজ আমরা ভেসেছি। আমরা আজ সারাদিন ধরে ভেসে বেড়াব। নদী-নালা, বনজঙ্গলে ঘেরা এই প্রত্যন্ত

এলাকা জুড়ে আমরা সম্প্রীতির বার্তাগুলি পৌঁছে দেব। নদীর ধারে ধারে অসংখ্য গ্রাম, জনপদ, মানুষ। আমরা তাদের কাছে এক সুনির্দিষ্ট বার্তা নিয়ে এসেছি। আজ দিনভর আমরা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নিয়ে আলোচনা করব, ভাব বিনিময় করব, গ্রাম জনপদগুলির কাছাকাছি পৌঁছুলে আমরা সমবেত কণ্ঠে গাইতে থাকব সম্প্রীতির গান। পাঠ করব দাঙ্গা বিরোধী কবিতা। চালিয়ে দেব দেশপ্রেমের গানের ক্যাসেট। প্রচার করব সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ভাষণ। আমাদের মধ্যে শিল্পী আছেন, গায়ক আছেন, কবি, গল্পকার, বক্তা, বুদ্ধিজীবী সকলেই আছেন। আসুন আজকের এই সম্প্রীতি-ভ্রমণকে আমরা সব অর্থে সফল করে তুলি।

—বাঘ দেখতে পাব তো?

সেবাব্রতর ভ্রূজোড়া নিমেষের মধ্যে কুঁচকে ওঠে। কিন্তু কথাটা যিনি বললেন, তিনি মণীশ তালুকদার, একজন স্বনামধন্য ঔপন্যাসিক, তাঁর ওপর রাগ করা চলে না, তাঁর কথাবার্তাই এমন। তাছাড়া, তাঁর অনেক ভক্ত আছেন এই লঞ্চেই।

'তাও পেতে পারেন, কপাল ভালো থাকলে।' খুব প্রশ্রয়ের হাসি হাসেন সেবাব্রত, 'আমাদের প্রিয় ঔপন্যাসিক বাঘ দেখতে চাইছেন। কিন্তু বাঘ তো শুধু জঙ্গলেই থাকে না। আমাদের মনের মধ্যে যে জঙ্গলখানা, তার মধ্যে যে বাঘটি অ্যাদ্দিন ঘুমিয়েছিল, রক্তের ঘ্রাণ পেয়ে সে জেগে উঠেছে। সারা জঙ্গলভূমি তোলপাড় করছে সে। সেই বাঘটিকে দেখতে হবে, চিনে নিতে হবে, মেরে ফেলতে হবে।'

—ক্লাস, ক্লাস! সেবাব্রতর এটাই বিউটি। খুব ভোঁতা তীরেও সে অনায়াসে লক্ষ্যভেদ করতে পারে।

...আমাদের আলোচনাকে আমরা তিনটি পর্বে ভাগ করেছি। এক, ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারা। দুই, সাম্প্রদায়িকতা নির্মূল করবার উপায়। তিন, কবি-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা। আমরা এখন প্রথম পর্বের আলোচনা শুরু করব। এই পর্বেব মূল বক্তা সুধীন সান্যাল, শেখ হায়দার এবং সত্য বাগচি। কো-অর্ডিনেটর হিসেবে থাকবেন আমাদের পরমশ্রদ্ধেয় বন্ধুবর শ্রী বিপদভঞ্জন ভট্টাচার্য।

—কো অর্ডিনেটর বলবেন? না কি মডারেটর?

—সাম্প্রদায়িকতার উৎপত্তিও ক্রমবিকাশের ধারা, এখানে 'বিকাশ' শব্দটি কি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হচ্ছে? বিকাশ খুব সদর্থক শব্দ। খুবই পজেটিভ।

—বিবর্তন কিংবা রূপান্তর বলা যেতে পারে।

—তাতে, বিকাশ কথাটা যে অর্থে আসে, সেই অর্থটা পাচ্ছে না। আমরা বলতে চাইছি, সাম্প্রদায়িকতা যে এক্সটেন্টে এবং ডিগ্রিতে বেড়ে চলেছে, এই বেড়ে যাওয়ার ব্যাপারটা—।

—সংক্রমণ শব্দটা কেমন? উৎপত্তি এবং সংক্রমণের ধারা—?

—ক্যাপশন নিয়েই পড়ে থাকব নাকি? বিষয়ের গভীরে ঢুকব না?

—ক্যাপশনটাই তো বিষয়। বিষয় স্থির না হলে কার গভীরে ঢুকবেন হারানদা?

—ক্যাপশনের মধ্যে বিষয়কে না খুঁজে, আসুন, আমরা প্রত্যেকের হৃদয়ের মধ্যে, বিবেকের মধ্যে তাকে খুঁজি।

—আমার মনে হয়, ক্যাপশন নিয়ে বেশি সময় নষ্ট না করে, আসুন, আমরা আলোচনা শুরু

করি। এগোতে এগোতে এক সময় ঠিকই বিষয়কে চিনে নেব।

—ঠিক। পথে—এবার—নামো—সাথী—, পথেই—হবে—এ পথ চেনা—।

—বন্ধ করলে কেন? শেষ করো গানটা। কী ভালো—!

—এই যে চা এসে গেছে। একপ্রস্থ চা খেয়েই না হয় শুরু হোক। ততক্ষণে সৈকতদা, গানটা শেষ করে ফেলুন। পথে-এবার-নামো-সাথী—।

তিন

আমি এই পর্বের কো-অর্ডিনেটর অথবা মডারেটর, যা-ই হই না কেন, আমার প্রথম প্রস্তাব হল, টিমে একজন মহিলা থাকলে ভালো হত না? মহিলাদেরও তো একটা রিপ্রেজেণ্টেশন চাই।

—(যা ভেবেছিলুম! বিপদদাকে নিয়ে এই হল বিপদ।)

—(যা বলেছেন! এই বয়সেও স্বভাবটা গেল না।)

—মেয়েরা গান করবে।

—এ কী রে! মেয়েরা শুধু কেন গান গাইবে? মেয়েরা আলোচনা করতে পারে না? আপনারা মেয়েদের কী ভাবেন ভাই?

—বিদিশাদি, শুধু শুধু চটছেন। আমি ওটা মিন করি নাই। আমি বলছিলাম, দায়িত্ব ভাগাভাগি হয়ে যাক, ভূমিকা সুনির্দিষ্ট হোক।

—যাকে বলে ডিভিশন অব লেবার।

—ইয়েস, লেবার অ্যাণ্ড পেইন।

—অ্যাই, কী অসভ্য রে!

—মণীশদাটা চিরকালই এমনি ফাজিল রে—।

—ভাগ্যিস লেখা দিয়ে মজিয়ে রেখেছেন, নইলে আমরা সব মেয়েরা মিলে পেটাতাম আপনাকে।

—শুধু শুধু চটছ সুন্দরীর দল। লেবার-পেইন বলিনি ভাই।

—বললেও কী, ওটার আর ডিভিশন চলে না। পারবেন ওটা শেয়ার করতে?

—এই যে, আমরা বড্ড অন্যদিকে চলে যাচ্ছি। সময় নিঃশব্দে গলে যাচ্ছে আমাদের আঙুলের ফাঁক দিয়ে, খরচ হয়ে যাচ্ছে পলে পলে। মণীশদা, প্লীজ।

—অ্যাই, চুপ চুপ। সেবাব্রত চটে যাচ্ছে। আফটার অল, হি ইজ আওয়ার চিফ কম্যাণ্ডাণ্ট! তাকে চটিয়ে লাঞ্চের মুরগীর ঠ্যাং এবং তৎসহ এটসেট্রা, এটসেট্রা হারাব না কি!

—ঠিক আছে, এই পর্বে চতুর্থ বক্তা থাকছেন বিদিশাদি। বিপদ, শুরু করো ভাই। আর কোনো সাইড-টক নয়।

—সুপ্রাচীন এই ভারতবর্ষে, সেই প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষ পাশাপাশি বাস করছে।...

—(দ্যাখো, প্রাগৈতিহাসিক কালেও আমাদের দেশে নাকি মানুষ ছিল, ধর্ম ছিল। বোঝ।)

—(শুনে যাও। দু'কান ভরে শুধু শুনে যাও।)

...তাদের চেহারা ভিন্ন, ভাষা, আচার, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য-পানীয়, শিক্ষা-সংস্কৃতি পৃথক। পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে, সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে বারে বারেই এসেছে, 'কত মানুষের ধারা/দুর্বার স্রোতে, এল কোথা হতে, সমুদ্রে হল হারা।/হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড়-চীন/শক-হুণদল, পাঠান, মোগল একদেহে হল লীন। যাকে বলে, বৈচিত্র্যের মধ্যে সুমহান ঐক্য। য়্যুনিটি ইন ডাইভারসিটি। যাকে বলে—। সেই সুমহান ঐক্যটি কবে হারিয়ে গেল, কেন হারিয়ে গেল, তার শিকড় খুঁজতে চাইলে, আমাদের ফিরে যেতে হবে আজ থেকে হাজার বছর আগে—।

– বিপদদা, আপনি মডারেটর। বক্তা নন।

—ডানদিকের গঞ্জটার নাম কী ভাই? ও মাঝি ভাই—।

—লঞ্চের ড্রাইভারকে মাঝি বলে না, সারেঙ বলে।

—গঞ্জটার নাম হিঙ্গলগঞ্জ বাবু।

—কত মানুষের বাস?

— এ দ্বীপে মুসলমান আছে?

—বাংলাদেশটা এখান থেকে কতদূরে সারেঙ ভাই?

—ওই তো দেখা যায় বাংলাদেশ।

—ওইটা? ও হিরন্ময়দা, কবিতাদি, ওই দেখুন বাংলাদেশ!

—ইস, কী সুন্দর লাগছে, তাই না? ওই দ্যাখ, মানুষ হাঁটছে। মানুষ!

—আমার মনে হয়, আমরা যদি বর্তমানের এই জ্বলন্ত সমস্যাটিকে ধরতে গিয়ে পুরো রমেশ মজুমদার ওগরাতে থাকি, তবে তিনদিনেও তার শেষ হবে না।

—এরপর গান আছে, কবিতা আছে। মণীশদার দাঙ্গাবিরোধী গল্প।

—আমরা বরং সমস্যাটাকে সরাসরি অ্যাটাক করি।

—খুবই অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলছি, গরম কিন্তু পইড়া গেছে, আর যেন লাঞ্চে কিংবা টিফিনে ডিম না দেওয়া হয়।

—আপনি কি এতক্ষণ চোখ মুদে ডিমে তা দিচ্ছিলেন নাকি মণীশদা? আমরা ভাবি, বুঝি কোনো দাঙ্গাবিরোধী গল্পের প্লট খেলছে মনে!

দু'পাশে শুরু হয়েছে খুব নিচু, অথচ ঠাসবুনোট অন্তহীন বন। এক সময় আমরা ইচ্ছামতী ছাড়িয়ে রায়মঙ্গলে পড়লাম।

হাওয়া বইছে উদ্দাম। স্বাতী মজুমদারের ঘাড় অবধি ছাঁটা চুল ফুরফুরিয়ে উড়ছে। নদীটা এখানে বিশাল চওড়া। অনেক সরু সরু নদী দু'পাশের বনভূমি চিরে, চলে গেছে এঁকেবেঁকে। নদীর দু'ধারে সুন্দরী, ক্যাওড়া আর গরান গাছের জঙ্গল, হেতাল গাছের ঝোপ। সুন্দরী গাছের মূলগুলো খুঁটির মতো ঠেলে উঠেছে মাটির ওপর। যেন নদীর পাড়ে পাড়ে শয়ে শয়ে খুটি পোঁতা রয়েছে, পাঁকের ওপর। ডিঙি নৌকাগুলো, সংখ্যায় অনেক, ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে পুরো নদীখানা জুড়ে। জাল পেতেছে জেলেরা। মাছ ধরছে।

—সুধন্যখালি কদ্দুর হে? তার আগেই শেষ করতে হবে সেমিনার। ওয়াচ-টাওয়ারে উঠে

বাঘ দেখতে হবে।

—মণীশদা খালি বাঘ-বাঘ করেই গেলেন।

—এর পরের উপন্যাসের নামটি কি 'বাঘ'?

সেমিনার চলছে। চারপাশের প্রকৃতি ক্রমশ উদোম হয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে নিজেকে। অডিটোরিয়ামের সেই ঠাসবুনোট ভাবখানা এখন অল্প ঢিলে ঢালা। উঠে গেছে অনেকেই। এরই মধ্যে এখানে-ওখানে চোরা-গোপ্তা পান করছে কেউ কেউ। ঢুলু-ঢুলু চোখ, গরম নিঃশ্বাস, বেশ উদারতা মাখানো মুখ...। লঞ্চের ধাক্কায় ফেনায়িত নদীর জল, ফেনায়িত বিয়ারের বোতল, সুন্দরী মহিলাদের সঙ্গে সামান্য ফষ্টিনষ্টি...। গ্রাম আসছে, গ্রাম।

ওই তো, ডাইনে পাতলা জঙ্গলের আড়ালে গ্রাম! কত মানুষ, হাঁটছে, চলছে, চাষ করছে মাঠে। গরু-বাছুর চরছে।

—ও সারেঙ ভাই, লঞ্চখানা একটু তীরের কাছাকাছি নিয়ে চলুন।

—এই, তোমরা শুরু করো গান।

—মাইকটা চালু করো হে—।

—বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান/তুমি কি এমনি শক্তিমা—ন!

—আমাদের ভাঙাগড়া তোমার হাতে এমন অভিমান/তোমাদের এমনি অভিমা—ন।

—বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল.../পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, হে ভগবান।

—বাঙালীর প্রাণ, বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন/এক হউক, এক হউক, এক হউক, হে ভগবান।

—...ধর্ম য—বে শঙ্খ র—বে করিবে আহ্বান/নীরব হয়ে, নম্র হয়ে পণ করিয়ো প্রাণ...।

—ওরে! এ গান গাস নে-রে! লোকে 'বিজু' ভাববে রে!

নদীর ধার ঘেঁষে লম্বা দহ। জোয়ারের জলে ভরে আছে। সেই জলে ছাঁকনি-জাল নিয়ে নেমে পড়েছে ডজন খানেক কিশোরী, মহিলা। জলে, কাদায় মাখামাখি। এতগুলি মানুষের সমবেত চিৎকারে মুখ তুলে তাকায়।

—গ্রামটার নাম কী গো?

—ঝামাখালি।

—কী ধরছ জাল দিয়ে?

—বাগদা। বাগদার বাচ্চা।

—বাগদা! কত্তোদিন খাইনি!

—সব কিছুই ধীরে ধীরে আমাদের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে।

—যাবেই তো। বিদেশে রপ্তানী হচ্ছে যে। ফোরেন এক্সচেঞ্জ!

—শুধু রবীন্দ্রনাথই কেন? নজরুলও গাওয়া উচিত।

—হ্যাঁ, নজরুলের 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার'খানা ফ্যান্টাস্টিক!

—ওই যে, ওই জায়গাটা, হিন্দু না ওরা মুসলিম, ওই জিজ্ঞাসে কোন জন!/কাণ্ডারী, বল ডুবিছে মানু—ষ, সন্তান মোর মার।

—ও সারেঙ-ভাই, এই গ্রামগুলো কি শুধু হিন্দুদের?

সারেঙ মাথা নাড়ে।

—শুধুই মুসলমানদের?

—দু'সম্প্রদায়ের মানুষই থাকে।

—দাঙ্গা হয় না?

—তেমন একটা হয় না। তবে মানুষ তো, মতিভ্রম হবেই। বিশেষ করে আপনেরা যখন শহরে লাগিয়ে দেন ঝঞ্ঝাট, গেরামে তার তাপ-উত্তাপ আসে বৈকি। এই তো, কিছুদিন আগে সামান্য কারণে ধুন্দুমার লেগে গেল।

—গ্রাম পেরিয়ে এসেছি আমরা। এবার আলোচনা শুরু হোক। সত্য কী বলছিলে, বল।

—এই, চলে আসুন সবাই। সেবাব্রত ডাকছেন। আলোচনা শুরু হচ্ছে।

—আসলে, আমার মনে হয়, সাম্প্রদায়িকতাকে নির্মূল করতে হলে, আমাদের দু'সম্প্রদায়ের ফোকগুলিকে আবার বাঁচিয়ে তুলতে হবে। কারণ, ফোকের মধ্যেই রয়েছে, প্রকৃত অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতার বীজ, বিশ্বভ্রাতৃত্বের প্রেরণা। বাংলার বাউল, লালন, সুফীবাদ—।

—আমার মনে হয়, সাম্প্রদায়িকতাকে দূর করতে হলে আমাদের আরও অনেক সহনশীল হতে হবে। বৃক্ষের মতো, ধরিত্রীর মতো সহিষ্ণু। কারণ—।

—আমি তো মনে করি, সাম্প্রদায়িকতাকে আমাদের দেশে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে আমদানি করা হয়েছে, লালন করা হয়েছে—।

—তথ্য এবং পরিসংখ্যান চাই।

—সাম্প্রদায়িকতা বলে আমাদের দেশে কিছুই থাকত না, যদি ৪৬-৪৭-এ আমরা একটা কাজ করতে পারতাম। যদি সমস্ত মুসনমানদের নিরাপদে সসম্মানে পাঠিয়ে দিতে পারতাম পাকিস্তানে, ফিরিয়ে আনতে পারতাম সব হিন্দুদের, তবে আজ আর এই জলন্ত সমস্যাটি আমাদের পদে পদে বেইজ্জত করতে পারত না।

—ঠিকই তো। ওদেশেও কোনো হিন্দু নেই, এদেশেও কোনো মুসলমান নেই। মাথা নেই তো মাথা-ব্যথাও নেই। কী ভালই না হত ব্যাপারটা! গল্পটিও ফুরোত, নটে গাছটিও মুড়োত।

—পরিহাসের কথা নয়। কথাটা ভেবে দেখুন একবার। যখন জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশটা ভাগই হয়েই গেল, তখন মানুষগুলোই বা এমন এলোমেলো ছড়িয়ে রইল কেন দু'দেশে? এ কেমন দেশভাগ! ইচ্ছে করে সমস্যার বীজটিকে রেখে দেওয়া হল কেন?

—শেখ হায়দর এ ব্যাপারে কী বলেন?

—এটা একটা কুযুক্তি। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা রুখতে এদেশকে যদি মুসলমানহীন করতে হয়, কিংবা বাংলাদেশকে হিন্দুহীন, তাহলে তো মাথার যন্ত্রণা হলে পুরো মাথাটাই কেটে ফেলতে হয়। আসলে, এদেশে, আমার মতে, সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসেবে হিন্দুদের যে উদারতা দেখানোর প্রয়োজন ছিল, যেভাবে ভাই বলে বুকে টেনে নেবার দরকার ছিল, মুসলিমদের প্রতি হিন্দু সম্প্রদায়ের একটা অংশ তা করেননি।

—তথ্য ও পরিসংখ্যান কিন্তু তা বলে না, হায়দার ভাই। আপনাদের জন্য আমরা অন্য আইন রেখেছি। এখনও চারটে বিয়ে করায় বাধা দিইনি। কাশ্মীরে তো আপনারা প্রিভিলেজড

ক্লাস। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে বাস করেও আপনারা এখনও আপনাদের ধর্মীয় আইনে চলতে পারেন। পাকিস্তান জিতলে বোমা ফাটাতে পারেন।

—আমি যদি বলি এর ফলেই সাম্প্রদায়িকতা বাড়ছে! একটা বিশেষ কম্যুনিটিকে, হোক না তারা মাইনরিটি, দিনের পর দিন, সুযোগ-সুবিধে দিলে অন্য কম্যুনিটি তো চটবেই! শুধু ভোটের রাজনীতি করতে গিয়ে আমাদের নেতারা যে হারে মাইনরিটি তোষণ করছেন—।

—আমরা কিন্তু আমাদের আলোচনায় মৌলবাদের ব্যাপারটাকে এড়িয়ে যাচ্ছি।

—এড়িয়ে যাব কেন? ওর থেকেই তো মৌলবাদ শক্তি সঞ্চয় করে। দু-সম্প্রদায়ের মানুষ যদি রাষ্ট্রীয় নীতির দোষে পরস্পরের চোখের বালি হয়ে পড়ে, তখনই দুই সম্প্রদায়ের মৌলবাদীরা নড়েচড়ে বসে। তবে এটাও ঠিক, মৌলবাদের বিরুদ্ধেও আমাদের কশেরুকা টানটান করে এগোতে হবে।

—কশেরুকাটি কী বস্তু, ব্রাদার?

— জানিনে। ডাক্তারি তো পড়িনি। শরীরের অ্যানাটমিটা তাই জানা হল না ঠিক ঠিক। ভারী স্বপ্ন ছিল, ডাক্তার হব। তিন নম্বরের জন্য জয়েন্ট এনট্রান্সে ছিটকে গেলাম। তবে স্ট্রং কমন-সেন্স থেকেই বলতে পারি, মেরুদণ্ডের হাড় কিংবা মাস্‌ল্‌ হবে। ওটা টানটান করে এগোবার কথাই যখন উঠেছে—।

—সাইড-টক করছেন কেন সুধীনদা? এমন একটা সিরিয়াস বিষয়।

—ভেরি সরি, সেবাব্রত। আসলে আমি একটা স্বপ্নের কথা বলছিলাম।

—আমরা কিন্তু শেখ হায়দরকে বলতে দিচ্ছি না।

—আরে, বলুন বলুন, হায়দার ভাই।

—বলছিলাম, পরস্পরের দোষ নিয়ে উতোর-চাপান চালালে আমরা মূল সমস্যাটাকে ধরতে পারব না। আসল কথাটা হল, আমার যা মনে হয়, এ দেশের অনেক মুসলমানই মনে করেন, ধর্ম-নিবপেক্ষতার নামে এদেশের সংখ্যা-গরিষ্ঠ হিন্দু-নেতারা ছদ্ম-হিন্দুত্বকেই প্রশ্রয় দিয়েছে রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকর্মে।

—তথ্য দিন। পরিসংখ্যান।

—ধরুন ওই সংগীত, সুজলাং সুফলাং ইত্যাদি ইত্যাদি, সেখানে আপনাদের ধর্মেরই ভাষা, অর্থাৎ, সংস্কৃত। সেখানে দেব-দেবীর উল্লেখ। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এতে দুঃখ পেতে পারে। তারপর ধরুন, অশোকস্তম্ভ, অশোক চক্র, সত্যমেব জয়তে...।

—হারানদা বসে বসে অত মনোযোগ সহকারে কী লিখছেন? আলোচনার নোট নিচ্ছেন নাকি?

—হারানদা কবিতা লিখছেন।

—কবিতা নয় রে ভাই, ছড়া লিখত্যাছি। লিখতে লিখতে আটকাইয়া গেছি। 'আস্ফালন'-এর সঙ্গে কী মিল দেওয়া যায় বল তো?

—আবার ছড়াও লিখছেন হারানদা! গল্প কবিতা, তার ওপর ছড়াও! আর কত দিগন্ত জয় করবেন আপনি!

—হাঁস-পালন।

—দারুণ! অন্ত্যমিলে এখনও প্রবীর চট্টরাজের পাশাপাশি আসা মুশকিল!

—একেবারে, যাকে বলে, মিল-মালিক।

নদীটা দু'ভাগ হয়েছে সামনে। একটা দ্বীপই ঘটিয়ে দিয়েছে এই ব্যবচ্ছেদ। সবুজ দ্বীপটা যেন আমাদের পথ আগলে দাঁড়িয়েছে।

—সামনের দ্বীপটার নাম কী, সারেঙ ভাই?

—মরিচঝাঁপি।

—এই দ্বীপটাই মরিচঝাঁপি! একে নিয়েই এত কাণ্ড!

—তুমি বললে, দণ্ডকে নয়, এই দেশেতেই চাই/আমি বললে ভণ্ড, কেবল লোক খেপাবার চাঁই/...চোখের সামনে ধুঁকছে মানুষ, উড়িয়ে দিলে টিয়া/ তুমি বললে গণতন্ত্র, আমি প্রতিক্রিয়া। —শঙ্খদা।

—মরিচঝাঁপি নিয়ে আমারও একখানা কবিতা রয়েছে। 'কম্বুকণ্ঠ'তে বেরিয়েছিল।

—আর এক রাউণ্ড চা হলে হত না? সেমিনারে, ওয়ার্কশপে ঘনঘন চা না হলে ঠিক জমে না।

—ঠিক। বুদ্ধির গোড়ায় লিকুইড-ম্যানিওর।

—আপনার বনসাইগুলো কেমন আছে?

—ওই একরকম। দেখভাল করবার সময় পাইনে আজকাল। পুজোর লেখা লিখতেই হিমসিম।

—বনসাই নিয়ে একখানা উপন্যাস লিখুন। জমে যাবে।

—ব্যাপারটা খুব বোর করছে আমাদের, নয় কী? আসলে, সমস্যাটা তো আমরা সবাই জানি। এ নিয়ে আর অত কচকচানীর দরকার কী? কৃমিকে বিষ্ঠার স্বাদ বোঝাতে যাওয়া বাহুল্যমাত্র। তার চেয়ে, সমাধানের উপায় নিয়ে ভাবা যাক।

—আপনিই বলুন।

—মুরগিটা খুব জমিয়েছে মনে হচ্ছে। যা খুশবু ছেড়েছে।

—নৌকোয় রান্নাবান্না করে খাওয়ার মজাটাই আলাদা। সাধারণ রান্নার স্বাদও এমন বদলে যায়! একবার নৌকোয় চড়ে গঙ্গায় ভেসেছিলুম, মুর্শিদাবাদের ওদিকে। সে কি দারুণ অভিজ্ঞতা! নদী থেকে টাটকা মাছ উঠল, বাটা, আড়...। বাটাগুলোকে সরষে, কাঁচা-লঙ্কা দিয়ে, আর কালোজিরে ফোড়ন দিয়ে আড়মাছের টলটলে ঝোল। মোটা চালের ভাত, তার সঙ্গে গরম গরম ঝোল, চারপাশে গাঁ-গঞ্জ, ক্ষেত, মাথার ওপর ঝকঝকে নীল আকাশ, তার তলায় খেতে বসলুম আমরা। উহ, সে স্বাদ এখনও লেগে রয়েছে জিভে। সমরেশ কী করে 'গঙ্গা' লিখেছিলেন, বুঝতে পারি খানিকটা।

—এই সমস্যার সমাধান লুকিয়ে রয়েছে তিনটি জিনিসের ওপর। এক, দেশের আইন এবং সুযোগ-সুবিধায় কোনো বৈষম্য রাখা চলবে না। দুই, মুসলমান ভাইদের ভাবতে হবে, তাঁরাও এই দেশের মানুষ। তাঁরা ভারতেরই নাগরিক, পাকিস্তান কিংবা বাংলাদেশের নয়। তিন, মাইনরিটিকে নিয়ে ভোটের খেলা বন্ধ করতে হবে নেতাদের।

—বন্ধ করতে হবে আরও একটা জিনিস। মুসলিমদের বহু বিবাহ। বহু বিবাহের ফলে ওরা

সংখ্যায় হুহু করে বেড়ে যাচ্ছে, হিন্দুরা তো এই ভয়েই মোলো!

—তথ্য আর পরিসংখ্যান কিন্তু তা বলে না বটব্যালটা।

—সেই জন্যই তো পরিসংখ্যানকে 'গাধা' বলা হয়। মানুষ সাদা চোখে দেখছেটা কী?

—আমরা কিন্তু মৌলবাদীদের নিয়ে বড্ড কম বলছি। এই যে মসজিদটা দুম করে ভেঙে দিল—!

—লজ্জা! বিশ্বের কাছে আমাদের মাথা হেঁট হয়ে গেছে।

—অবশ্যই লজ্জা। কিন্তু সমস্যাটা ওখানেই কেন্দ্রীভূত নেই। মন্দির-মসজিদ ভাঙাটা নতুন কিছু নয়। সেই বাবরের আমল থেকে চলছে।

—তারও আগে থেকে। হিন্দুরাও বৌদ্ধ মন্দির ভেঙেছে।

—যা হোক গে, ব্যাপারটা নতুন কিছু নয়। আজও কথায় কথায় পাকিস্তানে, বাংলাদেশে আকছার মন্দির ভাঙা হয়। সমস্যাটা হল—।

- -আমার মনে হয়, মন্দির মসজিদ বলে কিছু রাখাই উচিত নয়। গম্‌মেন্ট এক্ষুনি ওগুলোকে টেক-ওভার করে সংস্কৃতিকেন্দ্র বানিয়ে দিক।

—কোন সংস্কৃতিকেন্দ্র, ভায়া?

—কেন? ভারতীয় সংস্কৃতি।

—ভারতীয় সংস্কৃতি মানেই তো ভাঁজে ভাঁজে, পরতে পরতে, ছদ্মবেশে হিন্দু-সংস্কৃতি।

—এখন তবে লাঞ্চের ব্রেক। এক ঘণ্টা। তারপর আমরা দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বের আলোচনা শুরু করব।

—গান আর কবিতাপাঠ কখন হবে?

—হবে, হবে। আগে তো খাওয়া-দাওয়াটা চুকুক।

লাঞ্চের আয়োজন দেখে পরম প্রীত হলেন সবাই। সেবাব্রতর সাংগঠনিক ক্ষমতার প্রশংসা করা হল মুক্তকণ্ঠে। বুফে সিস্টেম। সবাই নিজে নিজে তুলে নিচ্ছেন খাবার। ঘুরে ঘুরে খাচ্ছেন। যাঁরা একটু বেশি পান করে ফেলেছেন, তাঁরা ঢুলু ঢুলু চোখে আকাশ দেখছেন, বাতাস দেখছেন, নদী-জঙ্গল দেখছেন। এরই ফাঁকে কেউ কেউ এখানে-ওখানে একটু-আধটু ইকুয়েশন সেরে নিচ্ছেন। ছোটখাটো জনসংযোগ। আগামী ফাংশনে গান গাওয়া, ছবির প্রদর্শনীর স্পনসরশিপ, সদ্য প্রকাশিত বইয়ের রিভিউ, লেখা ছাপানো কিংবা গ্রন্থ প্রকাশ নিয়ে প্রাথমিক কথাবার্তা, সুযোগ বুঝে কাছে চলে আসা, অপ্রয়োজনীয়জ্ঞানে দূরে সরে যাওয়া। স্বাতী মজুমদার প্লেট নিয়ে চলে গিয়েছেন ডেকের অন্যপ্রান্তে, লেপ্টে দাঁড়িয়েছেন পঞ্চাশোর্ধ্ব হারান দত্তর গায়ে। ইদানিং হারান দত্ত স্বাতী মজুমদারের কবিতায় ম্যাজিক-রিয়েলিটি আবিষ্কার করেছেন, তাই নিয়ে লিখছেন এখানে-ওখানে।

মুরগির ঠ্যাং থেকে এক খাবলা মাংস টেনে নিয়ে চিবোতে চিবোতে হাসলেন হারান দত্ত। স্বাতী বলে, এমন ঝকঝকে হাসেন কী করে, বলুন তো?

হারান দত্তর তিনটি দাঁত বাঁধান। আলাদা আলাদা নয়, এক গুচ্ছেই তিনটি। ওই অঞ্চলে বুঝি আটকে গিয়ে থাকবে মাংসের কুচি, হারান দত্ত 'উজ্জ্বল হাসি তো?' বলেই আধ খাওয়া ঠ্যাংখানা

রাখেন প্লেটের উপর। তারপর তিন-দাঁতের গুচ্ছটিতে সবলে টান মারেন। মাংসের কুচিগুলো খুব দক্ষ আঙুলে সাফ করতে করতে তাকান স্বাতী মজুমদারের দিকে। ফিক করে ফোকলা হাসি হেসে বলেন, কী দ্যাখস?'

'এ-মা, হারানদা, আপনার তিনটে দাঁত বাঁধানো?' স্বাতীর চোখে বিস্ময়, কৌতুক, সামান্য স্বপ্নভঙ্গও বুঝি।

মাড়ির সঙ্গে দাঁত তিনটিকে খট করে চেপে দিয়ে আবার হাসেন হারান দত্ত, 'ইয়ার নামই ম্যাজিক-রিয়েলিটি, বুঝলা?'

চার

দ্বিতীয় পর্বের আলোচনাচক্র ঠিক সময়ে শুরু করা গেল না। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক বাদে যখন শুরু হতে চলেছে, সেই সময়েই গ্রামের দিক থেকে ভেসে এল কোলাহল।

নদীর পাড় ধরে রাস্তা। রাস্তার ওপারে প্রায় আধমাইল দূরে গ্রাম। মধ্যিখানে গাছপালা, ক্ষেত..। হাওয়ায় ভেসে আসছিল বহু মানুষের চিৎকার।

—কী হয়েছে সারেঙ ভাই? চিৎকার কেন?

—বাঘ পড়ল নাকি? এখানে বাঘেরা তো হঠাৎ হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়ায়।

—কোনো রাজনৈতিক লড়াই-ফড়াই নয় তো? ফসল কাটা নিয়ে, কিংবা জমির দখল নিয়ে দু দলের মধ্যে সংঘর্ষ?

—ওই দ্যাখো, গ্রাম থেকে পিল পিল করে ছুটে আসছে মানুষ। ওই দ্যাখো, লাঠিসোঁঠা নিয়ে দৌড়চ্ছে সবাই।

পাঁইপাঁই সাইকেল চালিয়ে নদীর পাড় ধরে উর্ধ্বশ্বাসে চলেছে এক ছোকরা, উদভ্রান্ত চেহারা তার, দু-চোখের মণি জুড়ে আশঙ্কা, অতদূর থেকেও মালুম হয়।

— কী হয়েছে ভাই? ও ভাই—?

—দাঙ্গা বেঁধেছে!

ছোকরা নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায় পাতলা গাছ-গাছালির আড়ালে।

—দ্যাখো কাণ্ড! বলতে বলতেই দাঙ্গা! যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধে হয়।

—সেবাব্রতবাবু, কোথায় গেলেন? ওই দেখুন দাঙ্গা বেধেছে।

—সেবাব্রত বোধকরি এখনও মুরগির হাড় চিবোচ্ছে?

—বাজে বকবেন না ভাদুড়িদা। সেবাব্রত বহুক্ষণ আগেই আঁচিয়ে ফেলেছে। ইনফ্যাক্ট, কিছুই খেতে পারেনি বেচারা।

মাঠের মধ্যে কোলাহলটা ক্রমশ বাড়ছে। একদল অন্যদলকে তাড়া করছে। কিছু দূরে দুটো ছোট্ট দলের মধ্যে মুখোমুখি লড়াই বেঁধে গিয়েছে। কে আক্রমণকারী, কে আক্রান্ত, বোঝা যাচ্ছে না।

—মনে হচ্ছে হিন্দুদের গ্রাম, আক্রমণ করছে মুসলমানরা।

—কী করে বুঝলেন? আপনি গুনতে জানেন?

—নাহ্, এমনিই মনে হল।

—এমনিই মনে হল? স্ট্রেঞ্জ! আমার তো মনে হচ্ছে, আপনার পাইল্‌স্‌ আছে।

—পাইল্‌স্‌! আমার! কী করে বুঝলেন?

—এমনি, মনে হল!

—এ আপনার রাগের কথা।

—আর ওটা বুঝি আপনার অনুরাগের কথা?

—আহা-হা ঝগড়া করবেন না। মানুষের সঙ্কটের সময়। এ সময় নখে-দাঁতে ঝগড়া করে না।

—ঝগড়া নয়। এটা একটা মানসিকতার ব্যাপার। মুখে তড়পালেই সেকুল্যার হওয়া যায় না।

—দাড়ি কামিয়ে ফেললেই সেকুল্যার হওয়া যায়?

—থামুন, থামুন, করছেনটা কী? দেখছেন না, মানুষ আত্মঘাতী লড়াইতে নেমেছে?

—দেখুন, দেখুন, সেবাব্রত, আপনি তো ছিলেন না, সামান্য কথায় কী অপমানটাই না করলেন হিরন্ময়বাবু!

—চুপ করুন, চুপ করুন। এ সময়ে ঝগড়া করে না।

—ছোকরাটা সাইকেল চালিয়ে কোথায় গেল?

—থানায় যেতে পারে!

—অন্য গাঁয়ে জাতভাইদের খবর দিতেও যেতে পারে।

—তাহলে তো দাঙ্গা আরও ছড়িয়ে পড়বে।

—আসুন, সবাই মিলে সম্প্রীতির গান গাই।

—দুর মশাই, গান এখন কাজ করবে না।

—এখন চাই মেশিন-গান। এ-কে-৪৭ কিংবা ৫৬।

দূরে, মাঠের মধ্যে মানুষগুলো কিলবিলিয়ে লড়ছে। পুতুল-পুতুল লাগে অদ্দুর থেকে। মাঠের মধ্যে যেন পুতুল-নাচ চলছে। পেছনে গাছ-গাছালি, গাঁ, আকাশ, যেন প্রেক্ষাপট। ব্যাক-সিন। লড়াইটা চোত-বোশেখের আগুনের মতো হু-হু করে বেড়ে যাচ্ছে। ছড়িয়ে পড়ছে মাঠময়। মাঠের মধ্যে লুটিয়ে পড়ছে কেউ কেউ। কেউ বা উর্দ্ধশ্বাসে পালাচ্ছে।

—দেখুন, দেখুন, দাড়ির সংখ্যাই বেশি।

—দাড়ি মানেই কি মুসলমান?

—আমি তা বলিনি!

—আপনি কিছুই বলেননি!

—চুপ করুন আপনারা। ঝগড়া বন্ধ করুন। এখন সংঘবদ্ধ হওয়ার সময়। মানুষ মরছে, দেখছেন না?

—এমন লড়াই আর কিছুক্ষণ চললে, দু-পক্ষের বহু মানুষই হতাহত হবে।

—তার চেয়েও বড় কথা, দাঙ্গাটা ছড়িয়ে পড়তে পারে চারপাশের গাঁয়ে।

—তাহলে? কিছু একটা করুন। এতগুলো মানুষ আমরা, নীরব দর্শক হয়ে তো থাকতে পারিনে। উই কান্ট।

—কিন্তু আমরা কী করব? কী করতে পারি? আমরা তো এখন গভীব জলের মধ্যে বন্দী!

'তো, কী হয়েছে?' এগিয়ে আসেন সেবাব্রত, সবাইয়ের মাঝখানে এসে দাঁড়ান, 'মানুষ মরছে, আর সামান্য একটুখানি জলের ভয়ে আমরা লঞ্চের মধ্যে চুপ করে চুড়ি পরে বসে থাকব?'

'সামান্য নয়, সেবাব্রত।' ওঁর কাঁধে হাত রাখেন সুধীন সান্যাল, 'আমাদের থেকে পাড়ের দূরত্ব কম করেও পাঁচশো গজ, মানে, রাফলি ওয়ান-থার্ড অফ আ মাইল। দু'ধারেই সারি সারি জাল পেতে রেখেছে জেলেরা। পাড়ের দিকে লঞ্চ ভেড়াবার উপায় নেই। নদীতে এখন গভীর জল। জোয়ারের সময় এটা। আর, সুন্দরবনের নদীতে কুমির, কামট, এসবের কথা তো আপনাকে বলতে লাগবেই না।'

'স্টপ ইট, স্টপ ইট।' দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলতে থাকেন সেবাব্রত। চোখদুটো লাল হয়ে উঠেছে ক্রুদ্ধ ষাঁড়ের মতো, 'যত সব লেম-একস্‌কিউজ! অলস এবং সেলফিস্‌দের এস্‌কেপিজ্‌ম। বাঘ কোথায় নেই? কুমির কোথায় নেই? জল কোথায় নেই? তা বলে সব থেমে থাকবে? মানুষের বিপদে মানুষ ছুটে যাবে না? ঝাঁপিয়ে পড়বে না?'

—কী ভাবে ছুটে যাবেন? বলুন না। ইমোশন্যাল হলে তো চলবে না।

—'এই যে, বিপদ এসে গেছে, আর চিন্তা নাই—।' বলতে বলতে সেবাব্রত ওঁর দিকে দু'পা এগোন।

বিপদবাবু বুঝি গুরু ভোজনের পর, কেবিনে গিয়ে একটু গড়িয়ে নিচ্ছিলেন। চেঁচামেচি শুনে এই মাত্তর সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে এলেন। ওঁকেই সাক্ষী মানেন সেবাব্রত, 'এই যে বিপদ, তুমিই বলো না। জল কোথায় পাই? কুমির কোথায় নেই? বাঘ কোথায় নেই? তা বলে মানুষ থেমে থাকবে? মানুষের সঙ্কটে মানুষ ছুটে যাবে না? ঝাঁপিয়ে পড়বে না? আমি—আমি—আমি' বলতে বলতে প্রতিজ্ঞায় কঠিন হয়ে আসে সেবাব্রতর মুখ, 'আমি ঝাঁপ দেব। আমি সাঁতরে পার হয়ে যাব নদী। আমি দেশমায়ের ডাকে দামোদব সাঁতরে পার হব।' সেবাব্রত তাকালেন ঘিরে থাকা মানুষগুলোর দিকে, 'কে কে ঝাঁপ দিতে চান আমার সঙ্গে? কে কে মানুষের সঙ্কটে ঝাঁপিয়ে পড়বার সাহস রাখেন? কে—কে—?'

সবাই পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। তাই দেখে ঘৃণায় তাচ্ছিল্যে বেঁকে যায় সেবাব্রতর মুখ, 'কাওয়ার্ড! কেবলই বড় বড় কথা! ফুর্তি মারতে এসেছে, বলে কিনা, সম্প্রীতি-ভ্রমণ! কাগজে খবর বেরোবে? ফটো ছাপবে? ল্‌ক, কাওয়ার্ডস ডাই মেনি টাইম্‌স বিফোর দেয়ার ডেথ। ঠিক হ্যায়। আমিই ঝাঁপ দে. । একাই ঝাঁপ দেব। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চল রে।'

—সেবাব্রত, কী করছ এসব? তোমার ওপর পুরো টিমের দায়িত্ব। এতগুলি মহিলা রয়েছেন টিমে। তুমি এমন করলে চলে?

কিন্তু কারও পরামর্শ, সদুপদেশ শোনাব মতো অব ্য়ে তখন সেবাব্রত নেই। খোলা ডেকের ওপর তিনি ভীষণ টলোমলো। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন না। চোখ খোলা রাখতে পারছেন না। জিভ জড়িয়ে আসছে। এই মুহূর্তে কারও প্রতি, কোনো কিছুর প্রতিই দৃষ্টি নেই ওঁর। শুধু অস্ফুট গলায় বিড় বিড় করে চলেছেন, 'আমি ঝাঁপ দেব—ঝাঁ-প দে-ব—।'

—আঁতলামোর একটা সীমা আছে!

—সিম্পল আঁতলামো হলেও কথা ছিল। এ হল, ম-কার যুক্ত আঁতলামো, যাকে বলে, মাতলামো।

—খুব টেনেছে। একেবারে বেহেড হয়ে গেছে।

—টানবে না? বোতলগুলো তো ওরই কাস্টডিতে ছিল।

—সত্যি, এ যুগে রক্ষক মানেই ভক্ষক! এটা একটা ন্যাশন্যাল প্রব্লেম মাইরি।

—এর ওপরই একটা সেমিনার হওয়া উচিত।

—ইয়েস। এবং নদীবক্ষে।

—এবং প্রেফারেবলি, শীতকালে। পাখি-টাখি আসে।

সেবাব্রত টলতে টলতে এগোতে থাকেন সন্তোষ ভাদুড়ির দিকে। সামান্য তফাতে ডেকের কিনারে একা একা দাঁড়িয়ে একমনে চুরুট টানছিলেন তিনি। পাশটিতে গিয়ে ওঁর ঘাড়টাতে থাবড়া মারেন সেবাব্রত। জড়িয়ে জড়িয়ে বলেন, 'ভাদুড়িদা, আমি কিন্তু ঝাঁপ দিচ্ছি।'

'দাঁড়াও ব্রাদার—।' স্প্রিংয়ের মতো ছিটকে সরে আসেন ভাদুড়ি, 'আমি দূরে সরে যাই। নইলে পুলিশ হয়ত তদন্তের সময় ভেবে বসবে, আমিই তোমাকে কায়দা করে ল্যাং মেরে ফেলে দিইচি। এমনিতে তো সবাই আড়ালে বলে, আমি নাকি ল্যাং মারতে ওস্তাদ!'

পক্ষীবিলাস

প্রতিটি ঋতুর একটা আলাদা সৌন্দর্য আছে। বর্ষার সবুজ সজীবতা, শরতের শিউলি, পালতোলা সাদা মেঘ আর কাশফুল, হেমন্তের শিশির আর ধানের শিষ...। আর বসন্তের তো জবাব নেই। সে তো ঋতুর রাণী। শীত এদেশে রিক্ততার প্রতীক। তা হোক, রিক্ততারও একটা আলাদা সৌন্দর্য আছে। মহিমা। হে দারিদ্র্য তুমি মোরে করেছ মহান ..। পত্রহীন গাছগুলিকে মনে হয় সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। কেমন অবলীলায় সমস্ত পাতা ঝরিয়ে দিয়ে নিজের মধ্যে ঢুকে পড়ে বুঁদ হয়ে যায়। আমরা তো একটি পাতাও ঝরাতে পারিনে সারা জীবনের সাধনায়। ভোগের একটিমাত্র দরজা বন্ধ করতে হলেও আমাদের বুক ফেটে যায়। অথচ, জান তো, গাছের প্রতিটি পাতা ভোগের এক একটি প্রশস্ত দরজা। শীত কালই শাশ্বত ভারতের আত্মা।

এই পর্যন্ত বলে সুধেন্দু একখানা সিগারেট ধরালেন।

সামনে প্রশস্ত বেলাভূমি। তার ওপারে মগ্ন সমুদ্র। এতক্ষণ দূরে, একবারে নাগলের বাইরে ছিল। জোয়ারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ কাছে আসছে। চৈতী, বুবুন, মৌ—সব ওইখানে আছে। জোয়ারের জলে অনেক ঝিনুক ভেসে আসে। এখন ঐ নিয়েই মেতে রয়েছে। বারণ করলে শুনবে না। বারণ করবার দরকারই বা কী? সমুদ্রের সঙ্গে খেলছে ওরা।

ভীষ্ম বলল,'শীত তো খুবই ভাল ঋতু। তোমার এই আত্মা-ফাত্মার জটিলতায় না গিয়েও বলা যায়, বেশ প্যালেটেবল। অন্যগুলোও ফ্যানটাস্টিক। তুমি যা যা বলেছ, এগ্রিড। কিন্তু আমি বলছিলাম এই গরমকালটার কথা। না থাকলেই ভালো হত। কাবাব মে হাড্ডি।'

ভীষ্মর কথা বলার ধরনটাই এমন। মেদহীন চাঁচাছোলা শরীর। ভারী কথাটাকে হালকা করে দেয় তরল ভাষার প্রয়োগে। প্রচুর জল মিশিয়ে মদ খায়। বলে, ড্রিঙ্ক মিনস থ্রি ডি'জ। ডাইলুশন, ডায়েট অ্যান্ড ডিলে। সুধেন্দু স্মিতহাস্যে ওর এই তারল্যকে মাফ করে দিলেন। বললেন, ভুল। গ্রীষ্মেরও একটা ভয়ঙ্কর সুন্দর রূপ আছে। বাইরে থেকে যাকে ভৈরব, রুদ্র মনে হয়, ওটা হল তপঃক্লিষ্ট তপ্ত তনু। আসলে, গ্রীষ্মকালও সন্ন্যাসী। শীতের মতোই। শীত হল স্নিগ্ধ সন্ন্যাসী, আর গ্রীষ্ম হল, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি, দীপ্তচক্ষু এক শীর্ণ সন্ন্যাসী। যাই বল, আমার কাছে বাউল গ্রীষ্মেরও কোনো জবাব নেই।

'বটেই তো।' ভীষ্ম ফুট কাটে, 'নইলে এই আকাট গরমে বউ-ছেলে নিয়ে বেড়াতে আস? নেহাত সমুদ্রের কাছে এসেছ, তাই রক্ষে, নইলে—। তাও বলি, এমন ভর-দুপুরে কেউ ঘরের বাইরে বেরোয় না। সমুদ্রের ধারে হলেও, না। বাপরে, গা জ্বলে গেল।'

সুধেন্দু গেলাসের শেষ পানীয়টুকু শেষ করে, গেলাসখানা এগিয়ে দিলেন ভীষ্মের দিকে। বললেন, 'এই তো ভুল করলে। দিনের প্রতিটি প্রহরের আলাদা সৌন্দর্য ও উপভোগ্যতা

রয়েছে। আমার তো মনে হয়, এ দেশের প্রতিটি দিনের মধ্যেই ছয় ঋতুর খেলা চলে প্রহরে প্রহরে। দুপুরটা হল গ্রীষ্ম। সত্যি বলতে কী, আমার এও মনে হয়, ভারত এক আশ্চর্য দেশ। এই সব কারণেই মনে হয়।

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন সুধেন্দু—চলো, ঝাউ বনে বসে থেকে লাভ নেই। আমরা জলের দিকে এগোই। জোয়ারের দিকে। ওর কাছেই তো এসেছি।

পায়ে পায়ে এগোলেন সুধেন্দু। সামান্য টলোমলো পা। শুধরে নিলেন। মদ খেয়ে কখনও মাতাল হন না সুধেন্দু। ভুল-টুল বকেন না। তবে সারা মুখ লাল হয়ে ওঠে। চোখ দুটি আরও ভাসাভাসা। হাসিখানি আরও ভরাট। ঠোঁট দুটির ফাঁক গলে ঝরে ঝরে পড়ে আহরণযোগ্য শব্দগুচ্ছ। খুব মুডি হয়ে ওঠেন সুধেন্দু। সামান্য হেসে বলেন, 'খুব ভালো লাগছে'। এমনই করেন মদ খেলে।

হাঁটতে হাঁটতে সহসা থমকে দাঁড়ালেন সুধেন্দু। পাঞ্জাবীর কোনা দিয়ে চশমার পুরু কাঁচ মুছলেন। সামনে তাকালেন মুগ্ধ ভরাট চোখে। নৌকাগুলো এখন অনেক কাছাকাছি। নৌকোর আরোহীরাও অনেক স্পষ্ট। জীবন্ত। বিশ্বাসযোগ্য। ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন সুধেন্দু। নির্বাক তাকিয়ে রইলেন।

ভীষ্ম বলল, 'দাঁড়ালেন যে?'

একটু সময় নিয়ে জবাব দিলেন সুধেন্দু, 'দেখছি।'

ভীষ্ম বুঝল, সুধেন্দু মজে গেছেন। এখন আর ওঁকে নড়ানো যাবে না। ওই টানেই তো এই ভর-দুপুরে লজ ছেড়ে, আধ মাইলটাক চাঁদি-ফাটা রোদে হেঁটে এই ঝাউবনে এসে বসে রয়েছেন। ভীষ্ম অনেক কাকুতি মিনতি করেছিল। সমুদ্রে দেড় ঘণ্টা ঢেউ ভেঙে, হোটেলে দই-ইলিশ আর চিকেন সহযোগে ভরপেট ভাত খেয়ে শরীর যেন এলিয়ে পড়ছিল।

বলেছিল, এখন একটু ঘুমোই, সুধেন্দুদা। যা গরম বাইরে! ঝলসে দেবে। বিকেল পড়লে না হয়—।

—আরে না, না। তখন গিয়ে হবেটা কী? সি-বিচে গিজগিজ করবে মানুষ। নৌকোগুলোও পৌঁছে যাবে ডাঙায়। চলো না তুমি, এমন একটা জিনিস দেখাব তোমায়, জীবনে দ্যাখনি।

ঝাউবনে পৌঁছতে হাঁটতে হল পাক্কা কুড়ি মিনিট। তখন ঝাঁ-ঝাঁ করছে দুপুর। দুজনেই ঘেমে নেয়ে একশা। ভীষ্মের কাঁধে ড্রিঙ্কস-এর কিটস, ক্যামেরা ইত্যাদি ছিল। সে তো হাঁফাচ্ছিল।

বালিয়াড়িতে পলিথিন-শিট পেতে বসল দুজনে। ভীষ্ম বলে, 'কই, কী দেখাবেন, দেখান।'

'ধীরে—, রজনী ধীরে—।' প্রায় লোভ দেখানোর ভঙ্গিতে বললেন সুধেন্দু, 'জোয়ারটা শুরু হোক, দেখাব, ততক্ষণ একটু স্কচ হয়ে যাক।'

বরফ দিয়ে পরপর চার পেগ স্কচ। ততক্ষণে রোদ্দুরটা লালচে হয়েছে। জোয়ার শুরু হয়েছে একটু আগে। স্কচের ফাঁকে ফাঁকে ঘন ঘন দূরবীন চোখে লাগাচ্ছিলেন সুধেন্দু। সামান্য অস্থির লাগছিল ওঁকে।

'কী দেখছেন বলুন না?' ভীষ্ম বলে, 'অত সাসপেন্স দিচ্ছেন কেন?'

ভীষ্মের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকান সুধেন্দু। সারা ঠোঁটে আঠালো মৌ-এর মতো জমে ওঠে হাসি। 'পাখি। বুঝলে, এক দুর্লভ জাতের পাখি!' চোখের কোল ঈষৎ ফোলা সুধেন্দুর,

রোমাঞ্চে গাঢ় হয়ে আসে, 'তেমন পাখি তুমি দ্যাখনি।'

জোয়ার ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। ঢেউগুলোর উচ্চতা বাড়ছে...।

একসময় দিগন্তের গায়ে কালো বিন্দুগুলি দূরবীন ছাড়াই স্পষ্ট হল।

দু'চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সুধেন্দুর। বলেন, ওই দ্যাখো! ওই যে দিগন্তের গায়ে!

জেলে-নৌকো। ভীষ্ম দেখা মাত্রই চিনতে পারে। সকালে বেরিয়েছিল মাছ ধরতে। সারাদিন সমুদ্রের বুকেই কেটেছে। এখন ফিরছে।

'হ্যাঁ!' দৃশ্যটা বেশ পরিপাক করতে করতে সুধেন্দু বললেন,'ওরা ফিরছে!'

—কিন্তু পাখি কোথায়?

সুধেন্দু অপাঙ্গে তাকালেন ভীষ্মের দিকে।

বললেন, 'আছে, আছে! ক্রমশ প্রকাশ্য!'

যেন তিলের নাড়ুর লোভ দেখাচ্ছেন বাচ্চাকে।

একটুবাদে চৈতী-বুবুন-মৌ এল। ঝাউবনের ভেতর দিয়ে হেঁটে এল ওরা। সুধেন্দুর পাশটিতে এসে দাঁড়াল।

'আমরা সমুদ্রের ধারে যাচ্ছি বাপি।' ছোট্ট মৌ বলল।

'কেন যাচ্ছ?'

'আমরা সমুদ্রের সঙ্গে খেলব।'

বুবুন বলল, 'তুমি যাবে না বাপি?'

'যাব রে।' খুব সুখী সুখী গলা সুধেন্দুর, 'তোরা যা। একটু বাদেই যাচ্ছি।'

চৈতী ভীষ্মের দিকে তাকাল। ভ্রূ-সঙ্গমে সামান্য অসন্তোষ।

বলল, 'দাদাকে দেখো। একটু বাদেই চলে আসবে।'

ওরা কলকল করতে করতে চলে গেল। সুধেন্দু সামান্যক্ষণ তাকিয়ে দেখলেন ওদের, তারপর ঢুলু ঢুলু চোখে তাকালেন ভীষ্মের দিকে। সামান্য হাসলেন, 'খেলতে গেল। সমুদ্রের ধারে। ভালোই হল। এখানে থাকলে কলকল করত।' অকপটে কথাগুলো বলতে পেরে খুব তৃপ্তি জমল সুধেন্দুর ঠোঁটে, 'আমার বউ-ছেলেমেয়েরা ভালো, খুব ভালো। তবে মাঝে মধ্যে বড় ডিসটার্বিং। আর এমনই কাণ্ড, আমি নিজের খোলে একটুখানি লুকোতে চাইলেই, ওদের পজেসিভনেস বেড়ে যায়। তখন আমি কী করি জান?'

ভীষ্ম মাথা নাড়ে নিঃশব্দে। জানে না।

'তুমি তো বিয়েই করলে না। জানবেই বা কী করে? তখন আমি, মনে মনে 'নিঃসঙ্গতার সুখ' রচনাটা বহুবার লিখে ফেলি।' হো-হো করে হেসে উঠলেন সুধেন্দু,'এই ধর, এখন ওদের একটুখানি প্রশ্রয় দিলে, ওরা এখানেই কলকল করত অনেকক্ষণ। পাখি দেখা মাথায় উঠত আমাদের।'

সূর্যটা লাল হয়ে উঠেছে। এতক্ষণ বালিয়াড়িতে লুটোপুটি খাচ্ছিল রোদ্দুর। এখন মগডালে। মাথা উঁচু করে রোদ্দুর দেখছিলেন সুধেন্দু। দু-চোখে আধো-বিস্ময়। হঠাৎ বললেন, 'রোদ্দুরগুলো, বুঝলে, একজাতের পাখিই। সক্কাল বেলায় উড়ে এসে প্রথমে বসে গাছগুলোর চুড়োয়। তারপর এ-ডাল ও-ডাল করতে করতে নেমে আসে মাটিতে। বিকেলে আবার মাটি থেকে ডালে, ডাল

থেকে মগডালে, তারপর ফুড়ুত করে উড়ে যায়।' ডান হাতের আঙুলগুলোকে পাখি বানিয়ে উড়িয়ে দেন সুধেন্দু। ততক্ষণে নৌকাগুলো বেশ কাছে চলে এসেছে।

—আপনি কি 'রোদ্দুর-পাখি' দেখাতে এনেছেন আমায়? ভীষ্মর গলায় ঈষৎ বিরক্তি ছিল। সুধেন্দুকে ছুঁল তা। হেসে বললেন, 'আরে না, না। আসল পাখিই দেখাব তোমায়। সবুর করো না একটুখানি।'

ঢেউগুলো এখন দানব হয়ে উঠেছে। সারবন্দী দানব-সৈন্য এগোচ্ছে বেলাভূমির দিকে। ভেঙে পড়বার মুহূর্তে মনে হয় রুপোর পাহাড়। রুপোর পাহাড়গুলো অবিরাম তৈরী হচ্ছে। পরমুহূর্তেই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ছে। ততক্ষণে পেছনে আরও তিন সারি রুপোর পাহাড়। নৌকোগুলো রয়েছে ওই পেছনের পাহাড়গুলোতে। ঢেউয়ের টানে উঠে যাচ্ছে আকাশে। পরমুহূর্তে আছড়ে পড়ছে নিচে। এইভাবেই ঢেউয়ের সঙ্গে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করে করে এগোচ্ছে একটু একটু।

সুধেন্দু চোখের পলক ফেলছিলেন না। ভীষ্মর দিকে না তাকিয়েই বললেন, 'এই জায়গাটুকু অতিক্রম করাই এদের পক্ষে সবচেয়ে কষ্টকর। দ্যাখো, দ্যাখো।' দুরবীনটা এগিয়ে দেন।

ভীষ্ম দেখল, ছোট ছোট ডিঙি নৌকোগুলো। দু-দিকে দু-জন করে লোক শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে বৈঠা মারছে। প্রবল ঢেউয়ের মধ্যে নৌকোর মুখ ঠিক রাখা যাচ্ছে না মোটেই। লড়াই করে করে যা দু-এক হাত এগোচ্ছে, ফিরতি জলের টানে পিছিয়ে যাচ্ছে চার হাত। তবু দাঁতে-দাঁত চেপে লড়ছে ওরা। চোয়াল ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। দু-হাতের পেশিগুলো যেন কেউটে সাপ। কোটরের মধ্যে একজোড়া চোখ। ওই চোখের মণিতেই কেবল টের পাওয়া যায়, সারাদিনের ক্ষুধা ও শ্রান্তিতে ভেঙে পড়তে চাইছে ওদের শরীর। মন হয়ে উঠেছে ব্যাকুল, ঘরে ফেরার জন্য। ওরা সেই আশাতেই লড়ছে। শরীরের তাবৎ শক্তি জড়ো করেছে দু'খানি হাতে।

সুধেন্দু পলকহীন দেখছিলেন দৃশ্যটা। বললেন, 'দেখতে পাচ্ছ?'

'কী?' ভীষ্ম দুরবীন থেকে চোখ সরায়।

'পাখি।'

'কোথায়?'

'সে কী! তুমি দেখতে পাচ্ছ না?'

ভীষ্ম নির্বোধ মাথা দোলায়।

কয়েক পলক বুঝি ভীষ্মের চোখের ওপর দৃষ্টি স্থির রাখেন সুধেন্দু।

'তোমার মনে হচ্ছে না, নৌকোগুলো এক একটি পাখি। বৈঠা মারতে থাকা দু'জোড়া মানুষ ওই পাখির দুটি ডানা? মনে হচ্ছে না, দিনের শেষে নীড়ে ফিরতে গিয়ে ঘোর ঝঞ্ঝায় পড়েছে এক ঝাঁক পাখি? নখ-ডানা-চঞ্চু দিয়ে ঝড়ের সঙ্গে মরণপণ লড়াইয়ে মেতেছে ওরা? দ্যাখো, দ্যাখো, ভাল করে দ্যাখো, একঝাঁক বিপন্ন পাখি, উদ্দাম সামুদ্রিক ঝড়ের বিরুদ্ধে লড়ছে। দ্যাখো, দ্যাখো।'

সূর্য ডুবছে। লাল আভা ছড়িয়ে পড়েছে জলে। ঢেউয়ের ভাঁজে ভাঁজে। নৌকাগুলোর গায়ে। মানুষগুলোর চোয়ালে, চিবুকে।

পলকহীন মুগ্ধ দৃষ্টি সুধেন্দুর! বিড়বিড়িয়ে বলতে থাকেন 'দিন শেষ হল। লড়াই করে ঘরে

ফিরছে একঝাঁক পাখি। সূর্য ওদের ওপর লাল আবির ছড়িয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। উঁহু, ভাবা *যায় না!'*

'কিন্তু, সুধেন্দুদা—,' দূরবীনে চোখ রেখেই বলে ভীষ্ম, 'খুবই কষ্ট হচ্ছে ওদের। জান বেরিয়ে যাচ্ছে। একটা বুড়ো মতো লোক তো কুকুরের মতো হাঁপাচ্ছে। বুকখানা প্রচণ্ড বেগে ওঠানামা করছে ওব। বোধহয় হাঁপানির টান আছে। জিভখানা বারবার ঝুলে পড়ছে বেচারার।'

ভীষ্মর কথাগুলো বোধ করি কানে গেল না সুধেন্দুর। উত্তেজিত গলায় বললেন, 'ক্যামেরাটা বের করো তো। জলদি।'

ক্যামেরা নিয়ে পটাপট কয়েকখানা শট নিলেন সুধেন্দু। টেলি-লেন্স লাগিয়ে ক্লোজ-আপে নিলেন মানুষগুলোকে। এগিয়ে-পিছিয়ে কতভাবেই যে নিলেন!

বললেন, 'যতবার দীঘায় আসি, প্রতিটি বিকেল উন্মুখ হয়ে থাকি এই দৃশ্যটুকুর জন্য। সামুদ্রিক ঝড়ের মধ্যে মরণপণ লড়াই করছে এক ঝাঁক সামুদ্রিক পাখি।' বলতে বলতে সুধেন্দুর মুখমণ্ডল মাখনের মতো নরম আর উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

'আজকের শটগুলোর মধ্যে একটা অন্তত মাস্টারপিস বেরোবেই। ডাইনিং প্লেসে টাঙাব।' ক্যামেরা ফেরত দিতে দিতে বললেন সুধেন্দু।

—ড্রয়িংরুমে নয় কেন?

—ড্রয়িংরুমে একটা রয়েছে যে। দেওয়াল আলো করে রয়েছে।

—কীসের ছবি ওটা?

সামান্য অনমনস্ক দেখাল সুধেন্দুকে। বললেন, 'ওটাও এক বিকেলের ছবি। এবং একটি পাখির ছবি। পাখিটা অবশ্য ছবির মধ্যে নেই।'

—বছর কয়েক আগে একবার দেবেশের সঙ্গে ওদের বীরভূমের গাঁয়ে গিয়েছিলুম, অজয়ের তীরে। রোজ বেড়াতে যেতুম অজয়ের পাড়ে। একদিন, পড়ন্ত বিকেলে বসে রয়েছি নদীর তীরে, একটা বুড়ো ছাতিম গাছের তলায়। পাশে দেবেশ। ওপারে সূর্যটা লাল হয়ে ডুবছে।

—ওই বুড়ো মানুষটা নৌকোর থেকে জলে পড়ে গেল, সুধেন্দুদা।

—সূর্য্যটা...ডুবছে...জানোই তো এমন সময়ে মনখানা অকারণে বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। মনে হয়, একটা দিন শেষ হয়ে গেল। এমনি সময়ে দূরে সোরগোল—।

—সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ে লোকটাকে তুলেছে সুধেন্দুদা। শুইয়ে দিয়েছে নৌকোর ওপর।

—তাকিয়ে দেখি, দশ-বারো জনের একটি দল এগিয়ে আসছে নদীর পাড় ধরে। ওদের পেছনে একটি কচি যুবতীকে জাপটে ধরে রয়েছে তিন-চারজন প্রৌঢ়া। মেয়েটি আকুল গলায়, বুক ফাটিয়ে কাঁদছে। তীক্ষ্ণ, তীব্র সে কান্নার আওয়াজ, অজয়ের জলে তার করুণ প্রতিধ্বনি। কাছে আসতেই, দু' একটা প্রশ্ন করেই দেবেশ বুঝে নিল পুরো ব্যাপারখানা। ধাঙড়দের একটি বাচ্চা মারা গেছে। বয়েস বছর-দুই। মা-বাবা কাজে-কর্মে ব্যস্ত ছিল। কখন পুকুরের জলে নেমেছে বাচ্চাটি। আর উঠতে পারেনি। বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে চলেছে একজন বয়স্ক মানুষ। খোঁচাখোঁচা দাড়ি তার সারা মুখে। মৃত শিশু নয়, সে যেন দেবতার উদ্দেশে নৈবেদ্য নিয়ে চলেছে, এমনই ভাবলেশহীন মুখ। তাকে ঘিরে চলেছে সাত-আটজন উদোম মানুষ। কচি যুবতীটি বাচ্চার মা। কতই বা বয়েস, সতের-আঠারোর বেশি নয়। শীর্ণ শরীরে অপুষ্টি আর

রক্তহীনতা প্রকট। কী আকুল কান্না তার! আলুথালু বসন। এলোমেলো রুক্ষ চুল। ছেঁড়া শাড়ির আঁচলখানি অজয়ের বালিতে লুটোচ্ছে। চিৎকার করে কাঁদছে সে। হাত-পা ছুঁড়ছে পাগলিনীর মতো। তিন-চারজন মহিলা মিলে কিছুতেই সামলাতে পারছে না। মেয়েটি তার বাচ্চার কাছে পৌঁছুতে চায়। বাচ্চার শ্মশানের পথ আগলাতে চায়। উহ, তুমি ভাবতে পারবে না ভীষ্ম, মানুষের গলা থেকে এমন তীক্ষ্ণ মর্মভেদী আওয়াজ বেরোতে পারে! ছেলে-কোলে বয়স্ক মানুষটি মাঝে মাঝেই থমকে দাঁড়াচ্ছে। দু'চোখে অসহায় রোষ। মৃদু গলায় ধমক —লিয়ে যা, লিয়ে যা ওকে। কিন্তু কাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে! ক্ষেতে-খামারে খাটা তিন-চারটে তাগড়াই মেয়ে ওই এক চিলতে পুঁচকে মেয়েকে আটকে রাখতে পারছে না। কী এক অদৃশ্য শক্তিতে সে সমস্ত প্রতিরোধ গুঁড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে চলেছে, মরা বাচ্চাটির দখল নিতে। ওর কান্নাটা অনেকক্ষণ ধরে কানে ঢুকছিল। মনোযোগ দিয়ে শুনতে শুনতে একসময় মনে হল—

—সুধেন্দুদা, বুড়োটাকে নৌকো থেকে পাঁজাকোলা করে নামাচ্ছে সবাই।

—এক সময় মনে হল—

—বুড়োটা নড়ছে না একতিল—

—মনে হল, একটা সুর আছে কান্নাটার মধ্যে। একটা ভারী করুণ আদিম সুর। ঠিক ধরতে পারলাম না, কিন্তু কোনোই সন্দেহ নেই, একটা খুব মেজর রাগিণীর সঙ্গে তার খুব মিল রয়েছে। তখন চারপাশটা কেমন? চৈত্রের পড়ন্ত বিকেল। শীর্ণ অজয় সরু খাতে বইছে। দু-ধারে চওড়া বালির চর। সূর্য ডুবু ডুবু। নদীর জলে সূর্যের আলো। লাল রং ধরেছে জলে।

—বুড়োটার চারপাশে ভিড় জমে গিয়েছে। বোধ করি মেজর কিছু হয়েছে গো।

—নদীর পাড় ধরে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে শববাহী পুরো দলটি। ওদের পেছনে, কচি মেয়েটির গলা চিরে ওই অচেনা আদিম রাগিণী।

..পাশটিতে এসে ওরা থামল। দেবেশই থামাল। মাত্র তিন-চার হাত দূর থেকে দেখতে পেলুম বাচ্চাটার মুখ! মারা গেছে ঘণ্টা তিন-চার আগে, কিন্তু এমন টাটকা তরতাজা মুখ, যেন ঘুমোচ্ছে। বললে বিশ্বাস করবে না, ঠোঁটের হাসিটিও মেলায় নি। মনে হল, আর একটু ঝুঁকে পড়লে, আমি ওর মুখ থেকে দুধের গন্ধ পাব। এই শরীরটাতে প্রাণ নেই, এটা বিশ্বাসই হচ্ছিল না কিছুতেই। অথচ সেটাই তো সত্যি। যা-ই বল, কাব্যি নয়, প্রাণটা সত্যিই এক মজার পাখি। খাঁচার মধ্যে কখন যে আছে, কখন যে উড়ে গ্যাছে, বোঝাই মুস্কিল। ওই যে, খাঁচার মধ্যে অচিন পাখি ক্যামনে আসে যায়..।

নাকি সুরে মিনমিনে গলায় গানের কলিটি ভাঁজতে লাগলেন সুধেন্দু।

ভীষ্ম বলল, 'ওই দেখুন সুধেন্দুদা। বুড়োটাকে পাঁজকোলা করে নিয়ে চলেছে সবাই।

—বাচ্চাটাকে ক্লোজ-আপে নিয়ে পটাপট ছবি তুললুম কয়েকটা। মা টাকেও আলাদা নিলুম। তারপর নদী, ছাতিমগাছ আর ডুবন্ত সূর্যসহ পুরো দলটিকেনিয়ে একটা কম্পোজিট শট। ভেবে দ্যাখো, কী মার্ভেলাস হবে পুরো সেটখানা। উঠেওছিল দারুণ। এন্‌লার্জ করিয়ে বাঁধিয়ে রেখেছি ড্রয়িংরুমে। একখানা ছবি, যেন ভরিয়ে রেখেছে সারা দেওয়াল! নিচে ক্যাপশন কী দিয়েছি জানো? 'নীড়ে ফেরা'।

সূর্য ডুবে গেছে তখন। কিন্তু অন্ধকার নামেনি সি-বিচে। সুধেন্দু দেখলেন, সি-বিচ ছিন্নভিন্ন

করে কেউ একজন ছুটছে। একজন যুবক। ছুটে আসছে ওদেরই দিকে। সুধেন্দু নিরাসক্ত চোখে দেখলেন।

কাছে এসে যুবকটি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'আপনাদের মধ্যে সুধেন্দু লাহিড়ী নামে কেউ আছেন?'

—আমি সুধেন্দু লাহিড়ী।

—জলদি চলুন। আপনার ছেলে বুবুন ঝিনুক কুড়োতে কুড়োতে জলে ডুবে গিয়েছে।

মুহূর্তের জন্য হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন বুঝি, সহসা, 'ও ভীষ্ম, আমার সর্বনাশ হয়্যা গেল' বলেই বালিয়াড়ি থেকে মারলেন এক লাফ। সি-বিচে পড়েই উর্ধ্বশ্বাসে দৌড় মারলেন যুবকটিকে অনুসরণ করে। ছুটতে ছুটতে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে কাঁদছিলেন সুধেন্দু। পরিপাটি করে পরা ফিনফিনে ধুতির কোঁচা খুলে গেল একটু বাদেই। ধুতির সঙ্গে পা জড়িয়ে আছাড় খেলেন বার-দুই। কোঁচাসহ ধুতিখানা দু'হাতে তুলে ধরে দৌড়ুতে লাগলেন ধুপধাপ আওয়াজ তুলে।

পাগলের মতো ছুটছেন সুধেন্দু। প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁর আজীবন-চর্চিত মুদ্রাগুলি ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। অতি গ্রাম্য, অশিষ্ট ভঙ্গিতে কাঁদছেন, গলার শিরা ফুলিয়ে।
একমাত্র ছেলের জন্য নিপাট মেঠো কান্না, কোনো রাগিণী ছিল না তাতে।

বেড়িয়ে আসা

এক

আরতি ডাইনিং-টেবিলটা মুছছিল, কার্তিক এলো। আরতি বলল, চলে এলে? রাখো ব্যাগখানা। ওখানে নয়, এই কোণে রাখো। সব দেখেশুনে এনেছ তো? তোমার মোটা গেঞ্জিটা? আমার একখানা বাড়তি শাড়ি? টিপের প্যাকেটটা? শোবার খাটের দিকের কুলুঙ্গিতে ছিল। পাও নি? থাক্ গে। বউদিমণি যাবার কালে দিয়ে গেছে দু'তিনটা।

ব্যাগের মধ্যে কার্তিকদের কাপড়-জামা, টুকিটাকি, দিন তিনেকের জন্য দু'জনার ব্যবহারের সামগ্রী। কার্তিক মোলায়েম দৃষ্টি বুলোয় ঘরে! বেশ সাফসুতরো, সাজানো-গোছানো ঘর। চারিদিকেই লক্ষ্মীশ্রী। ছিমছাম সবকিছু।

জানলা দিয়ে আলো পড়েছে ডাইনিং-টেবিলের মাঝ বরাবর। টেবিলটা মুছতে থাকবার দরুন আরতির ডান হাতে কনুইতক রোদ্দুর পড়েছে। শ্যামলা মাজামাজা মানুষের গায়ে রোদ্দুর পড়লে তাকে বেশ ফরসা লাগে। আরতিরও ডান হাতখানা কনুইতক বেশ ফরসা লাগছে। আরতি বলে, তুমি মুখ-হাত ধুয়ে, চা খেয়ে, চট-জলদি বাজারটা এনে দাও। বাজারটা হাতে পেলে সব বুদ্ধি খোলে। আমি ততক্ষণে তোমার জন্যে আলুর বড়া ভেজে রাখছি। একটুখানি টাটকা মুড়ি এনো।

কার্তিক স্থির পলকে দেখছিল আরতিকে। খুশিতে একেবারে ডগোমগো। বয়েস যেন কমে গেছে দশ বছর! বেশ উজ্জ্বল লাগছে আরতির মুখখানি। নাকের ডগায় একটা লালচে জড়ুল, ওটাই ঝিলিক মারছে বেশি। জড়ুলটা নাকি ছিল না আরতির নাকে। কার্তিক অতশত খেয়ালই করেনি। মাস কয় আগে, একদিন রাতের বেলায়, তখন বাইরে ঝিমির-ঝিমির বৃষ্টি, আরতি কার্তিকের গায়ে ঘন হয়ে বলেছিল, জান, একটা বেপার ঘটেছে। কার্তিক সেদিন সন্তোষ মাঝির পাল্লায় পড়ে কিঞ্চিৎ বেশি টেনেছিল। তার মাথা ঝিমঝিম করছিল। চোখ খোলা থাকতে চাইছিল না। তার মধ্যেই আরতির দিকে বহু কষ্টে চোখ মেলে তাকায়, কী ব্যাপার? বাধালি নাকি আবার? আরতি ভ্রূকুটি করে তাকায়। গেল-বছর বাধিয়েছিল আরতি। মাস পাঁচ-ছয় বয়েসে, কেন কে জানে, শুকিয়ে গেল জালি। আরতি দুষে কার্তিককে, তুমি ওই যে মাতাল-বেহেড হয়ে ঠেলে ফেলে দিয়েছিলে আমায়, ওতেই গেল। কার্তিক দুষে আরতিকে, তুই শালী বারণ করা সত্ত্বেও গেরস্থের বাড়ি-বাড়ি কাঁড়ি-কাঁড়ি বাসন মাজলি, বাসি রুটি আর টক আচার খেলি গাদা গাদা, অত অনিয়ম সয়? কেঁদেকেটে ধীরে ধীরে সয়ে গিয়েছিল ব্যাপারটা। আরতি সইয়ে নিয়েছিল, নিজেকে হাজার প্রবোধ দিয়ে। কার্তিকের সুঁই-ফোঁড়া কথাটা অ্যাদ্দিন বাদে আবার খুঁচিয়ে দিল ক্ষতটা। দু'এক দণ্ডের চিনচিনানি বুকের মধ্যে। ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু তীব্র। পরমুহূর্তে আরতি বলে, আরে না, না। কী কথায় কী কথা! এটা অন্য বেপার। কার্তিক

চোখ ছোট করে তাকিয়ে থাকে। নিরাসক্ত দৃষ্টি। যান্ত্রিক গলায় বলে, বল্। আরতি আরও ঘন হয়। একখানা হাত চুড়ির আওয়াজসহ তুলে দেয় কার্তিকের বুকে। বলে, আমার না লাল জুড়ুল বেইরেছে। এই দ্যাখ, নাকের ডগায়। ততক্ষণে কার্তিকের সব উৎসাহ মরে গেছে। চোখ দুটো আবার বুজে আসে। বিড়বিড়িয়ে বলে, নতুন নাকি? নতুনই তো, আরতি ভেতরে ভেতরে বেজায় উত্তেজিত, আগে ওটা ছিল নাকি! দেখেছ কোনওদিন? কার্তিক হাই তোলে। সর্বাঙ্গ টানটান করে আবার ঢিলে করে দেয়। ঘুমঘুম গলায় একরাশ বিরক্তি, কে জানে! কে অত দেখে রেখেছে!

'না গো, সত্যিই ছিল নি। মা-কালী।'

'তো, কী হয়েছে? লাল জুড়ুল নিয়ে রাতের বেলায় অত গবেষণা কেন?'

'জান না?' খুব চাপা, আবেগ মাখানো গলায় আরতি বলে, 'গায়ে লাল জুড়ুল হলে ট্যাকা হয়। এবার অনেক ট্যাকা হবে আমাদের।'

'তাই বল্। আমি ভাবি, কী না কী!' কার্তিক পাশ ফিরে শুয়েছিল সে রাতে। আমল দেয় নি আরতির কথায়। আরতি শুয়ে শুয়ে অনেক কিছু আকাশ-পাতাল ভেবেছিল অনেক রাত অবধি। আগামী দিনের প্রাচুর্যের কথা, সম্ভাব্য সন্তানের কথা। লোকটা বোধ করি মনে মনে চায়, আরতি ফের বাধিয়ে বসুক জলদি। কিন্তু বলল এমন করে—! আসলে লোকটার কথা বলবার ধরনটাই এমন। কোনও ছিরি-ছাঁদ নেই।

এই মুহূর্তে আরতির নাকের লালচে জড়ুলটার দিকে নিবিষ্ট মনে তাকিয়ে রয়েছে কার্তিক। তার মনে হলো, জড়ুলটার সঙ্গে আরতির মুখখানাকেও যেন বহুদিন বাদে নতুন করে দেখল।

আরতি পাতলা ঠোঁটে হাসে। বলে, হাঁ করে দেখছ কী? যা—ও।

এই এলাকাটা কার্তিকের খুব চেনা নয়। তার ঘোরাঘুরি মূলত কালীতলার দিকটায়। কালীতলা থেকে বোসপাড়া, বড়জোর রেল-গেট। এদিকটায়ও এসেছে, তবে ক্বচিৎ-কদাচিৎ। এলাকাটা নতুন গড়ে উঠছে। এখনও সাজ-গুজ করে তৈরি হয় নি। পুরো এলাকা জুড়ে, ঘর-বাড়ি, রাস্তা-ঘাটে, কেমন কাঠামো কাঠামো ভাব।

কার্তিক বলে, বাজার মানে তো সেই বাদামতলা? নাকি কাছাকাছি কোথাও বসে?

আরতি বলে, বসে, তবে তুমি বাদামতলায়ই যাও, নক্কীটি। এখানে মাছটা ভালো পাবে নি। তুমি কিন্তু বড্ড দেরি করছ। যাও, বাথরুমের কাজ সেরে নাও। চা বসিয়েছি।

বার-দুই উঁকি মেরে কার্তিক ঢুকে পড়ে বাথরুমে। ঝকঝকে বাথরুম, নতুন পলিথিনের বালতি, দেওয়ালে কাঁধ-সমান উঁচু মোজাক।

আরতি গলা চড়িয়ে বলে, নীল মগটা বালতিতে ডুবিয়ো নি। ওটা মুখ ধোবার মগ। বড় লালটা নিও। আর, তাকের ওপর পেস্ট রয়েছে। জলদি কর না গো, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

অন্য দিন হলে খেঁকিয়ে উঠত কার্তিক। মাথায় আগুন জ্বলে যেত। যা মুখে আসে বলত আরতিকে। কিন্তু আজকের দিনে আরতিকে চটাতে চায় না সে। কোনওক্রমেই তার মেজাজ খারাপের কারণ হতে চায় না। নিজেকেও যথাসম্ভব ফুরফুরে রাখে। আকাশটা কী নীল আজ! বাথরুমের ছোট্ট জানলা দিয়ে দেখা যায়। কার্তিক কল খুলে প্রচণ্ড আওয়াজ তুলে মুখ-হাত ধুতে থাকে। চা খেয়ে আবার ঢুকবে। চা না খেলে পায়খানার বেগ আসে না। অথচ নিজেদের ভাড়া বাড়িতে ওই বিলাসিতাটুকু কোনদিনও

করতে পায় না কার্তিক। ভাড়াবাড়ির বারোয়ারি পায়খানা, একটিবার চান্স পেতে কালঘাম ছুটে যায়।

এই এলাকাটা খুব খোলামেলা। জানলা দিয়ে হাওয়া ঢুকছে শনশনিয়ে। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি। শীত যাই-যাই করেও যায়নি পুরোপুরি। দিনের বেলায় সামান্য গরম। রাতে ঠাণ্ডা। হিম পড়ে শেষ রাতে, এখনও।

চা খেয়ে আবার বাথরুমে ঢুকল কার্তিক। ঝকঝকে প্যানটার ওপর বসেই একটা চালু হিন্দি গানের কলি মনে এল।

আরতি ঠোঁট টিপে হাসে। বলে, নাও, আর গান করতে হবে নি। ফুর্তির প্রাণ গড়ের মাঠ! বাঁশপাতি মাছগুলো বেশিক্ষণ থাকে না।

বাজার থেকে কী কী আনতে হবে, তার একটা লিস্টি মুখে মুখে আউড়ে গেল আরতি। কার্তিক রাস্তায় পা দিতেই পেছন থেকে ডাকে ফের, শোনো, ডুমো ডুমো আলু এনো হাফ-কেজি। অন্যদিন হলে খেপে টং হতো কার্তিক। পিছু-ডাক সে একদম সইতে পারে না। কিন্তু আজ মেজাজ খারাপ করল না। বরং, 'ইলু-ইলু' গানের সুরে 'আলু-আলু' ভাঁজতে ভাঁজতে আর শিস দিতে দিতে চলে গেল বাদামতলার দিকে।

দুই

বউদিমণিরা নির্ঘাত এতক্ষণে ট্রেনে চড়ে বসেছে। ডাইনিং-রুমখানা মুছতে মুছতে ভাবছিল আরতি। যাবার সময় বলে গেছে, ভালো থাকিস আরতি, যা দরকার হয়, নিস। বাগানে লঙ্কা-বেগুন-টম্যাটো রয়েছে, ইচ্ছে করলে তুলে খাস। বড় ভালো মানুষটা বউদিমণি। এই ক'মাসে আরতির সেটাই মনে হয়েছে। একটুও দেমাকি লাগে না। আর, লাগলেই বা কী? বড়লোক বাপের এক মেয়ে। বাপ আর তিন-তিনটে ভাই মিলে সব সময় মাথায় তুলে রাখে। এমন সুন্দর চাকুরে সোয়ামি। নতুন বাড়ি, নিজেদের। লোন নিয়েই অবশ্যি বানিয়েছে, তা হোক, তবু নিজের বাড়ি তো! নিজের বাড়ির সোয়াদই আলাদা। আরতি সেটা আন্দাজ করে পলে পলে। থাকে তো কেদার দাসের ঝুপড়িতে। বোঝে, ভাড়া-ঘরে থাকবার যন্ত্রনা। নিত্যি খোঁটা, দাঁত কিচিমিচি। কেদার দাসের বউটা নিজেকে ভাবে, কী না কী। রাস্তার দিকে ইঁট বের করা একতলা বাড়িতে নিজেরা থাকে। পেছনের দিকে, ইটের দেওয়াল আর টালির চাল দেওয়া সারবন্দি খান-দশেক ঘর। ওই নিয়ে কেদারের বউয়ের সাম্রাজ্যি। প্রত্যেক ঘরের সুমুখে এক চিলতে বারান্দা। ওখানেই রান্নাবান্না, ওঠাবসা। দশটি পরিবারের জন্য একটি কল, দুটো পায়খানা। কাপড় কাচা, বাসন মাজা, পেছনের পচা পুকুরে। কলকতলাতেই চান! দশটি ভাড়াটের বেরোবার রাস্তাও পাঁচিল ফুটিয়ে আলাদা করে দিয়েছে। ভাড়া যাট টাকা। আরও বাড়াবে। হুমকি দিচ্ছে ফি-মাসে। তো, ওই বাড়িতে থাকা নয়, কয়েদবাস। কেদার দাসের বউয়ের শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে একটু কিছু এদিক ওদিক হওয়ার জো নেই। কে ক'বালতি জল নিল, কতক্ষণ চান করল, খিচ মেরে কল টিপছে কিনা...। বাড়ি-ঘরে একটু কিচ্ছুটি করবার উপায় নেই। একটা হাঁস-মুরগি, পাখি-পাখাল পুষতে পারবে না ভাড়াটেরা। কী? না উঠোন নোংরা করবে। ক্ষেতের সবজি নষ্ট করবে। একটা লঙ্কা কি বেগুনের ডগা

পুঁততে পারবে না কেউ সামনের উঠোনে। কী? না মাটির সার খেয়ে নেবে। ঝোপ-জঙ্গলে ভরে যাবে উঠোন। একটা লাউগাছ পুঁতে, তুলে দিই টালির চালে, ও মাসিমা, তাতে উঠোন পরিষ্কার থাকবে। লাউ ফললে তোমাকেও দেবো। কাজ নেইকো আমার লাউতে, আসলটা পেলেই হলো, কী হবে আমার ফাউতে? ছড়া কাটে কেদারের বউ। বলে, আহম্মক নম্বর পাঁচ, যে ভাড়াটাকে লাগাতে দেয় গাছ। আসল ছড়াটি উলটে নেয় নিজের মতো করে। বলে, লাউয়ের ভারে টালি ভাঙলে, তখন দ্বিগুণ অর্থদণ্ড। তোমাদের আর কী? বলেই খালাস। আমাকেই তো সারাতে হবে।

ধানকলের ভাঙা-চাতাল যখন দখল হলো, কার্তিকও নেতা ধরে কাঠা দুয়েক জমির দখল পেয়েছে। বারোশো টাকা নিল নেতা। তাও, বলতে হবে, জলের দাম। পাশাপাশি দর যাচ্ছে কুড়ি-বাইশ হাজার করে কাঠা। এটা জবর-দখলি জমি, তাও শুধু দখলটা বিক্রি করলেই এখন দর পাবে ছ-সাত হাজার। বারোশো টাকা মেটাতে সর্বস্ব গেছে কার্তিকদের। ঋণ-কর্জও হয়েছে। ওসব শোধটোধ হলে, তবেই না বাড়ি তৈরির প্রশ্ন। কার্তিকের প্ল্যান, দরমার বেড়া, টালির চাল। আরতির ইচ্ছে, পাঁচ ইঞ্চি গাঁথনি, সিমেন্ট দিয়ে নয়, ঘ্যাঁস-চুনের গাঁথনি। তার ওপর অ্যাসবেস্টসের চাল। কার্তিক খিঁচিয়ে ওঠে, শালি, তোর ইয়ে বেড়েছে। ইঁটের গাঁথনি! কার্তিকটা এমনিতেই খুব বদরাগী। কথায় কথায় আরতিকে খিস্তি-খেউড় করে। রিকশো জমা দিয়ে ফিরবার পথে রোজ খানিকটা ছাইপাঁশ গিলে আসবেই। তখন সামান্য কথায় চড়-চাপড় লাগিয়ে দেয় আরতিকে। বাড়ি তৈরির প্রশ্নে, সুতরাং, সমঝোতা চায় আরতি। অ্যাসবেস্টসের না হোক, টালির চালই সই, কিন্তু দেওয়াল হোক পাঁচ-ইঞ্চি ইটের। ওই নিয়ে রশি টানাটানি চলছে।

ধানকলের চাতাল খোঁড়া হলো যখন, পুরনো দিনের ইঁট থরে থরে। প্রতি হাজার আট-ন'শোয় বিকোলো। বাজারে নতুন ইঁট সতেরো-আঠারোশো। আরতির খুব ইচ্ছে করছিল, হাজার দু-তিন কিনে ফেলে। কার্তিক শুনে থানইট ছুঁড়ে মারতে আসে। বলে, আটশো করে দু'হাজার ইঁটের দাম জানিস? ষোলোশো টাকা!

'আ-হা।' আরতি ঝামরে ওঠে, ষোলোশো টাকাই দেখছ কেবল। বাজারের থেকে যে আঠারোশো টাকা কম পড়বে, সেটা কিছু নয়? ওই টাকাটা যে বেঁচে যাবে.. ।'

যা হোক গে, কেনা যায়নি, ওই নিয়ে আর হিসেব কষে কী হবে? বছর পাঁচেক যাক। এই বারোশো টাকা তো শোধ হোক আগে, তার ওপরে কিছু জমুক হাতে। কিছু হাতে নিয়ে তো নামতে হবে। বাড়ি করা বলে কথা! কিন্তু সে সব পরের কথা পরে। উপস্থিত বউদিমণির নতুন বাড়িতে এলেই আরতির দুঃখুটা চাগিয়ে ওঠে রোজদিন। কী সুন্দর, ছিমছাম বাড়ি! সাজানো গোছানো। সামনে, পেছনে ফুল আর সবজির বাগান। বারান্দার গ্রিলে ফুলন্ত লতা। বলে, 'তোমাকে দেখে হিংসে হয় গো বউদিমণি। কেমন নিজের বাড়িতে বাস করছ। কী মজা তোমার।'

'আর বলিস নে, মজা বেরিয়ে যাচ্ছে। আজ তিন বছর বাড়ির মধ্যে বন্দী।' সুপ্রিয়া তার দুঃখের কথা শতগুণ করে জানাতে বসে আরতিকে। রোজ, অরিন্দম অফিসে বেরিয়ে গেলে একটুখানি দম নেবার ফুরসত পায় সুপ্রিয়া। আরতিকে চা-রুটি দেয়। নিজের জন্যেও একটা ওমলেট ভেজে নেয়। ওমলেট আর চা সহযোগে চলে আরতির সঙ্গে সামান্য-সামান্য সুখ-দুঃখের অসামান্য সব গল্প। ছেলে স্কুল থেকে ফিরবে আড়াইটে-তিনটেয়। সুপ্রিয়ার সময় কাটানো নিয়ে সমস্যা। আরতিকে, তাই, এটা-ওটা সাত-সতেরো

কথা তুলে একটুখানি আটকে রাখা। তারপর, আরতি বিদায় নিলে, একটুখানি ঝাড়পোছ, সাজানো-গোছানো,—এসব সেরে-টেরে বাথরুমে ঢোকা। খেয়ে দেয়ে ঘুম। ঘুমটা জমতে না জমতে ছেলে ফিরবে স্কুল থেকে। তারপর, দ্বিতীয় দফায়, আরতি আসে সাড়ে-চারটে নাগাদ। অরিন্দমের ফিরতে ফিরতে ছ'টা।

সুপ্রিয়া বলে, 'বাড়ি হওয়া ইস্তক, বুঝলি আরতি, বাড়ি ছেড়ে এক-পা বেরোতে পারছি নে। অথচ বেড়াতে আমার কী ভালো যে লাগে! আগে আমরা বছরে দু'বাব যেতামই। একবার বেশি সময় নিয়ে, দূরে। আর একবার তিনচারদিনের মতো কাছাকাছি। বাড়িতে তালা লাগিয়ে, বাড়িওয়ালাকে 'জেঠু একটুখানি দেখবেন' বলে দিব্যি কেটে পড়া যেত। এক বছর পাহাড়ে যেতাম, পরের বছর সমুদ্রে। তোর কী ভালো লাগে? পাহাড়, না সমুদ্র?'

কী জবাব দেবে আরতি! পাহাড়, না সমুদ্র? দুটোর কোনওটাই তো দেখা হয়নি তার। সে তো এ যাবৎ যায় নি কোথাও বেড়াতে। না পাহাড়ে, না সমুদ্রে। অথচ এই দুনিয়ায় কত্তো সুন্দর সুন্দর জায়গা রয়েছে! টাকাওয়ালা বাড়ির দাদাবউদিরা বছরে একবার দু'বার দল বেঁধে বেড়াতে যায়। হই-হই করে যায়, হই-হই করে ফিরে আসে। তারা কতই না সুন্দর সুন্দর গল্প বলে সে সব জায়গার। বলে, আরতি রে, কী সুন্দব যে জায়গাটা, তুই যদি দেখতিস! বিয়ের পরপর, তখন আরতির মনটা খালি উড়ে বেড়াত, বায়না ধরেছিল, কোথাও বেড়াতে যাবে দু'জনে। দূরে দূরান্তে যদি নাও হয়, কাছে-পিঠে কোথাও, নিদেন বকখালি কিংবা মায়াপুর...। কার্তিক শুনে খিঁচিয়ে উঠেছিল, বেড়াতে যাবে! খরচ জানিস? শালির তেল কত! নিদেন কলকাতাটা একদিন ঘুবে আসার কথাটা এখনও ভাবে আরতি। চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, মনুমেণ্ট মা-কালীব দর্শন, আদি গঙ্গায় স্নান। এই তো কাছেপিঠেই কলকাতা। তাও সেটা হয়ে উঠল না আজ অবধি। সময় হলো যদি, টাকাকড়ির বাড়ন্ত। টাকা জোটে তো সময় অকুলান। আরতি ক্ষেপে গিয়ে মাঝে-মাঝেই বলে, এবারে মিটিং হোক বিগেডে, ঠিক চলে যাবো নি মিছিলেব সঙ্গে। এমনি আর হবে নি। কার্তিক শুনে ক্ষার হাসে, কলকাতা দেখা হোক না হোক, মিছিলের ভিড়ে শবীরের আরামটা পাবি। কার্তিক খ্যা-খ্যা করে হাসে। দেখে, মাথা থেকে পায়ের নখ অবধি জ্বলে যায় আরতির।

আসলে, কপালে নেই ঘি, তার ঠকঠকালে হবে কি? দত্ত-বাড়িব বুড়ি-দিদিমা প্রায়ই বলতেন কথাটা। শুধু টাকা থাকলেই হয় না, সময় থাকলেও নয়, বেড়ানো হলো ভাগ্যের কথা, বুঝলি আরতি, মানুষের হাতের তেলোতে লেখা থাকে। পুরুষমানুষের ডানহাতে, মেয়ে মানুষের বাঁ-হাতে।

শুধু বেড়ানো নয়, মেয়ে-মানুষের বাঁ-হাতে নাকি সবকিছুই লেখা থাকে। বাড়ি, বেড়ানো, স্বামী-পুত্তুর,...সব কিছু। আরতি মাঝে-মাঝেই বাঁ হাতের তেলোখানি মেলে ধরে চোখের সুমুখে। অসংখ্য দুর্বোধ্য বেখা। কোন্‌টিব কী মানে, বোঝে না অতশত। তবুও কোন্ রেখাকে আয়ুরেখা, কোন্‌টিকে ভাগ্যরেখা, ভ্রমণ রেখা, সন্তান, স্বামী, টাকাপয়সা, ঘরবাড়ি, সব কিছুর জন্য এক একটা রেখাকে বেছে নিয়ে নিজে নিজেই বিচার করতে বসে নিতান্তই ভিত্তিহীনভাবে! রেখার আকার-আকৃতি, সোজা-বাঁকা, কাটাকুটি ইত্যাদি দেখে-টেখে নিজের অদৃষ্টের অনেক কিছু বিচাব করে সে নিজের মতো করে। তার মনে হয়, একদিন তাদের টাকা হবে। ঢের টাকা। তখন বাড়ি হবে।

বেড়ানোও হবে এন্তার। মূলত পাহাড় এবং সমুদ্রে। অন্তত, আরতির বিচার অনুয়ায়ী, ওর হাত তাই বলছে।

বউদিমণির প্রশ্নটা অনেক্ষণ ধরে পরিপাক করছিল আরতি। এক সময় জবাব দেয় দুই-ই। গ্রীষ্মে পাহাড়, শীতে সমুদ্দুর।'

'তোর দাদাবাবুরও তাই।' সুপ্রিয়া বলে ওঠে, 'আমার বাপু পাহাড় অত ভালো লাগে না। আমরা হলো, সমুদ্র। কী ঢেউ, ফেনা! বালির পাহাড়! আর, কত্তো ঝিনুক!'

দাদাবাবুর পাহাড়-সমুদ্র দুটোই পছন্দ শুনে, মনটা সহসা ভালো হয়ে যায় আরতির। বলে, 'বেরোও না কেন? বেরোলেই পারো।'

'কী করে বেরোব?' সুপ্রিয়া দুঃখী-দুঃখী মুখে বলে, 'এই বাড়িখানা দেখবে কে? রাত্তিরে কে শোবে? গাছগুলোতে জল দেবে কে? এই বাড়ি নিয়ে হয়েছে আমার যত জ্বালা!'

কী মনে হলো, হঠাৎ মুখ ফসকে বলে ফেলল আরতি, 'আমি থাকব বউদিমণি, তোমরা যাও ঘুরে এসো।'

'কী করে থাকবি তুই? তোর পাঁচ-বাড়ির কাজ। সেসব সামলে-টামলে—।'

'সে আমি ঠিক ম্যানেজ করে নেব নি। তোমরা গিয়ে দ্যাখই না।'

'তুই সত্যি থাকবি আরতি?' সুপ্রিয়া যেন আকাশের চাঁদ পায়, 'রাত্তিরে একলাটি তোর ভয় করবে না?'

'ভয় কিসের গো বউদিমণি? বাড়িতে আমি একা একা থাকি নে রাত্তিরে? ও তো কত রাত্তির বাড়িই ফেরে না। রোগী-টোগী নিয়ে গেলে—।'

সুপ্রিয়া জানে, আরতির বর রিকশো চালায়। দু'একদিন চড়েছে ওর রিকশোয়।

আরতি বলে, তেমন বুঝলে, ওকে বলব। রাত্তিরে এসে শোবে।'

'তা হলে তো ভালোই হয়।' সুপ্রিয়া আনন্দে ডগোমগো হয়ে ওঠে, 'আরতি তুই আমায় বাঁচালি রে!'

অফিস থেকে ফেরা মাত্রই অবিন্দমকে শুভ খবরটা জানাল সুপ্রিয়া। আর কোনও ভাবনা নেই, জানো, আরতি রাজি হয়েছে। দরকার হলে ওর বরও এসে শোবে রাতে। কিছু চাল-ডাল, মসলাপাতি দিয়ে গেলে রেঁধে-টেধেই খাবে। কোথাও বেড়াতে গেলে লোক তো রেখে যেতে হবেই। আর, যাকেই রেখে যাও, তার পেছনে কিছু খরচও হবে। এটাকে মেনে নিতেই হবে, বেড়াতে চাইলে। সে হিসেবে আরতিই ভালো। মেয়েটার কোনও বদনাম নেই এ পাড়ায়। বরং সুনামই। হাতটান একেবারেই নেই ওর।

সুপ্রিয়া অস্থির গলায় বলে, 'তুমি ব্যবস্থা করো এবার। কতদিন বেরোই নি।'

অত জলদি খুব দূরে কোথাও প্রোগ্রাম করা গেল না। হাতের কাছে দীঘা। ঘণ্টা পাঁচেকের জার্নি। দিন তিনেকের জন্য আদর্শ ট্রিপ। একটা প্রাইভেট বাংলো পাওয়া গেল, এক বন্ধুর সৌজন্যে।

সুপ্রিয়া বলে, 'জানিস আরতি, আমরা যে বাংলোটাতে থাকব, সেখান থেকে সমুদ্রটা দেখা যায়।'

বলতে বলতে সুপ্রিয়া রোমাঞ্চিত।

তিন

বাজার সেরে ফিরল কার্তিক। শিস দিতে দিতে ঢুকল।

আলুর বড়া ভেজে তৈরি ছিল আরতি। বলে, 'কী মাছ নিয়ে এলো গো?'

'বাঁশপাতি পাইনি। ভালো ট্যাংরা এনেছি। বরফের, তবে ভালো।'

কার্তিক ব্যাগ দুটো নামিয়ে রাখে ডাইনিং-রুমের এক কোণে।

ট্যাংরাও খুব প্রিয় আরতির। বলে, 'সরষে দিয়ে ঝাল-ঝাল করে রাঁধব। আর, মুসুরির পাতলা ডাল। বাগানের টমাটো দিয়ে সামান্য চাটনি। ইস্, একটু গুড় বলতে ভুলে গেলাম।'

দিন তিনেকের মতো চাল-ডাল, তেল-মসলা বের করে রেখে গেছে সুপ্রিয়া। রান্নাঘরে তালাবন্ধ। কেরোসিন-স্টোভখানা বের করে দিয়ে গেছে। নগদ টাকাও কিছু ধরিয়ে দিয়েছে যাওয়ার সময়। চাল-ডাল, মসলা অবশ্যি একজনের মতোই।

আরতি বলে, ওই দিয়ে টেনে-টুনে দু'জনারই হয়ে যাবে। শুধু চালটাই বাড়তি লাগবে। সে তো বাড়িতেও লাগত। তুমি আবার রিকশো নিয়ে বেরোবে নি তো?'

'আবার!' কার্তিক মোহনীয় হাসে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকায়। এ'দিকটা বেশ খোলামেলা। ইস্টার্ন বাইপাসের দু'ধারে এই ধরনের জায়গাগুলো কিছুদিন যাবৎ প্লটে প্লটে বিক্রি হচ্ছে খুব। যানবাহনের সুবিধে বেড়েছে, আর বেশ ফাঁকা-ফাঁকা, দিনরাত আলো-হাওয়া খেলে। কিন্তু থাকবে না। যে হারে বাড়িঘর হচ্ছে, পাঁচ-দশ বছরের মধ্যে ঘিঞ্জি হয়ে যাবে। অথচ, আর জমিই বা কোথায়, কলকাতার ধারে-কাছে!

আরতি বলে, 'বড়া ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। এসো, বসো। শুরু করো। আমি চা বসাই।'

'তুমি খাবে না?' একমুঠো মুড়ি হাতে নিয়ে কার্তিক শুধোয় 'এসো, একসঙ্গে খাই। তোমারটাও নিয়ে এসো।'

আরতি অবাক চোখে তাকায়। সামলে নেয় পরমুহূর্তে। বলে, 'চা-টা নিয়েই আমি চলে আসছি। তুমি শুরু করো না।'

বাইরের দিকে গ্রিল বসানো খোপ-খোপ জানলা। কার্তিক একখানা খোপে বসে। মুড়ি খেতে থাকে বড়া দিয়ে। হাওয়ায় চুল উড়ছে ফুরফুরিয়ে। গায়ের ঘাম জুড়িয়ে যাচ্ছে দ্রুত। কার্তিক খেতে খেতে দেখতে থাকে বাইরের দৃশ্যাবলী।

একটা উঁচু হাইরোড গোছের রাস্তা হচ্ছে বাড়ির পুব দিকে। মাটি ফেলেছে উঁচু করে। লম্বা বাঁধের মতো। ঘাস আর আগাছা গজিয়েছে বাঁধের ঢালে। এই বাড়িটা থেকে বড় জোর শ' পাঁচেক গজ দূরে। দেখতে দেখতে কার্তিক বলে, 'এই বাঁধের ওপর দিয়ে আমি মাঝে মাঝেই রিকশা চালিয়ে যাই। তেমন করে বুঝি নি, কিন্তু এখান থেকে বেশ পাহাড়-পাহাড় লাগছে, বুঝলি! আমরা বিকেলে ওই বাঁধের চুড়োয় গিয়ে বসব।'

দুপুরে খাওয়াটা একটু বেশিই হয়ে গেল। পেটে হাত বুলোতে বুলোতে কার্তিক বলে, 'এবার একখানা ঘুম লাগাতে হবে বেশ জম্পেশ ক'রে।'

দুটো বেডরুমই বন্ধ করে রেখে গেছে সুপ্রিয়া। বসবার ঘর আর ডাইনিংস্পেসটাই খোলা। বসবার ঘরে একখানা লম্বা সোফা। কভার খুলে ধোপাবাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে সুপ্রিয়া। এক কোণে একটা নিচু চৌকি, তাতে পাতলা তোশক। তার ওপর বাহারি বেড-

কভার পেতে, লাল-নীল কুশন দিয়ে সাজিয়ে রাখে। বেড-কভার, কুশনগুলো ঢুকিয়ে রেখে গেছে। চৌকির ওপর শুধু তোশকখানাই পাতা। কয়েকখানা ময়লা বেড-শিট বাইরে রেখে গেছে সুপ্রিয়া। ওগুলো সার্ফে ভিজিয়ে কেচে রাখবে আরতি। আরতি বলে, 'শেষের দিনে কাচব। এখন পেতে শোও।'

তোশকের ওপর একখানা চাদর পরিপাটি করে পেতে নেয় কার্তিক। টানটান হয়ে শোয়। আরতি খিড়কির কলতলায় গিয়ে বাসন-কোসনগুলো মেজে নিয়ে আসে। তারপর শুয়ে পড়ে কার্তিকের পাশটিতে।

শেষ শীতের বেলা, অল্পেতেই পড়ে আসে। অল্পক্ষণ গল্পগুজব করে কার্তিক এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে। আরতি শুয়ে শুয়ে এটা-ওটা ভাবে। একসময় জানলা দিয়ে গাঢ় লালচে রোদ্দুর ঢোকে ঘরে। খিড়কির জবা গাছে একটা হলুদ বেনেবউ বসে রয়েছে সেই কখন থেকে। বেলা পড়ে এলো, তবু তার উড়ে যাবার নামটি নেই। আরতি উঠে বসে। মুখে-চোখে জল দেয়। পরিপাটি করে চুল বাঁধে। হালকা পাউডার লাগায় মুখে। একখানা আকাশি রঙের ফুল-ফুল ছাপা শাড়ি পরে তৈরি হয়ে নেয়। কপালে পরে নীল রঙের টিপ। কার্তিককে ডাকে, 'কই, যাবে যে?'

শেষ বেলার রোদ্দুর, বাঁধের চূড়োয় পড়েছে। ওরা চড়াই ভেঙে উঠতে থাকে। নরম মাটি ঝুরঝুরিয়ে ভেঙে যায়। চপ্পল টাল খায়। পিছলে পড়বার আগেই কার্তিক ধরে ফেলে আরতিকে।

লজ্জা পেয়ে হাসে আরতি, 'আর একটু হলে পড়ে যেতাম নি।'

বাঁধের চুড়োয় উঠে দুজনে পাশাপাশি বসে। সামনে বিশাল ভেড়ি। থই থই করছে জল। পাড়ের কাছাকাছি কচুরিপানার জঙ্গল। বনকলমির দল মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ফিঙেরা দোল খাচ্ছে কলমির ডগায়। ভেড়ির ওপারে সারি সারি নারকোল গাছ। অন্যান্য গাছ-গাছালি। ফাঁকে ফাঁকে দু'চারটে ঘর-বাড়ি। সবকিছু একেবারে দিগন্তের কিনার ঘেঁষে। দিগন্ত বরাবর একখানা লম্বা সবুজ রঙের ফিতে যেন। ওদের পেছনে সূর্য। লালি ধরেছে তার গায়ে। ভেড়ির জল ছলাত ছলাত নাচছে। ছোট ছোট তরঙ্গ উঠছে হাওয়ার টানে! সূর্যের লাল আলো পড়েছে জলের ওপর। ঢেউয়ের ডগা ছুঁয়ে যাচ্ছে রোদ্দুর। পাড়ের কাছাকাছি ছোঁ মেরে মাছ খাচ্ছে বক আর মাছরাঙার দল। কয়েকখানা ডিঙি-নৌকো ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে দূরে দূরে। সবকিছু যেন ছবির মতো লাগে!

আরতি নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে ছবিখানার দিকে। এক সময় বলে, 'বাব্বা! ভেড়ি নয় তো যেন সমুদ্দুর!'

চারপাশটা বেশ ফাঁকা। মাঝে মাঝে ইতস্তত একটা-দুটো একতলা বাড়ি। লাগোয়া দু-একটা নারকোল-সুপারির চারাগাছ, কলমের আম...। এলাকার জমিগুলো বিক্রি হয়ে যাচ্ছে দ্রুত। প্লটে-প্লটে বাড়িঘর হচ্ছে। এইসব মাঠ আর সবুজ বনানী চিরে একদিন রাস্তা চলে যাবে, বিদ্যুতের তার...। দু'-পাঁচ বছরের মধ্যেই পুরো এলাকাটা ইট-কাঠ-কংক্রিটে ভরে যাবে।

সহসা কার্তিক আরতির হাতে হাত রাখে। কার্তিকের কাণ্ড দেখে হকচকিয়ে যায় আরতি। এমন বদরাগী লোকটা। রোজ রাতে রিকশো চালিয়ে ফিরে এসে আরতিকে একটা খিস্তি করে তারপর জল খায়। সামান্য কথায় রুদ্ররূপ ধরে। কথায় কথায় চড়-চাপড় লাগিয়ে দেয়। আসলে ভেতর-মনে মানুষটা ভালো, সহসা আবিষ্কার করে বসে

আরতি।

'আজ রাত্তিরে কী খাচ্ছি আমরা?' নবাবি চালে শুধোয় কার্তিক।

'উঁহ্' সব সময় খালি খাবার চিন্তা!' আরতির গলায় কপট রোষ। পরক্ষণেই হেসে ফেলে, 'সে আমি ভেবে রেখেছি। ঠিক সময়ে জানতি পারবে।'

কিন্তু আরতিই শেষ অবধি পারে না। বলে, 'আজ খিঁচুড়ি রাঁধব। শীতের রাতে জমবে। বউদিমণির বাগানে টমাটো ফলেছে। ডুমো ডুমো কেটে দেবো নি। বেগুনও আছে গাছে। বেগুনি ভাজব। মোড়ের দোকান থেকে একটু বেসম নিয়ে এসো।'

সূর্যটা ডুবে গেল। পাখি-পাখাল ঘরে ফিরছে। অল্প তফাতে, জলের কাছাকাছি কয়েকটা মেছো বক। ওদের বুঝি ঘরে ফেরার কথা মনেই নেই। কিন্তু আরতিরা উঠল। জলের ধারে ঠাণ্ডা বেশি। হাওয়া কনকনে। শাড়িটা গায়ে জড়িয়ে নেয় আরতি। কার্তিকের হাত ধরে সাবধানে নেমে আসে বাঁধের গা বেয়ে।

ঘরে ফিরে জানলাগুলো একে একে বন্ধ করল আরতি। সুইচ টিপে আলো জ্বালাল।

'একটু চা খাবে নাকি?'

'চা খেয়ে একটু বেরোব।'

'না...।' আরতি ঘনঘন মাথা নাড়ে, 'ছাই-পাঁশ গিলতে যাবে তো? আজ সন্ধ্যেয় কোথাও যেতে পারবে নি তুমি।'

'কী করব সারা সন্ধ্যে ঘরে বসে?'

'আমি খিঁচুড়ি রাঁধব, তুমি বসে বসে তাই দেখবে, আর আমার সঙ্গে গল্প করবে।' আরতি মায়াবী হাসে, 'বউদিমণিরা যেমন করে।'

কার্তিক পায়ের ওপর পা তুলে সোফায় চড়ে বসে। আরতি চা এগিয়ে দেয়। চায়ের সঙ্গে দুটো পাঁপড় হলে জমে যেত। পাঁপড় নেই। অগত্যা শুধু চা-তেই সন্তুষ্ট থাকতে হয় কার্তিককে।

চা শেষ করে বিড়ি ধরায় কার্তিক।

আরতি ব্যস্ত হয়ে ওঠে, 'মেঝেতে ছাই ফেলো নি। দাদাবাবুর ছাইদান রয়েছে ওই ওখানে, নিয়ে এসো। বউদিমণি খুব সাফ-সুতরো রাখে ঘর। তাকে-তাকে কেমন পুতুল সাজিয়ে রেখেছে।'

এককালে তিন-চার ক্লাস অবধি পড়েছিল কার্তিক। বাংলাটা খটোমটো পড়তে পারে এখনও। টেবিলের ওপর একখানা রঙচঙে বই দেখে তুলে নিল হাতে।

'এই, কি করছ তুমি?' আরতি হা-হা করে ওঠে, 'দাদাবাবুর বইপত্তর। একদম হাত দিও নি। বই হলো দাদাবাবুর প্রাণ।'

আরতির এই গিন্নিপনায় সামান্য বিরক্ত হলো কার্তিক। বাড়িতে থাকলে একটা খেউড় করত নির্ঘাত। কিন্তু এখানে, ও যেন একেবারে অন্য মানুষ। আরতির কথায় হাসে। বলে, 'বছর-কয় সবুর ধর্, বাড়িটাতে হাত দেবো। ব্যাঙ্ক থেকে লোনে একটা রিকশা পেলে ভালো হতো। রোজ রোজ মালিককে সাত টাকা দিতে গায়ে বড্ড লাগে।'

'তোমাকে লোন দিতে ওদের বয়ে গেছে।' আরতির গলায় ক্ষোভ এবং হতাশা, 'ওরা সব শাঁসালো পার্টি দেখে দেখে হাত উপুড় করে।'

কথাটা মিথ্যে নয়। তবুও একটা আশার আলো রয়েছে সুমুখে। গণপতি দাস, ওদের এলাকার নেতা, কথা দিয়েছে ওকে। শ-দুই খরচ করলে ব্যাঙ্ক থেকে একখানা রিকশো

বের করে দেবে। গণপতির প্রসঙ্গে ক্ষেপে যায় আরতি। পয়সা না পেলে বাক্যি খসায় না যে মানুষ, সে কিনা রিকশো পাইয়ে দেবে!

কার্তিক বলে, 'না-রে, টাকা নেয় বটে, লোকটা কাজও করে দেয়। বারো-শো নিল বটে, কিন্তু জমিটা তো দিল।' বিড়বিড় করে নিজের মনে বলতে থাকে কার্তিক, 'নিজের রিকশা হলে ডবল-টাইম খাটব। বাড়ি একটা না হলেই নয়।'

বিড়িটা নিভে গিয়েছিল। ছাইদানিতে গুঁজে দিয়ে উঠে দাঁড়ায় কার্তিক। চলে যায় বেসন আনতে।

খিচুড়িটা ভালোই জমল। বাগানে কাঁচালঙ্কাও ছিল। আর বেগুনগুলোও খুব কচি। ডাইনিং-টেবিলে বসে খুব তৃপ্তি করে খেলো দু'জনে।

শীতটা ছাড়ি-ছাড়ি করেও ছেড়ে যায় নি এখনও। রাতের বেলায় শীত করছে। তার ওপর এমন ফাঁকা জায়গায় কনকনে হাওয়ার দাপট। কার্তিক একখানা কম্বল এনেছিল বাড়ি থেকে। তাই গায়ে দেয় দুজনে।

চৌকিতে কম্বলের মধ্যে পাশাপাশি শুয়ে একসময় আরতিকে কাছে টেনে নেয় কার্তিক। আরতি বহুদিন বাদে অনাবিল হারিয়ে যায়।

চার

সকালবেলায় পুবেয় জানলা খুলতেই বাঁধের ওপারে লাল টকটকে সূর্য। ভেড়ি এবং নারকোল বনের ওপারে। শনশন হাওয়া বইছে। সবুজ নারকোল গাছের চূড়োগুলো দোল খাচ্ছে। কার্তিক একনজরে দেখতে থাকে সূর্যটাকে।

আরতি পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে।

কার্তিক বলে, 'এই আরতি, তুই কাজে যাবি নে?'

'নাহ্' আড়মোড়া ভেঙে পাশ ফিরে শোয় আরতি, 'তিনদিন ছুটি নিইচি।'

'বলিস কি!' কার্তিক অবাক হয়ে যায়। সহসা খুশি খুশি হয়ে ওঠে মন। শুয়ে শুয়ে খানিক বাদে বিছানা ছাড়ে। আড়মোড়া ভেঙে হাই তোলে। খিড়কির দরজা খুলে পেছনে আসে।

কলতলাটা পেরোলেই সবজির বাগান। রাতে হিম পড়েছে খুব। পাতাগুলো ভিজে সপসপে। তার ওপর দিনের প্রথম আলো পড়ে চিকচিক করছে।

নিমের দাঁতন দিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে সবজি-বাগানের মধ্যে অনেকক্ষণ পায়চারি করে কার্তিক। গাছগুলোকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। শুকনো পাতা ঝরিয়ে দেয় কিছু। একটা হেলে পড়া বেগুনের ডাল কাঠি দিয়ে সোজা করে দেয়। ততক্ষণে আলসেপনা পায়ে বাইরে এসেছে আরতি। চোখ থেকে তখনও ঘুম যায় নি। কাল অনেক রাত্তির অবধি ঘুমুতে দেয়নি মানুষটা।

'বালতিতে জল ভরে নিয়ে গাছগুলোতে দাও।' আলতো হাই তুলতে তুলতে আরতি বলে, 'আমি চা করছি ততক্ষণ।'

শুধু জলই দিল না কার্তিক, কলতলার রাস্তাটা ঝাঁটপাট দিয়ে পরিষ্কার করে দিল। ডালপালায় তখন সোনালি রোদ্দুর। ঘাসের ওপর শিশিরের ফোঁটাগুলো হিরের মতো

জ্বলছে। বাঁধের ওপর দিয়ে গরুর পাল চলেছে। কোনও খাটালের গরু নির্ঘাত। ভেড়ির ধারে নিয়ে চলেছে ঘাস-জল খাওয়াতে। ভেড়ির পাড়ে কচি কচি ঘাস। খুব হেলতে দুলতে চলেছে গরুগুলো। এমন মুক্ত জীবন ওদের কপালে বড় একটা জোটে না। গাঁয়ের গরুদের মতো দিনভর চরে বেড়াতে পারে না মাঠে মাঠে। এরা কালে-ভদ্রে ভেড়ির জলে চান করবার এবং নরম ঘাসে চরে বেড়াবার সুযোগ পেয়েছে। পিঠের ওপর তাই লেজ আছড়াচ্ছে আহ্লাদে। সামান্য শিং নেড়ে এর-ওর সঙ্গে খুনসুটি করছে। আর দিনের প্রথম রোদ্দুর পড়েছে ওদের পিঠে।

বাঁধের পিছনে, গাঢ় সবুজ ফিতেটা দিগন্তের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অর্ধচক্রাকারে ছড়ানো। সবুজ ফিতে এবং উঁচু বাঁধের মধ্যিখানে রয়েছে ভেড়িটা। কার্তিক দেখতে পাচ্ছে না ওটা। ভেড়িটা রয়েছে বাঁধের আড়ালে। এতক্ষণে সকালের উদ্দাম হাওয়ায়, নিশ্চয়ই ছলাত ছলাত নাচতে লেগেছে ভেড়ির জল। মেছো বকের দল হাজির হয়ে গেছে এতক্ষণে। দখল নিয়েছে পাড়গুলোর।

পায়ে পায়ে ঘরে ফিরে আসে কার্তিক। আরতি চা এগিয়ে দেয়। দিনের প্রথম চায়ের কাপে চুমুক মারে কার্তিক। 'আহ্' গোছের আরামের শব্দ তোলে গলায়। সূর্য ততক্ষণে উঠে গেছে অনেকখানি ওপরে। চা খেতে খেতে কার্তিক জানলা দিয়ে দেখতে থাকে বাইরের দৃশ্যপট। ভারি অচেনা লাগে পুরো এলাকাটাকে। জানলার ফ্রেমটাকে একখানা ছবির ফ্রেম ধরলে, বাইরের দৃশ্যখানা যেন ওই ফ্রেমের মধ্যে আটকানো এক নিটোল ছবি। যেমন ঢাউস ছবি টাঙানো থাকে বাবুদের ঘরের দেওয়ালে।

'জানিস আরতি' চা খেতে খেতে কার্তিক বলে, 'এলাকাটাকে এই ঘর থেকে বড্ডই অচেনা লাগছে। দিনরাত তো ওইসব এলাকায় রিকশা নিয়ে গেছি কতবার। কিন্তু এখন কেমন যেন মনে হচ্ছে,, জায়গাটাকে তো আগে দেখিইনি কোনও দিন।'

'ঢং দেখে আর বাঁচি নে।' আরতি অপরূপ ভঙ্গি করে হাসে, 'বাথরুম সেরে একটুখানি বাজারে যাও। একটু কুচো চিংড়ি নিয়ে এসো, লাউ দিয়ে রাঁধব।'

এখান থেকে ভেড়ির জল দৃশ্যমান নয়। সেই কারণেই বুঝি ওই নিয়ে কার্তিকের কৌতূহলটা বেশি। এই মুহূর্তে ভেড়িটাই টানছে ওকে। চায়ের কাপে লম্বা চুমুক মেরে কার্তিক বলে, 'আজ বিকেলে লঞ্চে চড়াব তোকে।'

খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে আরতি, 'লঞ্চ কোথা পাবে এখানে?'

কার্তিক জানে সেটা। ভেড়িতে লঞ্চ নেই। ডিঙিনৌকো গোটা দু-তিন। ঘুরে ঘুরে মাছ ধরে। একটা চালায় সন্তোষ মাঝি। কার্তিকের সঙ্গে এক ঠেকে মদ খায়। কার্তিক বললে বিনে পয়সায় ঘুরিয়ে আনবে একপাক। আরতির প্রতি ওর কিঞ্চিৎ নেক নজর আছে বলে মনে হয় কার্তিকের। কারণে-অকারণে আরতির প্রসঙ্গ তোলে মদের ঠেকে। আরতির প্রসঙ্গে ভারি মনোযোগী হয়ে ওঠে। ঢুলে আসা চোখের পাতা ঈষৎ টানটান হয়।

কার্তিক বলে, 'চল্ না, যদি তোকে লঞ্চে চড়িয়ে হাওয়া না খাওয়াই আজ। তোকে নিয়ে আজ নৌকাবিলাস খেলব ভেড়িতে।' বলতে বলতে কার্তিক বাচ্চা ছেলের মতো ছটফটে হয়ে ওঠে। হো-হো করে হাসতে গিয়ে কাপের চা ছলকে পড়ে মেঝেয়।

'ফেললে তো!' আরতি গম্ভীর হয়ে যায়, 'এই জন্যেই তোমাদের কোথাও আনতে নেই। বউদিমণি দিনরাত কত সাফ-সুতরো রাখে ঘরদোর। ধুয়ে মুছে মেঝে, চাতাল

সব ঝকঝকে করে রাখে। কী ভাববে বল দেখি ও!'

'আরে, তুই তো মুছবিই একটু বাদে।'

'আমি মুছি, কি না মুছি, কথায় কথায় ঘরদোর নোংরা করা তোমাদের অব্যেস।' বলতে বলতে ক্ষেপে যায় আরতি।

'আরে, মুছে দিলেই তো সাফ হয়ে যাবে।' সমঝোতা চাইছে কার্তিক।

'না, যাবে না।' দ্বিগুণ ফুঁসে ওঠে আরতি, 'বউদিমণি বলে, চায়ের ছোপ পুরোপুরি ওঠে না। চায়ে কষ আছে।'

আধ-খাওয়া চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে আরতি ছুটল। পেছন থেকে কার্তিক ডাক পাড়ে, চা-টা শেষ করে মুছলে কী হয়? ততক্ষণে ভিজে-ন্যাকড়া নিয়ে ফিরে এসেছে আরতি। আহা, যত দেরি হবে, কষটা মেঝেয় বসে যাবে নে? ঘষে ঘষে চা-টুকু তুলে নেয় ন্যাকড়ায়। গজগজ করতে থাকে সামনে। সাফ-সুতরো থাকবার মাহাত্ম্য বোঝাতে থাকে কার্তিককে। শুধু জিনিসপত্তর কিনলেই হয় না, তাকে যত্ন করে রাখতি হয়। যত্নের অভাবে দামি জিনিসও নষ্ট হয়ে যায়। সবাইয়ের সেই যত্নটাই আসে না। কথাগুলো আরতি কাকাতুয়ার মতো আউড়ালো বউদিমণির মুখ থেকে। বউদিমণি কথাটা প্রায়ই শোনায় দাদাবাবুকে। না, কোনও গেরস্থালি সামগ্রী নিয়ে বলে না। বলে নিজেকে নিয়েই। মাঝে মাঝে সাক্ষী মানে আরতিকেই, বল্ আরতি, বিয়ে করলে টুকটুকে দেখে, তারপর তাকে মেনটেন না করলে—। কথাগুলো বলতে বলতে আরতি আড়চোখে তাকায় কার্তিকেব দিকে। দামি জিনিস ধুয়ে-মুছে ঝকঝকে রাখতি হয়। নইলে, চাঁদের অঙ্গেও ধুলোবালি জমে। কী বুঝলে?

কী কথা থেকে কী! কার্তিক চমকে তাকায়। আরতির ইঙ্গিতটা বুঝতে পারে স্পষ্ট। দু'চোখ বড় বড় হয়ে ওঠে। আমার আরতিরানী কত কথা শিখেছে গো! কী সুন্দর সুন্দর কথা! এসব তুই জানতি, নাকি এই দু'দিনে শিখলি? কার্তিক হো-হো করে হেসে ওঠে।

পাঁচ

বিকেল বেলায় নৌকোয় চড়ে আরতি কী খুশি!

মাছধরা নৌকো। ভেজা জাল এককোণে স্তূপাকারে। সারা নৌকো জুড়ে আঁশটে গন্ধ। এমনকি মানুষগুলোর গায়েও। সন্তোষ ছাড়াও রয়েছে আর একজন মাঝি এবং একজন হেল্পার। সাকুল্যে পাঁচজন।

সন্তোষ বলে, 'এ হলো মধুকর ডিঙা।'

'কোথা যায় ডিঙা?' কৌতুকে শুধোয় কার্তিক।

'ডিঙা যায় সওদা করতে।'

'কী সওদা করবে, চাঁদ সওদাগর?'

'দেখি, তেমন সরেস সওদা যদি মিলে যায় কপালে গুণে।' সন্তোষ আলতো চোখ হানে আরতির দিকে। ঠোঁটের কোণে আঠাল হাসি।

'ওরে চাঁদু—!' কপট রোষে ফুঁসে ওঠে কার্তিক, 'তুমি এই সওদায় বেইরেছ তবে!'

অন্যদিন হলে নির্ঘাত ক্ষেপে যেত, কিন্তু আজ আরতি হেসে কুটিকুটি হয় সন্তোষের কথায়। বলে, 'ওইখানে, ওই মাঝ-জলে নিয়ে চলো সন্তোষদা। ওইখান দিয়ে।' টলোমলো নৌকোয় সে টাল খেতে থাকে বারবার। কার্তিকের মাথায়, ঘাড়ে, পিঠে হাত ঠেকিয়ে সামাল দেয় কোনও গতিকে। হু-হু হাওয়ায় তার তাঁতের জল-ঢেউ-ঢেউ শাড়িখানি বেসামাল হয়ে ওঠে। আর ঠিক সেই সময়ে সন্তোষ উচ্চস্বরে গান ধরে, নির্মলেন্দুর গান, বুকের কাপড় হাওয়ায় উড়াইয়া লইয়া যায়—।

সহসা যেন সারা শরীর কেঁপে কেঁপে ওঠে আরতির। শরীর নিয়ে ইঙ্গিত মাঝে মাঝেই করে কার্তিক। সন্তোষও করে বলে কানাঘুষোয় শুনতে পায়। পেটে দু'ফোঁটা পড়লেই কার্তিকের মুখ একেবারে আলগা হয়ে যায়। হাসতে হাসতে বলে, সন্তোষটা তোকে নিয়ে কী বলে জানিস? বলতে বলতে হেসে গড়িয়ে পড়ে মাতাল লোকটা। আরতি কখনও এড়িয়ে যায়, কখনও খেপে টং হয়। কিন্তু আজ, মাঝ ভেড়িতে, ছলাত ছলাত জলের মধ্যিখানে, উথাল-পাথাল হাওয়ায় সন্তোষের ভরাট গলায় গান শুনে অবধি, কেমন যেন সিরসির করে ওঠে ওর সর্ব শরীর। গানের কলিটি যেন বার বার নির্লজ্জ হয়ে ওঠে। যেন সর্বসমক্ষে বারবার দু'হাত দিয়ে সরিয়ে দেয় আরতির বুকের আঁচল। আরাতিকে পুরোপুরি বেআব্রু করেই যেন তার সুখ। আরতি আঁচল সামলাতে এমনই ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে, উড়ন্ত মাছরাঙাটি একটি বড়সড় মাছ ছোঁ মেরে নিয়ে যায়, সবাই হইচই করে দৃশ্যটা দেখায় ওকে, কিন্তু মনোযোগ দিয়ে দেখতেই পারে না। আফসোসে বুক ভারী হয়ে আসে তার। হাওয়াকে ছেড়ে সহসা সবটুকু রাগ গিয়ে পড়ে সন্তোষের ওপর।

সন্তোষকে চেনে আরতি আগে থেকেই। মাঝে মাঝে এসেছে ও, আরতির উঠোন অবধি। কখনও টাল-মাটাল কার্তিককে পৌঁছে দিতে। কখনও, কার্তিক কেন ঠেক-এ যায় নি, তাব খোঁজ নিতে। কখনও বা, 'কার্তিক রোগী লিয়ে গেছে হাসপাতালে। আজ রাতে ফেরা দুষ্কর। খবরটা তোমাকে দিতে বলল।' এতখানি অবধি ঠিক আছে। কিন্তু খবরটা দেবার পরও মাঝ-উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকবে লোকটা। লম্বা, পেটাই শরীর, বেশ পুরুষালি চেহারা। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। পা'দুখানি ঈষৎ টলোমলো। চোখদুটি ঈষৎ ভাসাভাসা। বলে, 'কী বুঝলে?'

'বুঝেছি!' আরতি ঘরের ভেতর থেকে ঠাণ্ডা গলায় বলে।

'চলে যাবো?' সন্তোষ নির্দোষ গলায় শুধোয়।

এ আবার কেমন কথার ছিরি! আরতির গা জ্বলে যায়। গুমরে মরে ভেতরে। জবাব দেয় না।

'কিছু বলবে?'

আরে! জবাব না দিলে লোকটা যাবে না দেখছি। আরতি ঠাণ্ডা গলায় বলে, 'না'।

তাও একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চলে যায় সন্তোষ। খারাপ কিছু নয়, একটু ছোঁক-ছোঁক লোকটার, এই যা। মাঝে মাঝে রাগ হয় আরতির, হাসিও পায়।

কিন্তু তার অমন সুন্দর ভরাট গলা! আরতির যেন বিশ্বেসই হয় না। মাঝ-ভেড়িতে, উথাল-পাথাল জলের মধ্যিখানে, টলোমলো নৌকোয় বসে সে যখন টান দেয়, কূল নাই—কিনার নাই—ই—ই—ঈ—, তখন অকস্মাৎ ওই মানুষটার মধ্যে এক অন্য জাতের মানুষকে চিনে ফেলে আরতি। সন্তোষকে এক মহাগুণী শিল্পীর আসনে বসিয়ে ফেলে

সে। আর, একজন গুণী শিল্পীর যা যা প্রাপ্য তার মহিলা-ভক্তর কাছ থেকে, সব কিছু এক লহমায় দিয়ে বসে তাকে। সন্তোষ ততক্ষণে বাঁ-হাত কানে চেপে, দু'চোখ মুদে, এক্কেবারে খাদে ধরেছে, পদ্মগন্ধে মজে আছি—।

মাঝ-ভেড়ি থেকে নৌকোটা আস্তে আস্তে তীরে এসে ভিড়ল। আরতি লাফিয়ে নামল। কাপড়-চোপড় সামলে নিয়ে ডাঙায় গিয়ে দাঁড়াল। সন্তোষ ততক্ষণে গানের অন্তিম কলিটি শেষ করেছে। সহসা কেমন যেন গুম মেরে যায় সন্তোষ। মুখচোখ থমথমে হয়ে থাকে। সূর্যটা তখন ডুব মারছে, ভেড়ির ওপারে, গাছ গাছালির আড়ালে।

ছয়

সকালবেলায় চোখ খুলতেই কার্তিক দেখল, বিছানায় নরম রোদ্দুরে পড়েছে, এবং আরতি পাশটিতে নেই।

আরতি ঘুরছিল পেছনের সবজি-বাগানে। দোয়েলের মতো হালকা পায়ে হেঁটে বেড়াচ্ছিল বাগানময়। সবুজ পাতা কিংবা রঙিন ফুলের পাপড়িকে আলতো ছুঁয়ে যাচ্ছিল ওর আঙুল। জানলা দিয়ে দৃশ্যখানা দেখল কার্তিক। পায়ে পায়ে এগোল আরতির দিকে। সকালের নরম বোদ্দুরে আরতির সারামুখে মিষ্টি আভা। আরতি কার্তিকের দিকে তাকায়। চোখাচোখি হওয়া মাত্তর ওর সারা মুখে ঝলকে ঝলকে রক্ত জমে। নাকের ওপর লাল জড়ুলটি টসটসে হয়ে ওঠে।

আরতিকে বিস্মিত চোখে দেখতে থাকে কার্তিক। তাই দেখে আরতির লজ্জা যেন বেড়ে যায় দ্বিগুণ। গেল-রাতের কথা মনে পড়ে।

দুপুরে ফেরার কথা, কিন্তু সুপ্রিয়ারা ফিরল বিকেলে। ট্রেন লেট। ট্যাক্সি গিয়েছিল জ্যামে আটকে।

সন্তোষ চা মুড়ি খেয়ে দুপুরের আগেই চলে গেছে। আরতি ঘর-দোর ঝেড়ে মুছে অপেক্ষা করছিল বারান্দায়। সুপ্রিয়ারা চোখে-মুখে একরাশ ক্লান্তি নিয়ে ঢুকল। ঝকঝকে ঘর দোর, সবকিছু সাজানো-গোছানো,—দেখে-শুনে অল্পক্ষণেব মধ্যেই মনটা ঝবঝরে হয়ে গেল সুপ্রিয়ার। আরতি দেখল, সুপ্রিয়ার চোখে-মুখে ক্লান্তি যত না, তার চেয়েও বেশি খুশির ঝিলিক।

সুপ্রিয়া বলে, 'কী সুন্দর যে বেড়ালাম, আরতি! সমুদ্রে কী ঢেউ! ঝাউবনে কী হাওয়া! মনে হচ্ছিল, থেকে যাই ওখানেই। যে বাংলোটায় আমরা ছিলাম, তার ব্যালকনি থেকে নুড়ি ছুঁড়লে সমুদ্রের জলে পড়ে। আর সারারাত কী গর্জন! ভয় করছিল আমার!'

আরতি হাসে, 'চা করি?'

'কর্। আর, লঞ্চে চড়েছি, জানিস? লঞ্চটা কী দুলছিল! কী ভয় করছিল!'

বউদিমণির চোখে-মুখে কিন্তু ভয়ের লেশমাত্র দেখতে পেল না আরতি। ভয় পাওয়াটাও যেন এক ভারি খুশির ব্যাপাব শুর।

'তোরা সব ভালো ছিলি তো রে? তোর বর এসেছিল শুতে? রান্নাবান্না করেছিলি? ভয় করেনি তো?' প্রবল খুশির তোড়ে একটার পর একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে মারতে থাকে

সুপ্রিয়া।

আরতি ঠোঁট টিপে হাসতে থাকে। বউদিমণির খুশিখানা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে থাকে যেন।

একসময় বলে, 'আমরাও বেড়িয়ে এলাম গো, বউদিমণি। কী খুশিতে যে কাটল দু'জনাতে!'

'কোথায় বেড়িয়ে এলি!' সহসা আকাশ থেকে পড়ে সুপ্রিয়া। গম্ভীর হয়ে যায় ভীষণ। চোখে-মুখে গাঢ় উৎকণ্ঠা জমে।

'সে এক দারুণ জায়গা গো, বউদিমণি। সেখানে পাহাড়ও আছে, সমুদ্দুরও।' আরতির ঠোঁটের কোণে গূঢ় হাসি, 'একটা নিচুমতো পাহাড়, তার ওপারে বিরাট সমুদ্দুর, তারও ওপারে বন। রোজ সূয্যি উঠত বনের আড়াল থেকে। ডুবত সমুদ্দুরের মধ্যে। আর, আমরাও লঞ্চে চড়েছিলাম গো। মাঝ-সমুদ্দুরে গিয়ে কী যে ভয় করছিল আমার! আমরাও একটা ছিমছাম বাংলোয় ছিলাম। ঠিক পাহাড়ের কোলেই। কী ভালোই না কাটল ক'টা দিন!'

'কী বলছিস তুই, আরতি?' সুপ্রিয়ায় চোখে পলক নেই। সন্দেহে, রাগে থমথম করছিল মুখ।

'হ্যাঁ গো, বউদি—।' আরতি চোখদুটিকে পাখির মতো উড়িয়ে দেয় আকাশে, 'আমাদের ফাটা কপালেও বেড়ানোর কথা লেখা থাকে। সুযোগ পেয়ে সেটা আর ছাড়তে পারলাম নি গো। তুমি হয়তো বিশ্বেস করবে নি, আমরাও কী ভালোই যে বেড়িয়ে এলাম!'

দ্বীপগুলি

এক

সাধারণ সম্পাদকের ভাষণ দিয়েই অনুষ্ঠান শুরু হল।

হরষিতের আজ অনুষ্ঠানে আসবার ইচ্ছে ছিল না। কদিন ধরে শরীরটা ভালো নেই। বুকের মধ্যে এক ধরনের যন্ত্রণা। খুবই দুর্বল বোধ করছেন। তাও শেষ মুহূর্তে অণিমার পীড়াপীড়িতে এসেছেন। কিন্তু হলের মধ্যে ঢোকা অবধি শরীরটা আইঢাই করছে।

পুরু লেন্সের চশমার আড়ালে একজোড়া উজ্জ্বল চোখকে আরো বাঙ্ময় করে ভাষণ দিতে উঠলেন 'ইন্দ্রপুরী' হাউসিং এস্টেট'-এর ওয়েলফেয়ার কমিটির সাধারণ সম্পাদক উপমন্যু সিকদার।

বন্ধুগণ, ইন্দ্রপুরী হাউসিং এস্টেটের ত্রয়োদশ বিজয়া সম্মিলনী উপলক্ষে ভাষণ দিতে গিয়ে আজ অতীতের দিনগুলো বারবার ধাক্কা মারছে স্মৃতির দরজায়। ইস্টার্ন বাইপাসের লাগোয়া এই সাজানো-গোছানো আবাসন প্রকল্পটি দীর্ঘ কুড়ি বছরের ঘাম ঝরানোর ফল। এককালে ওটা লবণহ্রদ এলাকার মধ্যেই ছিল। আজ কল্পনা করাও কঠিন, এইসব এলাকার অবস্থা বিশ বছর আগেও কেমন ছিল! খোদ ইস্টার্ন-বাইপাসই তখন কাগজের প্ল্যানে ঘুমোচ্ছে। সেই সময়ে, সত্তর বিঘে জলা জায়গা জুটিয়ে নিয়ে শুরু করেছিলুম আমরা ক'জনায় মিলে। বাইরের থেকে মাটি বয়ে এনে ভরাট করা হলো জমি। রাস্তাঘাট তৈরি হলো। প্লটে-প্লটে ভাগ হলো। পানীয় জলের বন্দোবস্ত। প্রচার। মানুষ কি প্রথম প্রথম আসতে চায় এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায়? দু-চারজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ এলেন। জমি কিনে বাড়ি বানালেন। দেখাদেখি আরো অনেকে। আপনারা এলেন। ধীরে ধীরে ভরে গেল, 'ইন্দ্রপুরী'র সবকটি প্লট। 'ইন্দ্রপুরী' এখন তার চারপাশের সীমানা বাড়াতে চাইছে। আবো অন্তত একশটি প্লট বানাবার মতো জমি আমাদের জোগাড় করতেই হবে। কারণ, সমাজের বহু বরেণ্য ব্যক্তি আজ 'ইন্দ্রপুরী'তে সেটল্ করতে চাইছেন। অত্যন্ত গর্বের বিষয়, আজ 'ইন্দ্রপুরী' বৃহৎ কলকাতার যে কোনো অভিজাত এলাকাকে প্রথম দর্শনেই লজ্জা পাইয়ে দেবে। কী নেই এখানে? চারটি সেক্টরে সাড়ে তিনশ প্লটের এই আধুনিক নগরীর মধ্যে রয়েছে সুসজ্জিত পার্ক, শিশু-উদ্যান, স্পোর্টর্স-কমপ্লেক্স, শপিং-সেন্টার, স্কুল-কলেজ-লাইব্রেরি, নিজস্ব মেডিকেল ইউনিট, কমিউনিটি হল, ক্যাসেট লাইব্রেরি, ওপেন স্টেজ, সেলুন-লন্ড্রি-বিউটি পার্লার, হবি-সেন্টার—অ্যাণ্ড হোয়াট নট! আর সর্বোপরি রয়েছেন আপনাদের মতো কিছু রুচিসম্পন্ন সংস্কৃতিবান মানুষ, যাঁরা কেবল শান্তিপূর্ণ অত্যাধুনিক জীবনযাপনের টানে 'ইন্দ্রপুরী'কে বেছে নিয়েছেন। সবকিছু মিলিয়ে 'ইন্দ্রপুরী' আজ রাজধানীর দুঃসহ জীবনের পাশাপাশি এক টুকরো শ্যামল মরুদ্যান। এখানে জীবন মধুর, স্নিগ্ধ, সুশৃঙ্খল। এক ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড়...। অশান্তি, উদ্বেগ, বিশৃঙ্খলা, হইচই, 'ইন্দ্রপুরী'তে ঢুকতে সাহস পায় না...।

শেষ বয়েসে হরষিত যখন এক টুকরো জমি খুঁজে খুঁজে হয়রান, তখনই অণিমা নিয়ে এলেন খবরটা। হরষিতরা তখন বাগবাজারে একটা আড়াই কামরার ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে থাকতেন। ওখানেই কেটেছে দীর্ঘ তেত্রিশটি বছর। নিজের বাড়ির স্বপ্ন অণিমাই দেখত বহুদিন ধরে। মেয়েরাই আগে দ্যাখে। স্বপ্নটা হরষিতের মনেও সংক্রামিত হচ্ছিল। কিন্তু উপায় ছিল না তখন। তিন মেয়ে এবং এক ছেলের ভরণপোষণ, এডুকেশন, মেয়েগুলোকে সুপাত্রস্থ করা—এসব চুকিয়ে-টুকিয়ে বাড়ির কথা ভাববার সময় পাওয়া গেল যখন, হরষিতের রিটায়ারমেন্টের আর বছর দু-তিন বাকি। একমাত্র ছেলে টিকু সবে ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয়েছে প্রেসিডেন্সি কলেজে। বছরখানেক চলল জমি খোঁজাখুঁজি। নিজের পাড়ারই শেষ প্রান্তে এক টুকরো জমি বিক্রি ছিল। পাড়ার শুভানুধ্যায়ীরা এক বাক্যে পরামর্শ দিয়েছিল, জমিটা কিনে ফেলুন। এমনকী, জমির মালিক সুশোভনবাবুও বলেছিলেন, আপনি যদি নেন তো কমে-টমে দিয়ে দেব। হাজার হোক, আপনার মতো মানুষ এ পাড়ায় থাকলে—। হরষিত নিমরাজি হয়েছিলেন। কিন্তু বাধ সাধলেন অণিমা। এ পাড়ায় মরে গেলেও বাড়ি করবেন না। অণিমার যুক্তিগুলোকেও একেবারে উড়িয়ে দিতে পারেননি হরষিত। তিনিও তো পাড়াটাকে দেখছেন তিন দশকেরও বেশি। এককালে হয়ত বনেদী মানুষজনের বাস ছিল, কিন্তু এখন একেবারে বসবাসের অযোগ্য। বিশেষ করে, বুড়ো বয়েসে মানুষ যে একচিলতে শান্তি খোঁজে, সেটিই এখানে পুরোপুরি অনুপস্থিত। সরু সরু গলিগুলো বাহাত্তুরে বুড়োদের শরীরের শিরা-উপশিরার মতো চারিয়ে গেছে পাড়াময়। দিনের বেলাভেও কেমন অন্ধকার ভাব। ওর মধ্যে বসবাসের বাড়িঘর, মুদির দোকান, কয়লার ডিপো, গম ভাঙানোর কল, লন্ড্রি, সেলুন...। রাস্তাগুলো খানাখন্দতে বোঝাই। দু'পাশের কল থেকে চব্বিশ ঘণ্টা ঘোলাটে জল বয়ে গিয়ে খানা-খন্দগুলো ভরিয়ে তোলে। রাস্তার দুধারে নোংরা ড্রেন। তাতে আদ্যিকালের কাদা-ময়লা মাখানো তেলতেলে কালো জল। পচা বেড়াল ছানা...। মরা সাপের মতো ওই আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়ে গিজগিজ করে হেঁটে চলেছে মানুষ। ছুটে চলেছে টেম্পো, অটোরিকশো, ঠেলা...। বেওয়ারিশ ষাঁড় শুয়ে রয়েছে রাস্তার মাঝ-বরাবর। অল্প হাঁটতেই প্রাণ হাঁফিয়ে ওঠে। গলির মুখেই ট্রাম-রাস্তা। ভোর তিনটে থেকে রাত বারোটা অবধি ঘড়ঘড়িয়ে চলছে ট্রাম। কেঁপে কেঁপে উঠছে পুরনো কালের বাড়িঘর। ছুটে চলেছে ডবল-ডেকার বাস, মিনি, বিশালকায় ট্রাক। তাদের সমবেত গর্জন এবং কালো ধোঁয়ায় এ এলাকার বাতাস বিষাক্ত হয়ে থাকে বারো মাস। তাও পাড়াটায় যদ্দিন শান্তি ছিল, এসব মেনে নেওয়া গেছে। ইদানীং তাও উধাও। ভদ্রবাড়ির ছেলেপিলেরা সব প্রকাশ্যে মস্তানি-গুণ্ডামি করে বেড়ায়। জবরদস্তি চাঁদা আদায় করে। দিনভর রাতভর অকারণে মাইক বাজিয়ে ফুর্তি করে। হাজার ফিকিরে মানুষের ওপর জুলুম করেই ওদের সুখ। ওদের আবার তিন-চারটে দল। সব এক-একটি পার্টির টিকিতে বাঁধা। আলাদা আলাদা চাঁদা দিয়ে তুষ্ট রাখতে হয় প্রত্যেককে। মাঝে মাঝে কারণে-অকারণে বেধে যায় শুম্ভ-নিশুম্ভের লড়াই। বোমা ফাটে। চাকু-পিস্তল চলে। লাশ পড়ে! এইসব নিয়ে সর্বক্ষণ বাস করতে গিয়ে স্নায়ুর ওপর যে প্রচণ্ড চাপ পড়ে, তা সহ্য করাই কঠিন। অ্যাদ্দিন তবু বয়েসের জোরে কিংবা নিরুপায় হয়ে সবই সয়েছেন হরষিত। কিন্তু বুড়ো বয়েসে এসব সইবে না। এখন চাই শান্ত পরিবেশে ছিমছাম একখানি বাড়ি। নিটোল দিঘির মতো স্বচ্ছ নিরুদ্বেগ জীবন।

অণিমা বলল, 'সনৎ একটা জমির খোঁজ পাঠিয়েছে।'

'কোথায়?'

'ইস্টার্ন বাইপাসের ধারে সুন্দর হাউসিং এস্টেট। ওখানকার পরিবেশের নাকি তুলনাই হয় না।'

দামটা কিছু বেশিই পড়ল। কিন্তু পুরো এস্টেটখানা দেখে দু'চোখ জুড়িয়ে যায় হরষিতের। কলকাতার ধার ঘেঁষে এমন এক 'ইন্দ্রপুরী' ছিল, ভাবাই যায় না! হাউসিং এস্টেট তো নয়, কোনো শিল্পীর নিপুণ হাতে আঁকা একখানা ছবি বুঝি! প্রতিটি প্লট তিন কাঠা করে। একেবারে সমান মাপের। সামনে ঋজু-প্রশস্ত পিচের রাস্তা। তেলতেলে মসৃণ। রাস্তার দু'ধারে সারিবদ্ধ প্লটগুলোতে হাল-ফ্যাশানের দোতলা বাড়ি। বাড়ির সামনে একচিলতে বাধ্যতামূলক বাগান। রাস্তার দু'ধারে কৃষ্ণচূড়া, দেবদারু, সিলভার-ওক, জ্যাকারাণ্ডা লাইন করে লাগানো। সব কিছুই সুপরিকল্পিত, সুবিন্যস্ত। তিন-চারখানা মাত্র প্লট খালি ছিল তখনো। চটপট তারই একখানা কিনে ফেললেন হরষিত।

হাউসিং এস্টেটের একটি নির্বাচিত ওয়েলফেয়ার কমিটি আছে। তারাই সারা এস্টেটের প্রশাসনিক, নান্দনিক ও উন্নয়নমূলক ব্যাপারগুলো নিয়ন্ত্রণ করে। ওদের অনুমোদিত প্ল্যান অনুযায়ীই বাড়ি বানাতে হল। শুধু তাই নয়, সামনে যে একচিলতে বাগান, তারও লে-আউট দিয়ে গেল কমিটি-নিযুক্ত ডিজাইনার। তা হোক। নান্দনিক শৃঙ্খলার প্রয়োজনে এটা মেনে নিতেই হবে। সবাই যদি নিজের খুশিমতো প্ল্যানে বাড়ি বানায়, ইচ্ছেমতো দোতলা-তেতলা তোলে, যে-কোনো জাতের গাছ-গাছালি দিয়ে ভরিয়ে দেয় বাগান, তবে এই ছবির মতো কমপ্লেক্সটা দু'দিনেই বাগবাজারের ওই গলির রূপ নেবে। পুবমুখো একতলা বাড়ির পাশেই উঠবে দক্ষিণমুখো পাঁচতলা। আমার বাড়ির গন্ধরাজ গাছকে গ্রাস করবে পাশের বাড়ির ঝাঁকড়া কাঁঠাল কিংবা বকুল। তার চেয়ে ওই বন্ধন ঢের ভালো। বাগানের গাছগুলোর জাত অবধি ঠিক করে দিয়েছে ওরা। কতখানি উঁচু হলে ছেঁটে ফেলতে হবে, সে ব্যাপারেও রয়েছে সুস্পষ্ট নির্দেশিকা। এই শৃঙ্খলাটিকে শৃঙ্খল মনে হয়নি হরষিতের। নতুন পাড়ায় এসে ওঁরা বেঁচেছেন।

দুই

বাগবাজারে ঘোতন নামে একটি ছোকরা আছে। তাকে ওই তল্লাটের প্রত্যেকেই যমের মতো ভয় করে। ভদ্রবাড়ির ছেলে। দাদু ছিল উকিল। বাবারা চার ভাই মাঝারি চাকরি করে। পৈতৃক তিনতলা বাড়িটিকে ভাগাভাগি করে নিয়েছে ওরা। দরকার মতো দেওয়াল তুলেছে, পাঁচিল ভেঙেছে। ঘোতনটা স্কুলের গণ্ডি কোনো গতিকে টপকেছিল। তারপর আর এগোয়নি। পাড়ার 'শক্তি সংঘ'-র সেক্রেটারি সে। তার একটি চামচে-বাহিনী আছে, যারা ঘোতনের কথায় দিন-দুপুরে মানুষের ধড় থেকে মুণ্ডু নামিয়ে দিতে পারে। বারো মাস-তিরিশ দিন পাড়া দাপিয়ে বেড়ায় ওই বাহিনী। বারো মাসে তের পার্বণ লেগেই আছে ওদের। পাড়ার পুজো, পাড়ার স্পোর্টস্, পাড়ার জলসা, পাড়ার মারামারি—সবকিছু নিয়ে মশগুল রয়েছে সর্বক্ষণ। অস্থির করে তুলেছে পাড়ার শান্তিপ্রিয় মানুষজনকে। হুমকি দিয়ে চাঁদা তুলছে। বোমা-পটকা নিয়ে তাণ্ডব বাধাচ্ছে। আকণ্ঠ মদ গিলে প্রেত-

নৃত্য নাচতে নাচতে প্রতিমা ভাসাতে চলেছে রাস্তাঘাট জ্যাম করে। গভীর রাতে হইহই করে মড়া বয়ে নিয়ে চলেছে শ্মশানে। বলো হরি—। শেষরাতে মড়া পুড়িয়ে হইহই করে ফিরছে। ওদের চিৎকারে সারা পাড়ার মানুষের ঘুমের দফা গয়া। ঘোতনের একটা মোটর-সাইকেল আছে। রাজদূত। আদ্যিকালের পুরনো ঝরঝরে। তার বিকট গর্জনে কানে তালা লাগে। বুক ধড়ফড় করে। তার এক্‌জস্ট্‌ পাইপ থেকে কলের চিমনির মতো কালো ধোঁয়া হল্‌কা দিয়ে বেরোয়। সারাদিন ওই রাজদূতে চড়ে পাড়াময় টো-টো করে বেড়ায় ঘোতন। পেছনে বসে থাকে এক নম্বর চামটে বিল্টে। কালো চামচিকের মতো অবয়ব তার। কিন্তু খেপে গেলে ওই শরীরে নাকি শয়তান ভর করে। ওদের তেমন একটা ঘাঁটান নি হরষিত। ঘাঁটানোর ইচ্ছে কিংবা সাহস কোনোটাই ছিল না। কিন্তু ওর ওই শব্দ-বাহনটি দিনের মধ্যে নানান অছিলায় যাতায়াত করত হরষিতের বাড়ির সামনে দিয়ে। পাশে ছিল গদাইয়ের পান-সিগ্রেটের দোকান। ঘোতন ওখানে পান-সিগ্রেট খেত। গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করত না। বরং মাঝে মাঝে পিক-আপ তুলত দ্বিগুণ, আর কালো ধোঁয়া ছড়াত চতুর্গুণ। ওই বিকট আওয়াজ আর বিষাক্ত ধোঁয়া বেশিক্ষণ সহ্য করা কঠিন। একদিন বেজায় বিরক্ত হয়ে হরষিত বলেছিলেন, 'তোমার মোটর-বাইকটায় বড্ড আওয়াজ হয়। সাইলেন্সার-পাইপটা—।' জবাব যা দিল, কানে আঙুল দিতে হয়! সেই থেকে হরষিত পণ করেছিলেন, ওদের সঙ্গে আর কথাই বলবেন না। মুখদর্শনও নয়। কিন্তু হরষিতের ইচ্ছেয় তো সবকিছু হয় না। ওরাই আসত দর্শন দিতে। ধূমকেতুর মতো উদয় হত যখন-তখন। আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল চাঁদা আদায়। হাজার অছিলায় চাঁদা তুলত ওরা। পুজোর চাঁদা, পার্টির চাঁদা, আমোদ-প্রমোদের চাঁদা...। দুর্গাপুজো, লক্ষ্মীপুজো, কালীপুজো, সরস্বতী, গণেশ, কার্তিক, বিশ্বকর্মা, জগদ্ধাত্রী, মায় সন্তোষী মায়ের পুজো অবধি কিছুই বাদ দিত না। পার্টির চাঁদাও হরেক কিসিমের। পার্টির মাসিক চাঁদা, বার্ষিক চাঁদা, মিটিং-মিছিলের চাঁদা, নির্বাচন তহবিল, আঞ্চলিক সম্মেলন, জেলা সম্মেলন, রাজ্য-সম্মেলন, বন্যা-খরা...। এছাড়াও আরো কত অজুহাতেই যে চাঁদা তুলত ওরা! একটা জলসা করছি দাদা। চাঙ্কি পাণ্ডেকে কন্ট্যাক্ট করেছি। দুটো বেওয়ারিশ মড়া পোড়াতে হবে দাদা। সামনের হপ্তায় পাড়ার স্পোর্টস্‌। ক্লাব থেকে সাইকেল-ভ্রমণে বেরোচ্ছে তিনজন। দল বেঁধে আসত, দরজা খটখটাত, রসিদখানা ধরিয়ে দিয়ে বলত, এখন দেবেন? নাকি ক্লাবে গিয়ে দিয়ে আসবেন? চামচেরা যখন এসব কম্মো করত, ঘোতন বসে থাকত ওর ঝরঝরে রাজদূতে। বিকট আওয়াজ তুলত ইঞ্জিন। কালো ধোঁয়া ছাড়ত। দু'কান ঝালাপালা হরষিত তখন কোনো গতিকে চাঁদাটি মিটিয়ে দিয়ে রেহাই পান। ব্যাপারটা তাও কোনো গতিকে সহ্যের মধ্যে ছিল। একেবারে অসহ্য হয়ে যেত টেলিফোন নিয়ে। হরষিতের একটা টেলিফোন ছিল। কখনোসখনো চালু থাকত ওটা। অধিকাংশ সময়ই বিকল। ওই টেলিফোনটার দিকে থাকত সারা পাড়ার শ্যেনদৃষ্টি। ঘোতনরা তো মাঝে-মাঝেই আসত। দরজা খুলতেই সদলবলে ঢুকে পড়ত হইহই করে। অনুমতির ধার ধারত না।

—টেলিফোনটা তো খারাপ, ভাই।

—ও কথা সবাই বলে দাদা।

—সত্যি বলছি, খারাপ!

—আমাদের হাতের ছোঁয়ায় ফের চালু হয়ে যাবে দাদু।

—এই, এই, তোমরা বিশ্বাস করছ না তো? শুধু শুধু যাচ্ছ বাবা। চালু থাকলে—।

—আরে, এ তো আচ্ছা ঠ্যাঁটা লোক মাইরি! পটলা বোসের দাদু হেঁচকি তুলছে। অ্যাম্বুলেন্স ডাকতে হবে। আপনি তো আচ্ছা সেলফিস্ জায়েণ্ট মাইরি!

টেলিফোন চালু থাকলে দু-দশ মিনিটে ব্যাপারটা হয়ত চুকে যেত। কিন্তু অচল থাকলে বাড়িসুদ্ধ লোকের দুর্দশার অন্ত থাকত না। বিকল টেলিফোনে লাইন পাওয়ার আশায় অবিরাম রিসিভার তোলা-নামানো, এক নাগাড়ে খটাখট বোতাম টিপতে থাকা। ছোটমেয়ে সুমিতার বিয়ে হয়নি তখনো। ওই ঘরে বসেই পড়াশুনো করে সে। অন্য ঘরে পালিয়েও তার নিস্তার নেই।

—এই মেয়ে, একগ্লাস ফ্রিজের ঠাণ্ডা জল আনো তো।

—আমিও একগ্লাস খাব।

—আমিও খাব।

জল খেয়েই দলের একটা খ্যাংরা-কাঠির মতো ছোকরা শুধোয়, কোন ক্লাসে পড়, খুকি? খুকি! সুমিতা তো রেগে টং। রাগের চোটে কেঁদে ফেলে বুঝি। খালি গেলাসখানা ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায় শোবার ঘরে।

তিন

সনৎ, অণিমার পিসতুতো ভাই, থাকে একনম্বর সেক্টরে। চার নম্বর থেকে বেশ দূরে। বলেছিল, ইনভিটেশনটা আপনার ব্যাপার। ওঁরা আসবেন কিনা, সেটা ওঁদের ব্যাপার।

সেই অনুসারে হরষিত চার নম্বর সেক্টরের সবাইকে নেমন্তন্ন করেছিলেন গৃহপ্রবেশের দিনে। এখানে নেমন্তন্ন করবার কোনো ঝক্কি নেই। একদিন হরষিত গেলেন ওয়েলফেয়ার কমিটির অফিসে। একটা ছোট্ট অ্যাপলিকেশন, আমি গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে চার নম্বর সেক্টরের সবাইকে নেমন্তন্ন করতে চাই। সঙ্গে পঁচাত্তরটি ছাপানো কার্ড, খাম এবং টাইপিং ও ডেলিভারি বাবাদ কিছু টাকা। টাকার পরিমাণটা মোটেই বেশি নয়।

'ব্যস।' সনৎ বলল, 'ইয়োর টাস্ক ইজ ওভার। ওরাই এবার খামে ঠিকানা টাইপ করবে, ডাক টিকিট লাগাবে, এবং যথা সময়ে পোস্ট করে দেবে।'

'চিঠিগুলো সব ডাকে যাবে নাকি?'

'তবে?' সনৎ কপাল কোঁচকায়, 'হাতে হাতে বিলি করবে নাকি? হাতে একগোছা খাম নিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে দরজা খট-খটানো! ওইসব ব্যাপারগুলোই এখানে ভুলে যান, হরষিতদা। এখানে কেউ কাউকে, বাধ্য না হলে, একতিল বিরক্ত করবে না। সেদিন আমাদের কমিউনিটি হলে একটা ওয়ার্কশপ হয়ে গেল ওই নিয়ে। 'ভেক্সিং ইয়োর নেইবার'। কত সামান্য কারণে যে মানুষ কত বেশি ডিস্টার্বড হয়...। ভারি সুন্দর আলোচনা হল। একজনের বাড়িতে একটিবার মাত্র কলিংবেল টিপলেই, ওই বাড়ির সমস্ত বাসিন্দাব ওই দিনের জীবন-যাপনের ছন্দটাই কীভাবে পুরোপুরি এলোমেলো হয়ে যেতে পারে, ওই বক্তৃতা শুনলে বুঝতেন।

আশ্চর্য! হরষিত ভাবেন। এ-পাড়ায় কি তবে বাণীদি নেই? আকাশবাণীদি?

ওয়েলফেয়ার কমিটির অফিসে সেদিন উপমন্যু সিকদার বললেন, 'বাই দ' বাই।

গৃহপ্রবেশের দিন বাড়িখানা সাজাবেন-টাজাবেন তো?'

মাথা নেড়ে সায় দেন হরষিত। মৃদু হাসেন, সামান্য একটু ডেকরেশন..।

'সামান্য কেন? ভালো করেই সাজাবেন। গৃহপ্রবেশ বলে কথা।' উপমন্যু প্রশ্রয়ের হাসি হাসেন, 'আপনি ইচ্ছে করলে সেজন্যে কমিটির অ্যাপ্রুভ্‌ড্ ডেকোরেটর নিতে পারেন।'

হরষিত ইতস্তত করেন। ডেকোরেশনেব জন্য পাড়ার অসিতকে তিনি অ্যাড্‌ভান্স করে ফেলেছেন। তিন মেয়ের বিয়েতে গেট-প্যাণ্ডেল-আলো সবকিছুর ঝক্কি সামলেছে অসিতই। আর, এমন আনন্দের দিনে তাকে বাদ দেওয়াটা—।

'অ্যাপ্রুভ্‌ড্ ডেকোরেটর নেওয়াটা কি ম্যাণ্ডেটরি?'

মৃদু হাসেন উপমন্যুবাবু। বলেন, 'আসলে কী জানেন? প্রথম প্রথম আমরা অ্যালাও করতাম। কিন্তু নানা জনে নানা পার্টিকে নিয়ে আসে। তারা এই এস্টেটের রীতিনীতি কিছুই জানে না। ভর দুপুরে, লেডিজদের রেস্ট নেবার সময়, ঘড়ঘড় আওয়াজ তুলে বাঁশের ঠেলা ঢুকল। তারপর ধরুন, বাঁশ, কাগজ, পীচ বোর্ড, চাঁচের বেড়া ইত্যাদি এনে, সামনে স্তূপাকার কবে, দিনভর ঠকাঠক... গর্ত খুঁড়ছে, পেরেক পুঁতছে...। কাজের শেষে বাড়ির সামনে ফেলে গেল কাঠের টুকরো, বাঁশের পাব, মরচে ধরা পেরেক, কাগজ-রাংতা—সব মিলিয়ে ব্যাপারটা অন্যের কাছে বড়ই ডিস্‌গাস্টিং। সেই কারণে, আমরা মিটিং করে, রেজোল্যুশন নিয়ে...। আমাদের ডেকোরেটরকে কমিটির অ্যাপ্রুভ্‌ড্ ডিজাইন দেওয়া আছে। রেটও রিজনেব্‌ল্ অ্যান্ড ফিক্সড্। ওরা সবকিছু ওদের ফ্যাকট্রিতে বানাবে। গৃহ-প্রবেশের দিন নিঃশব্দে সেট করে দেবে। আপনার 'নেইবার'রা জানতেই পারবে না। আমাদের এই সিদ্ধান্তটিকে একটু হয়ত ডিক্টেশন মনে হতে পারে, কিন্তু কী জানেন মিঃ বাগচী, আজকের দিনে, মানুষের কাছে, পিস ইজ আ মিরাজ। সেই কারণেই, কোনোভাবেই মানুষের সামান্যতম শান্তিভঙ্গ করাটা এক ধরনেব ক্রাইম।

এর ওপর আর কথা চলে না। অসিত, অতএব, বাতিল।

একদিক থেকে দেখলে, ব্যাপারটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করতেই হয়। সমস্ত কাজ কত সহজে, কত মসৃণভাবে চুকে যায় এতে। দর কষাকষি, মন কষাকষি, তাগাদা, হুজ্জোতি, উদ্বেগ—এ সবের বালাই নেই। আব, খরচ যা পড়ল, অসিতের চেয়ে সামান্য বেশি।

গৃহপ্রবেশের দিন ওয়েলফেয়াব কমিটির সেক্রেটাবিকে নিয়ে নিমন্ত্রিত ছিলেন ছিয়াত্তরটি ফ্যামিলি। তার মধ্যে আটষট্টিটি পরিবার থেকে শুভেচ্ছাবাহী টেলিগ্রাম সকালের ডাকে পেয়ে গেছেন হরষিত। উপমন্যু এলেন নটায়। কমিটির তরফ থেকে ফুলের সুদৃশ্য বোকে দিয়ে গেলেন। সাড়ে নটা নাগাদ বাকি সাতজন এলেন মিনিট দশেকের ব্যবধানে। ঢাউস ফুলের তোড়া দিলেন হরষিত আর অণিমার হাতে। আপনাদের 'ইন্দ্রপুরী'-বাস সুখ ও শান্তিময় হোক।

—বসুন, বসুন। কী সৌভাগ্য আমাদের। ওরে, কে আছিস, জলদি পাত পেড়ে দে এঁদের জন্য।

—সরি! লাঞ্চ সেরেই বেরিয়েছি। অফিসে যাচ্ছি তো।

—আর, আমি তো দশটায় লাঞ্চ করিই না। এখন হেভি-টিফিন। দেড়টায় অফিস-ক্যান্টিনে লাঞ্চ।

—তা হোক। আজকের দিনে অন্তত একটু মিষ্টিমুখ না করলে—।

—মিষ্টি? আপনি হাসালেন মিঃ বাগচী। মিষ্টি সেই কবে ছেড়ে দিয়েছি।

—আইসক্রীম? ক্রনিক ফ্যারেন্‌জাইটিস।

—আচ্ছা একখানা মিষ্টি দিন। স্রেফ একখানা। ম্যাডামের অনারে।

আত্মীয়স্বজনরা এসেছিল হাতিবাগান-চেতলা-পুঁটিয়ারি থেকে। হইহই করে সব পোলাও-মাংস, দই-মিষ্টি সাবাড় করল ওরাই। ভাগ্যিস এসেছিল! নইলে, অত জিনিস, নষ্টই হত! 'ইন্দ্রপুরী'র রীতিনীতি সম্পর্কে খানিকটা জ্ঞান-সঞ্চয় হলেও, এটা হরষিত একেবারেই আন্দাজ করতে পারেননি। সনৎও কোনো আগাম আভাস দেয়নি। পরে জিগ্যেস করায় ব্যাপারটা খোলসা করেছিল। এহ্‌ হে! এ কী-কাণ্ড করেছেন আপনি! কথায় কথায় সব্বাইকে বাড়িতে ডেকে এনে গাণ্ডেপিণ্ডে গেলানো। আসবে, গিলবে, ব্যবস্থাপনার নিন্দে করতে করতে ফিরে যাবে, এই তো? যত না খাবে, ফেলে-ছড়িয়ে নষ্ট করবে তার চতুর্গুণ। বাড়ির সামনে কাঙালিদের ভিড় জমে যাবে। এঁটোকাঁটার স্তূপে একপাল কুকুর রাতভর থার্ড ওয়ার্ল্ড-ওয়ার বাধাবে। মেয়ের বিয়ে দিয়ে ফতুর হওয়ার জোগাড়, কিংবা হয়ত প্রিয়জনের মৃত্যুশোক জমাট বেঁধে রয়েছে বুকের মধ্যে ভারি পাথরের মতো, তার মধ্যেও পাড়া-পড়শি, চেনা-আধচেনা, সবাইকে পাত পেড়ে গেলাতে হবে। বলেছি না, এখানে ওসব শরচ্চন্দর-মার্কা সিস্টেম ভুলে যেতে হবে আপনাকে।

—এখানে কি তবে বিয়ে-শাদি-উৎসবে খানা-পিনার কোনো বন্দোবস্তই নেই?

—আছে, তবে খুবই কম। এটা যে শুধু খরচের প্রশ্ন, কিন্তু নয়। আসলে, এটা অতি ডিসটার্বিং সিস্টেম। আপনি তো নেমন্তন্ন করেই খালাস। আমি ইনভাইটেড হয়ে, পড়লাম অবলিগেশনে। আমার অন্য কাজ আছে, আমার শরীর ভালো নেই, আমি সারা সন্ধে পড়াশুনা করব ভেবেছি, আমার ইচ্ছে করছে না—তা সত্ত্বেও একখানা প্যাকেট বগলে গুঁজে আমাকে যেতে হবে আপনার বাড়িতে। আপনার খেয়ালখুশিমতো সময়ে আপনি আমাকে পীড়াপীড়ি করে খাওয়াবেন সেইসব বস্তু, যার অধিকাংশই আমি খাই না। আমার ওয়ার্ক-রুটিনের বারোটা বাজল। আমার ডায়েট-রুটিন, ডায়েট-চার্ট, শিকেয় উঠল। খাওয়ার দশ মিনিট আগে আমার একটা লিকুইড টনিক খাওয়ার কথা ছিল, এদিনের মতো বাদ রইল সেটা। কেন? আমার ছন্দোবদ্ধ জীবনের ওপর এতখানি অত্যাচার করে আপনি কিনলেন খানিকটা তৃপ্তি, কী না, কত খরচই না করলাম! কী ভুরিভোজখানাই না দিলাম! কী সুখ্যাতিই না হল আমার!

—এখানে কি তবে বিয়ে-শাদিতে প্রীতিভোজের ব্যাপারটাই উঠে গেছে?

—পুরোপুরি ওঠেনি। কেউ কেউ এখনো অন্যকে ডিসটার্ব করে আনন্দ পায়। আর, যে কোনো ছুতোয় গাদাগুচ্ছের খরচ করে মধ্যযুগীয় সুখ পায়। কী আর করা যাবে! একদিনেই সব বদলানো যায় না। রোম ওয়াজ নট বিল্ট ইন আ ডে—। তবে করলেও এখন আর কেউ নিজের বাড়িতে এসব ঝঞ্ঝাট রাখে না। কমিউনিটি হলের লাগোয়া আমাদের ক্যাটারিং-কর্ণার রয়েছে। অ্যাপ্রুভড্‌ ক্যাটারার রয়েছে। ওয়েলফেয়ার কমিটিকে তিন-লাইনে অ্যাপ্লাই করুন, মেনু এবং হেডসহ। তিনদিনের মধ্যে এস্টিমেট পেয়ে যাবেন। টাকাটা জমা দিয়ে আপনি চুপচাপ বসে থাকুন ঘরে। কমিটি উইল টেক কেয়ার অব্‌ এভ্‌রিথিং। আপনি শুধু দেখবেন, নির্দিষ্ট দিনে, ক্যাটারিং-কর্ণারে অভ্যাগতরা এলেন, ক্যাটারার পরিবেশিত সুস্বাদু খাবার খেলেন এবং আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফিরে গেলেন। এই তো, আমার ছোটমেয়ের বার্থ-ডে-তে পার্টি দিলাম। সবাই এল, অ্যাটেন্ড

করল, আমি তখন স্টেট্‌স্‌-এ।

—বুঝলাম তবুও আমার অনুষ্ঠানে আমার বাড়িতে পাঁচজনের পায়ের ধুলো না পড়লে—।

—শুধু পায়ের ধুলোই পড়বে? জোরে হেসে ওঠে সনৎ। সারা ঘর, মেঝে, দেওয়াল, কার্পেট জুড়ে তেল-মশলা, অন্ন-ব্যঞ্জনের হরেক ছোপ, আপনার বেডরুম, ড্রইংরুম এলোমেলো ছত্রাকার..., আপনার সাধের বাগানটি পদপিষ্ট..., ঠিক নয়?

গৃহপ্রবেশের পরদিন হরষিত গিয়েছিলেন কমিটির অফিসে। অনেক গল্প-গুজব হল উপমন্যু সিকদারের সঙ্গে। বিদায় নেবার সময় উপমন্যুবাবু বললেন, 'খুব হইচই হল কাল, কী বলেন? গৃহপ্রবেশ বলে কথা।

'কয়েক জন আত্মীয় এসেছিল তো—।' হরষিত মৃদু হাসলেন, 'ওরাই মাতিয়ে রেখেছিল বাড়িটা।'

'ভেরি গুড।' উপমন্যু সিকদার অমায়িক হাসেন, 'শুধু দেখবেন, আপনার আনন্দ চারপাশের মানুষজনের কষ্টের কারণ হচ্ছে কিনা।' একটু থামলেন উপমন্যু সিকদার। লক্ষ করলেন হরষিতের প্রতিক্রিয়া, 'একটা জিনিস আমাদের সব্বাইকে মনে রাখতে হবে। আমাদের চারপাশের বাড়িগুলোতে একজামিনি-স্টুডেন্ট রয়েছে, ইন্‌টেন্‌সিভ কেয়ারে পেশেন্ট রয়েছে, দিনভর খেটে আসা মানুষজন রয়েছে, ঘুমের পিল খেয়ে ঘুমোনো বৃদ্ধ রয়েছেন—আর, এঁরা সব্বাই এখানে এসেছেন, ঠিক আপনার মতোই, একটুখানি নিরুদ্বেগ স্নিগ্ধ জীবনের আশায়।

খুব মিষ্টি করেই কথাগুলো বলেছিলেন উপমন্যু সিকদার। কিন্তু হরষিতের বুঝতে কষ্ট হয়নি, তিনি বাইরের উটকো লোক এনে গভীর রাত অবধি নিজের বাড়িতে হল্লা বাধানোর জন্য তিরস্কৃত হলেন।

পববর্তীকালে পুরো ব্যাপারখানা বিশ্লেষণ করে দেখেছেন হরষিত। শুনতে খারাপ লাগলেও, কথাগুলো অযৌক্তিক নয়। কী অধিকার আছে তাঁর, অন্যের বহুমূল্যে কেনা শান্তিটুকু কেড়ে নেওয়ার? এই ক্ষোভেই না তিনি নিজেই বাগবাজার ছেড়েছেন তেত্রিশ বছর বাদে!

চার

বাণীদিকে সবাই আকাশবাণীদি বলে।

আকাশবাণী বাগবাজার—। খবর পড়ছেন...। বাণীদির নজর এড়িয়ে এ পাড়ায় কিচ্ছু হওয়ার জো নেই। প্রত্যেকের দুটো করে চোখ, তাও সামনের দিকে। বাণীদির মুণ্ডুজুড়ে সামনে পেছনে অসংখ্য চোখ। ওই দিয়ে তিনি সব দেখতে পান। পাড়ার-বেপাড়ার প্রতিটি ঘরের হাঁড়ির খবর বাণীদির নখদর্পণে। পাড়ার সব্বাই তাঁকে চেনে। তিনিও সব্বাইকে। সব বাড়িতেই তাঁর অবাধ যাতায়াত। মাছি যেমন মুখে নোংরা নিয়ে উড়ে বেড়ায়, বাণীদিও তেমনি। এক ঘরের কথা বয়ে নিয়ে যান অন্য ঘরে। সেখানে ওটা খালাস করে দিয়ে, আবার ওই বাড়ির কথা মুখে নিয়ে উড়ে যান তৃতীয় বাড়িতে। এইভাবে বাণীদির দিন কেটে যায়। কারোর বাড়ির কোনো খবর জানতে হলে, তাই,

এ পাড়ার কেউ এদিক-ওদিক দৌড়ে বেড়ায় না। সরাসরি বাণীদির কাছে গিয়েই হাজির হয়। বাণীদিও রেডিওতে খবর পড়বার ভঙ্গিতে সবকিছু বলে যান গড়গড় করে। আসলে, এটা স্থানদোষ। বাণীদি একটু বেশি বেশি করলেও, এপাড়ায় প্রায় সকলেই একই রোগে ভুগছে। অন্যের ব্যাপারে সর্বদা অগাধ কৌতূহল। কে কী খেল, কী করল, কে কোথায় বেড়াতে গেল—সব জানা চাই মানুষজনের। বাইরের রোয়াকে বসে কথা বলছে দুজনায়। রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে কান খাড়া করে শুনে নিচ্ছে তৃতীয় জন। জানলার পর্দা ভেদ করে চোখদুটি অব্যর্থ নিশানায় পাঠিয়ে দিচ্ছে একেবারে রান্নাঘর অবধি। আর একটি রোগ হল, সর্বদা গায়ে-পড়া ভাব। আলাপ থাকলে তো কথাই নেই। গায়ে পড়ে গপ্পো জুড়বে, খবর দেবে, নেবে। আধ-চেনা কিংবা অচেনা হলেও 'কটা বাজে, দাদা,' কিংবা 'উহ্, আজ কী গরম পড়েছে দেখেছেন—' বলে আলাপ জমিয়ে ফেলবে। অন্যের ব্যাপারে কৌতূহল দেখানো যে এক ধরনের রুচি-বিকৃতি তা ও-পাড়ার মানুষ বোঝেই না।

'ইন্দ্রপুরী'তে এসে হরষিত তাই অণিমাকে প্রথম প্রশ্নটি করেছিলেন, 'এই যে আমরা এখানে এলুম, তোমাদের আকাশবাণীটি তো জানেই।'

'জানলেই বা। বয়েই গেল।'

'যদি ঠিকানা খুঁজে চলে আসে কোনোদিন? লাইফ হেল করে দেবে।'

অণিমা জবাব দেয় না। সেও জানে, আকাশবাণীদি সেটা পারে। অন্যের ব্যাপারে খবর সংগ্রহ করে সে এক বিজাতীয় আনন্দ পায়।

কিন্তু ক'দিন কেটে গেল, বাণীদি এল না। হরষিতরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

'ইন্দ্রপুরী'তে এ সবের বালাই নেই। কেউ কারোর কথায় থাকে না। আড়িপাতা, চোরা-চাউনি, কারো ব্যাপারে অকারণ উৎসাহ দেখানো, আগ-বাড়িয়ে ভাব জমানো, একের খবর অন্যকে পরিবেশন করা—এসব এখানে ভাবাই যায় না। বাড়ির সামনে একচিলতে সবুজ জমি। বিকেলের দিকে চেয়ার পেতে বসেন হরষিত আর অণিমা। গ্রীলের গায়ে অলক-লতা দোল খায়। সামনের রাস্তা দিয়ে মানুষজন হেঁটে গেল। সামান্য কৌতূহলবশতও তাকাল না হরষিতের বাড়ির দিকে। এসব এটিকেটবিরোধী কাজ। এমন কী শপিং-সেন্টারে, কিংবা কমিউনিটি হলে, খুব বন্ধুত্ব না থাকলে, বেশি কথাবার্তা বলবে না কেউ। শুধু 'হ্যালো' বলবে। সঙ্গে মৃদু হাসি-বিনিময়। চেনা কিংবা অচেনা, ওই মৃদু হ্যালোজেনটি জ্বালাতেই হবে মুখে। না হলে সেটাও হবে চরম অসৌজন্য।

বাণীদি অবশ্যি মাস তিনেক বাদেও এলেন না। হরষিতের মনের দুশ্চিন্তা তবু ঘোচে না। বাণীদি না এলেও অন্যেরা রয়েছে। ঘোতন অ্যান্ড কোং। এখন না এলেও পুজোর আগে তো আসবেই। পুজোর মাসখানেক আগে থেকেই বুকটা তাই ঢিপঢিপ করছিল হরষিতের। এদেশে পুজো মানেই হৃদ্‌স্পন্দন বেড়ে যাওয়া। সকাল না হতেই দলে দলে হাজির হবে। লাল-হলুদ-গোলাপি রসিদ ছুঁড়ে মারবে। ঘোতনের দল আসবে একেবারে শেষে। অন্য পাড়ায় আগে, নিজের পাড়ায় শেষে। নিজের পাড়ার লোকজন মানে তো খাঁচার মুরগি। যখন ইচ্ছে জবাই করা যায়। গেল বছর সাকুল্যে সাড়ে চারশ টাকা চাঁদা দিতে হয়েছিল হরষিতকে। সে তো তবু ভাড়াবাড়ি ছিল। এবার হরষিতের নিজস্ব বাড়ি।—তিন লাখ খসিয়ে বাড়ি করলেন দাদা, একান্ন টাকার রসিদ দেখেই ভিরমি খাচ্ছেন? চারপাশে অনেকগুলি পুজোর ব্যানার ঝুলছে রাস্তায়-ঘাটে, মোড়ের মাথায়।

যাতায়াতের ফাঁকে নজরে তো পড়েই। হৃদ্‌কম্পটা বেড়ে যায়। এরা সবাই আসবে চাঁদার বই নিয়ে। হরষিত যে রিটায়ার করেছেন, সেটা কি চাঁদা তোলার সময় মনে রাখবে ওরা?

একদিন ডাকে একখানা চিঠি পেলেন হরষিত। বেশ জমকালো মোটা খাম। খাম খুলেই ধীরে ধীরে বোধগম্য হল। ওয়েলফেয়ার কমিটির চিঠি। কমিটির গত বছরের সিদ্ধান্ত অনুসারে সবাইকে একান্ন টাকা দিতে হবে 'ইন্দ্রপুরী' হাউসিং এস্টেটের নিজস্ব পুজো বাবদ। আগামী অমুক তারিখের মধ্যে পুজো কমিটির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকাটা জমা দিয়ে, রসিদের একটি জেরক্স কপি কমিটির অফিসে জমা দেবার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। এছাড়া, আগামী এত তারিখে বিজয়া সম্মিলনী হবে কমিউনিটি হলে। নাচ, গান, এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আপনিও যোগ দিতে পারেন। সেই কারণে আপনার কাছে পাঠানো হল একটি ফর্ম। আপনি কিংবা পরিবারের কেউ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে চাইলে, অংশগ্রহণকারীর নাম, বয়স, কোন বিভাগে অংশ গ্রহণ করতে চান ইত্যাদি লিখে ফর্মটি অমুক তারিখের মধ্যে কমিটির অফিসে অবশ্যই জমা দেবেন। হরষিত বিস্মিত হয়ে কাগজগুলোর ওপর চোখ বোলাতে থাকেন। সকাল নেই, দুপুর নেই, রাত্রি নেই, যখন খুশি দরজা ঝনঝনাবে, চাঁদার পরিমাণ নিয়ে তর্কাতর্কি, অপমান, হুমকি—এসব নইলে পুজো! বাগবাজার হলে অ্যাদ্দিনে ঘোতনের ঝরঝরে বাজদূত দিন-রাত কান ঝালাপালা করে দিত না? সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবার আমন্ত্রণও এভাবে কস্মিনকালে পাননি তিনি। পুজো উপলক্ষে সাতদিন ধরে অবশ্যি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলে বাগবাজার এলাকার সব প্যাণ্ডেলে। চব্বিশ ঘণ্টাই মাইকে চড়া গলায় 'দম মারো দম' গোছের গান। দিনে-রাতে এক মুহূর্ত থামে না। 'বাগবাজার-চক্র' নামে একটি নাটকের ক্লাব আছে। তারা কোনো কোনো বছর পুজোর সময় নাটক করে। গলির মোড়ে স্টেজ বানিয়ে, বড় রাস্তাটাকে অডিটোরিয়াম হিসেবে ব্যবহার করে ওরা। একবার ওই ক্লাবের পাণ্ডা শঙ্কর এল দলবল নিয়ে। তাদের আগামী নাটকে হরষিতের মেজ মেয়ে পাপিয়াকে পার্ট করতে হবে। হরষিত-অনিমা প্রবল আপত্তি জানান। ওরা অনুরোধ করতে থাকে নরমে-গরমে। শেষে হুমকি দিয়ে যায়। নাটক-ফাটক তো এক বাহানা, শঙ্করও ঘোতনেরই স্বগোত্র। বিষ্ঠার ও-পিঠ। ওকেও ভয় পায় বাগবাজারের সব্বাই। ওদের সংস্থাটিকে বলে, 'বাগবাজার চক্রান্ত'। অনেক ভেবেচিন্তে, শুভার্থীদের পরামর্শে শেষ অবধি নিমরাজি হতে হয় হরষিতকে। মেয়েটা যে ভেতরে ভেতরে একপায়ে খাড়া, তা কি তখন জানতেন? অনুমতি পেয়েই যেভাবে লাফাতে লাফাতে রিহার্সালে চলে গেল, তাতেই মালুম হল ব্যাপারটা। হরষিত স্পেশাল কার্ড পেয়েছিলেন নাটকের দিন। গিয়েছিলেন অনিমাকে নিয়ে। পাপিয়াকে মানিয়েছিল দারুণ। পার্টও খুব ভালো করছিল। চড়াচড় হাততালি পড়ছিল ওর পার্ট শুনে। সত্যি কথা বলতে কী, হরষিতের মন্দ লাগছিল না ব্যাপারটা।

পাঁচ

বুকের ব্যথাটা ক্রমশ বাড়ছে। সারা শরীর আইঢাই করছে। দম আটকে আসছে যেন। গলা শুকিয়ে কাঠ। ঠোঁট, জিভ চটচটে লাগছে। দরদরিয়ে ঘামছেন হরষিত।

বক্তৃতা থেমে গেছে। এখন নাচ-গান চলছে স্টেজে। অণিমা মনোযোগ দিয়ে দেখছেন। হরষিত অলক্ষ্যে একখানা হাত রাখলেন অণিমার হাতে। স্পর্শ মাত্রই চমকে তাকালেন অণিমা। আবছা আলোয় হরষিতকে দেখলেন।

—একি, একদম ঘেমে গিয়েছ যে!

হরষিত অতি কষ্টে সামলাচ্ছেন নিজেকে। চাপা গলায় বললেন, 'বুকে প্রচণ্ড পেইন হচ্ছে। দম আটকে আসছে।'

অণিমা বিপন্ন বোধ করেন। এই নিশ্ছিদ্র স্তব্ধতায় বেশি কথা বলতেও সংকোচ হয়। ঘড়ির ডায়ালে চোখ ফেললেন অণিমা। এখন সাতটা, কার্ডে ছাপা অনুষ্ঠান-সূচী অনুযায়ী, ফাংশন চলবে আটটা অবধি। অতক্ষণ মানুষটাকে এখানে বসিয়ে রাখা উচিত হবে না।

অণিমা হরষিতের কানের কাছে মুখ এনে বললেন, 'চলো, বাড়ি যাই।'

যন্ত্রণা-কাতর চোখে সায় দেন হরষিত।

অণিমা চারপাশে আলতো নজর বোলান। আবছা আলোয় নজর বোলান প্রতিটি মুখের ওপর। সবগুলো চোখ মঞ্চের ওপর নিবদ্ধ, স্থির। অণিমা বোঝেন, এ সময়ে উঠে দাঁড়ানো, সারবন্দী দর্শকের সামনে দিয়ে হেঁটে বেরিয়ে আসা, সে এক নিদারুণ অসৌজন্য। এক তিলের জন্যও এই নিমগ্নতা ভেঙে গেলে মনে মনে বিরক্ত হবে সবাই। তা-ও নিরুপায় অণিমা উঠে দাঁড়ালেন। হাত দিয়ে হরষিতকে তুললেন। পায়ে পায়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলেন হল থেকে। কেউ তেমন করে গা করল না ব্যাপারটা। দু-একজন মুহূর্তের জন্য তাকিয়েই ফের ফিরিয়ে নিয়েছেন মুখ। কেউ কোনো প্রশ্নই করেন নি। প্রতিটি পদক্ষেপে বাগাবাজারি কৌতূহল ইন্দ্রপুরীর মানুষজনের নেই। অণিমার স্বস্তি এখানেই। নইলে, 'চলে যাচ্ছেন কেন', 'কী হয়েছে ওর', 'কেমন ব্যথা', 'আগে স্ট্রোক-ফোক হয়েছিল কিনা', 'লাস্ট কবে ই-সি-জি করিয়েছিলেন', 'গ্যাসের ট্রাবল আছে কিনা,' 'বিকেলে কী খেয়েছিলেন',—হাজার জনের হাজার কৌতূহল মেটাতে জেরবার হয়ে যেতেন অণিমা।

বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়াটা ভালো লাগল। অণিমার হাত ধরে পায়ে পায়ে বাড়িতে এলেন হরষিত। অণিমা ওঁকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে পাখা চালিয়ে দিলেন। মুখে-চোখে অল্প জলের ছিটে দিলেন। দু-এক ঢোক জল খাওয়ালেন। হরষিত নিঃসাড় হয়ে শুয়ে রইলেন বিছানায়।

এখন ঘড়িতে সাতটা দশ। টিকু গেছে স্পোর্টস কমপ্লেক্স-এ। সেখানে ব্যায়াম করে, সাঁতার কেটে, টেবিল টেনিস খেলে আটটা নাগাদ ফিরবে সে। ওসব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সে একদম পছন্দ করে না। টিকুর ফিরতে এখনো মিনিট-পঞ্চাশেক বাকি। অণিমা কী করবেন, ভেবে পাচ্ছেন না। একবার মনে হল, বেহালায় মেজ জামাইবাবুকে ফোন করেন। পরমুহূর্তে ভাবলেন, কী লাভ? অদ্দূর থেকে ওরা করবেই-বা কী? সনৎকে ফোন করেও লাভ নেই। ও এখন বউ-ছেলে নিয়ে ফাংশন দেখছে। এস্টেটের মধ্যেই মেডিক্যাল সেণ্টার। ওদের ফোন নম্বরও রয়েছে অণিমার কাছে। ফোন ধরে ডায়াল

করলেন অণিমা এবং কী আশ্চর্য, এক চান্সেই পেয়ে গেলেন।

—হ্যালো, আমি চার নম্বর সেক্টরের সি-১৪ থেকে মিসেস বাগচী বলছি। আমার হাজব্যান্ড হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। কী বললেন? না, না, বুকে ব্যথা, বড্ড ঘামছেন। তালু অবধি—। না কেউ নেই। ছেলে গেছে খেলতে। আমি? আমাকে যেতে হবে আপনাদের ওখানে? ফর্ম? কীসের ফর্ম? কিন্তু আমি ওঁকে একলাটি ফেলে রেখে, যাই কী করে? ছেলে ফিরলে? খুব দেরি হয়ে যাবে না? আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা, কী আর করা যাবে? আচ্ছা, রাখছি, নমস্কার।

হতাশ চোখে ফোন নামিয়ে রাখলেন অণিমা। ব্যাকুল চোখে ঘড়ি দেখলেন। সাতটা কুড়ি। পরদা সরিয়ে বাইরে এলেন। টিকুটা আজ একটু জলদি ফিরলে ভালো হয়। কিন্তু সে তো আর জানে না বাবার অসুস্থতার কথা। অল্পক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে ফের ঘরে ফিরলেন অণিমা। হরষিত শুয়ে রয়েছেন বিছানায়। বাঁ-হাত দিয়ে বুকখানা আলতো ঘষছেন। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। আঁচল দিয়ে কপালটা মুছিয়ে দিলেন। বললেন, 'একটু জল খাবে?'

ঘাড় নাড়লেন হরষিত। ডান হাতটা দিয়ে শক্ত করে ধরলেন অণিমার একখানা হাত। অণিমার চোখ ফেটে জল আসার উপক্রম। বড় অসহায় লাগছে নিজেকে। ঘন ঘন ঘড়ির ডায়ালে চোখ ফেলছেন।

এখন সবে সাড়ে সাতটা বাজে। কিন্তু পুরো এলাকাটা কী নির্জন! রাস্তায় লোক চলাচল নেই বললেই হয়। রাস্তার দু'ধারে সারবন্দী সাজানো গোছানো হাল-ফ্যাশানের বাড়িগুলো। এখন বাগবাজার এলাকায় কী দারুণ ভিড়! গমগম করছে পুরো এলাকাটা। ট্রাম-বাস-লরি-ঠেলার পাঁচমেশালি বিকট আওয়াজ। রকে রকে চ্যাংড়াদের আড্ডা। পেছন থেকে মেয়েদের টিটকিরি-শিস দেওয়া। ঘোতনের ঝরঝরে রাজদূতের কান ফাটানো আওয়াজ। কালো ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার পুরো গলিটা। গদাইয়ের পানের দোকানে খবর পড়ছে রেডিওতে। টিকু মাঝে মাঝেই চেঁচিয়ে উঠত, 'উহ, এত চিৎকারে পড়াশুনো করা যায়? নিজের গলার আওয়াজ নিজের কানেই ঢোকে না।'

আটটা নাগাদ টিকু ফিরল। সব শুনে-টুনে বাবার ঘরে এল। হরষিতের কপালে হাত রাখল। তারপর সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে গেল মেডিকো-সেণ্টারের দিকে।

অণিমা দেখলেন, কমিউনিটি হলের দিক থেকে দলে দলে মানুষ ফিরে যাচ্ছে যে-যার বাড়ির দিকে! ফাংশন শেষ হল বুঝি। এখানে ফাংশন আটটা-সাড়ে আটটার মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। বাগবাজারের মতো 'সারারাত্রিব্যাপী' পাড়ার তাবৎ মানুষের ঘুমের বারোটা বাজিয়ে 'অমুক কুমার' কিংবা 'অমুক দেবী নাইট' চলে না এখানে। 'ইন্দ্রপুরী'র মানুষের সময়ের দাম আছে! পরের দিনের ঠাসা প্রোগ্রাম রয়েছে সবাইয়ের। এখানে সবকিছু চলে ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে।

মেডিকো-সেণ্টার অনেকখানি পথ। প্রায় দুনম্বর সেক্টরের কাছাকাছি। পাশেই থাকেন ডাঃ বোস। চার নম্বর সেক্টরের বি-রোডে। টিকু সাইকেল চালিয়ে দিল ডাঃ বোসের বাড়ির দিকে।

ডাঃ বোসের বাড়ির গেট ভেতর থেকে বন্ধ! গেটের বাইরে কলিং বেল। বেল টিপতেই একটি মাঝবয়েসি লোক বারান্দায় এসে দাঁড়াল। গ্রীলের ভেতর থেকে শুধলো, 'কাকে চাই?'

'ডাঃ বোস আছেন?'

'সিমলা গেছেন। সামনের হপ্তায় ফিরবেন' বলেই ভেতরে ঢুকে গেল লোকটি।

টিক্কু কয়েক মুহূর্ত বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইল। তারপর সাইকেল চালিয়ে রওনা দিল মেডিকো-সেণ্টারের দিকে।

'আমার বাবা হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।'

'বসুন'। বেশ আন্তরিক গলায় বললেন রিসেপশনের ভদ্রলোক, মিঃ গুহ। ড্রয়ার থেকে একখানা ফর্ম বের করে এগিয়ে দিলেন টিক্কুর দিকে, 'এটা পূরণ করুন।'

চার পাতার বিশাল ফর্ম। তাতে রোগীর নাম, ধাম, ফোন নম্বর, রোগের যাবতীয় বিবরণ, পূর্বে চিকিৎসা হয়ে থাকলে সে বিষয়ে বিস্তৃত তথ্যাবলী, কোথায় চিকিৎসা করাতে চান, কোন ডাক্তার পছন্দ, অ্যাম্বুলেন্স লাগবে কিনা, আরো অনেক, অনেক কিছু। ফর্মখানা পূরণ করতে গিয়ে বার বার হোঁচট খাচ্ছিল টিক্কু। অনেক প্রশ্নের উত্তর তার মাথায় আসছিল না। মিঃ গুহর পরামর্শ নিতে হচ্ছিল বার বার।

ফর্ম পূরণ শেষ হলে, মিঃ গুহ মন দিয়ে পড়লেন তথ্যগুলো। কিছু প্রশ্নও করলেন। যথাসম্ভব মাথা ঠিক রেখে জবাব দিয়ে গেল টিক্কু।

'নার্সিং হোম চাইছেন? গ্রীন-ভিউই ভালো। বুকের পেইনটা কি হার্টের ট্রাবল বলে মনে হচ্ছে? তাহলে এই নিন আমাদের এনলিস্টেড কার্ডিওলজিস্টদের নাম এবং ফি-এর তালিকা। সিলেক্ট করুন, কাকে দিয়ে চিকিৎসা করাবেন।'

'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, মিঃ গুহ। আপনি, প্লীজ, যা ভালো বোঝেন, একটা ব্যবস্থা করে দিন।' টিক্কু ব্যাকুল গলায় বলে ওঠে।

লিস্টখানা হাতে নিয়ে মাথা চুলকোতে থাকেন মিঃ গুহ। 'ডাঃ ধরকে তো এখন পাবেন না। তিনি এখন স্টেটস-এ। ডাঃ পণ্ডিত খুব সম্ভব সাউথ ইন্ডিয়ায় বেড়াতে গেছেন। ডাঃ সান্যাল নিজেই বেড্-রিডন্। সেকেন্ড স্ট্রোক হয়ে গেছে। বাকি রইলেন ডাঃ যড়ঙ্গী। দেখি, যদি পাওয়া যায়।' ডায়াল ঘুরিয়ে কথা বললেন মিঃ গুহ। ফোন নামিয়ে বললেন, 'বেলভিউতে। কখন ফিরবেন ঠিক নেই।'

'বেলভিউতেই যদি নিয়ে যাই?'

'বেলভিউ তো আমাদের এনলিস্টেড নার্সিং হোম নয়—।'

'ডাঃ ষড়ঙ্গী কখন ফিরবেন, জানা গেল না?'

'বলতে পারল না ওর বাড়ির লোক।'

'একবার বেলভিউতে ফোন করলে হত না? রোগীর অবস্থা জানালে, হয়ত-বা—।'

'আমি সব জায়গায় ফোন করতে রাজি। কারণ, টেলিফোন চার্জ আপনার বিলের মধ্যেই ঢুকে যাবে।' মিষ্টি হেসে ডায়াল করতে শুরু করেন মিঃ গুহ।

'বেলভিউতে ডাঃ ষড়ঙ্গী আছেন। কিন্তু তিনি এখন সিরিয়াস মেডিকেল-বোর্ডে বসেছেন। কথা বলতে পারবেন না।' ফোন নামিয়ে রাখলেন মিঃ গুহ, 'ঠিক আছে, আপনি এখন যান। ফর্মে তো সবই লেখা রইল। আমি খানিক বাদে আবার কনট্যাক্ট করার চেষ্টা করব। যদি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে পারি, খবর পাবেন' আপনাদের টেলিফোনটা ঠিক আছে তো?'

মাথা নেড়ে সায় দিল টিক্কু।

'ওক্‌কে। আপনি এন্ট্রী ফি, ডাক্তারের ফি, অ্যাম্বুলেন্স চার্জ, বেড-ফি,—সব জমা দিয়ে যান। আমাদের অ্যাম্বুলেন্সটা অবশ্যি এই মুহূর্তে বাইরে গেছে। রাতের মধ্যেই ফিরবে। ডাঃ ষড়ঙ্গীও আজ রাতে আর দেখবেন বলে মনে হয় না। সব ঠিকঠাক চললে, কাল সকালে পেশেন্টকে মুভ করানো যাবে।'

'কিন্তু, এর মধ্যে যদি তেমন কিছু—।' টিক্কুর চোখ ছলছল হয়ে ওঠে।

'কাণ্ট হেল্প'—ম্লান হাসলেন মিঃ গুহ, 'তেমন মনে করলে, ট্র্যাক্সি-ফ্যাক্সি ডেকে হসপিটালে শিফট করতে পারেন। সে ক্ষেত্রে কিন্তু এই মেডিকো-সেণ্টার কোনো দায়িত্ব নেবে না। নার্সিং হোম এবং ডাক্তারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়ে গেলে আপনার ডিপোজিটও রিফান্ড করা যাবে না।'

বড্ড অসহায় লাগে টিক্কুকে। বিধ্বস্ত শরীর ও মনটাকে সে টেনে তুলল চেয়ার থেকে।

মিঃ গুহ সমবেদনার হাসি হাসলেন, 'আপনার মানসিক অবস্থা বুঝতে পারছি, ইয়ং ম্যান। কিন্তু বুঝতেই পারছেন, আমাদের একটা নিয়ম মেনে চলতে হয়। ওক্‌কে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমাদের দিক থেকে চেষ্টার ত্রুটি হবে না।'

দ্রুত সাইকেল চালিয়ে ঘরে ফিরল টিক্কু। বুকের ব্যথাটা বেড়েছে। চোখ-মুখ বিকৃত করে বহু কষ্টে যন্ত্রণাটা সহ্য করবার চেষ্টা করছেন হরষিত। দরদরিয়ে ঘামছেন। দু'চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। অণিমা অস্থির হয়ে পড়েছেন। আঁচলে মুখ ঢেকে বহু কষ্টে কান্না সামলাচ্ছেন তিনি। টিক্কুর দিকে তাকিয়ে কাতর গলায় বললেন, 'একটা কিছু কর বাবা। আমার ভীষণ ভয় করছে।'

টিক্কু এগিয়ে যায় টেলিফোনের দিকে। সনৎকে ফোন করে।

'হ্যালো, মামা—।' টিক্কু সবকিছু খুলে বলে মামাকে।

'আই সি।' ওপার থেকে গম্ভীর গলা সনতের। বলে, 'এখানকার মেডিকো-সেণ্টার খুবই সিনসিয়ার। ওরা যখন দেখবে বলছে—। তাও তোমাকে ডাঃ পালধির ফোন নম্বরটা দিচ্ছি। ফোন করে আমার নাম বলো, কিছু অ্যাডিশন্যাল অ্যাডভাইস পাবে। আমি? আরে স্কুটারটা রিপেয়ারে গেছে কাল থেকে। শম্পা শপিং-এ বেরবে বলছিল, যাওয়া হল না। আচ্ছা, কাল সকালে একবার ডেভেলপমেণ্টটা জানাবে। কোনো হেল্প দরকার হলে, বোলো।'

টেলিফোন নামিয়ে রাখে টিক্কু। কী করবে, ভেবে পায় না। মিঃ গুহর দ্বিতীয় প্রস্তাবটা ভোলেনি সে। সাইকেল চালিয়ে সুভাষ কলোনির মোড় অবধি গেলে একটা ট্যাক্সি হয়ত পেয়ে যেতেও পারে। ওই দিয়ে বাবাকে নীলরতন কিংবা আর জি করে নিয়ে যাওয়াও সম্ভব। কিন্তু, তারপরে? হাসপাতালের ব্যাপারস্যাপার যা, মনে হলেই হৃৎকম্প শুরু হয়। এমার্জেন্সির ডাক্তার খোঁজা, ভরতি করানো, বেড জোগাড় করা, ডাক্তার ডাকিয়ে আনা, নার্স খুঁজে আনা, ওষুধ কিনে আনা, হাসপাতাল তো নয়, নরক এক-একটি। দশজনে মিলে হই-হুজ্জুতি করেও ম্যানেজ করা যায় না। রোগী বিনা চিকিৎসায় মরে গেলেও গা করে না কেউ। এমন জায়গায় একলাটি এমন সিরিয়াস পেশেন্ট নিয়ে—। আর ভাবতে পারে না টিক্কু। মায়ের দিকে তাকায়।

—একটা কিছু কর বাবা। অণিমা চোখের জল মোছেন নিঃশব্দে।

টিক্কু দ্রুত বেরিয়ে আসে বাইরে। রাস্তায় নামে। চারপাশের বাড়িগুলোর দিকে

তাকায়। রাস্তার উলটো দিকে পর পর দুটো বাড়িতেই আলো নেভানো। সি-১৯-এ আলো জ্বলছে। প্রফেসর বোসের বাড়ি। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই অধ্যাপনা করেন। মনটা অস্থির হয়ে উঠছিল ক্রমশ। নিরুপায় হয়ে টিক্কু প্রফেসর বোসের বাড়ির দিকেই হাঁটতে লাগল দ্রুত।

এখানকার সব বাড়িতেই একই ব্যবস্থা। গেটে তালা থাকে চব্বিশ ঘণ্টা। গেটের ওপারে ছোট্ট বাগান। তারপর গ্রীল দেওয়া সুদৃশ্য বারান্দা।

গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে কলিং বেল-এ চাপ দিল টিক্কু। ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছে। টিভি চলছে। চড়াগলায় পার্ট, ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক, ভেসে আসছে হাওয়ায়। ঘড়িতে চোখ রাখল টিক্কু। নটা পনের। হিন্দি সিরিয়াল চলছে। আজ কি বার? কোন সিরিয়াল আজ? মনে করবার চেষ্টা করল টিক্কু। অজান্তে ফের চাপ দিল কলিং বেল-এ। বেল বাজল কিনা অদ্দুর থেকে বোঝার উপায় নেই। খানিক অপেক্ষা করে ফের সুইচে চাপ দিল।

চারপাশটা ভারি নির্জন। শেষ অক্টোবরের রাত। হিমেল হাওয়া আলতো ছুঁয়ে যাচ্ছে তার কানের ডগা, চুল...। শিউলি ফুল এখনো ফুটছে বুঝি। হাওয়ায় গন্ধ।

'কে—?' গ্রীলের ভেতর থেকে ভরাট গলা।

'আমি। সি-১৪য় থাকি। আমার বাবা ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। বুকে পেইন হচ্ছে ভীষণ—। কী করব বুঝতে পারছি না।'

অন্ধকার বারান্দায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছেন ভদ্রলোক। কথা বলছেন না। পেছনে টিভি চলছে ফুল ভল্যুমে।

'মা খুব অস্থির হয়ে পড়েছেন।'

'আপনি ভুল করছেন। ডঃ পি. বাসু থাকেন নেক্সট রো-তে। বি-রোডে।' বলতে বলতে পিছু ফিরলেন ভদ্রলোক। দরজা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল।

অন্ধকারে বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইল টিক্কু। বাবার যন্ত্রণাকাতর মুখখানি মনের মধ্যে ভাসছে। মায়ের মুখখানাও। 'ইন্দ্রপুরী'তে রাত ক্রমশ নিঝুম হয়ে আসছে।

উলটোদিক থেকে একখানা গাড়ি তীরবেগে ছুটে আসছিল। মেডিকো-সেণ্টারের দিক থেকেই আসছে ওটা। টিক্কু ব্যাকুল চোখে তাকিয়ে রইল আশায় আশায়।

পাশ দিয়ে হুশ করে চলে গেল গাড়িটা। প্রাইভেট কার। সি-রোড পেরিয়ে ওটা তিন নম্বর সেক্টরের দিকে চলে গেল।

টিক্কুর কান্না পাচ্ছে। গলার মধ্যে দলা পাকিয়ে রয়েছে কিছু। নানা আশঙ্কায় জমাট হয়ে আসছে বুক। মা নিশ্চয় খুব কাঁদছে এতক্ষণে।

সাত-পাঁচ ভেবে ফের কলিং বেল টিপল টিক্কু। পরপর তিনবার। বারান্দায় আলো জ্বলে উঠল দপ করে। টিভিতে খবর পড়ছে ইংরেজিতে।

'কে—?' মিঃ বাসুর গলায় তীব্র বিরক্তি।

'আমি।' বিপন্ন গলায় বলল টিক্কু। 'বাবার অবস্থা ভালো নয়—। মা খুব কাঁদছে। কী করব বুঝতে পারছি না। আপনি যদি আসেন একটি বার—।'

'কী করে বোঝাই আপনাকে? আমি ডঃ পি. বাসু। ডাক্তার নই, ডক্টরেট। ডক্টরেট ইন সোসিওলজি। ইম্‌পসিবল্! ডাঃ পি. বাসু বি রোডে থাকেন।'

বলতে বলতে ঘরে ঢুকে গেলেন মিঃ বাসু। চকিতে নিভে গেল বরান্দার আলো।

টিক্কুর চোখের সামনে সব কিছু অন্ধকার হয়ে গেল নিমেষে!

পায়ে পায়ে ঘরে ফিরল টিক্কু। অণিমা ব্যাকুল গলায় শুধলেন, 'কীরে, কিছু হল?'

নিঃশব্দে মাথা নাড়ল সে। সংক্ষেপে বলল তার অভিজ্ঞতার কথা। অণিমা ধপ করে বসে পড়লেন চেয়ারে।

প্রচণ্ড যন্ত্রণার মধ্যেও বুঝি টিক্কুর কথাগুলো কানে গেছে হরষিতের। নির্বাক চোখ-দুটি সিলিং-এর দিকে নিবদ্ধ। র‍্যাকে রাখা ডায়েরিখানা ইঙ্গিতে চাইলেন তিনি। কাঁপা কাঁপা হাতে পাতা উলটে বের করলেন বাগবাজারে সাধু খাঁ-দের তেলকলের ফোন নাম্বার।

বহু কষ্টে চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, 'ঘোতন।'

প্রথম বারেই তেলকলের লাইন পাওয়া গেল। ঘোতনরা আড্ডা মারছিল পাশেই। পুরো ঘটনাটা সংক্ষেপে বলল টিক্কু।

'মাল খাওয়ার সময়ে উটকো ঝামেলা বাধালে তো! শালা এই ঘোতন দত্তর কপালে সুখ নেই, মাইরি! আসছি।' বলেই ফোন ছেড়ে দিল ঘোতন।

হরষিত চোখ মুদলেন। আধো-অচেতনে তাঁর মগজে অনেক দৃশ্য, অনেক স্মৃতি...।

কানে বাজছে একটি জরাজীর্ণ রাজদূতের বিকট ঘরঘরে আওয়াজ। 'ইন্দ্রপুরী'র অভিজাত বাতাস কেটে কেটে, রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে খানখান করে যেন তীব্র বেগে ছুটে আসছে ওটা।

পুরোপুরি জ্ঞান হারাবার আগে অবধি ওই বিকট আওয়াজটাকে বুকে জাগিয়ে রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা করলেন হরষিত।

সুবচনী

সুবচনীর ভারি রাগ হচ্ছিল ভেতরে ভেতরে।

এই ড্যাক্‌রাগুলানের হস্তীর লজর। একতিল বেবেচনা নাই। খাটালি কবাবে তুমি ষোলআনা, পঁইসা দিবার ব্যালা লবডঙ্কা, হাত উপুড় হইতেই চায় না! সুবচনীর গলাটা যেন ঝামা পাথরের! উল্টোদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সুবচনী। ছেপ্ ফেলে মাটিতে, চরম বিতৃষ্ণায়। বলে, লয় বাবু, দশটাকায় হব্যেক নাই। পন্‌দরো টাকার এক ছ্যাদাম কম লয়।

দীঘিটা বড়ই নিঃসঙ্গ। চিরকালই। ঠিক সুবচনীর মতন। সেই কারণেই বুঝি, এই দীঘির পাড়টিতে এসে বসলে মনের মধ্যে এক ধরনের একাত্মতা বোধ করে সুবচনী। ঈশেন কোণে সেই কোন্ যুগের একটা বটগাছ। সুবচনী গাছের একটা মোটাপানা শেকড়ের ওপর পাছা ঠেকনা দিয়ে বসেছে। পাশে দাঁড়িয়ে কুমুদ কাইতি। সুবচনীকে কিনতে এসেছে। দরদাম চলছে।

মাঝ দীঘিতে ঘাই মারছে মাছ! পাড়ের ধারে ধারে কচুরিপানার ফাঁকে ফাঁকে জলপিপি। উল্টো পাড়ে মোটা মোটা জাম আর অর্জুন। ছায়া পড়েছে জলে। গলাটা ঝেড়ে নিয়ে ফের থুথু ফেলল সুবচনী। কোটরবন্দী চোখদুটো চারিয়ে থুথুটা পরীক্ষা করল এক নজর। বলে, খাটালি অনুপাতে পন্‌দরো টাকা বেশি লয়।

পনের টাকা! কুমুদ কাইতি হতবাক হয়ে যায়। এ শালী কয় কী? দোলা ভাড়ায় বউ বিক্রি হইয়ে যাব্যেক যে! দীঘির কালচে জলে দৃষ্টি বিঁধিয়ে সে লাভ-লোকসানটা খতিয়ে দেখে। একটা বাচ্চা খাসি, বড়জোর ছ-সাত কেজি হবে। এই মুহূর্তে বিক্রি করলে কত আর দাম হবে? বড় জোর দেড়শ। তবে হ্যাঁ, বাড়বে খাসিটা। খাঁচা দেখলেই মালুম হয় সেটা। পনের-ষোল কেজি হবেই। তখন অবশ্যি বেশ দাম হবে ওটার। কিন্তু সে ত পরের কথা পরে। উপস্থিত একটা পাঁচ-ছ' কেজি খাসির জন্য পনের টাকা নগদ গুনে দিতে কুমুদ কাইতির গা কষকষ করে। পনের টাকা অবশ্যি একদিনের জন্যে নয়। তিন দিনের ঠিকা-চুক্তি। রোজ ঝিঝকা-পহর থেকে বেসাম বেলাতক্ক কাজ। কিন্তু ধরো, যদি প্রথম দিনেই কাজটা হয়ে যায়, তবে বাকি দুদিনের টাকাটাই লোকসান। আবার ধরো, সুবচনীর সব ক্যাদ্দানিই বিফলে গেল, খাসিটা আর মিলল না, তখন তো পুরো টাকাটাই চোট। এইসব নিয়ে চিন্তা কুমুদ কাইতির। সে সহসা সিদ্ধান্ত নিয়ে উঠতে পারে না।

বলে, মাসী, দশ টাকা কর।

সুবচনী ত্যারচা চোখে তাকায়। বলে, পন্‌দরো টাকা বেশি লাইগ্‌ছে বাবুর? খাটালিটা দেখবি নাই?

নিজের মনে গজগজ করতে থাকে বুড়ি। কপালকে দোষ দেয়। গাল পাড়ে সেই

ড্যাকরাকে, যে সুবচনীর অমন ফাটা কপালখান্ বানিয়েছে। বলে, তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেইক্ছি বাবু, কণ্ঠায় আর জোর পাই নাই আগের মতন। অল্প চিচ্কারেই গলা শুকাঁই কাঠ। ছাতি ধড়ফড় করে। লিহাৎ তুমরা চিনা-জানা লোক্, বহুৎদিনের খইদ্দার, তাই ঠেইল্তে লারি। ডাইক্তে যাবা কের্মশ বন্ধ কইর্‌ব্যে দিচ্ছি আমি।

সুবচনী দাম বাড়াতেই বলে এসব, অন্তত কুমুদ কাইতির ধারণা তাই।

কিছুদিন যাবৎ সুবচনীর গলায় একটা অচেনা ব্যথা। মাঝরাতে ওঠে ব্যথাটা। সারারাত আর লিদাতে নাই দেয়। চিচ্কার করলে ব্যথাটা বাড়ে। ঝরিয়া-বনকাটির কোবরাজের কাছ থেকে ওষুধ এনে দিয়েছিল ভাসুর-পো পেঁচা বাউরি। মধু দিয়ে মেড়ে খেতে হয়। খেয়েও ছিল সুবচনী। একটু ভালোও ছিল। ওষুধও বন্ধ হল,তা বাদে, ডাকতে গেল জিতেন মণ্ডলের বাড়ি, যন্ত্রণাটা বেড়ে গেল ফের। পেঁচা বলে, খুড়ীগো, তুমি ডাকা বন্ধ কর। বন্ধ ত কইর্‌ব রে খালমুয়া, খাব কী? তুয়ারা খাবাবি? হাত থিক্যে এক ফোঁটা জলে গলে তুয়াদ্যার? কোবরাজের ওষুধ বাবদ সাত টাকা লিয়ে গেলি, কত খচ্চা হল কে জানে! সামান্য শিকড়-বাকড়ের দাম কি অত হব্যেক্? সুবচনীর দৃঢ় বিশ্বাস, ওর থেকে অন্তত দুটি টাকা সরিয়েছে পেঁচা। নিজের ভাসুর-পো হয়ে যে-লোক খুড়ীর তরে ওষুধ আনতে গিয়েও দুটি টাকা সরায়, সে কিনা খাবাবেক খুড়ীকে? ডেকে যেতে হবে, যতক্ষণ শ্বাস, শুধু পেটের দায়েই ডেকে যেতে হবে সুবচনীকে।

সুবচনীর যুক্তিটা অবশ্যি মনে মনে উড়িয়ে দিতে পারে না কুমুদ কাইতি। বয়েস কম হল না বুড়ির। কমপক্ষে তিন-কুড়ি। মাথার চুল সব শনের মতো সাদা। মুখের চামড়া কোঁকড়ানো, চিমসে। শরীরের হরেক ডিজাইনের উল্কিগুলো ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে চামড়ার ভাঁজে। চোখদুটিও ঢুকে গেছে কোটরে। অনবরত গলা ফাটাবার পক্ষে বয়েসটা বেশিই। অন্য কেউ হলে হেদিয়ে পড়ত ঘড়িটাক বাদে। কিন্তু এ হল, সুবচনী বাউরি। দীর্ঘ চল্লিশটা বছর ঐ গলাটির জোরে সে কত রাজা-গজাকে কেঁচো বানিয়ে দিয়েছে। স্বয়ং বিডিও সাহাব সর্বসাক্ষাতে কেঁদেছে বাচ্চা শিশুর মতো। আজ বয়েস হয়েছে বটে, কিন্তু ঐ যে, পুন্না শাল, চাকর আর চাউল, এদের মাহিত্ম্যই আলাদা। এখনো এক ঘটি জল নিয়ে কারো উঠোনে বসলে, সে যুবতী মেয়েদের গলাকেও টেক্কা দেয়। তা বাদে, তার বাখানেব যে ধারা, ঝুলিতে চোখা-চোখা শব্দের যে অতুল সঞ্চয়, সেটা কি বাউরিপাড়াব দ্বিতীয় কেউ এখনতক্ক অর্জন করতে পেবেছে!

কুমুদ কাইতি বিড়বিড়িয়ে হিসেব কষতে তাকে। বলে, শুধু পন্দরো টাকাই ত লয় মাসী, আরো যে খচ্চা আছে। তুমাকে লিয়ে যাবার ভ্যান্-ভাড়া, সিট্যাও ধর পাঁচ পাঁচ দশ। যে উঠাব্যেক নামাব্যেক, সে ও লিবাক দু'—দু' চার। হিসাব কর দেখি, সাকুল্যে কত হইল্যাক!

সে খচ্চাটা অবশ্যি সুবচনী ক্ষেত্রে আছে। অন্যদের ক্ষেত্রে নেই। সুবচনীর ক্ষেত্রে এটা বাস্তবিকই একটা বাড়তি খরচ। কোমর থেকে নিম্নাঙ্গ অসাড় হয়ে গেছে আজ দশ বছব। বহু ওষুধ-বিষুধ মালিশ দিয়েও সাবেনি। কাজেই ওকে ভ্যানে চড়িয়ে নিয়ে যেতে হয়, পৌঁছেও দিতে হয়। তুলতে নামাতেও একটা লোক লাগে। তা সত্ত্বেও সুবচনীব কাছেই এত লোকের ভিড় কেন? না, তার কাজের কদর আছে, তাই। তা, ভাজা খেইত্যে হইলে টুকচান্ তেলের ব্যয় ত হব্যেক্ই বাপ।

সুবচনী ঠাণ্ডা চোখে তাকায়। হয়তো বা হিসেবও কষতে থাকে মনে মনে।

বলে, ভ্যান্ ত তুয়ার লিজের। ভাড়া কিসের? আর ভ্যান ত চালায় পুষ্করা বাউরি। উ-ত তুয়ার ঘরের মাইন্দার। পইসা লিব্যেক ক্যানে?

আচানক কথা! ঘরের ভ্যান্ বলে সেটা খচ্চার মধ্যে ধরতে হব্যেক নাই? ঘরের মাইন্দার বলে তার খাটালির দাম নেই? হিসাব করত্যে হলে তুমাকে ত সবকিছো হিসাবের মধ্যে রাখতে হব্যেক, না—কি?

সুবচনী আকাশের দিকে তাকায়। একদল শাগ্‌না উড়ছে আকাশে! গরু মরেছে নাকি কোথাও? গরু না মরলেও, অনেক সময় শাগ্‌না ওড়ে আকাশে। মরার খবর আগাম জানতে পারে ওরা। তখন আনন্দে ওড়াওড়ি করে। ভোজের জন্য ক্ষণ গুনতে থাকে। সুবচনীর বুকের মধ্যে অচেনা ভয়। কনকনে শীতল অনুভূতি। গলার যন্ত্রণাটা বেড়েছে ক'দিন। পেঁচাকে খোঁচাচ্ছে বারবার, যা বাপ, ঝরিয়া-বনকাটির কোবরাজের পাশ, এক পুঁটলি ওষুধ এইন্যে দে। ত, 'আইজ যাব কাল যাব' বলে সে পুড়ামুয়া দিন লিচ্ছে খালি। ইদানিং, গভীর রাতে, যখন চারপাশ শুনশান হয়ে যায়, গলার যন্ত্রণাটা বাড়ে. তখন, ঝিম-নিশুতে ঝুপড়ির মধ্যে সুবচনী একলাটি। সঙ্গী থাকে গলার মধ্যে ঐ জীবন্ত যন্ত্রণাটি। সুবচনী আর তার যন্ত্রণা, দুটিতে মিলে রাত উজাগর করে। এই বয়েসে অসাড় নিম্নাঙ্গ নিয়ে এমনিতেই ঘুম আসে না তার। গলার যন্ত্রণাটাও ঘুমোয় না এক মুহূর্তের তরে।

ভাবতে ভাবতে সুবচনীর বাঁ হাতখানা একসময় অজান্তে উঠে আসে গলার কাছাকাছি। নিঃশব্দে নড়ে চড়ে বেড়ায়। আহা, ভাবতে থাকে সুবচনী, কী একখানা বাহারী গলা ছিল তার! তারই দৌলতে চারপাশে কত নাম ছিল সুবচনীর! তল্লাটের সবাই যমের মতো ডরাত ওকে। রেশনের দোকানে নামমাত্র দামে পচা ডাল, আটা দিয়ে দিত। মাসী গো লিয়ে যাও। না, না, দাম দিতে হব্যেক নাই। গরিব মানুষ, খাও। দোকানদাররা ওকেই আগে মাল দিয়ে বিদেয় করে দিত। যা শত্রু পরে পরে। গ্রহ গেলে, পাপ যায়। মনে মনে হেসে কুটিকুটি হত সুবচনী। বাবুদের বড় ভয় সুবচনীকে। মানের ভয়। আর সুবচনী হেন মেয়ে, এক নিমেষে, শুধু জিভের ডগা দিয়ে চেটে নিতে পারে বাবুদের শরীরের তাবৎ মান। এই সব নিয়ে সুবচনীর বুকে চিরকালই এক জাতের চাপা দেমাক। সেই দেমাকের বশেই পারিশ্রমিকটা কমাতে পারে না সে। মানুষ উব্‌কার পায় বলেই না আসে! হাতের তেলোতে আগেভাগেই গুঁজে দেয় লোট! বলে, চল্ সুবচনী, মুরগিটা কাল থিক্যে পাচ্ছি নাই, কিম্বা খাসিটা কাল চরতে গিয়ে ফিরে নাই,—টুকচান্ ডেকে দিবি চল্। আর, সুবচনী ডাকতে বসলো, অথচ হারানো মালের হদিশ মিলল না, এমনটা বড় একটা ঘটেনি জীবনে। কাজেই সুবচনী এই বয়েসে এসে মজুরী কমাবে কিসের লেগে! তা বাদে, অন্য কথাও আছে। সেটাও বিবেচনার বিষয়। মানুষকে অমন ভাষায় বাখান দিলে তো পাপ লাগে, না—কি? অবশ্যি সে পাপের চোদ্দ আনা লাগে নিয়োগকর্তা মালিককে, কিন্তু দু-আনা তো সুবচনীকে লাগে। মিনাশূন্যে পাপ নিতে কে চায়, এ দুনিয়ায়! পাপের প্রশ্নে মনটা কেমন অবশ হয়ে আসে ইদানিং। গলার মধ্যে বুনো ওলের কুটকুটানিটা বেড়ে যায়। সুবচনী ভাবে, দুনিয়ায় কত লোক কত কিছু করে পেট চালাচ্ছে, সুবচনী কেন ধরল অমন বেয়াড়া লাইন? মানুষকে বাখান দিয়ে পেটের ভাত জোগাড় করা, এ হেন বৃত্তি তাকে কে শেখাল!

ঝোপের মধ্যে কোথায় যেন একটা কুটুম-পাখি ডাকছে। ট্যা-ট্যা...। ডেকেই চলেছে।

কুটুম-পাখি ডাকলে নাকি কুটুম আসে ঘরে। সুবচনীর চোখদুটো পাখিটাকে খুঁজতে থাকে আঁতিপাঁতি।

দুই

একে-অন্যকে বাখান দেওয়াটা বাউরিপাড়ায় বলতে গেলে জলভাতের তুল্য। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেটা উৎসবের রূপ নেয়। কোনো নির্দিষ্ট গুরুতর কারণের দরকার হয় না সে জন্য। সামান্য কথায় লেগে যায় ঝগড়া-কাইজ্যা, ধুন্দুমার। পাড়াশুদ্ধু বাউরি মেয়েদের চিল-চিচ্‌কারে আকাশ-বাতাস ভরে যায়। আশেপাশের ভদ্দর সজ্জনেরা দরজায় খিল দেয়। বন্ধ করে দেয় জান্‌লার পাল্লা। পাখ-পাখাল ঘরের চালে বসতে লারে। কলহের কারণ হয়তো ভারি নগণ্য। ছাগলে গাছ খেয়েছে, বেড়া থেকে একগাছি ডাল ভেঙেছে কেউ, আগড়ের ধার ঘেঁষে বাহ্যি করেছে কারো বাচ্চা, ব্যস্‌ অমনি লেগে গেল গজ-কচ্ছপের লড়াই। দুজনেই কোমরে কাপড় জড়িয়ে তৈরি। সঙ্গী সাথী জুটিয়ে ফেলল দ্রুত। দু'পক্ষ দাঁড়াল পাশাপাশি দুটি উঠোনে। মুখোমুখি সারবন্দী দাঁড়াল যে-যার নেতাকে মধ্যিখানে রেখে। বাম হাতখানি তুলে দিল কোমরে। ডান হাতের তর্জনী তাক করল শত্রুপক্ষের দিকে। শুরু হয়ে গেল বাখান-উৎসব। দু'পক্ষই নিজের নিজের এলাকার মধ্যে সারবন্দী দাঁড়িয়ে, বারবার সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে ছুঁড়তে লাগল চোখা চোখা তীর। অল্প বয়েসীরা সঙ্গে সঙ্গে দু' দাওয়াতে বসিয়ে দিল জলভরা এনামেলের ঘটি। 'অরে খালমুয়া, ভাতার খাকী রে—অরে শিবের অসাধ্যি রে'—বলে শুরু হয়ে, ক্রমশ গভীরে সেঁধাতে লাগল দুই দলই। অশ্লীল শব্দগুচ্ছ, অশ্রাব্য, ছুঁড়ে মারতে লাগল চিৎকার করে, সুরে বেঁধে, হাত-পা দশদিকে ঘুরিয়ে, উদ্ভট অঙ্গ-ভঙ্গি করে, যেন যাত্রার দলে পার্ট করছে। আর, কী সে গালি-গালাজের ভাষা! লঘু-গুরু, বাচ্চা-বুড়ো জ্ঞান নেই, ভাসুর-শ্বশুর বাছ বিচার নেই..., ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলতে থাকে খিস্তি খেউড়ের চাপান-উতোর, লক্কা পায়রার মতো গলার শিরা ফুলিয়ে, পাছা কোমর দুলিয়ে, চোখজোড়া বনবন ঘুরিয়ে... সে এক দৃশ্য! পথচারী রসিকজন হাঁটতে হাঁটতে গতি শ্লথ করে, কিম্বা দাঁড়িয়ে যায় দু'দণ্ডের তরে। বেরসিক ভদ্র সজ্জনেরা ইন্দ্রিয়ের তাবৎ দ্বার রুদ্ধ করে কোনো গতিকে পেরিয়ে যায় জায়গাটা। দাওয়ার ওপর মজুত থাকে জলের ঘটি। মাঝে মাঝে ছুটে যায়, ঢকঢকিয়ে জল খেয়ে আসে। ফের শুরু করে পূর্ণোদ্যমে। উত্তেজনায় টাটিয়ে থাকে সারা মুখ। ঘামে ভিজে যায় কাপড়-চোপড়, সারা শরীর। কিন্তু এর জন্য লড়াইতে তিলমাত্র ভাঁটা পড়ে না। দলে অবশ্যি রদবদল হয় মাঝে মাঝে। কেউ চলে যায় রান্নাবান্না করতে, নিজেদের কাজকর্মে। সে যায়, যোগ দেয় অন্যজন। এই ভাবে, এক যায়, অন্যে আসে...। বাহিনী বদল হয়। চলে নিরন্তর বিয়োগ-পূরণের খেলা। লড়াই কিন্তু অব্যাহত থাকে। ধীরে ধীরে সূর্য অস্ত যায়, সন্ধ্যে নামে, রাত গাঢ় হয়। চারপাশের মানুষজন ঘুমিয়ে পড়ে। নিস্তব্ধ হয়ে আসে পৃথিবী। শুনশান নিশুত রাতে আরো প্রকট হয় ওদের চেরা গলার স্বর, ছড়িয়ে পড়ে আরো দূরে, দূরান্তে...। একসময় সাতভায়া তারা ঢেলে পড়ে মাথার ওপর থেকে। কোন্দল-ক্লান্ত দু-দলেরই কেউ কেউ দাঁড়াতে দাঁড়াতে হয়তো বা বসে, তারপর শুয়ে পড়ে মাঝ

উঠোনে। শুয়ে শুয়ে খেউড় দিতে দিতে একসময় ঘুমিয়ে কাঠ মেরে যায়। কিন্তু তা বলে লড়াই বন্ধ থাকে না। যারা জেগে থাকে তারাই চালিয়ে যায় লড়াই। একটু বাদে ঘুমন্ত মানুষটি জেগে ওঠে। ফের কোমরে কাপড় জড়িয়ে শুরু করে দ্বিগুণ উৎসাহে। তখন, অন্য জন যায় খানিকক্ষণের জন্য চোখের পাতনি জুড়তে। এমনও হয়, বাখান দিতে দিতে ক্লান্ত দু'পক্ষই ভূমিশয্যা নিয়েছে একে একে। ঘুমিয়ে অচেতন হয়ে গেছে দু-উঠোনে। সকাল বেলায়, গায়ে রোদ্দুরের ছ্যাঁকা খেয়ে উঠে বসে ফের শুরু করেছে নব কলেবরে।

খেউড়ের লড়াইতে যোগ দিত বাউরিপাড়ার অনেকেই। কিন্তু নেতৃত্ব দেবার যোগ্যতা ছিল না সবার। সে বিচারে সুবচনীর মেজো-খুড়ী রাধী বাউরি, আর পুষ্করা বাউরির মা এলোকেশী ছিল সবার সেরা। ফলে, পাড়ার যে কোনো উঠোনেই খেউড়ের লড়াই শুরু হোক না কেন, ওরা দুজন অচিরেই রণস্থলে হাজির হত, এবং সুবিধেজনকভাবে দু-দলে যোগ দিত দুজনায়। অল্প খানিক বাদে, বিবাদমান দু'টি পরিবারের মানুযজনকে গৌণ করে দিয়ে, ওরাই হয়ে উঠত মূল গায়েন। অন্যরা তখন শুধু ধুয়ো দিত। এইভাবে বাউরিপাড়ার সমস্ত খেউড়ের লড়াইতে রাধী আর এলোকেশী দীর্ঘকাল নেতৃত্ব দিয়ে গেছে। আজীবন ওদের মধ্যে ছিল এক সমঝোতাহীন প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্পর্ক, যদিও লড়াইয়ের বাইরে দু'টিতে একত্রে শুশনি শাক তুলত দীঘির পাড়ে। শীতের বিকেলে কুসুম গাছের তলায় বসে একে অন্যের মাথার উকুন বেছে দিত নিপুণ আন্তরিকতায়। রাধী আর এলোকেশীর নেতৃত্বে খেউয়ের লড়াই,— সে ছিল বাস্তবিকই এক দর্শনীয় ব্যাপার। শুরু হলে শেষ হতে চাইত না কিছুতেই। সহজে হার মানত না কোনো পক্ষই। এমনও হয়েছে, নাগাড়ে চব্বিশ, আটচল্লিশ, বাহাত্তর ঘণ্টা চলেছে লড়াই, এবং শেষমেষ, একদল 'তুয়াদ্যার হব্যেক লো—ভগ্‌বান বিচাব কইব্যেক— । যে মুখে অতগুলান বাখান দিলি, সে মুখে কূট হব্যেক, দুনিয়ার লোক দেখব্যেক—।' বলে যতক্ষণ পিছু না হটছে, ততক্ষণ লড়াই থামবে না কিছুতেই। কোনো লড়াইতে রাধী খুড়ী জিতত, কোনোটাতে এলোকেশী।

সুবচনী তখন ছোটটি। ঘুরে বেড়ায়, ছাগল চরায়, পুতুল খেলে, বালি দিয়ে ঘর-গেরস্থালি বানায়। মরসুমে আম-জামের তলায় তলায় দিন কাটে। তুরকির মেলায় রামায়ণ-গান শুনতে শুনতে এক সময় ছেঁড়া তালাইয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। রাধী-খুড়ী আর এলোকেশী তখন মধ্য গগনে। সেসব দিনের কথা, সেই দুই ওস্তাদের খেউড়-লড়াইয়ের দৃশ্যাবলী, আজ এ্যাদ্দিন বাদেও স্মৃতিতে ভারি তরতাজা। কতবার দু'পক্ষকে ঘটি ঘটি জল জুগিয়েছে সুবচনী। কতবার ভূমিশয্যায় ঘুমন্ত রাধী খুড়ীর মাথার তলায় গুঁজে দিয়েছে ছেঁড়া-চট, বালিশ হিসেবে—, আর, খুলে নিয়েছে একমাত্র দু' আনিটি খুড়ীর আঁচল থেকে, ঐ দিয়ে পরের সন্ধ্যেয় তুরকির মেলা থেকে কিনেছে টিনের পাত বসানো আয়না, কিংবা মোষের শিংয়ের একমুখো কাঁকই। রেখেছে চালের বাতায় গুঁজে। চানের পর সবার আড়ালে বের করে অতি সংগোপনে দেখেছে মুখখানি। কতবার,—সুবচনীদের পক্ষ নিয়ে যখন তুমুল লড়ছে রাধী-খুড়ী— তখন তারই নির্দেশে শত্রুপক্ষের পাকশালে গিয়ে রান্নাবান্না সেরে ওঁদের কাচ্চা-বাচ্চাগুলোকে খাইয়ে-দাইয়ে ফিরে এসেছে সুবচনী। মেজ খুড়ীর সে উদারতা ছিল। যে খালমুয়ী কোঁদল কচ্ছে, উ জাহান্নামে যাক্, মড়াচীরে উয়ার ঘাস গজাক, কিন্তু উয়ার কাচ্চা-বাচ্চাগুলান ত'

কুনো দোষ করে নাই। রান্নাটা না কইর‍্যে দিলে উয়াদ্যার কাচ্চা-বাচ্চাগুলান যে উপাসে থাইক্‌বেক। অতএব, যা সুবচনী, উয়াদ্যার তরে চাট্টি চাল ফুটাই দিয়ে আয়, মা। সুবচনী যে শুধু জল জোগাতো আর রান্না করে দিত, তা নয়। কখনো সখনো এক-আধ ঘণ্টা গলা সাধত, দলের মধ্যে ভিড়ে গিয়ে। তবে সর্বদা মেজো-খুড়ীর দলেই থাকত সে। ধীরে ধীরে প্রতিভার বিচ্ছুরণ ঘটতে লাগল সুবচনীর। অনেক চোখা-চোখা, নতুন জাতের খেউড় উপহার দিতে লাগল সে। আর, যেটা বাউরিপাড়ার অন্যদের মধ্যে, এমন কি রাধী-খুড়ী এবং এলোকেশীর মধ্যেও বিরল ছিল, সুবচনী সেই ছড়া কেটে কেটে খেউড় করতে শিখল। শোলক, প্রবচন, ছড়া—এসব অবশ্যি খেউড় লড়াইয়ের অঙ্গ। এগুলো ছাড়া খেউড় জমে না। কিন্তু সুবচনীর মতো অমন কথায় কথায় ছড়া কাটা,—সে ছিল একেবারে তাক লাগিয়ে দেবার মতো। 'অরে খালমুয়ী / মর্ মর্ তুই।' কিংবা, 'অরে হারামজাদী / তুয়ার মুখে পাদি।' কিংবা 'অরে ড্যাকরা, মুখপুড়া / তুয়ার মুখে জ্বাইল্‌ব লুড়া।'— এমন পদে-পদে, ছত্রে-ছত্রে ছড়া কাটা শুনে সকলে মোহিত হয়ে যেত। চাপান-উতোর করতেই ভুলে যেত অনেক সময়। ধীরে ধীরে, এলোমেলো ছন্দ ছেড়ে পয়ার ছন্দ ধরল সুবচনী। কথায় কথায় ছড়া বেঁধে ফেলে পয়ার ছন্দে—

খালমুয়ী, ভাতাবখাকী দিস নাই ক লাফ।
আমার বাপ ত ভালা মানুষ, (তুযার) বেধা বাপকে ডাক্॥

এ সব শুনতে, লোক দাঁড়িয়ে যায় রাস্তায়।

নিজেব দল তো বটেই, মনে মনে তারিফ করতে থাকে শত্রু-শিবিরও। প্রশংসায় ফেটে পড়ে কোন্দলের দু-এক দিন বাদে। নাহ্, এ লাইনে থাইক্‌লে সুবচনী বহুৎ ধুর যাব্যেক। উ দুনিয়া জয় করব্যেক এক দিন। কিন্তু কেবল পয়ারেই থেমে থাকে না সুবচনী। সে ত্রিপদীও ধরে—

অরে মুখ পুড়ী, আমার মাইজো খুড়ী
হাগল্যে কাঁকবা পিঠা—।
খেইয়্যেঁ দেখিস তবা, অবে খালভরা
সিট্যা কত লাগে মিঠ্যা—।।

কিংবা,

অরে ম্যাদা-হাতি তুয়ার মুখে লাথি
মর্ তুই পুইড়্যে আগুনে—।
অরে খালমুয়ী, মর্ মর তুই
খাক তুয়াকে শ্যাল-শাগুনে—।।

ধন্য ধন্য রব উঠল চতুর্দিকে। সুবচনী রে, তুয়ার জিভায়, কণ্ঠায় মা সরেস্বতীর বাস।

যথা সময়ে বিয়ে হল সুবচনীর। ঘুঘীমুড়া গাঁয়ে নিতাই বাউরির সঙ্গে। কিন্তু কাচ্চা-বাচ্চা হল না। নিতাই ফের বিয়ে করল। সুবচনী ফিরে এল বাপের ভিটেয়। তিন বোন সুবচনীর, কোনো ভাই ছিল না। বাপ-মা মরবার পর থেকে সুবচনী একা। নিজের পেট নিজেই চালায়। নিজের খিদা নিজের মারে।

সুবচনীর জীবনের মোড় ঘুরে যায় একটি ঘটনায়। মেজ খুড়ীর বিরুদ্ধে যেদিন লড়াইয়ে নামল সে। এলোকেশী তখন গত। মেজ খুড়ী একাই শিং দিয়ে মাটি খুঁড়ছে তল্লাটে। বাউরিপাড়ায় হেন কেউ নেই যে ওর সঙ্গে দু-এক ঘণ্টাও পাল্লা দিয়ে লড়ে।

ব্যাপারটা নাড়া দেয় সুবচনীকে। শরীরের মধ্যে এক ধরনের অস্থিরতা টের পায়। স্বপ্নের মধ্যে নিজের মাথাখানি রাধী-খুড়ীর একহাত ওপরে গিয়ে থামে এবং একদিন বাউরিপাড়ায় এক তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে যখন খেউড়ের লড়াই বাধল, তখন সুবচনী নাটকীয়ভাবে রাধী-খুড়ীর বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।

প্রথম আসরেই, মনে পড়ে, সুবচনী মেজ-খুড়ীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল চার পংক্তি ছড়া দিয়ে।

অরে মাইজো-কাকী
শুন্ রে ভাতারখাকী,
তুয়াকে আমার কুস্থানে রাখি
তুয়ার মুখে আমি জুমড়া-কাঠ জাঁকি।

সামান্য ক্ষণের জন্য বুঝি হকচকিয়ে গিয়েছিল রাধীবুড়ী। সামলে নিয়ে শুরু করেছিল বীর বিক্রমে। চালিয়েছিল এক বিকেল, এক রাত। কিন্তু শেষ অবধি এঁটে উঠতে পারেনি। এক সময় পিছু হঠতে হয়েছিল বুড়িকে. আসলে, তখন রাধী বুড়ীর বয়েস হয়েছে। কণ্ঠায় সে জোর আর নেই। তার ওপর নিজের ভাসুর-ঝিকে বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হতে দেখে এবং পিলে চমকানো ছড়া কাটতে দেখে, সেই যে ঘাবড়াল, আর সেই ছন্দটাই খুঁজে পেল না বুড়ি।

ধীরে ধীরে সুবচনী একচ্ছত্র রাজত্ব গড়ল বাউরিপাড়ায়। চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল ওর খ্যাতি। কিন্তু উল্টো ফল ফলল অন্যদিকে। চারপাশের ভদ্দব-সজ্জন-সমাজে গ্রীষ্মের গুলাচ ফুলের মতো ছড়িয়ে পড়ল সুবচনীর নাম। তাকে পারত পক্ষে এড়িয়ে চলে সবাই। একটা ঝি-গিরিও জোটে না তার। ক্ষেত-খামারেব কাজেও তাকে নিতে চায় না কেউই। মুখ যার এমনই কাঁচা, কথায় কথায় যে নর্মদার ময়লা জল ছিটোতে পারে মুখ দিয়ে, তাকে ছেইলা-পুইলাব সংসারে সাধ করে ঢোকাতে চায় কে? দু' দিনের বাচ্চাদের মুখে উঠবেক ঐ সব বোল। কাজেই পেট চলতে চায় না সুবচনীর। সে মাঠে-ঘাটে গোবর কুড়োয়, ঘুঁটে দেয়, ব্যাচে। কিন্তু তাতে করে কিছু হয় না। প্রায় দিনই অনাহারে কাটে ওর। শরীরের চামড়া চিমসে হয়ে আসে। দু-চোখ গর্তে ঢুকে যায়। খিদে তেষ্টা এবং আরো সব জাগতিক শারীরিক অভাব-অনটনে ওর সর্বাঙ্গ পুড়তে থাকে, মাথায় আগুন জ্বলতে থাকে সর্বক্ষণ। ফলে তার জিভের ডগা আরও ধারালো হয়, শব্দবাণগুলো হয়ে ওঠে আরো চোখা। মাঝে-মাঝেই সে কারণে অকারণে বাউরিপাড়ার কোনো এক উঠোনে বসিয়ে দেয় লড়াইয়ের অসব। ঐ করে তার দিন কাটে, রাত কাটে, বয়স বাড়ে ..।

তিন

মিহির দত্ত বিষ্টুবাবুর নেতা। কিছুদিন যাবৎ মূল পার্টি থেকে বহিষ্কৃত। ফাঁক-ফোকর খুঁজছে সে। বিরোধী দলগুলোতে লাইন লাগাচ্ছে। কিন্তু আজকের যুগটাই হল আলাদা। যার পেছনে মানুষ নেই, তাকে কেউ পোছে না। থাকত পেছনে দু'দশজন মানুষ, সব দলই পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়ে ডেকে নিত মিহির দত্তকে! বিরোধী দলগুলোর একটাতে কোনো

গতিকে মাথা গোঁজার ঠাঁই পেয়েছে মিহির দত্ত। তলায় তলায় নিজের 'ফিল্ড' বাড়াতে উঠে পড়ে লেগেছে সে। পাড়ায় পাড়ায় ঘোরে। এর-ওর খোঁজ-খবর নেয়। আলগা সান্ত্বনা দেয় একে-তাকে।

একদিন সুবচনী ধরে বসে মিহির দত্তকে। খাদ্য বিহনে পরাণ যায়, বাঁচাও।

মিহির দত্ত বলে, চাল-গম সব আছে সরকারি ইস্টকে। দিচ্ছে নাই শালারা। গরিবকে সহজে কেউ দিতে চায় না কিছু। একদিন চল্ যাই বিষ্টুপুর ব্লক আপিসে। আরো কিছু মেইয়া জুটিয়ে লে। তুয়াদ্যার বাখান শুনলে বিডিও সাহেবের অন্নপ্রাশনের ভাতশুদ্ধ বার হয়ে আসবেক। আর, পুলিশ পড়বেক ফাঁপরে। মেইয়াছেইলার গায়ে হাত দিবেক? অত সাহস!

প্রথম দিনেই বলক আপিসে প্রায় অবিশ্বাস্য ব্যাপার ঘটিয়ে ফেলে সুবচনী। মাত্র আধঘণ্টাটাক সমবেত বাখানেই হাতে হাতে ফল মিলল।

বিডিও সাহাব মিহির দত্তকে ডেকে বলল, রেহাই দিন। জনে জনে দু'কেজি করে আটা দিচ্ছি! ঐ নিয়ে ওদের ফিরিয়ে নিয়ে যান।

মিহির দত্ত বলে, হবেক নাই। চার কেজির কমে লড়বেক নাই ইয়ারা।

হাত জোড় করে উঠে দাঁড়ালেন বিডিও সাহেব, নেই। এই নিয়েই সন্তুষ্ট হোন। বিদায় নিন আজ। অতবড় মান্যিগণ্যি মানুষটা প্রায় কেঁদে ফেলেন অতজনের সুমুখে।

মিহির দত্ত সগর্বে হেসে কয়, আজ চললাম্। কিন্তু ফের আসব।

কথাটা গাঁথা হয়ে ছিল সুবচনীর বুকে। কাজেই দিন দশ-পনের বাদে ফের সে হাজির হয় মিহির দত্তর বাখুলে। বলে, যাবি নাই বলক আপিসে? বলে এইলি যে সাহাবকে! ইবারে গোটা বাউরিপাড়া তুয়ার সাথ যাবেক।

বাস্তবিক, প্রথম দিনেই লগদা দু'কেজি করে আটা পাওয়ায় উত্তেজিত বাউরিপাড়ার মেয়েগুলো। শুনে হায় হায় করে ওঠে অন্যরা।

বলে, 'মাসী গ, তুমি আমাদেরকে ডাইক্‌লে নাই?'

সুবচনী বলে, কী কইবে বুঝব বাবু! ইবার যখন যাব, ডাকব।

শুনে মিহির দত্ত মনে মনে যারপরনাই পুলকিত। তার 'ফিল্ড' বাড়ছে দ্রুত।

বলে, একদিন যাব তোদের পাড়ায়। মিটিং করব সক্কলকে লিয়ে। ওইখানেই ঠিক করব বলক আপিসে যাবার দিনক্ষণ।

সুবচনী বলে, কবে মিটিন্ কইর্‌বি, বল? দিন দে তুই।

দ্বিতীয়বার বলক অফিসে গেল মিহির দত্ত। সঙ্গে পঞ্চাশ জন বাউরি মেয়ে। সুবচনী অগ্রে অগ্রে। সেদিন প্রথম থেকেই আরো চোখাচোখা খেউড় প্রয়োগ করতে থাকে সুবচনীব দল। কিন্তু পঞ্চাশ জনের মতো আটা ছিল না ইস্টকে। সাহেব কাকুতি-মিনতি করে জানান দেন সেটা। মিহির দত্ত গ্যাঁট মেরে বসে থাকে। ইঙ্গিতে চালিয়ে যেতে বলে সুবচনীদের। বিডিও সাহেব কানে আঙুল দিয়ে চোখ বন্ধ করে বসে থাকেন। এক সময় কাতর গলায় বলেন, মিহিরবাবু বাঁচান।

'কিছু মঞ্জুর করে দিলেই চলে যায়, মশয়।'

'বিশ্বেস করুন, আজ কিচ্ছু নেই। বিশ্বেস করুন।'

'তা কি হয়?' মিহির দত্ত দাঁত গিজুড়ে হাসে, 'শুধু হাতে উয়ারা ফেরত যায়! চিল যখন উড়েছে, কুটাটা হইলেও লিব্যাক।'

অবশেষে জনা পিছু এককেজি করে আটা। ধারে কেনা হল, এক আটা চাকির থেকে। সুবচনীরা ঐ নিয়ে গাল দিতে দিতে বিদায় হয়। ঐ শেষ, সুবচনীর বলক আপিসে যাওয়া। টিকরাও শেষ, কাজেই ছাতুও শেষ। কারণ, ঐ সন্ধেয় পুলিশ গ্রেপ্তার করল মিহির দত্তকে। রাতভর পেটাল। শোনা যায়, এস-ডি-ও সাহেবও নাকি স্বহস্তে পিটিয়েছিলেন কিছুক্ষণ। বোধ করি উনিই সতর্ক করে দিয়ে থাকবেন, কারণ, তারপর থেকে মিহিব দত্ত এ ধান্দা ছেড়ে দিল পুরোপুরি। সুবচনীর দানাপানি ঘুচল। কিন্তু আশা কি সহজে ছাড়ে মানুষকে! আশায় মরে চাষা। সুবচনী সহজে মিহির দত্তর পিছু ছাড়ে না। মাঝে মাঝেই গিয়ে বসে ওর বাড়ির সুমুখে। চল্ না গ, একটিবার বিডো আপিসে। প্যাটের জ্বালা যে আর সইতে লাবি। মিহির দত্ত শুনেও শোনে না। এটা-সেটা বলে পাশ কাটায়। খালি পিছলে যায়। কিন্তু গায়ে গু মাখলেও ভূত তো ছাড়বেক নাই। কাজেই ঝিঁঝকা পহর থেকে মিহির দত্তর বাড়ির সুমুখ দরজায় বসে সুবচনী যখন 'অরে চল্ না বে আঁটকুড়ির ব্যাটা' বলে প্যাঁচাল পাড়তে লাগল, মিহির দত্তর বসবাস দায় হল। আব খবগোস হেন নিরীহ প্রাণী, সে-ও ফাঁদে পড়লে প্রাণপণে ছিঁড়তে চায় ফাঁস, মিহির দত্ত হেন পাটোয়ার ব্যক্তি কি চুপটি করে বসে থাকবে! সে সুবচনীকে নিয়োগ করল অন্যত্র।

বলল, বলক আপিসে পরে যাব মাসী। উপস্থিত তুমি একটা কাজ কর দেখি।

মিহিব দত্তর ছোট ভাই পল্টু দত্ত পোলট্রি-চায করে। ভালোই আয়-উপায় হয় ঐ দিয়ে। কিন্তু মাঝে মাঝেই মুরগি-যাঁড়া চুরি যায় তার। পাশের বাড়িটা সন্তোষ দাসের। ওর ছেলেগুলোই ধরে নেয় ফাঁক বুঝে। রেঁধে খায়। তিন-চারটে অপোগণ্ড যোয়ান ছেলে সন্তোষের। কিছুই করেনা। এইসব করে বেড়ায়। ওদের সঙ্গে পেরে ওঠা কঠিন। মুখে, কিংবা শক্তিতে।

গতকাল সন্ধ্যে থেকে একটা যাঁড়াকে পাওয়া যাচ্ছে না। মিহিব দত্তর দৃঢ় বিশ্বাস, সন্তোষের ব্যাটাগুলোই গাপ্ কবেছে ওটাকে। রেঁধে খায়নি এখনো। তাহলে মাংস রান্নার গন্ধ পাওযা যেত। দু-একদিন থম মেরে থাকবে। তারপর ব্যাপারটা বাসি হয়ে গেলে, একদিন রেঁধে খেয়ে ফেলবে।

মিহিব দত্ত বলে, মাসী, তুমি আমার উঠোনে বসে বসে যাঁড়াটাকে ডাক ত। আব, যে লিয়েছে, উযাকে দম্মে শাপ দাও। যাঁড়া ত আব মিলবেক নাই হয়তো, বাখান শুনে যদি কিছুদিন এমন গু-খাবা কাজ বন্ধ বাখে শালারা।

সুবচনীর হাতে-খড়ি হল ঐ দিনই। সে সন্তোষ দাসের বাড়ির দিকে মুখ করে পরিপাটি বসল মিহির দত্তর উঠোনে। তারপর শুরু করল প্যাঁচাল, 'কুন্ খালমুয়া আমাব মুরগিটা লিলি রে—? কুন্ ভাতারখাকী সিটা রাঁধলি রে—? কুন্ মা-মেইগ্যারা খেলি রে—? অরে, তুয়াদ্যার সক্কলের মুযে হাগি রে—' এই মতে মুরগিটিকে বিষ্ঠা, গোমাংস, ইত্যাদি বলে প্রতিপন্ন করে ক্রমশ এগোতে থাকে সুবচনী। এই ধরণেব শিষ্টভাষা থেকে ক্রমশ এগোতে থাকে অশ্লীল, অশ্রাব্য, খিস্তি-খেউড়ের দিকে। সেসব কথা কান পেতে শোনা দায। অবশেষে, 'কাল সকালে আমি ফের আইবো রে, পুড়ামুয়ার দল—।' বলে প্রস্থান কবে সুবচনী। আব, কী আশ্চর্য, দুপুব নাগাদ ঘরের মুরগি অলৌকিকভাবে চরতে থাকে মিহির দত্তর উঠোনে। হাতে হাতে ফল পেয়ে মিহির দত্ত তাজ্জব! নিজে গিয়ে সুবচনীকে জানিয়ে আসে শুভ খবরটা। হাতে গুঁজে দিয়ে আসে একটি করকরে দু'টাকার

নোট।

চমৎকৃত সুবচনীও। মানুষের একটা বিশেষ নড়বড়ে জায়গার খোঁজ পেয়ে গেছে আচমকা। মানের জায়গা। মান হারাবার ভয়। ঐ ভয়টাকে পুঁজি করে যা খুশি করা যায়। সহসা একটা আলো দপ্‌দপ্ করে জ্বলতে নিভতে থাকে সুবচনীর বুকের মধ্যে।

চার

বার বার মিনতি করে হেদিয়ে পড়ে কুমুদ কাইতি। ঝাঁ করে ক্ষেপে যায়। ভারি ত এক কাম, দুয়ার গোড়ায় বইস্যে বইস্যে প্যাঁচাল পাড়া। উয়ার লেইগ্যে পন্‌দর টাকা! দু'টা বাখান বৈ ত লয়: তুই ত আর শাস্তর-পাঠ করবি নাই সিখ্যেনে।

সুবচনী বিষ-চোখে তাকায়। আজ এক যুগেরও বেশি এই কাজে রত সে। কোনো ড্যাকরা তার কাজকে অমন অবহেলা করে কথা কয়নি। বলে কিনা, সামান্য একটু বাখান দেওয়া! কাজটা সামান্য হল্যাক তুয়ার পাশ! বলে, 'বটে' ত, দালু কাইতির উঠানে বইস্যে, তুয়ার ঘরের দিকে মু' কইর‍্যে ডাকি! দুটা বাখান বৈ তো লয!' কুমুদ কাইতির গলা নকল করে শেষের কথাগুলো বলে সুবচনী। এবং মুখ-চোখের ভাব-গতিক দেখে বুঝতে পারে, সুবচনীর প্রস্তাবে প্রায় অর্ধেক শুকিয়ে গেছে কুমুদ কাইতি। আহা রে! সুবচনী মনে মনে হেসে কুটিকুটি হয়, ভদ্দর লোকদের বড় মানের ভয়! মানকচু বড় কুটকুট করে উয়াদ্যার গলায়।

শেষমেষ বারো টাকায় রফা হয়। দীঘির জলে চোখ বিধিঁয়ে ঠকঠকে গলায় সুবচনী বলে, 'ভ্যান পাঠাবি বিকাল বেলায়। যাহ্।'

কুমুদ কাইতি চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ বসে বসে গজগজ করতে থাকে সুবচনী। গাল পাড়তে থাকে বাবুদের উদ্দেশে। নিরীহ মানুষ পেয়ে ঠকিয়ে নেবার ধান্দা বাবুদের। বিচার নাই এ দুনিয়ায়।

শাগনাগুলো তখনো উড়ে চলেছে আকাশময়। দু'চোখ ছোট করে, কপালে বাঁ-হাত এড়ে তাকায় সুবচনী। গলার মধ্যে যন্ত্রণাটা শুরু হয়েছে আবার। কুমুদ কাইতি তিনটে টাকার তরে গাদা-গুচ্ছেক বকাল। এখন ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেই ভালো হত। কিন্তু সে উপায় নেই সুবচনীর।

ওকে এক ঠাঁই বসিয়ে দিয়ে পেঁচা বাউরি গেছে রসিকগঞ্জ বাজারে। সে ফিরে এসে পাঁজাকোলা করে না নিয়ে যাওয়া অবধি ঠায় বসে থাকতে হবে সুবচনীকে।

আবার শাগনাগুলোর দিকে তাকায় সুবচনী। শুধুমুদু নয়, খুব নির্দিষ্ট কোনো কিছুর ওপর নজর রেখেই উড়ছে এরা। ওড়ার ধরন দেখেই মালুম হয় সেটা। সুবচনীর সহসা মনে হয়, যদি উড়তে উড়তে শাগনাগুলো একে একে নেমে আসে ওরই কাছটিতে! সুবচনী পালাতে পারবে না। দেখে শুনে, সাহস পেয়ে যদি ড্যাকরাগুলো ডানা সাপটে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে, গোল হয়ে বসে চারপাশে, যদি ক্রমশ এমনই ঘন হয়ে আসে সুবচনীর গায়ের কাছটিতে যে, ওদের গরম নিঃশ্বাস এসে পড়ে সুবচনীর গায়ে! যদি ধারাল ঠোঁটে একটু একটু করে ছিঁড়তে থাকে ওকে! ভাবতে ভাবতে সর্বাঙ্গ ভিজে যায় ঘামে। দুর্ভিক্ষের স্মৃতিগুলো দগদগে হয়ে জেগে ওঠে মনে। মৃতবৎ মানুষ শাগ্‌নার

খাদ্য হয়ে গেছে জীয়ন্তে। সুবচনীদের এলাকাতেই ঘটেছে এমন ঘটনা। সুবচনী চিল-নজরে দেখতে থাকে শাগনাগুলোকে। ওদের মতিগতি বোঝার চেষ্টা চালায়। হাত বাড়িয়ে টেনে নেয় কাঠ-কলমীর শুকনো কঞ্চি-ডাল। মুঠোর মধ্যে শক্ত করে ধরে থাকে।

কুটুম-পাখিটা ডাকছে মাঝে মাঝেই। এতক্ষণ কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে শুধু কানেই ঢুকছিল সেই ডাক। এবার ওর প্রতি কিঞ্চিৎ মনোযোগী হয়ে উঠতে চায় সুবচনী। চারপাশে অজস্র ঝোপ-ঝাড়, গুল্ম। তার মধ্যে কোথাও গা-লুকিয়ে ডেকে চলেছে পাখিটা। ট্যাঁ—ট্যাঁ—। সুবচনী চারপাশে চোখ চারায়। মালুম কববার চেষ্টা করে। খুব ছেলেবেলায় ঐ পাখিটাকে খুঁজতে খুঁজতে কেটে যেত সারা বেলা। নাওয়া-খাওয়া মাথায় উঠত। পাখিটা কোনো ঝোপের ভেতরে শরীর লুকিয়ে ডেকে যেত অবিরাম। কিন্তু সুবচনীরা একটি বারের জন্যও দেখতে পেত না ওকে। সঙ্গীদের নিয়ে পাখিটার ডাক অনুসরণ করে করে কত দুর্গম, অগম্য জায়গায় পা টিপে টিপে ঘুরে বেড়িয়েছে সুবচনী। কাঁটা-খোঁচায় গা কেটেছে, কাপড় ছিঁড়েছে। খুঁজে পায়নি পাখিটাকে।

সেই থেকে সারা জীবন পাখিটা সুবচনীর চারপাশে অসংখ্যবার ডেকেছে। কুটুম-পাখি ডাকলে নাকি কুটুম আসে ঘরে। সেই ছেলেবেলা থেকেই কথাটা শুনে আসছে সুবচনী। দু'একবার প্রমাণও পেয়েছে। পাখির পেছনে পেছনে সকালটা খুয়ার করে ফিরল বাড়িতে, এসেই দেখল, পিসী এসেছে, কিংবা মামু। সব ক্ষেত্রে না হলেও দু-চারবার ব্যাপারটা ঘটেছে তো। সুবচনীর মনে হয়, পাখিটা ওর সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে আজীবনকাল। আজও, সুবচনী যতই শোনে তার ডাক, ততই প্রলুব্ধ হয়। খোঁজে, পায় না।

দীঘির পাড়ে বসে, চারপাশে চোখ চারিয়ে হয়রান হয়ে যায় সুবচনী। পাখিটাকে কিছুতেই দেখতে পায় না। শুধু কালোপানা শকুনগুলো ডানা সাপটে উড়তে থাকে ক্রমাগত তার চোখের সুমুখে।

ভ্যান থেকে সুবচনীকে নামিয়ে পুষ্কবা ওকে বসিয়ে দেয় কুমুদ কাইতির উঠোনেব মধ্যিখানে। সূর্য তখন সজনে গাছের ডালে। বেলা গড়িয়ে গেছে। সুবচনী বলে, জল ভইর্যে দে ঘটিতে।

একটি এনামেলের ঘটি সঙ্গে এনেছে সুবচনী। যেখানেই যায়, ঘটিটা সঙ্গে নিয়ে যায়। উঁচু জাতের লোকেরা ঘটি দিতে চায় না ওকে।

জলভর্তি ঘটিটা পাশটিতে নামিয়ে রাখে পুষ্করা বাউরি। আঁচল থেকে পান খুলে একখিলি মুখে ভরে সুবচনী। মৌজ করে চিবোতে থাকে। দালু কাইতির বাড়ির দিকে বিষ নজর হানে এক ঝলক। ওদের বাড়ির কে কোথায় রয়েছে, কী করছে, তার হাল হদিশ নেয় চোখের সাহায্যে। মনের মধ্যে গুছিয়ে নেয় সব কিছু। এক সময় ডাকতে শুরু করে :

অরে গু' খাউকার দল, তুয়াদ্যার কি বইল্‌ব বল্‌,
হাতি লয়, ঘোড়া লয়, চুইর্‌লি এক ছাগল ;
অরে ছাগল লয় সে শুয়ের ল্যাড়, খা—খা—খা—।
অরে ছাগল লয় সে, বকনা বাছুর, খা—খা—খা—।

ক্রমশ উচ্চগ্রামে স্বর তোলে সুবচনী। কার সাধ্যি, অধিকক্ষণ বসে বসে সহ্য করে।

কুমুদ কাইতির বাড়ির সব দরজা-জানালা বন্ধ হয়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে। দালু কাইতিরাও বন্ধ করে দিল একে একে। কিন্তু এ হল সুবচনী বাউরির গলা। সামান্য কাঠের দরজা-জান্‌লার সাধ্য কী, তা আটকায়! সুবচনীর গলার স্বর আরো চড়া হতে থাকে। কথার তীরগুলি হয় আরও লক্ষ্যভেদী, আরও তীক্ষ্ণ। মর্‌—মর্‌—মর্‌—,খা-খা-খা-খক্‌—খক্‌—খক্‌—। এক সময় প্রবল বেগে কাশতে শুরু করে সুবচনী। খক্‌—খক্‌—খক্‌— । কাশি আর থামতে চায় না কিছুতেই। গলার মধ্যে যন্ত্রণাটা ক্রমশ অসহ্য হয়ে ওঠে। ঢকঢকিয়ে জল খায় সুবচনী। হাঁফাতে থাকে ফেতি-কুত্তার মতো। আর্তনাদ শুরু করে সে। অস্থির গলায় ডাকতে থাকে পুষ্করাকে। অ পুষ্করা, আমাকে ঘরে লিয়ে চল্‌। আমার গলার ভিতরটা জ্বইলে যায়। কাটা পাঁঠার মতো মাঝ উঠোনে পড়ে ছটকাতে থাকে সুবচনী।

পাঁচ

ঝুপড়ির মধ্যে দিনের বেলাতেও আলো কম থাকে। দিন যায়, রাত আসে, ভোর হয়...। হাসপাতালে ছিল সাতদিন। ডাক্তারেরা দেখে শুনে রায় দিল, কেনসার। শেষ অবস্থা। ভালো হবার লয়। কিছু ওষুধ-পাতি লিখে দিল। তার দাম অগাধ। সুবচনীর সাধ্য নেই কেনার। কাজেই, ঝরিয়া-বনকাঠির কোবরাজের থেকে কিছু শিকড়-বাকড় নিয়ে আসে পেঁচা বাউরি। তাতে গলার যন্ত্রণা কমেনি এক তিল।

সম্প্রতি, গলা থেকে বিদায় নিয়েছে স্বর। যেটুকু কথা বলবার, অতি কষ্টে সাঁই সাঁই আওয়াজ করে বলে। একেবারে মুখের কাছে কান ঠেকিয়ে শুনতে হয়, বুঝতে হয়। পাড়া-পড়শি কাজ কামের মধ্যে সময় করে যেটুকু পারে দেখাশোনা করে। বাকি সময়টা নিঃসঙ্গ কেটে যায়. গাঁ-ছাড়া দীঘিটার মতো। মাঝে মাঝে বাবু-ভায়া মানুষরা চলে আসে। হাঁক পাড়ে ঝুপড়ির বাইরে থেকে, অ সুবচনী, ডিমালু মুরগিটা কাল থিক্যে পাচ্ছি নাই। বড় পয়মন্ত মুরগি। টুকচান ডেকে দিবি চল্‌। ঘরের মধ্যে শুয়ে থেকে সে কথার জবাবও দিতে পারে না সুবচনী। লোকগুলো ডেকে ডেকে ফিরে যায়। সুবচনীর দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। গলার মধ্যে অসহ্য জ্বলন। কখনো বাড়ে, কখনো একঠাঁই স্থির থাকে, কখনো নড়া চড়া করে। দিনের বেলায় একটু যদিও বা কম থাকে, রাতের বেলায় একেবারে যমযন্ত্রণা শুরু হয়। মনে হয় যেন কিছুতে তীক্ষন্‌ দাঁত দিয়ে অবিরাম কুট্‌ কুট করে কেটে চলেছে গলার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শিরাগুলি। যেন গলার মধ্যে নিরন্তর সূচ ফোটাচ্ছে কেউ। এইভাবে দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে, দিন কাটে তার। দিন যায়, সন্ধে আসে, রাত নামে। এইভাবে রাতগুলিও কাটে তার, ধীরে ধীরে পুব আকাশ ধুয়া হয়, পাখ-পাখাল জাগে, আলো ফোটে..।

দিনরাত শুয়ে শুয়ে আকাশ-পাতাল ভাবে সুবচনী। কত কিছু ঘটনা, দৃশ্য, কত স্মৃতি একসাথে ভিড় করে আসে..। ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে।

কবরডাঙার কাছাকাছি একটা প্রাচীন জামগাছ ছিল। মরসুমে গাছ ভবে পেকে থাকত ফল। সুবচনী কোমরে একখান ছৈতা জড়িয়ে পাড়াতুতো ভাইবোনদের সঙ্গে ডেঁয়ো-পিঁপড়ের মতো ঘুরে বেড়াত জামগাছের তলায়। জাম খেয়ে খেয়ে জিভ নীল হয়ে

যেত। বাউরিপাড়ার মধ্যিখান দিয়ে বয়ে গেছে জলকুলি। পুরু বালির সরা পড়েছে। ছেলেবেলায় কতদিন ঐ বালি দিয়ে বানিয়েছে ঘর, দোর, উঠোন...। ভাত রেঁধেছে মোটা দানার বালি দিয়ে। খোলামকুচি দিয়ে মাছের ঝোল। আঁকোড় পাতা দিয়ে বেগুন ভাজা। ফণিমনসার রসাল ডাল চাকা চাকা করে কেটে ভেজেছে। তুর্কির ডাঙায় মেলা বসত। নাগাড়ে পনের দিন। ফি-সন্ধ্যায় কথক গান হত। রামায়ণের কথা, রাধাকৃষ্ণের লীলা...। সুবচনী তার কচি শরীরখানা নিয়ে চুপটি করে বসে থাকত আসরের এককোণে। মন দিয়ে শুনত কথক গান। অনেক রাতে ঢুলতে ঢুলতে ঘরে ফিরত বাবার হাত ধরে। রামায়ণের সীতা হরণ, অশোক বনে সীতা, গুহক চণ্ডালের গল্প, কৃষ্ণলীলার মাথুরপর্ব, খুবই ভালো লাগত ওর। সীতা এবং রাধিকার দুঃখে চোখ ফেটে জল আসত তার, ঐ বয়েসেই। কী সুন্দর সুন্দর পদ, কী মনোহর সুর...! শুনতে শুনতে বিভোর হয়ে যেত মন। ঐ যে, যেখানে সীতাকে হরে নিয়ে যাচ্ছে রাবণ, সীতা আকুল গলায় রামচন্দ্রকে ডাকছে, একটি একটি অলঙ্কার খুলে খুলে ফেলে দিচ্ছে পথচিহ্ন হিসেবে...। শূন্য পথে সীতাদেবী কাঁদে, হায় হায়/ অঙ্গের গহনা যত ধূলিতে ছড়ায়। কিংবা, অশোকের বনে সীতা কান্দে গড়াগড়ি/ চারিপাশে হাস্য করে রাবণের চেড়ী।... রামচন্দ্র ফিরে চলেছেন অযোধ্যায়। পথশ্রমে ক্লান্ত। হাজির হলেন গুহক চণ্ডালের কুটিরে। রাম নামানন্দে গুহক কিছুই না জানে/ পুলকে ভরিল দেহ, ধারা দু'নয়নে।... একের পর এক মনে পড়ে যাচ্ছে কথক গানের পদগুলি। কণ্ঠভরা যন্ত্রণা নিয়েও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় সুবচনী। এই সুন্দর সুন্দর পদগুলি, সেই কোন্ শিশুকালে, কোন্ এক মধ্যরাতে শোনা, এখনো মনে আছে ঠিক-কে-ঠিক! কোথায় ছিল এগুলো, মনের মধ্যে কোথায় লুকিয়ে ছিল এতদিন! আরো আছে, অনেক অনেক পদ,... রাসলীলা, কালীয় দমন, মাথুর,—সব আছে, মনের মধ্যে। এক কলি, দু'কলি করে একে একে সব ঠেলে উঠছে বুকের কোন্ গোপন অন্দরমহল থেকে। গুনগুন করে গাইতে থাকে সুবচনী, মনের মধ্যে। বাইরে সে আওয়াজ বেরোতে পারে না। আর, গুলি-সুতোর একপ্রান্ত ধরে টান দিলে যেমন খুলে আসে সুতো অবিরাম, ঠিক তেমনই, বুকের মধ্যে আশৈশব জমিয়ে রাখা পদগুলি, সুর-তাল-লয়, এমন কি কথক-ঠাকুরের বিচিত্র মুদ্রা সহকারে উঠে আসে একেব পর এক! বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় সুবচনী। কোথায় ছিল এরা এতকাল, কেন ছিল! ছিলই যদি, এতদিন একটি কলিও কেন ধরা দেয়নি জিহ্বায়, কণ্ঠায়! আজ কেন মনে পড়ছে সব কিছু, এত অনায়াসে! গাইতে থাকে সুবচনী। মনের মধ্যে। সুরের হিল্লোল বয়ে যায় ভেতরে। সবাইকে ডেকে ডেকে শোনাতে সাধ হয়। কিন্তু কণ্ঠা পেরিয়ে সে আওয়াজ আর বেরোতে পারে না বাইরে। গলায় যেন এক কড়া প্রহরী পাহাবা দিচ্ছে দিনরাত। তাব কঠিন নজর এড়িয়ে একটি শব্দও বেরোতে পারে না বাইরে।

মনে পড়ে যায়, গানের ফাঁকে ফাঁকে কথক ঠাকুরের মধুর আলাপ। মথুরায় রাজা হয়েছেন ব্রজের রাখাল। শ্রীরাধিকার কথা ভুলেছেন তিনি। প্রিয় সখী বৃন্দা, দূত হয়ে এসেছে মথুরার প্রাসাদে। সে বয়ে এনেছে শ্রীমতীর ব্যাকুল বার্তা। কিন্তু মথুরাপুরীর দ্বাররক্ষী তাকে কিছুতেই ঢুকতে দিচ্ছে না অন্দরে।

কেঁদে ওঠেন বৃন্দা-দূতী। বলেন,

যমুনা পুলিনে বহে আঁখিধারা শ্রীমতীর নিশিদিন।
তুমি শ্যামরায় হেথা মথুরায় সুখেতে বিতাও দিন!

সহসা চমকে ওঠে সুবচনী। এ পদ তো কেউ গায়নি কখনো! কী করে তবে হেন গান বেরিয়ে এল বুক চিরে! কে গাইল ভিতরবাগে অমন আশ্চর্য পদ! তবে কি নিজেই বাঁধল সুবচনী? এমন পদখান্, হাঁ রে সুবচনী, তুই কি নিজেই বাঁধলি এইমাত্তর? সুবচনীর ভেতরে অবিরাম গুনগুনিয়ে ওঠে সুর। বৃন্দা দূতী গেয়ে চলে,

দ্বার ছেইড়ে দে'রে দ্বারী
ভিত্‌রে আছেন শ্যাম-মুরারী
দ্বার ছেইড়ে দে'রে দ্বারী...।

সুবচনীর বুকের মধ্যে উথাল পাথাল ঝড়। কণ্ঠার বিষাক্ত যন্ত্রণাকে ছাপিয়ে, সেই ঝড় উন্মত্ত হয়ে ওঠে। এতও ছিল, সুবচনী, এত সুন্দর পদ বাঁধবার ক্ষ্যামতাও ছিল তুয়ার! জানান্ দিস নাই! জীবনভর শুধু কু-বাক্যই খেলাই গেলি জিভের ডগায়!

ভেতরে আকুলিবিকুলি সাধ জাগলেও স্বরচিত পদগুলো কাউকে শোনাতে পারে না সুবচনী। কণ্ঠ তার স্বর হারিয়েছে একেবারেই। বুকের সুর বুকের মধ্যেই গুমরে মরে ঃ দ্বাব ছেইড়ে দে'রে দ্বারী / ভিত্‌রে আছেন শ্যাম-মুরারী / দ্বাব ছেইড়ে দে'রে দ্বারী...। গুমরে গুমরে কাঁদতে থাকে পদগুলি।; ভেঙে ভেঙে গুঁড়ো হাতে থাকে। রেণু রেণু হয়ে ছড়িয়ে পড়ে সর্বাঙ্গের রক্তে-মাংসে, মেদ-মজ্জায়...। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে আসে বাইরে, ছড়িয়ে পড়ে হাওয়ায়, পদ্মগন্ধে ভরে যায় সুবচনীর কুঁড়েখানি।

আশেপাশে কোথাও একটা কুটুম-পাখি ডাকছে। ট্যা—ট্যা—ট্যা। কুটুম আসবে না কি সুবচনীর ঘরে! পাখিটাকে দেখবার আশা বহুদিন জলাঞ্জলি দিয়েছে সুবচনী। শুধু চারপাশে চোখের মণি ঘুরিয়ে সে পাখিটার অবস্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করে। আর, এক অদৃশ্য দ্বারীর উদ্দেশে আকুল গাইতে গাইতে তার চোখের কোল নিঃশব্দে ভরে যায় জলে।

রাবণ

এক

গত রাতে এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেছে।

আমার খেজুর গুড়ের মহালে প্রহরাজ বেজ খুন হয়ে গিয়েছে। সে বড় মর্মবিদারক মরণ। পরম শক্রর মরণও যেন এমন না হয়।

আমি ভোরে উঠে নিমের ডাল দিয়ে দাঁতন করছিলাম। ক্ষুদিরাম সিং—আমার গুড়ের মহালের মাইন্দার এসে খবরটা দিল। ওহ্! লরক-যন্তন্না সইতে সইতে মরেছে গো লোকটা। লাখো লাখো বিষপিঁপড়া উয়ার সর্বাঙ্গ কুরে কুরে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। চোখদুটা বেমালুম নাই।

চোর-ডাকাতের দৌরাত্ম্যটা দিনকতক বেড়েছে এ তল্লাটে। এখন মহালে গুড় বানানো চলছে। গুড়, লবাত...। সেই আশ্বিনের শেষ থেকে গাছ কামানো, হাঁড়ি টাঙানো শুরু হয়েছে। এখন পৌষেও চলছে। মাঘ মাসের মাঝামাঝিতক চলবে। ইজারাবন্দী খেজুর গাছে গাছে খিল গোঁজা রয়েছে। গুঁজি ঝুলছে। আমার মহালে রোজ দু'শো গাছের রস আসে। দু'শো গুঁজি। অর্থাৎ, প্রায় একশো কেজি মতো রস। তা থেকে গুড় পাচ্ছি অবিশ্যি রোজ এক কুইণ্টালের থেকে কিছু কম। পাইকাররা আসছে, আসছে বাঁকুড়া, তালডাংরা, শিমলাপাল থেকে। দরদাম করছে। কিনে নিচ্ছে গুড়। ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে সে গুড় চলে যাচ্ছে দূরে-দূরান্তে। কাঁচা টাকা কিছু-না-কিছু রোজ ঢুকছে মহালে। রাতের জাগুয়া আছে সব মহালেই। যেমন আমার ছিল প্রহরাজ বেজ। তবুও, গুড়ের গন্ধে যেমন পিঁপড়া আসে, গুয়ের গন্ধে মাছি, ঠিক তেমনি, রাতের আঁধারে মহালে হানা দেয় রাত কুটুমের দল। সুলুকসন্ধান খোঁজে। সুযোগ মত লুটেপুটে নিয়ে যায়। শিমলাপাল থানা থেকে 'পুলুশ' আসে। লাঠিধারী 'কনিষ্ঠবল'। তারা চোর ধরতে আসে না। আসে মাল-টাল খেতে। তা দিই, মহাল-মালিকেরা যুক্তিবুদ্ধি করে দু'এক পাইট রাখি মহালে। লচেৎ উয়া'রা আইবেক ক্যানে শুদুমুদু অতখানি পথ ঠেঙিয়ে? ঠাকুর-দ্যাব্তা হেন চিজ, উয়ারাও শুদুমুদু আসেন না। দস্তুর মতো 'পাঠা দুবো, পূজা দুবো' বলে ডাকতে লাগে। আর ইয়ারা তো লেহাৎই মনিষ্যি। তায় আবার পুলুশ। তবু উয়ারা রাতেভিতে মহালে মহালে পা'র ধুলাটা দেয় বলেই টুকচান বাঁচোয়া। রাতের কুটুমরা ভেবেচিন্তে হানা দেয়।

ক্ষুদিরাম সিং দু'চোখ কপালে তুলে বলে যাচ্ছিল প্রহরাজ বেজের নরক-যন্ত্রণার কাহিনী। সম্পূর্ণ ন্যাংটো মানুষটা রাতভর লাখে লাখে বিষপিঁপড়ার খাদ্য হয়ে মরেছে!

বললাম, 'বলু কি রে? চোখদু'টা এক্কেরে নাই?'

'লয় আইজ্ঞা।' ক্ষুদিরাম সিং ভয়ে রক্তশূন্য, 'চোখের থানে একজোড়া বিশাল

গভ্‌ভর। উয়ার মধ্যে কালো রক্তের ঢেলা। তা বাদে লিঙ্গ, এ্যাঁড়কুষায়ও শতেক ছিদ্র করে সুড়ুং বাইনেছে বিষপিঁপড়ার দল।'

'থাম্‌রে। শুইন্‌তে লারি।' ক্ষুদিরাম সিংকে ধমকে থামিয়ে দিই, 'যা, প্রহরাজের বউকে খবরটা দে। আর শুলু মাঝিকে বল্‌, শিমলাপাল থানায় একটা খবর দিক। আর মাচাতোড়া পঞ্চাৎ অফিসে।'

ক্ষুদিরাম সিং চলে যায়। আমি চুপটি মেরে বসে থাকি। মনশ্চক্ষে দেখতে থাকি হৃদয়বিদারক দৃশ্যটা। সারা শরীর সহসা কেমন গুলিয়ে ওঠে আমার। এহ্‌! বড় বিদ্‌ঘুটে এই মরণটা! দুনিয়ার কোনও কষ্টের সাথেই বোধ লেয় তুলনা চলে না এমন মৃত্যুর। চোরেরা বিরক্ত হয়ে মাঝে মধ্যে বেয়াড়া জাগুয়াদের সাজাটাজা দেয় বটে। বছরটাক আগে মাচাতোড়ার শম্ভু গুচ্ছাতের মহালের জাগুয়াটির ঠোঁটের ধার থেকে গাল অবধি ছুরি দিয়ে ফালা করে দিয়েছিল। রাতভর 'হো-হো-খবরদার'—বলে চিল্লানোর সাজা। মরেনি। তবে বহুত দিগ্‌দারি পেয়েছিল লোকটা। প্রহরাজের কষ্টের সাথে অবশ্য তার তুলনা হয় না। এমন কি সতীকান্ত সিংহবাবুর মরণটাও এর তুলনায় নগণ্য। সতীকান্ত সিংহবাবু। জিরাবাইদ গাঁয়ের সেই প্রতাপশালী মনিষ্যিটির মরণ তো আমি নিজের চোখে দেখেছি। তখন ওর নব্বুইয়ের ওধারে উমর। অঙ্গের সব ইন্দ্রিয়ের দুয়ার শিথিল। নখ-দন্তহীন ব্যাঘ্র। দিনরাত শুয়ে থাকে বিছানায়। তলা দিয়ে বাহ্যি বেরিয়ে যায়। সুমুখপানে পেচ্ছাব। দেহের কোনও বস্তু তো নয়ই, মনের বাক্যিগুলানও চেপে রাখতে পারে না একতিল। ফোকলা মুখে অবিরাম বিড়বিড় বকে চলে! আক্ষেপ, অভিযোগ, অভিমান। নিজের উপর, বউ-ছাওয়ালের উপর। উপরওয়ালা—যিনি দিনকে রাত করেন—তাঁর ওপর। চব্বিশ ঘণ্টা বিছানাবন্দী। শীতে, গ্রীষ্মে, বর্ষায়। তবুও মরে না। বুকের খাঁচা থেকে শেষ হাওয়াটুকু আর বেরোয় না কিছুতেই। বিছানাতে পাশ ফিরিয়ে দিতে হতো। দিনের মধ্যে যতবার, সম্ভব। দিত, যার যখন সময় হতো। চিৎ থেকে উপুড়। উপুড় থেকে বাঁ-পাশ। যেন কড়াইয়ের ওপর ভাজা কই মাছ ওলটানো। আবার সংসারের মানুষ জন কাজে-কর্মে বেরিয়ে গেলে, তখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক মুদ্রায় শয়ন। অসহায় সতীকান্ত চিল-চিৎকার জুড়ে দেয়। অরে গু-খাউকীর ব্যাটা-বেটিরা, একপাশে শুয়্যে শুয়্যে যে কাঠ হইয়ে গেল্যাম রে খাল-মুয়ার দল! কেউ শোনে না। ইদানিং চিল্লানোর ক্ষমতাটাও প্রায় নেই বললেই চলে। কাজেই কাঁটাসার একটি শরীর দিনের পর দিন শুয়ে থাকে তেল চিটচিটে বিছানায়। চিৎ হয়েই শুয়ে থাকে অধিকাংশ সময়। চোখের কোনায় জলের ধারা শুকিয়ে থাকে। দু'চোখে মরা মরা চাউনি নিয়ে সে কেবল নিঃশব্দে দিন গুনে যায়।

এইভাবে শুয়ে থাকতে থাকতে সতীকান্তর পিঠেব ছোট্ট ছোট্ট ফুস্কুড়িগুলো বড় হলো। বিছানাব সাথে তাদের ঘষাঘষি চলল অবিরাম। রস চোঁয়ালো। ঘা হলো। কালে কালে দগ্‌দগে হলো সে ঘা। দুর্গন্ধ ছড়াল। মাছি ভনভনালো ঘায়ের ওপর। তখন কার সাধ্যি সতীকান্তর ঘরে ঢোকে। ফলে, কালেভদ্রে যারা উল্টে পাল্টে দিতে আসত, তারাও যেন না আসতে পারলে বেঁচে যায়। চানের আগে আগে মনে পড়লে তবু উল্টে দেবার ইচ্ছেটা জাগে একটু আধটু। উল্টে দিয়েই সোজা পুকুরে গিয়ে ডুব মারা। একটা সময় এলো, যখন দিন যায়, রাত যায়, একলা ঘরে একরাশ আঁধার, মাছি, দুর্গন্ধ ও যন্ত্রণা নিয়ে শুয়ে থাকত সতীকান্ত সিংহবাবু। দিন নয়, তখন কেবল ক্ষণই গুনত। তখন প্রতিটি

দণ্ডকে মনে হতো যেন এক একটি যুগ।

সতীকান্ত সিংহবাবুর ঐ সময়টাতেই আমি ওর ঘরে যেতাম। রোজ পালা করে একবার। নাকে কাপড় চাপা না দিয়েই ঘরের মধ্যে ঢুকতাম। থির পলকে দেখতাম ওকে। শুধু দেখবার জন্যই তো যেতাম। অন্য কোনও কারণেই নয়। সতীকান্ত সিংহবাবুর মতো একটা মানুষ মরছে। দণ্ডে-দণ্ডে, পলে-পলে। সেটাই তাকিয়ে দেখবার মতো ব্যাপার ছিল আমার কাছে। সতীকান্তও আমার দিকে পলকহীন তাকিয়ে থাকত। অবোলা সময় বয়ে যেত তিরতিরিয়ে। পুরনো দিনগুলো কি ওর মনের মধ্যে ঘাই মারে এখনও? ওর সেই দাপটের দিনগুলো? অনুতাপ হয়? অমন আকণ্ঠ যন্ত্রণার দিনেও কি পুরনো দিনের স্মৃতিগুলান মজলিশ বসায় উয়ার মগজে? কে জানে! মাঝে মাঝে অতি ক্ষীণ গলায় কতকিছু বলে যেত সতীকান্ত সিংহবাবু। কথার বারো আনাই ছিল অভিযোগ। আত্মীয়-স্বজন, গরম-ঘাম, মশা-মাছি, সরকার আর ভগবানের বিরুদ্ধে।

ফিস্‌ফিস্ করে বলত, 'ভগবান যদি বর দিতে চায় তুয়াকে, সোনাদানা, যশ-খ্যাতি, রূপ-বৈভব,—না, না, লিবি নাই উ'সব। বইল্‌বি, কিচ্ছোটি নাই চাই আইজ্ঞা। শুধু আচম্বিতে মরণ দাও। আচম্বিতে মরণ।' যেন বহু দূর থেকে ভেসে আসে ওর ক্ষীণ গলা, 'আইছু যখন এ দুনিয়ায়, ফেরৎ যাবিই। তেবে সার কথাটি শুনে লে। আসা যত সহজ, যাবা তত সহজ লয় হে—।'

আমি রা' কাড়ি না। শুধু নয়ন ভরে দেখে যাই। কান ভরে শুনে যাই। একসময় পায়ে পায়ে বেরিয়ে আসি ওর ঘর থেকে। তখন সর্বাঙ্গ জুড়ে কুলকুল করে নদী বয়!

মাস কয় বাদে মরে গেল সতীকান্ত সিংহবাবু। সবাই স্বস্তির শ্বাস ফেলল, কেবল আমি ছাড়া। বড় দুঃখু হয়েছিল আমার। হায়রে! অত জলদি মরে গেল! আরো কিছো দিন দেইখ্‌তে পেলাম নাই শালার লরকযন্তন্নাটা! আমার বুকের মইধ্যে একটা শাগ্‌নার বাচ্চা, সেই ছা' বেলা থেকেই কাঁদ্‌ছে। অহরহ শুধুই কাঁদ্‌ছে। সতীকান্ত সিংহবাবুর লরকভোগের দৃশ্যটা দেখে সে টুকচান থামাত তার কাঁদ্‌নাটা। আসলে উই শাগ্‌না ছা'র কাঁদ্‌নাটা থামাবার তরেই লিত্যিদিন সতীকান্তর ঘরে যেতাম আমি।

দুই

তখন আমার বয়েস সাত কি আট। জিরাবাইদ ইস্কুলে পড়ি। ইস্কুলের এক নম্বর পড়ুয়া ছিলাম আমি। বাড়ির লাগাও একটা জমিন ছিল আমাদের। এক চাকেই প্রায় চার বিঘা। ঐ জমিনের ওপর পেট চলত ছ'টা। বাবা, দিদি আর আমরা চার ভাই! কাজেই পেট চালাতে বাড়ির সব্বাই অষ্টপ্রহর পড়ে রইত ঐ জমিনে। শোল জমিন ছিল। সবার মেহনতে ফলত হাতিঠেলা ধান। আধপেটা খেয়ে আমাদের দিন চলে যেত কোনও গতিকে। সতীকান্ত সিংহবাবু বংশের শেষ জমিদার। তারপরেই জমিদারী লোপ পায় সরকারি আইনে। জিরাবাইদ গাঁয়ে ছিল তাঁর বিশাল বাখুল, গড়। তাঁর সুমুখে খাড়া হলে সিংহও নিমেষে হয়ে যেত মুষাটি। অনেক গুণের অধিকারী ছিলেন তিনি। সারাক্ষণ মদের নেশায় চুর হয়ে থাকতেন। তার ওপর ছিল মেয়ামানুষের দোষ। বিত্তবানদের এ রোগটা বোধ করি মজ্জাগত। অর্থবৈভব পেলেই মাইন্‌ষের সখ হয় 'ময়েমানুষ

পোষার। নিজের অন্দরমহলে মা-লক্ষ্মীর পায়ের ছাপটি পড়লেই, মানুষ অন্যের অন্দরমহলে নিজের পায়ের ছাপটি ফেলতে চায়। তো, অতুল বৈভবের মধ্যে সতীকান্ত সিংহবাবুর কেবল নিজের ঘরের মেয়ামানুষটিকে লিয়ে আর কিছুতেই সাধ মিটছিল না। লিত্যিদিন সে নতুন মেয়ামানুষ খোঁজে। চারপাশের গাঁ'র এ-ঘরে ও-ঘরে তার অনেক সাধ-আহ্লাদ মেটাবার ঠেক। আর বাঘও আড়াল করে খায়, কিন্তু সতীকান্ত সিংহবাবু কদাচ সেই আড়ালখান্‌ও রাখত না। দিনে-দুপুরে শতচক্ষুর সুমুখ দিয়ে ছাতি ফুলিয়ে সে রক্ষিতার বাড়ি যেত। সিংহবাবু-বংশের বড়কর্তাকে ঠেকাবে, অমন ছাতিব পাটা কার? বড় হয়ে বুঝেছি আমাদের ঘরেও সেঁধাবার সাধ হয়েছিল তার। দিদির তখন বছর আঠারো বয়স। বিয়ের উপাড় আসছে। বাবা ছিল এমনিতে খুব নরম আর দুর্বল ধাতের মানুষ। সতীকান্ত সিংহবাবুর মতো মানুষের সুমুখে একতাল কাদাটি। কিন্তু এই একটা ব্যাপারে সে রাজি হয়নি সতীকান্তর প্রস্তাবে। ছোটোবেলায় অতসব ব্যাপার মোটেই বুঝিনি। কেবল দেখেছিলাম, একদিন ঠায় দুপুরে বাবা ফিরল মাঠ থেকে। সেটা বোধ করি কার্তিকের শেষ। ধানের ডগায় শীষ এসেছে। কাঁদি পড়ছে। দুধ জমছে বুকে। বাবা ঘরে ঢুকেই বাখান জুড়লেন আর খুঁজতে লাগলেন বড়দাকে। আজ উয়ার একদিন কি আমার একদিন। গাইটাকে চরাই বুলাই আনত্যে পাঠাল্যম্‌ উয়াকে। গাই ছেইড়ে উ লেবেছে ভূতদীঘির জলায় পদ্মচাকির তরে। উদিকে গাই লেবেছে সিংহবাবুর জমিনে। প্রায় চার হাত আন্দাজ জমিনের ধানগাছ লণ্ডভণ্ড! বড়দা লুকিয়ে লুকিযে রইল সারা দুপুর। বাবাও গুম মেরে রইলেন সারাক্ষণ। সারা মুখে অপার দুশ্চিন্তা নিয়ে।

দুপুরের তেজ একটুখানি পড়তেই সাহেব-বাঁধের পাড় ধরে হেলতে দুলতে এলেন সতীকান্ত সিংহবাবু। বিশাল বপুখানি নিয়ে দাঁড়ালেন আমাদের জমিনের আলে। পেছনে পেছনে পাইকের কাঁধে চড়ে এলো তাঁর পেয়ারের কুর্শিটি। বত্রিশ সিংহাসনের পুতুলের মতন নকশা কাটা তার সর্বাঙ্গে। কুর্শির পিছু পিছু এলো তাঁর রূপোবাঁধানো আলবোলা। সোনালী ঝালর দেওয়া পাখা নিয়ে এলো সিংহবাবু-বাড়ির পুরনো ঝি বিন্দুবাসিনী। সিংহবাবু কুর্শি জাঁকিয়ে বসলেন প্রশস্ত আলের ওপর। লগেন বাগ্দী ছাতা ধরল মাথায়। হাতপাখা দিয়ে হাওয়া করতে লাগল বিন্দুবাসিনী। পুরুষ মাইন্‌ষের হাতের হাওয়া সিংহবাবুর শরীরে সয় না। জ্বলন্ত কলকে বসানো হলো আলবোলায়। লম্বা নলটি ধরিয়ে দেওয়া হলো সিংহবাবুর হাতে। ভুড়ুক ভুড়ুক আওয়াজ তুলে তামাক খেতে লাগলেন তিনি মৌজ করে। সুগন্ধি অম্বুরী তামাকের তীব্র সুবাস ছড়িয়ে গেল হাওয়ায়। সতীকান্ত সিংহবাবুর মুখ থমথমে। চক্ষু রক্তবর্ণ। দেখে শুনে প্রমাদ গুনি আমরা। ভয়ে যেন কাপাস পাতা। আড়ালে আবডালে লুকিয়ে চুরিয়ে দেখতে থাকি ওঁকে। কেবল বাবাই এগিয়ে গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম সেরে পাশটিতে দাঁড়ান। দাঁড়িয়েই থাকেন বোবার মতন। সতীকান্ত সিংহবাবুর অমন সাড়ম্বরে আগমনের হেতুটা জিগাতেও সাহস হয় না তাঁর।

সতীকান্ত সিংহবাবুর আগমণের হেতুটা অল্প বাদেই দেখা গেল স্বচক্ষে। জমিন থেকে অল্প তফাতে এসে দাঁড়াল সিংহবাবুদের বাছাবাছা জনাদশেক লাঠিধারী পাইক আর গোটা বিশেক পাহাড়িয়া গরু। আলবোলায় সুগন্ধি ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সিংহবাবু একবার আড়চোখে তাকালেন বাবার দিকে। তারপর ইঙ্গিত করলেন লগদীদের। ইঙ্গিত পাওয়া মাত্তর বিশটা পাহাড়িয়া গরু নেমে পড়ল আমাদের জমিনে। মনেব পুলকে খেতে লাগল সবুজ ধানের গাছ। গোছায় গোছায়। জমিনের চৌহদ্দি ঘিরে আলের ওপর খাড়া রইল

লগদীর দল। হাতে তাদের তেল মাখানো লম্বা লাঠি। বাবা হাঁউমাউ করে ছুটে যাচ্ছিলেন গরুগুলোকে তাড়াতে। দু'জন লগদী দু'ডানায় ধরে থামিয়ে দিল তাঁকে। ঐ অবস্থায় বাবা ঝাঁপিয়ে পড়লেন সিংহবাবুর পায়ের তলায়। আছাড়ি-পিছাড়ি খেয়ে মড়াকান্না কাঁদতে লাগিলেন। তাঁর চিৎকারে দু'চার জন পাড়া-পড়শী জমল এধার-ওধার থেকে। আশে-পাশে এসে পুতুলের মতো দাঁড়াল। কিন্তু মুখ থেকে কথা খসায়, সাধ্যি কি ওদের? কে আর সেধে সিংহবাবুর কোপে পড়তে চায়!

সিংহবাবু মৌজ করে তামাক খেতে লাগলেন। তাঁর দশাসই গরুগুলান প্রাণভরে খেতে লাগল আমাদের জমিনের ধানগাছ। খেলো যত, মাড়াল তার চেয়েও বেশি। আর, বাবা সারাক্ষণ সিংহবাবুর পায়ের তলায় নিথর হয়ে পড়ে রইলেন। আমরা আড়াল থেকে পাথরের মতন শক্ত হয়ে দেখতে লাগলাম দৃশ্যটা। ভয়ে কেঁদ কাঠ হয়ে গেছি সক্কলে। ধীরে ধীরে আমাদের জমিনটা ফাঁকা হতে লাগল। কাদায় চট্‌কে লণ্ডভণ্ড।

এক সময় সূয্যিদের পাটে বসলেন। তাঁর সোনার বর্ণ চাকি লাল হয়ে এলো পশ্চিম গগনে। সিংহবাবু উঠে দাঁড়ালেন কুর্শি থেকে। ভারি ভারি পা ফেলে ফিরে চললেন গড়ের দিকে। পেছন পেছন তাঁর কুর্শি, গড়গড়া, পাখাশুদ্ধু বিন্দুবাসিনী, লগদী, গরু ও লোকলস্কর। আমাদের চার বিঘার চাকটিতে তখন একটি ধানগাছও আস্ত নেই।

ধাক্কাটা হয়তো কোন প্রকারে সামলে নিতেন বাবা, কিন্তু বিধি বাম। পরের বছরই হলো অজম্মা। দেশ জুড়ে দারুণ খাটারশাল। ফলে একটা-দুটা করে তাবৎ জিনিসপত্তর, গরু-ছাগল, জমিজিরাত, মায় ভিটাটি পর্যন্ত বিক্রি কিংবা বন্ধক দিতে দিতে বছর দুয়েকের মধ্যে একেবারে ফতুর হয়ে গেলাম আমরা। আর, ঐ জমিনের বারো আনাই জলের দামে কিনে নিল সতীকান্ত সিংহবাবু। ধাক্কাটা বাবা সইতে পারল নাই কিছুতেই। সেই দুপুরের গুম মারা ভাবখানা আর নড়ল না তার মুখ থেকে। সর্বদাই বসে বসে শুধু ভাবত আর খকরখকর কাশত। বছর দুই না পেরাতে অতবড় জোয়ান লোকটা কেমন বুড়িয়ে ডাং মেরে গেল। এবং একদিন টুপ করে ঝরে গেল।

তার পরের অবস্থা আর কহতব্য নয়। দু'দিন না যেতেই ভিটা থেকে হটিয়ে দিল সিংহবাবু। আমরা পথে দাঁড়ালাম। দিন কতক এধাব-ওধার ফল-পাকুড় খেয়ে, ভিখ-[illegible] মেগে একেবারে হেদিয়ে পড়লাম আমরা। শুরু হলো আসল অর্থে উপবাস। পেটের জ্বালায় আমরা, যে যেদিকে মন চায় পালালাম। বড়দা কোন্ এক মাটিকাটা দলের সাথে পালিয়ে গেল গোরাবাড়ির দিকে। সেখানে কংসাবতীর উপর ড্যামের কাজ চলছে। মেজদা ছিল চিররুগ্না। সে শিমলাপালের বাজারে চট বিছিয়ে ভিখ মাগতে লাগলো। আমার তলার ভাইটার তখন বছর সাত-আট বয়েস। এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াত। ফল-পাকুড় পেড়ে খেতো। শিলাবতীর ঝিরঝিরে জলে ন্যাকড়া দিয়ে মাছ ধরত। একদিন রিঠা ফল পাড়তে গাছে উঠেছিল সাহেব বাঁধের পাড়ে। মাচাতোড়ার গুচ্ছাতদের সেজ-বৌয়ের মাথা ঘষবার জন্য। মাত্তর এক কাঁসি পান্তাভাতের লোভে। পা ফসকে পড়ল মাটিতে। বাপ বলবার সময় দিল না। মুখে রক্ত উঠল ঝলকে ঝলকে। আমি তখন বাঁশকানালী গাঁয়ে শক্তি চঁদের ইস্টেটে পেটভাতুয়ায় থাকি। ওদের ছাগল-টাগল চরাই। ছা-ছাওয়াল ধরি। খবর পেয়ে ছুটে গেলাম মাচাতোড়ায়। চোখের জলে বুক ভাসালাম। শক্তি চঁদের কাছ থেকে কুড়ি টাকা কর্জ নিয়ে সৎকার করলাম ভাইকে। তারপর ফিরে এলাম বাঁশকানালী। আর দিদি—যার জন্য সতীকান্ত সিংহবাবুর কোপে পড়ে আমাদের

হেন দুরবস্থা—তার ঠাঁই হলো পাঁচ থান ঘুরে সিংহবাবুদেরই বাখুলে। দিদি তখন চারপাশের গাঁ-গুলোতে পাগলিনীর মতো ঘুরছিল। কোনও ভদ্র ঘরে দিনরাত হাড়ভাঙা খাটালির বদলে একচিলতে আশ্রয়ের তরে। কিন্তু দিদিকে ঠাঁই দিতে ভরসা পায়নি কেউ। দিদি যে ঘরে ঠাঁই নেবে, সেই ঘরেই তো আনাগোনা জুড়বে সতীকান্ত সিংহবাবু। কালে কালে তার দৃষ্টিবাণ দিদিকে ছাড়িয়ে ঐ বাড়ির অন্যদের ওপর পড়াও বিচিত্র নয়। আরে রামো কহো! ঘরে হাঁস-মুরগীর ভাড়ি বানিয়ে কে আর শিয়াল আমদানি করতে চায় নিজের ভিটায়!

গাঁয়ে গাঁয়ে ঠাঁই না পেয়ে দিদি দিনকয় ছিল শিমলাপাল বাজারের হরিবোল মেলায়। সেখানে প্রথম রাতে হাজির হলো লক্কা পায়রার মতো একদল ছোকরা। পরের রাতে ওদের হটিয়ে হরিবোল-মেলার দখল নিল একদল খাঁকি। খাঁকি চোখের আড়াল হতেই এলো এক দালাল। সে দিদিকে নিয়ে যেতে চায় কোলকাতায়। সেখানে নাকি অতুল সুখ, বৈভব। দিনের বেলায় যেমন তেমন, রাতটি হলেই ভয়ে কাঁটা হয়ে যায় দিদি। বুকের মধ্যে একটা জন্তু যেন হাঁচোড়-পাঁচোড় মাটি আঁচড়ায়। গর্ত খোঁড়ে। সারারাত।

শেষ অবধি সতীকান্ত সিংহবাবুর দুয়োরেই মাথা খুঁড়তে হলো দিদিকে। এমনিতে পেটের জ্বালার তুল্য জ্বালা নাই এ দুনিয়ায়, মানুষের ইহকাল-পরকাল ভুলিয়ে দেয়—ঠাঁই নিতে হতোই, কোথাও না কোথাও। দালালের সাথে কলকাতা যাওয়ার চেয়ে এ বরং ভালো। কথায় বলে, অচেনা দহ আর চেনা শ্মশান, দুটোই ভয়ের। দিদির কাছে, এ হলো অচেনা দহর বদলে এক চেনা দহ।

সিংহবাবুদের গড়ে থাকাকালীনই একদিন গলায় দড়ি দিয়েছিল দিদি। জিভ ঝুলে পড়েছিল হাতটাক। চোখ বেরিয়ে এসেছিল কোটর ঠেলে। যে দেখেছে, সে-ই আঁতকে উঠেছে।

সাহেব বাঁধের পাড়ে দেখা হতেই তারিণী ওঝা আমায় একান্তে বলেছিল, 'শুধু তুয়ার দিদি লয়। পেটের মইধ্যেও একটা মইর্‌ল উই সাথে।'

শুধু তারিণী ওঝা নয়, তল্লাটের সব্বাই জানত ওটা আত্মহত্যা নয়। দিদিকে মেরে ওরা ঝুলিয়ে দিয়েছিল দড়িতে। সে নাকি সতীকান্ত সিংহবাবুর হাজার পীড়াপীড়িতেও পেট নামাতে রাজি হয়নি। ফলে, সিংহবাবু-বংশের 'মর্যাদা' রাখতে মরতে হলো দিদিকে।

আমি তখনও বাঁশকানালীর শক্তি চঁদের দোরে পেটভাতুয়া আছি। খবরটা তারিণী ওঝার মুখে শোনামাত্তরই ছুটে গিয়েছিলাম জিরাবাইদ গাঁয়ে, ওরা লাশ জ্বালিয়ে দিয়েছে ততক্ষণে। আমার জীবনে এই প্রথম শরীরের তাবৎ রক্ত উথাল-পাথাল। মাথায় জ্বলন্ত রাবণের চিতা। শয়তান জেগে উঠেছে মনে। প্রসন্ন ঠাকুরের আমবাগানে তপ্‌নি-ভাটের ঝোড়ের মধ্যে লুকিয়ে বসে রইলাম সারা রাত। হাতে নিলাম মাছ মারবার ক্যাঁচা। ঐ পথ দিয়েই সতীকান্ত সিংহবাবু আনাগোনা করে রোজ। আম বাগিচার পশ্চিম কোণেই ওর এক রাঁড়ের ঘর। কিন্তু না। আমার কপাল মন্দ। পরপর তিন-চার রাত উজাগর হয়েও ধরতে পারলাম না সিংহবাবুকে। শালা বোধ লেয় কোনো কিছু আন্দাজ করে সতর্ হয়ে গিয়েছিল। বাধ্য হয়ে ফের ফিরে এলাম শক্তি চঁদের গুড়ের মহালে। সেখানে দিনভর গুড়ে জ্বাল দিতে দিতে রাগের ফেনাটা মরে গেল দু'দশ দিনেই। আসল রাগটা ক্রমশ আঠা-গুড়ের মতোই গাঢ় হতে লাগল। একটা ছবি বুকের মধ্যে ছিলই। একটা খালুমুয়া, সব-খাউকী বিকালের ছবি। একটা পুরুষ্টু ধানের চাক। তার থোড়ে থোড়ে

গাঢ় দুধ। এক বিকালের মধ্যে শতচক্ষুর সুমুখে উড়ে গেল, যেন সতীকান্ত সিংহবাবুর অম্বুরী তামাকের ধোঁয়ার সঙ্গে ধোঁয়া হয়ে। এর সঙ্গে আর একখান্ ছবি যোগ হলো। ফুলের মতন একটি মেয়া উঁচু কড়িকাঠে অসহায় ঝুলছে। তার জিভ ঝুলে পড়েছে। দু'চোখ ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে কোটর ঠেলে। তার পেটের মধ্যে নিষ্পাপ এক শিশু।

তিন

প্রহরাজের বউটা বড় আছাড়ি পিছাড়ি কাঁদছে। আমারই ঘরের দাওয়ায় আমার পা' দুটো জাপটে ধরে কাটা পাঁঠার মতো ছটকাতে লেগেছে। কিছুতেই প্রবোধ দেওয়া যাচ্ছে না তাকে। হাজার হোক, মেয়ামাইন্ষের প্রাণ। সোয়ামীর অমন দগ্ধে দগ্ধে মরণ। চরম অসতীও সইতে পারে। এ'তো ফের ভালা ঘরের ঝি। গরিব হলেও উত্তম বংশে জনম।

ওর মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিই আমি। বলি, 'মেয়া তুই কাঁদিস না। প্রহরাজ ছিল আমার মাইন্দার। সে বিহনে তুয়ার সব দায়-দায়িত্ব আমার। সেটুকু মনুষ্যত্ব আমার আছে বটে। বিশ্ব সন্সার জানে সেটা। মাইন্দারী কর্যে কর্যে এ থানে উইঠেছি আমি। মাইন্দারের জীবনের দিগ্দারিটা বুঝি।'

প্রহরাজের বউয়ের কানে ঢোকে না বুঝি কথা। সে কেবল অবোধের মতন কুলকুলিয়ে কেঁদে যায়। মেয়ার মনটা ভারি নরম। মায়া-মমতাও অঢেল। আমি জানি। তিল তিল করে আমার মনে তেমন প্রত্যয় জন্মেছে। সে ঘটনাগুলো বড় মনে পড়ছে আজ।

আমার গুড়ের মহালে কর্মচারীর সংখ্যা ছিল তিন। ক্ষুদিরাম সিং আর গুলু মাঝি ছিল মহালের মাইন্দার। আর প্রহরাজ বেজ ছিল রাতের জাগুয়া। জাগুয়া হবার যোগ্য মনিষ্যি সে বটে। ইয়া বড় ছাতি। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। মুগুরের পারা বাহু! আকাট জোয়ান সে। সাহসও ধরে মনে। আর, নিজের কাজটি চেনে ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনা। রাতের বেলায় সে দু'চোখের পাতা এক করে না। ছিঁচকে চোর-বাটপাড়দের যম সে।

মহালে মহালে চুরির হিড়িক বেড়েছে। আমার ভরসা প্রহরাজ বেজ।

ঐ আনন্দেই ছিলাম। কিন্তু আনন্দটা মাটি করে দিল শিমলাপাল থানার বাঁটুল সিপাই। থানার পাশেই পঞ্চাৎ অফিস। গেটের সুমুখে খাড়া হয়ে দাঁত খোঁটাচ্ছিল বাঁটুল। আমাকে দেখে দাঁতের কানাচে হাসলো। বলল, 'মাস মাইনে দিয়ে পাহারাদার পুষছো রাবণ। রাতে পাখি খাঁচায় থাকে তো? নাকি পাখনা মেলে ফুড়ুৎ!'

প্রবল ধন্দের মধ্যে ডুবে যেতে যেতে শুধোই, 'তার মানে?'

'মানে, তিন রাত পরপর গিয়েও তাকে মহালে পাইনি।' বাঁটুল সিপাই আবারও হাসে।

মালের লোভে এরা রাতের বেলায় মহালে মহালে ঘুরে বেড়ায়, এটা ঠিক। শুধু শুধু মিছে বলবার লোক নয় এরা।

আমি মহা ভাবনায় পড়ে গেলাম।

সেই রাতেই বেরলাম আমি। মহালে পৌঁছে দু'চোখ ছানাবড়া! মহাল খাঁ খাঁ। কুমা'র

মধ্যে কেউ নেই। তিনটে কুঠরিই বাইরে থেকে তালা দেওয়া।

সকাল হতেই প্রহরাজকে তলব দিলাম বাখুলে। বাঘের ঝাপট নিলাম ওর ওপর। অতবড় জোয়ানটা আমার ধমক-ধামকের মুখে সারাক্ষণ মাথা হেঁট করে খাড়া রইল। শেষমেষ অধোবদন হয়ে লজ্জায় মরে যেতে যেতে বলল, 'বউটা, আইজ্ঞা, রাইতের বেলায় একলাটি রইতে লারে।'

রোগটা এতক্ষণে ধরা পড়েছে আমার কাছে। গেল ফাল্গুনে বিয়া করেছে প্রহরাজ বেজ। ফাগুনের বউ আগুন। তা, সে নাকি সত্যসত্যই এক আগুনের খাপ্‌রা। শোনা কথা। চর্মচক্ষে দেখি নাই। তো, এই কারণে প্রহরাজ রাতের বেলায় মহাল ছাড়ে? আমি তাকে এই মারি তো সেই মারি। শালা, মোর হাজার টাকার চিজ রইল মহালে, আর তুই চইল্‌লি বউ'র কোড়ে শুইতে! কালকেই শালা ডাইরি কইর্‌বো তুয়ার নামে। মহালে চুরি হল্যে তুয়াকে বি' বাঁধবেক পুলুশ। মুখে ধমক দিই বটে। কিন্তু মনে মনে হাসি। ঘরে সাক্ষাৎ আগুনের খাপ্‌রাটি গণগইন্যা হইয়েঁ জ্বলবেক রাতভর, আর প্রহরাজ বেজ লিত্যিদিন শরীলের সখ-সাধ চেপে পাহারা দিবেক আমার গুড়ের মহাল! তাও কি হয়? নিজে বিয়া-থা না করলেও সেটা আমি বুঝি। কিন্তু এক্কেরে ঢিলাও দেওয়া যায় না। মহালটি লাটে উঠবে তা'লে। তাছাড়া মাসটি গেলে বিশটি টাকা দিচ্ছি ওকে। ছ'মাসের আগাম নিয়েছে। করকরে একশো বিশটি টাকা। সে তো আর লিত্যিদিন বউযের কোড়ে গিয়ে শোবার তরে নয়। কাজেই ফোঁস করতেই হয়। ধমক-ধামক খেয়ে সে দু'রাত মহাল জাগে তো তৃতীয় রাতে বিগড়ায়। আমি বিষম ভাবনায় পড়ি।

মাঝে মাঝে ওই আগুনের খাপ্‌রাটিকে একটিবার দেখতে সাধ হয়। দেখি কেমন সে মেয়া, কি উয়ার অপার মায়া, যার তরে বাঁধা চাকবিকে তুচ্ছ করে প্রহরাজ বেজ ফি রাতে পালায় কাজের থান থেকে উয়ার সঙ্গ লালসায়।

একদিন কানে এলো, প্রহরাজের নাকি বেজায় জ্বর। শুনে, গেলাম ওর বাড়ি। প্রহরাজের বউ তড়িঘড়ি আসন এনে পেতে দিল দাওয়ায়। ঘটিতে জল এনে বসিয়ে দিল সুমুখে। আমি লয়ন ভরে দেখলাম ওকে। ডাগর-ডোগব শরীরে যৌবনের ভিয়েন চড়েছে যেন! কারণে-অকারণে হাঁসের মতো পায়ের পাতা মেলে ঘুরে বেড়াচ্ছিল প্রহরাজের বউ। আমি ওকে পলকহীন দেখতে থাকি। একসময় ট্যাঁক থেকে ফস করে বের করে ফেলি একটি পাঁচ টাকার নোট। বউকে কাছে ডাকি। নোটখানা গুঁজে দিই ওর হাতে। অল্প দূরে বসে বসে কুলকুচো করছিল প্রহরাজ বেজ। লাজুক হেসে শুধোয়, 'ফের টাকা কিসের লেগে আইজ্ঞা?'

'পরথম্ এল্যাম যে। বউয়ের মু' দেখত্যে হয় টাকা দিয়ে।'

টাকাটি বামহাতে মুঠো করে ধরে বউ গড় হয়ে প্রণাম করল আমাকে। আমি ওর মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করি।

বলি, 'বাহ্! ভারি সুলক্ষণা মেয়া। সর্ব অঙ্গে সুলক্ষণ। বাঁইচে থাকো মা।'

অতঃপর প্রহরাজের শরীরের খোঁজ-খবর করি আমি। অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওব ব্যারামের সুলুকসন্ধান নিই। উঠোনে নামতে নামতে বলি, 'ভয় নাই তুয়ার। আমি তো আছি। ফের বৈকালে এসে খোঁজ লিয়ে যাবো। চলি বৌমা।'

অমন উদার 'গলা. (মালিক) ক'জনের কপালে হয়? প্রহরাজ আর তার বউ কৃতজ্ঞতায় গলে যেতে থাকে।

জ্বর সারলে প্রহরাজ ফের যোগ দিল কাজে। একটা ছোট্ট কলসীতে সের-দুই গুড় ভরে তুলে দিলাম প্রহরাজের হাতে। লিয়ে যা। বৌমা গুড়-মুড়ি খাবেক।

দিন-দুই বাদে সেই গুড় ফিরে আসে কলাপাতার ঠোঙায়, গুড়পিঠা হয়ে।

প্রহরাজ বলে, 'আপনি মু' দেইখ্‌বার টাকা দিছলেন। উই টাকায় তেল আর আওয়াচাল কিনেছে মেয়া। আর আপনার দিবা গুড়। তিনে মিলে এই গুড়পিঠা।'

শুনতে শুনতে আমার মনে পুলক আর ধরে না। মুচকি হেসে বলি, 'অমন গুড়পিঠা পেইলে আমি রোজ রোজ গিয়ে বৌমাকে মু' দেখানি টাকা দিয়ে আসবো।'

শুনে প্রহরাজ বেজ হল্‌দে দাঁত বের করে হাসে। বলে, 'আপনার বৌমা বলে, একদিন আপনাকে পাত পেইড়ে খাবাবেক্‌। মুর্‌লা মাছের টক রাঁধবেক পাকা তেঁতুল দিয়ে। আলতি দিয়ে মৌ-ডাল ছাতুর ঝাল! কাল্মা দিয়ে লটিয়া শাক। আমচুর দিয়ে মুসুর-কলাইয়ের ডাল—।'

'শুইন্‌তে শুইন্‌তে আমার জিভে জল সরে রে! আহা! ঝিমির ঝিমির পানি হবেক। তখন আমচুর দিয়ে মুসুর-কলাইয়ের ডাল। সাথে টুকচান পস্তু দিয়ে চুড়চুড়ি মতন। আ—হা! তা, কবে? সিট্যা হব্যেক কবে? বৌমাকে শুধাই আইবি কাল।'

লাজুক লাজুক গলায় আকাট জোয়ানটা বলতে থাকে, 'তুমার তরে বড় দুখ করে তুমার বৌমা। বলে, আহা-রে, বেবসাপাতি, গুড়ের মহাল, দু'পাকিটে টাকা, কিন্তু টুকচান আদর সুহাগ দিবার কোউ নাই বিশ্ব-সন্‌সারে। একটা বিয়া-থাও করলেক নাই ইখন তক্কো।'

শুনতে শুনতে মনটা যেন ভুয়াশ গাছের কোটর। কেমন খাঁ-খাঁ ফাঁকা-ফাঁকা লাগে। সারা জীবনটাকে মনে হয় যেন এক বগ্‌চরা বিল। যুঝতে যুঝতে কবে চলে গেল বিয়ার সময়? কবে? শক্তি চঁদের মহালে? ব্যাঙ্কবাবুর পশ্চাতে? কে জানে!

কোনও গতিকে মনের কথা চেপে বলি, 'উ'সব কথা ছাড় তো। আগে বল্‌, উই মুরলা মাছের টক কবে খাবাবেক আমার বৌমা?'

চার

শক্তি চঁদের মহালে রসে জ্বাল দিচ্ছিলাম সকাল থেকে। বৈশাখ মাস। তাল-গুড়ের সময়। উনানে ডেগ্‌ চাপিয়ে তালরস ছেঁকে ছেঁকে ঢালি। জ্বাল দিতে থাকি উনানের পেটে। রস ফুটতে ফুটতে গাঢ় হতে থাকে। কিন্তু সে যে কী কষ্টের কাম! রোদের তাপ বাড়তে না বাড়তেই সারা অঙ্গে জ্বালা ধরে। তার ওপর আগুনের তাপ। আঙ্‌রা-পোড়া হয়ে যায় শরীর। আগুনের বেষ্টনীর মধ্যে কেটে যায় দিন-রাত-মাস-মরসুম।

একদিন দুপুরবেলা তলব এলো শক্তির চঁদের বাখুল থেকে। বিডো সাহেব এসেছেন। তাঁকে জীপে তুলতে যেতে হব্যেক্‌। সাহেবদের মহিমা আমার ভালোই জানা আছে। মাঝে মাঝে এক ব্যাঙ্কের বাবু আসেন শক্তি চঁদের দুয়োরে। 'সাহেব-বাঁধের' ওপারে তাঁর ভুটভুটি। কেজি দুই গুড়, কেজিটাক লবাৎ, আধসেরটাক নিমফুলের মধু কিংবা খড়ে জড়ানো পাকা রুই মাঝে মাঝেই পৌঁছে দিতে হয় আমাকে ভুটভুটির পাশে। আজ দেখলাম বিডো সাহেব বসে রয়েছেন শক্তি চঁদের বারান্দায়। সামনে রাখা মাটির

কলসীতে গুড়, সের পাঁচেক। পাতার ঠোঙায় লবাৎ।

বিডো সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে তুলে নিলাম সাহেবের সুটকেশ। ডান হাতে গুড়ের কলসীখান্ তুলতে যাচ্ছি, সাহেব বললেন, 'ওগুলো থাক। তাহলে, শক্তিবাবু, এবার থেকে মজুরদের খাতাপত্রগুলো ঠিকঠাক রাখবেন। একবার ছেড়ে দিলাম। বারবার ছাড়বো না।' আমি তো থ'। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে, এ কেমন ধারা সাহেব? অগত্যা সুটকেশখানা বাগিয়েই হাঁটতে থাকি সাহেবের পিছু পিছু। মাথার ওপর সূয্যিদেব জ্বলতে থাকেন।

হাঁটতে হাঁটতে সেই পুরনো লোভটা ভুট কাটল মনে। ব্যাঙ্কের বাবুকে যে আর্জিটা জানিয়ে জানিয়ে থকে গেছি, সেটাই ফের উগরে বসলাম বিডো সাহেবের সাক্ষাতে।

'একটা লোন-পাতি কিছো কইরে দ্যান আইজ্ঞা। এই চৈত-বৈশাখের রোদ-গরমে, দিনরাত একঠাঁই আগুনের পাশে বইসে, রক্ত আম্‌শা ধইরে গেল।'

বিডো সাহেব শুধোন, 'তোর নাম কি?'

বলি, 'অধমের নাম আইজ্ঞা, রাবণ মাঝি।'

বিডো সাহেব শুধোন, 'এখানে তোর মাইনে কত?'

'মাইনা নাই আইজ্ঞা। আমি চঁদের দুয়ারে পেটভাতুয়া।'

অল্প চমক খেলেন বিডো সাহেব, 'মানে? মাইনে নেই?'

'লয় আইজ্ঞা। ছা' বেলায় ছুটো ভাইটা গাছ থিক্যে আছাড় খেইয়্যে মরলেক। উয়ার সৎকার কইর্‌তে বিশ টাকা লিল্যম্ শক্তি চঁদের পাশ থিক্যে। সে কর্জ সুদে-আসলে শোধ হইল্যে পর মাইনে দিবেক্।'

বিডো সাহেবের চোখ কপালে উঠে যাচ্ছিল। বললেন, 'কর্জ শোধ হতে আর কত বাকি?'

'সে আমি কি জানি? চঁদবাবু জানে বটে।'

গুম মেরে গেলেন বিডো সাহেব। হাঁটতে লাগলেন চুপটি করে। একটু বাদে বললেন, 'ব্যাঙ্ক থেকে কর্জ দিলে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবি?'

শুনে আমার ছাতি কাঁপে। ডর লাগে। ফের লোভ হয়। জবাব দিই না।

বিডো সাহেব বলেন, 'টাকা পেলে কি করবি?'

ভেবে-টেবে জবাব দিই, 'একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়ায় খাটাবো আইজ্ঞা। ইদিগ্ সম্বচ্ছর গুড়ের মরসুম। তাবাদে মাছের ডিমের পাউস আছে অনেক। ঘোড়াগাড়ির চাহিদা খো-ব।'

'আমার নাম করে একটা ফরম্ আনিস ব্যাঙ্ক থেকে। বলবি, মৈত্র সাহেব পাঠিয়েছেন।'

বিডো সাহেবের দয়ায় ঘোড়ার গাড়ি পেলাম ব্যাঙ্ক থেকে। মাসে দেড়শো টাকা শোধ দিতে হবে। শক্তি চঁদ তো রেগে কাঁই। শালা, নিমকহারাম। জেলের ঘানি টানাবো তুয়াকে। মৈত্র সাহেব আর ক'দিন? তারপর তুয়াকে কে বাঁচায়?

চৈত-বৈশাখে দেদার তালের রস নামে। মহালে মহালে গুড় হয়। আবার কার্তিক থেকে মাঘ অবধি খেজুর গুড়। গুড়ের টিনে গাড়ি বোঝাই করে আমি জোরসে ছুটাই। দিনভর। ভাড়া যা পাই মন্দ নয়। খেয়েদেয়ে কিছু বাঁচে।

আকাট দুপুরে রাস্তার ধারে গাড়ি থামিয়ে মুরুলীর চায়ের দোকানে চা আর লেড়ে

বিস্কুট খাই। আরাম করি বসে বসে। ঘোড়াটা গাড়ির সাথেই বাঁধা থাকে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পিঠ পুড়ায়। তপ্ত মাটিতে বেশিক্ষণ পা রাখতে পারে না। মাঝে মাঝেই পা তুলে নেয় মাটি থেকে। ক্ষুরে ক্ষুরে খটখট আওয়াজ তোলে।

মৈত্র সাহেব মানুষটি বড় ভালো। তাই, মাসখানেক বাদে যখন একটা মহাল খোলবার লোনের জন্য আর্জি জানালাম, পঞ্চাত্কে বলে, করে দিলেন লোনটা। বললেন, 'ঘোড়া-গাড়িটার কি গতি হবে?'

বললাম, 'সিট্যা আমি যজ্ঞেশ্বর লোহারকে ভাড়ায় দুবো। মাসে মাসে ভাড়া দিবেক সে। ব্যাংকের লুন তো শোধ কইরে দিছি, আইজ্ঞা।'

মহালটা চালু হলো। চলছেও খোব! ভিটা কিনেছি। ঘর বানিয়েছি। সহায়-সম্বল হয়েছে। তবুও যখন-তখন মনটা বড় খাঁ-খাঁ করে। মনে হয় কিছুই যেন নাই আমার। সবাই বলে, 'ইবার একটা বিয়া-টিয়া কর হে রাবণ। বংশে বাতি দিবেক কে?'

শুনে মনটা খারাব হয়ে যায়। ফোঁপরা বাঁশের মতন বাজে। আড়াই কুড়ি উম্বর হলো আমার। বিয়া করবার কি আর বইস্ আছে?

পাঁচ

মুরলা মাছের টক খেয়ে ফের নিমপাতা দিয়ে সইজ্‌না ডাঁটার শুক্তানি খাওয়ার সাধ জাগল মনে। তারপর বেশি পরিমাণে রসুন দিয়ে বগা লাউয়ের ছেঁচকি। তারপর জলা গুড় দিয়ে মুড়ির ছাতু। সিঁদুর-পাকা আমের সাথে ধবলী গাইয়ের মারা দুধ...।

প্রহরাজ বেজের যদ্দিনে হুঁশ হলো, তদ্দিনে মাছির পা আটকে গেছে গুড়ে। প্রহরাজ লোকটার যেমন ষাঁড়ের মতো বল, তেমনি ষাঁড়ের মতো গোঁয়ারও। আর গোঁয়ার লোকগুলো যেমন সরল, ক্ষেপে গেলে তেমনি বিপজ্জনক। বউটাকে গুমসে গুমসে আম-ছ্যাঁচা করল প্রথমে। তারপর রাতের বেলায় হেতার নিয়ে বসে রইল সাহেব বাঁধের পাড়ে। নিজেকে দিয়ে বুঝি তো। ঐ ক্ষণটা বড় খ্যারাব। দিদি যেদিন মরল, সেদিন রাতে সতীকান্ত সিংহবাবু প্রসন্ন ঠাকুরের আমবাগিচা দিয়ে হাঁটলে ঐ রাতেই খতম হয়ে যেত। 'বাপ' বলে আর উঠে দাঁড়াতে হতো না। ভাবলাম, নাহ্। সংযম হারানো ঠিক লয়। আজকের রাতে ফিরে যাওয়াই উচিত। বড় কষ্টে কাটল সাবা রাত।

একদিন সকালবেলা প্রহরাজ এসে হাজির। আমি তখন উঠোনের আকোড় গাছটার তলায় বসে খিয়ান জালখানা সারাচ্ছিলাম মনোযোগ দিয়ে।

বললাম, 'কিরে? সকাল সকাল বড় যে?'

চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইল প্রহরাজ।

বললাম, 'দাদন-টাদন এখন হবেক্ নাই। আগের গুলান আগে শোধ কর্।'

প্রহরাজের মুখখানা গম্ভীর লাগছিল। রগের শিরা টানটান। একটুখানি চুপ থেকে আচমকা বলে উঠল, 'একটা কথা জিগাবার লেগ্যে এল্যাম্।'

'কি কথা?'

'বউ ক্যানে লিদের ঘোরে তুমার নাম আঁউড়ায়?'

আমি চমকে উঠি। হাতের ফাতি থেমে যায়। হাঁ করে তাকিয়ে থাকি প্রহরাজের

দিকে। তারপর হা-হা রবে হেসে উঠি।

'আউড়ায় নাকি? আমার নাম? তুই শুইনেছিস?'

নীরবে মাথা দোলায় প্রহরাজ, 'বিড়বিড় কইর‍্যে তুমার নামই আউড়ায়।' শুকনো খটখটে গলায় বলে, 'কিন্তু আউড়ায় ক্যানে? সিট্যা বল।'

আমার মনে পুলক আর বাগ মানছিল না। আড়চোখে প্রহরাজকে একবার দেখে নিয়ে বলি, 'সিট্যা আমি জানবো ক্যামন কর‍্যে?' মিচিক মিচিক হাসি আমি, 'তুয়ার বৌকে জিগাস্ নাই?'

'জিগাইছিল্যাম্। শালী বলে, স্বপনের কথা আমি কি জানি?' বলতে বলতে প্রহরাজের মুখ অসহায় হয়ে ওঠে। কাঁপা কাঁপা গলায় বলে, 'আমার বৌটাকে তুমি ছেইড়ে দাও রাবণদা। সে তুমার মেয়ার মতন।'

'এই দ্যাখ্।' আমি নাচার হয়ে বলি, 'শুধুমুদু আমাকে দোষ দিস্ তুই। যাহ্ শালা, ঘরে যা।' আমি ফের ফাতি চালাতে থাকি জালে।

অল্পক্ষণ চুপ করে খাড়া থেকে ঘরের দিকে পা বাড়ায় প্রহরাজ।

'একটা কথা।' আমি পেছন থেকে ওকে ডাকি, 'তুই বাপ্ আজ ফের ধরা পইড়্লি আমার পাশ। বাতের বেলায় মহাল ছেইড়ে ফের ঘর পালাচ্ছু তুই। তা না'লে স্বপনের কথা জানলি ক্যাম্নে?'

প্রহরাজ দাঁড়াল বটে। তবে জবাব দিল না আমার কথার।

আমি খিঁচিয়ে উঠি, 'অমন করল্যে ঘাড়টি ধরে দূর কইরে দুবো মহাল থিক্যে। আর একটা দিন দেখি। ভাত ছড়ালে আমার কাগের অভাব হবেক নাই।'

মাথা নিচু করে প্রহরাজ পায়ে পায়ে বেরিয়ে গেল আমার উঠান থেকে।

বললাম বটে, তাড়াব, তা বলে কি সত্যি সত্যিই তাড়াব? তাই কি আমি পারি? এককালের মাইন্দার হয়ে মাইন্দারেব চাকরি খাব আমি? তাছাড়া প্রহরাজকে তাড়ানো মানে নিজের পায়ে নিজে কুড়াট মারা। আমি তাড়ালে সে অন্য মহালে গিয়ে মাইন্দারের কাজ নেবে। রাত কাটাবে নিজের ঘরে। তার মানে আমার ইহকাল ফর্সা। এখন তবু রাতগুলোতে আমাতে আর প্রহরাজেতে ভাগাভাগি করে চলছে। না, প্রহরাজ বেজকে তাড়ানো যাবে না। তার বদলে, দরকার হলে, আরও দাদন দিয়ে ওকে পাকে-প্রকারে বেঁধে ফেলতে হবে।

পাশের গাঁয়ের যজ্ঞেশ্বর লোহার আমার প্রাণের বন্ধু। শক্তি চঁদের মহালে বহুদিন পাশাপাশি গুড় পাক করেছি দু'জনে। এখন আমার ঘোড়ার গাড়িখানা ওই ভাড়ায় চালায়।

যজ্ঞেশ্বর একদিন সঙ্গোপনে বলল, 'মানুষকে কব্জা কবত্যে হইলে লিশা খাবাও হে। লিশার পাশ দ্যাব্তাও জব্দ।'

সিংহবাবুর বাড়িতে একটা চন্দনা ছিল। খাঁচার মধ্যে নয়। বাবুদের বাগানে ওড়াওড়ি করত। কিন্তু পালাত না। দিনের মধ্যে রোজ দু'বার একটি নির্দিষ্ট টাইমে সে অন্দরমহলে গিয়ে দানাপানি খেত। তারপর ফের উড়ে যেত বাগানে। ভারি অবাক লাগত আমার। বাঁধা নেই, ছাঁদা নেই, ড্যানক্ ছাঁটার বালাই নেই, পাখি তবুও পালায় না! পরে জেনেছিলাম, পাখিটাকে আফিম খাওযাত ওরা। আফিমের নেশার কাছে বশ ছিল ওটা।

কাজেই যজ্ঞেশ্বরের কথাটা মনে ধরে আমাব। কয়েক বোতল দেশী নিয়ে ঘড়িটাক রাতে গেলাম মহালে। প্রহরাজ এখনও ঘরের দিকে পা বাড়ায়নি। আমাকে দেখে অবাক।

বললাম, 'মনটা ভালো নাই রে প্রহরাজ, ভালো নাই। আজ আমি থাইক্‌বো মহালে। ছুট্‌টে যা দেখি। হাইস্কুলের পাশ থিক্যে একঠোঙা ফুলুরি কিনে লিয়ে আয়। এই লে টাকা।'

ফুলুরি দিয়ে মদ খেতে লাগলাম আমি। প্রহরাজ পাশটিতে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল ভুলভুল করে।

বললাম, 'আয় বস্‌।' বসল ও।

বললাম, 'খা।' ওর লাজ-সঙ্কোচ যায় না তখনও।

বললাম, 'খা না। লজ্জা কি? আমি অত মালিক-চাকর নাই বুঝি। আরে, দু'দিন আগে তো চাকরই ছিল্যাম। শক্তি চঁদের গুলাম।'

বলতে বলতে একটা বোতল এগিয়ে দিলাম প্রহরাজের দিকে। বোতলটা খুলে ঢকঢক করে দু'ঢোক খেলো প্রহরাজ।

'শক্তি চঁদের মহালে রসে জ্বাল দিতে দিতে আমার সর্বাঙ্গের চাম সিদ্ধ হয়্যে যেতো।' আমি পুরনো দিনের কথা পাড়লাম, 'একদিন ভোখের জ্বালায় এক মগ রস খেইয়েঁছিল্যম্‌ বলে শক্তি চঁদ মু' চিরে ঢেলে দিয়েছিল এক মগ গরম গুড়। মু'য়ের সেই পুড়া দাগ, এই দ্যাখ্‌, ইখনো রয়েঁছে ঠোঁটে, নাকে, গালে। এই দ্যাখ্‌, এই দ্যাখ্‌।'

বলতে বলতে গলা ধরে আসে আমার। চোখের কোনা চিকিকিয়ে ওঠে। বুঝি, নেশাটা হচ্ছে। নেশা হলেই আমার ভিতরের বহুৎ কিছু ভুট্‌ মারতে মারতে উঠে আসে ওপরে। কিছু কিছু গুপ্ত ইচ্ছা প্রকট হতে থাকে।

একটা নতুন বোতল খুলে দু'ঢোক গলায় ঢেলে বলি, 'খেজুর গাছের তব্যো দয়া মায়া আছে, বল্‌? শীতকালেই বেশির ভাগ রস পয়দা করে। শীতের রস জ্বাল দিতে অত কষ্ট নাই। আগুনের পাশে আরাম। দয়া নাই তাল গাছের। শালা ঘোর বৈশাখে রস ঝরাবেক। বৈশাখে বলে এমনিতেই মাইন্‌ষের অঙ্গের চাম সর্বক্ষণ জ্বইল্‌ছে। উয়াব মধ্যে রস জ্বাল দাও দিনরাত। শালা বেজন্মা গাছ। গাছ বলে তুমার একটা বেবেচনা থাইক্‌বেক নাই হে!'

প্রহরাজ নিঃশব্দে খাচ্ছিল। ওরা সারা মুখে ঘাম জমছিল। চোখের লালিটা গাঢ় হচ্ছিল। ঠোঁট কাঁপছিল। বিড়বিড় করে বলল, 'এ দুনিয়ায় কারই বা বেবেচনা আছে? সব শালা মা-মেইগাকে চিনা আছে।'

এমন কথায় বড় ব্যথা পেলাম আমি। মানুষ জাতের ওপর প্রহরাজের ঘৃণা যে মূলত আমাকে কেন্দ্র করেই, সেটা বুঝি। একটা আলতো ঢেঁকুর তুলে আমি তাকালাম ওর দিকে। মনটা কেমন হাল্কা লাগছে। ভাবনাগুলান যেন শিমূল তুলার মতন ফুরফুরে হয়ে উড়ছে মগজে। বড় উদার উদার লাগছে নিজেকে।

বললাম, 'একটা কথা তুয়াকে সোজাসুজি বলি প্রহরাজ। তুয়ার বউটাকে দেইখে ইদানিং ফের বিয়ার ইচ্ছা জেইগেছে রে। বড় ভালা বটে তুয়ার বউটা। অর্থাৎ কিনা আমার বৌমাটা। কেমন বাঁশপাতির পারা নাক...। চালতাফুলি মুখ...। জামিরের কুয়ার পারা ঠোঁট...।

প্রহরাজ নিঃশব্দে তাকিয়েছিল আমার দিকে। আমার মুখে নিজের বউয়ের অঙ্গের বাখান শুনছিল মন দিয়ে।

ফিক করে হেসে বললাম, 'তুই দেখিস নাই?'

প্রহরাজের মুখের সে ধার নেই এখন। চোখেও নেই সেই আগুন। তার বদলে ঘোলাটে চোখে একধরনের ভোঁতা নজর! চাল-ধোওয়া জলের মতন। মাথা নাড়তে নাড়তে প্রহরাজ বলল, 'লয়। দেখি নাই।'

'ধুশ্ শালা!' আমি ঢোক-দুই খাই। তারপর ওর কাঁধে চাপড় মেরে বলি, 'ইসব না ভাইল্‌লে বউ তো রাতের বলায় আমার নাম আউড়াবেক্‌ই।'

কেমন অসহায় লাগছিল প্রহরাজকে। ঢুলু ঢুলু চোখে একধরনের বোবা যন্ত্রণা। একটা চার-পা-বাঁধা শুয়ারের মতন লাগছিল ওকে। সহসা খাওয়াটা বাড়িয়ে দিল সে। এক এক ঢোকে বোতলের মাল নাবতে লাগল তলায়। মাথাটা মাটির দিকে ঝুঁকিয়ে ঢুলতে লাগল ও।

এক সময় মুখ তুলে ফিক্ করে হাসল। বলল, 'তুমাকে একটা কথা বলি নাই।'

আমি চোখ তুলে তাকাই, 'কী কথা? বল্।'

হি-হি করে হাসল প্রহরাজ। তারপর বলল, 'আমরা আর নাই থাকবো ই-তল্লাটে।'

'মানে?' আমি ভীষণ চমকে উঠি।

'আমরা চল্যে যাবো বেলিয়াতোড়। সেখ্যেনে আমার একটা মামু আছে না? উয়ার তো ছেইলা-পুইল্যা নাই। উ' আমাদেরকে জমিন দিবেক। ঘর কইরে দিবেক।'

হি-হি করে হাসতে লাগল প্রহরাজ। আমার চুপসে আসা মুখখানার দিকে তাকিয়ে সহসা হাসিখানা বেড়ে গেল তার। বলল, 'মামু কয়, প্ররাজ রে, এ শালা মহাল পাহারা দিতে দিতে কবে না কবে চোরের হাতে মরবি তুই। তার চে' আমার ঘরে চল্। কথাটা তুমার পাশ ভাঙি নাই, রাবণদা। তুমি বাদী হবে, তাই। আজ আচমকা মু' ফুইট্যে বাহার হইয়েঁ গেল কথাটা।'

শুনতে শুনতে নেশাটা কেটে যাচ্ছিল দ্রুত। বললাম, 'চইলে যাবি মানে? আমার মহাল পাহাবা দিবেক কে? ঘোর মরসুম ইখন।'

প্রহরাজ বেজ বালকের মতো সরলপানা হাসে। তারপর মাথাব ওপব আঙুল তুলে দেখায়, 'উই। উ-ই যে, যিনি উপরে আছেন, তিনি জাগবেক্ তুমার মহাল।'

'থাম্। তামাশা রাখ্।' সহসা জেগে ওঠে পিতল-চোঁয়া রাগ, 'আমার বকেয়া দাদন ফেরত দিয়ে তবেই লড়বি ইখ্যেন থিক্যে।'

প্রহরাজ যেন নেতিয়ে পড়ছে ক্রমশ। তাব মধ্যেও বিড়বিড় করে বলল, 'দুবো। মামুর সম্পত্তিটা পেইল্যে সবার ধার মিটাই দুবো কড়ায়-গণ্ডায়।' বলতে বলতে খেজুরপাতার তালাইয়ের ওপর সটান শুয়ে পড়ল প্রহবাজ বেজ। শুয়েই চোখ বুঁজল।

আমার ভেতরেব সব কলকব্জায় ততক্ষণে আওয়াজ উঠেছে ঝনাঝন্। প্রহরাজকে দু'হাতে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলি, 'এই প্রহরাজ, এই শালা, কবে যাবি তুয়ারা? কবে?'

আমাব ঝাঁকুনিতে চোখ খুলল প্রহরাজ। যেন এই মাত্তর এক অন্য জগৎ থেকে ফিরে এলো! মুখখানা অকারণে চুষছিল সে। যেন যষ্টিমধু চুষছে। কিন্তু জবাব দেবার ক্ষমতা নেই তার। তবুও কোনওক্রমে উচ্চারণ করল, 'ঠিক নাই। কাল ভোরেও চইলে যেত্যে পারি।' ফের বেহুঁশ হয়ে গেল প্রহরাজ বেজ।

আমার ভেতরে একটা ঘণ্টা বাজছিল অবিরাম। ঘণ্টাটা থামছিল না কিছুতেই। দু'হাত বুকের ওপর আড়াআড়ি রেখে আমি বসে রইলাম অনেকক্ষণ।

এক সময় আমি উঠে দাঁড়ালাম। পায়ে পায়ে প্রহরাজের পাশটিতে গেলাম। শক্ত

হাতে ওকে তুলে ধরে বসালাম। চোখ দুটো অনেক কষ্টে খুলল প্রহরাজ। পাত্‌নি কুঁচকে তাকাল আমার দিকে।

বললাম, 'কাল ভোরে গাঁ ছাড়বি শালা, আইজ রাতভর মদ গিলছিস ইখ্যেনে? উদিকে কচি লাউডগার পারা মেয়াটা হয়তো ভয়ে-ভাবনায় কাঠ। শালা চামার! উঠ্। উঠ্ শালা ভোঁদড়।'

আমার বাখানের চোটে প্রহরাজের নেশাটা যেন অল্প পাতলা হলো। আমার দিকে এক পলক তাকিয়ে খাড়া হলো সে। তারপর ভেউ ভেউ করে কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়ল আমার পায়ের তলায়।

'আমার বউটাকে তুমি ছেইড়ে দাও রাবণদা। পায় পড়ি তুমার। তুমার ধরম হবেক্ হে—।

আমার পায়ের তলায় শুয়ে কাটা পাঁঠার মতন ছটকাতে থাকে প্রহরাজ বেজ। খানিকবাদে ফের ঘুমিয়ে পড়ে। আমি ওকে টেনে তুলি। খাড়া করে দাঁড় করাই।

বলি, 'চল্ বাপ। তুয়াকে বৌমার পাশ পৌঁছে দিয়ে আসি। আহা, সোনার বন্ন মেয়া সে। তুই বিহনে উয়ার চোখের কোনায় কালি জইম্‌ছে। রাত পুহালে তুয়াদ্যার ফের কত ঝঞ্ঝাট।'

আমার কাঁধে ভর দিয়ে বাইরে বেরয় প্রহরাজ। টলোমলো পায়ে হাঁটতে থাকে। আমার বাঁ-হাতে আর কাঁধে তার মুখের দুর্গন্ধময় লালা গড়িয়ে পড়ে।

উঠানের মধ্যে একটা তেঁতুলগাছ। বছর দশেক বয়েস তার। চামড়ায় সবে ফাট ধরেছে। উল্কি ছাপ পড়েছে গায়ে। লাল বিষপিঁপড়ের দল আনাগোনার পথ বানিয়েছে গাছের সারা অঙ্গে।

ঐ অবধি গিয়ে আর হাঁটতে পারল না প্রহরাজ। গাছের গায়ে ঠেশ দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি বলি, 'কি হইল্যাক রে? চল্। বৌমার পাশ যাবি নাই?'

আলতো মাথা দোলায় প্রহরাজ। যাবে। মুখ দিয়ে কথাগুলো বলতে পারে না সে। কেবল গোঙানির মতো একজাতের আওয়াজ বেরিয়ে আসে।

'একি ফ্যাসাদে ফেইল্‌লি বল্‌তো এই মাঝরাতে!' আমি নিজের মনে গজ-গজ করি, 'কাল ভোরেই যার জনম্‌ভূমি ছেইড়ে যাবার কথা, সে কিনা মাঝরাত অবধি মদ গিলে আমার ঘাড়টিতে চাপ্‌ল্যাক্! দাঁড়া। খাড়া হইয়োঁ থাক্ ইখ্যেনে। দেখি, কি বেবস্থা কইর্‌তে পারি।'

বলতে বলতে আমি ঝটিতি ঘরে ঢুকি। দু'গাছা মোটা পাটের দড়ি নিয়ে ফের ফিরে আসি তেঁতুল গাছের গোড়ায়। প্রথমে ওর হাত দু'টাকে গাছের সাথে বেড় দিয়ে পেছনের দিকে শক্ত করে বাঁধি। বার-দুই হাত নাড়ায় সে। কিন্তু বেহুঁশ ভাবটা কাটে না। তারপর তা পা' দুটোকে একসাথে কষে বাঁধি। জোড়া-পা খিঁচে বেঁধে দিই গাছের সাথে।

ততক্ষণে বোধ লেয় নেশটা খানিকে কেটে এসেছে ওর। মৃদু টানাটানি জুড়ে দেয় প্রহরাজ। মুখে বিড়বিড় করে বলতে থাকে, 'আমাকে বাঁইধ্‌ল্যো ক্যানে রাবণদা? বাঁইধ্‌ল্যো ক্যানে?'

'অমনি রে। ভয় পাস্ নাই।' বলতে বলতে ওর পরনের লৈতাখানা খুলে নিয়ে চর্‌চর্ করে দু'টুকরা করে ফেলি। এক টুকরা ওর মুখের মধ্যে ভালো করে গুঁজে

দিই। অপর টুকরা দিয়ে ও মুখখানা ঠেসে বেঁধে দিই। এবার অন্য দড়িগাছা দিয়ে ওকে পা থেকে গলা অবধি গাছের সাথে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে আচ্ছাটি করে বাঁধি। বিপদের আঁচ পেয়ে তখন নিষ্ফলা ছটকানি শুরু হয়েছে প্রহরাজের। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। নড়াচড়া কিংবা কথা বলার আর কোনও উপায়ই নেই ওর।

আমার আর অল্পই কাজ বাকি ছিল। আড়ত থেকে একখানা গুড়ের পায়া এনে গাছের তলায় রাখি। তারপর খাবলা খাবলা গুড় নিয়ে যেমন করে আবড়া মেয়ার গায়ে তেল-হলুদ মাখায় বিয়ার আগে, ঠিক তেমনি করে মাখাতে থাকি প্রহরাজের সারা গায়ে। বেশ পরিপাটি করে মাখাই। নাকের ছ্যাঁদা, কানের গর্ত, চোখ, মুখ, লিঙ্গ, অণ্ডকোষ—কিছুই বাদ দিইনা।

গুড়ের মিঠে গন্ধটা আমার নাকে ধাক্কা মারছিল বারবার। গন্ধটা চিরকালই আমার বড় প্রিয়। আহা, কী মিঠা সুবাস! তেঁতুল গাছের বিষপিঁপড়াগুলানও এই গন্ধটাকে যে কী ভালবাসে!

গুড় মাখানো শেষ হলে আমি আড়তে ঢুকি। দু'চারটা গুড়ের পায়া ফাটাই। কিছু গুড় গড়িয়ে পড়ে মেঝেতে। বাঁধের জলে হাত ধুয়ে মদের বোতল আর শালপাতার ঠোঙাগুলো ছুঁড়ে দিই জলে। তারপর ফের ফিরে আসি তেঁতুল তলায়।

গাছের ছায়ার আঁধারে প্রহরাজের গুড় মাখানো শরীরখানা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। কেবল, পিছু ফিরবার পূর্ব মুহূর্তে, দেখলাম একজোড়া পলকহীন চোখ। ভয়ে, তবাসে, অবিশ্বাসে, আতঙ্কে পাথরের মতন থির।

আঁধারপথ ভাঙতে ভাঙতে আমি এগোচ্ছিলাম প্রহরাজের বাড়ির দিকে। প্রহরাজের বউটা নিশ্চয় এতোক্ষণে ভয়ে-তরাসে কাঠ। রাতের বেলা একলা থাকতে ভারি ডর লাগে সে মেয়ার। ইচ্ছা করছে, আজ রাতে টুকচান সাহস জুগাই তাকে। কিন্তু না। ঘরের কাছটিতে এসেই সামলে নিলাম নিজেকে। আজ রাতে কদাচ লয়। সতীকান্ত সিংহবাবু বার বার বলতেন, 'কোনও অবস্থাতেই সংযম হারাতে নাই।' যে রমণীর সোয়ামী লরক-যন্তন্না পেতে পেতে মরছে শীতের রাতে, তেঁতুল তলায়, নিঃশব্দে,— উয়ার সাথে সহবাস! মহাপাপ হব্যেক তাতে। আর, এ কথা দুনিয়ার কে-ই বা না জানে যে, পাপ উয়ার বাপকেও নাই ছাড়ে!

নেশা

এক

খুব ভোরে ঘুম ভাঙতেই স্মৃতির মধ্যে সুবর্ণরেখা। গতকাল, উত্তীর্ণ-সন্ধ্যায়, কালো ঘোমটায় ঢাকা সুবর্ণরেখা ছিল রহস্যময়ী। নদীর পাড় ধরে লাল ধুলো উড়িয়ে জীপটা ছুটছিল। হেড-লাইটের আলোয় রাস্তাটুকু দৃশ্যমান ছিল। নদীটা শুয়েছিল অন্ধকারে। তখনো চাঁদ ওঠেনি। দোতলার একখানি ঘরে তিমিরবরণ শুয়েছিলেন রাতে। সকালে উঠে জানলার ধারে দাঁড়াতেই নদীটাকে দেখা গেল। নদীর ওপারে ঘন জঙ্গল, সামান্য ঢেউ-খেলানো সারবন্দী টিলা।

এখন শীতকাল। নদীর দু'ধারে অনেকখানি বালির চরা। মধ্যিখানে জলের ধারা। সূর্য উঠেছে খানিক আগে। নদীর চর রোদ্দুর মাখছে গায়ে। চিকচিক করছে বালি। বালি, না কি সোনা? কতদূরে সোনা-ধোওয়া ঘাট!

ঘুম ভেঙেছে কনকনে শীতে আর রিনিঝিনি মলের আওয়াজে। এমন স্নিগ্ধ সুরভিত সকালে, শুধু নাম না জানা ফুলের গন্ধ আর পাখির মিষ্টি ডাক। রিনিঝিনি মলের আওয়াজটিকেও প্রথমে কোনো এক অচেনা জাতের পাখির ডাক বলেই মনে হয়েছিল। ভুল ভাঙল জানলায় এসে দাঁড়াতেই। উঠোন জুড়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে এক কিশোরী। পরনে ডুরে শাড়ি। এলোমেলো বিনুনি। নুয়ে নুয়ে ঝাঁটপাট দিচ্ছে উঠোনে। মাঝে মাঝে বারান্দার দিকে তাকিয়ে ভেঙাচ্ছে, কিল দেখাচ্ছে, আর, কীসব কথায় হেসে লুটিয়ে পড়ছে। বারান্দায় বসে বসে রঙ্গ করছে, অদৃশ্যচারীটি কে, এই সাতসকালে! কাল রাতে মেয়েটিকে দেখেননি তিমিবরণ। ঠিকে-ঝি হতে পারে। সকালে-বিকেলে আসে। ঠিকে-ঝি হলেও মেয়েটি বেশ। সারা শরীর জুড়ে একটা নিবিড় ছন্দ আছে। হীরে যেমনি নাড়া-চাড়া করলেই ঝিলিক মারে, মেয়েটিও হাঁটা-চলায়, ঘাড় বাঁকানোয়, হেসে ওঠায়, প্রকাশ পাচ্ছে ঐ ছন্দ। গাঁয়ের পটভূমিতে কোনো ফিল্ম হলে, ভোলে-ভালে কিশোরী-নায়িকার রোলে যা মানাবে না! এমন কাচভাঙা হাসি যদি একখানা দিতে পারে সেট-এ, কিংবা ঐ ভ্রূ-ভঙ্গি, গ্রীবাভঙ্গি, কিল দেখানো, এমন কি ঝাঁট দেবার ভঙ্গিটিও কী দারুণ! ফিরে গিয়েই সোমেশ্বরকে পাঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে। ওর বাপটিকে শত খানেক টাকা আগাম দিয়ে, নিয়ে যাবে মেয়েটিকে। দু'দিনেই টালিগঞ্জ মাতিয়ে দেবে এই বুনো ফুল!

এটাই বেরিয়ে পড়বার সময়। এই কনকনে শীতের সকালে সারা গায়ে মিঠে রোদ্দুর মাখতে মাখতে সুবর্ণরেখার ভিজে বালির ওপর হেঁটে বেড়ানো! তুষের চাদরখানা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে ঘরের বাইরে পা বাড়াতে গিয়েই থমকে দাঁড়ালেন তিমিরবরণ! পরিচিত আশঙ্কাটি পলকের তরে ফণা তুলল। বেরোনো ঠিক হবে তো? যদি কেউ চিনে ফেলে?

সর্বনাশ হয়ে যাবে তবে। সোমেশ্বর মাহাতো অবশ্যি সারাটা পথ আশ্বাস দিয়ে এসেছে, 'এ এমনই এক পাণ্ডব-বর্জিত জায়গা, আপনাকে কেউই চিনবে না স্যার।' তবুও ঝুঁকি নেননি তিমিবরণ। বলেছিলেন, 'তুমি সন্ধে পেরিয়ে গাঁয়ে ঢোকো, বলা যায় না...।' গতকাল সন্ধে সাড়ে সাতটা নাগাদ সোমেশ্বরের জিপ তিমিরবরণকে নামিয়ে দিয়ে ফিরে গেছে। এ বাড়ির পুরনো কেয়ার-টেকার কান্‌চারাম, বুঁড়ো-থুড়ো, চোখে দেখে কম। ডিমের ঝোল-ভাত খাসা খাইয়েছে রাতে। নদীর হিমেল বাতাস কাঁপিয়ে দিয়ে গেছে শরীর। কম্বলের তলায় আকণ্ঠ ডুবে নির্জন রাত্রির স্বাদ নিয়েছেন তিমিবরণ। দূরবর্তী কোনো গ্রাম থেকে দ্রিমি দ্রিমি মাদলের আওয়াজ ভেসে আসছিল হাওয়ায়। শুনতে শুনতে তলিয়ে গেছেন ঘুমের অতলে। মদ লগেনি, ক্যাম্পোজ লাগেনি। কেবল, যতক্ষণ ঘুম আসেনি, একটা ভাবনাই চরে বেড়াচ্ছিল মগজে। সকাল বেলায় প্রথম নজরেই কেউ চিনে ফেলে যদি! কাল রাতের বেলায় ভাত খাচ্ছিলেন। হ্যারিকেনের নরম আলো যদ্দূর যায়, তার বাইরে নিকষ আঁধারের গাঢ় প্রলেপ।

'তোমরা সিনেমা-টিনেমা দ্যাখ, কান্‌চারাম?'

কান্‌চারাম ক্ষয়া দাঁতে হাসে। বড় আদিম হাসি। নেশায় মজা চোখ।

বলে, 'কুঠিঘাটের ডাঙায় টকি বুসলো। প্রায় বিশ-বচ্ছর আগের কথা। কাপড়ের তাঁবু। চঙায় গান। রাজা হরিচ্চন্দ্র পালা। চ্যানাচুর...র...র গ্রম্। উই একবার। ব্যস।

'সিনেমা হল নেই ধারে কাছে?'

'ধারে পাশে কুথা পাবেন উসব? সি-ই ঝাড়েকগ্রাম।'

'তোমাদের গাঁয়ের ছেলেরা যায়-টায় না?'

'কে যাবে বাবু, অদ্‌ধুরে টকি দেখতে? বলে খাটতে খাটতে কোমরের বাঁধন টুইট্যে যায়! সারা গাঁ-টাই মজুর খাইট্যে খায়।'

শুনতে শুনতে মুক্তির স্বাদ! বুক ভরে দম নেওয়া টাটকা বাতাস। সোমেশ্বব বোধ করি মিছে বলেনি। প্রকাশ পোদ্দার বলেছিলেন, ' সোমেশ্বরকে বিশ্বাস করা যায়। আমারই কর্মচারি তো। মিছে বলে পার পাবে না। যান, দেখে আসুন সোমেশ্বরের আদিম গ্রাম।'

'কিন্তু বিশ্বাস করা ভারি শক্ত যে। আমি দশ বছর আগে বর্ধমানের গাঁয়ে গেছি। চারপাশের গাঁ ঝেঁটিয়ে এসেছিল খবর পাওয়া মাত্র।'

পাশে দাঁড়িয়ে সোমেশ্বর মাহাতো হাসছিল। এঁরা দেখেননি তেমন গেরাম। যেখানে মানুষ পাহাড়ের কোলে আর জঙ্গলের ধারে প্রায় আদিম জীবন যাপন করে। যেখানে সূর্য ডুবলেই সাপের মতো রাত নামে। ভাত নয়, ওরা সেঁ-উ ঘাসের বীজ আর মহুয়া মিশিয়ে খায় বছরের ছ'মাস। নদী কিংবা ঝরনার জলে তেষ্টা মেটায়। জীবনে কাউকে কোনো দিনও চিঠি লেখেনি। চিঠি পায়নিও কারো।

'কিন্তু আপনি ফিরবেন কবে?' প্রকাশ পোদ্দার শুধোন।

'পাক্কা পনের দিন বাদে।'

'বাপরে! এক্কেবারে মরে যাব যে। আমার তিনখানা ছবির শুটিং বন্ধ থাকবে! সাতদিন করুন।'

তিমিরবরণ ক্লান্ত চোখে তাকিয়েছিলেন। ছবির প্রয়োজক হিসেবে প্রকাশ পোদ্দার আদর্শ ব্যক্তি। তিমিরবরণের মতো শিল্পীর জন্য কোনো কিছুরই অভাব রাখেন না।

কিন্তু খাটিয়ে নেন জানোয়ারের মতো। ইদানীং বড় ক্লান্ত বোধ করছিলেন তিমিরবরণ। মদের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েও জুত পাচ্ছিলেন না শরীরে। ঘুমের বড়ি খেয়েও ঘুম হচ্ছিল না। মাঝে মাঝে ব্যথা করে বুকের কাছাকাছি এলাকায়। শরীরের কোষে কোষে ছড়িয়ে পড়ে লক্ষ বিষপোকা। মগজের মধ্যে কুরে-কুরে নিরাপদ বাসা বানায়। খিদে চুষে খায়, ঘুম চুষে খায়, ফুর্তি-আনন্দ, তৃপ্তি-অভাববোধ, সব—। আসলে মানুষের জীবনে যতি চাই, অবসর চাই, বিনোদন চাই। চাই টাটকা বাতাস। মাঝে মাঝে দু-এক পশলা বৃষ্টি। চাই খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখবার সুযোগ। বহুদিন ধরে এগুলোই পাচ্ছিলেন না তিমিরবরণ। দেখে শুনে প্রকাশ পোদ্দারই বলেছিলেন, 'যান, ঘুরে আসুন ক'দিন। শীতে তো আর পাহাড় চলবে না। সমুদ্রে যান। পুরী, গোয়া কিংবা গোপালপুর অন-সি। শরীরটা খেলিয়ে আসুন। যে তিনটে ছবির শ্যুটিং চলছে, বন্ধ থাকবে না হয় কদিন। হিরোর মেজাজ শরিফ না থাকলে ছবিটাই মাটি। প্রকাশ পোদ্দারের কথায় তিলমাত্র উৎসাহ পাননি তিমিবরণ। 'পুরী, গোয়া, গোপালপুর যাব বেড়াতে? না কি অটোগ্রাফ বিলোতে? কিংবা বেঘোরে প্রাণটা দিতে! সেবার কী হয়েছিল মনে নেই চাঁদিপুরে?'

প্রকাশ পোদ্দার সোনা-বাঁধানো দাঁতে হাসেন, 'ও ফেমাস লোকদের অমন একটু আধটু হবেই। ও নিয়ে ভাবলে আপনার আর ঘরের বাইরে বেরোনোই চলবে না।'

প্রকাশ পোদ্দারের কথাগুলো মিথ্যে নয়। নামী জায়গাগুলোতে তো কথাই নেই, অখ্যাত আধা-গঞ্জ এলাকায় গিয়েও দুর্ভোগের অন্ত থাকে না তিমিরবরণের। চারদিক থেকে পিলপিল করে ধেয়ে আসে মানুষ। শুধু গন্ধটি পেলেই হয়। গুরু...গুরু. .বলে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় চারদিক থেকে। একটুখানি দেখতে চায়, ছুঁতে চায়। বেড়াবেন কী, বিশ্রামই বা নেবেন কী! ওদের কবল থেকে নিস্তার পেতে প্রাণটি নিয়ে পালিয়ে আসতে পথ পান না। আর, কলকাতা তো তাঁর কাছে শত্রুপুরীর শামিল। রাস্তা-ঘাটে, মার্কেটে-রেস্তোরাঁয় একা একা বেরোলে, ভক্তদের আদরের ঠেলায় সত্যি সত্যিই প্রাণটাই চলে যাবে। কাজেই বাড়ি থেকে কালো কাচে ঢাকা গাড়িতে স্টুডিও, এয়ারপোর্ট, ব্যস। বছর পাঁচেক আগে অবধি নিউমার্কেটে যাওয়ার অভ্যেসটা ছিল। মাসে দু'মাসে একবার। বার দু তিন নাকানি-চোবানি খেয়ে সেটাও এখন বন্ধ। শেষ বারে জনস্রোতের মাঝখান থেকে পুলিস গিয়ে কোনো গতিকে উদ্ধার করে। ঐ শেষ। বাছা বাছা কিছু ফাংশনে যেতেন টেতেন। এখন তাও যান না। ল-এণ্ড-অর্ডার প্রব্লেম হয়ে যাচ্ছিল। পুলিসের বিশাল বাহিনী লাঠি চার্জ করেও সামাল দিতে পারছিল না। অবশেষে পুলিস কমিশনারই কেঁদে পড়লেন। ফাংশন-জলসায় আপনি গেলে আমার প্রেসার বেড়ে যায় মশাই। আমাদের দিকটাও একটু ভাবুন। কাজেই এখন বোম্বে-কলকাতায় স্টুডিও-বাড়ি করেই তিমিরবরণের দিন-মাস-বছর কেটে যায়। রিক্রিয়েশন বলতে মাসে এক আধবার দু'একটি নির্বাচিত হোটেলে গভীর রাতে টুক করে ঢুকে পড়া। কিঞ্চিৎ খানা-পিনা করে চোরের মতো ফিরে আসা। হোটেলের মালিক নিরাপত্তার খাতিরে এমনই গোপন রাখেন ব্যাপারটা যে, কাক-পক্ষীতেও জানতে পারে না। কিন্তু এভাবে মানুষ বাঁচে? ফলে তিমিরবরণের মধ্যে ক্লান্তিজনিত ক্ষয় চলছে দীর্ঘদিন। ইদানিং তিনি কাজে তেমন মন দিতে পারেন না। খিটখিটে হয়ে ওঠেন অল্পেতেই। কিছু উদ্ভট ভাবনা-চিন্তা সর্বদাই খেলে বেড়ায় মগজে। আসলে, খ্যাতির বিষপোকাটি সাতরঙা তন্তু বুনছিল তিমিরবরণের শরীরে, মনে। বাধা দেননি। প্রশ্রয় দিয়েছেন। একদিন ঐ তন্তু তাঁর সারা শরীরে জড়িয়ে গিয়েছে!

দমবন্ধ অবস্থায় বেরিয়ে আসতে চাইছেন তিমিরবরণ। কিন্তু ঐ স্বর্ণতন্তুর বাইরে নিরেট দেওয়াল। বেরিয়ে আসার সবগুলো দরজাই নির্মমভাবে বন্ধ।

প্রকাশ পোদ্দার দেখে তৃপ্তিভরে হাসেন। 'এটাই তো স্বাভাবিক। বাংলা এবং হিন্দি ফিল্মের সুপারস্টার মশাই, আপনি। তরুণদের আইডল, রূপসীদের হার্টথ্রব, বিগত যৌবনাদের টনিক...। মানুষ আপনাকে দেখে তো উন্মাদ হয়ে উঠবেই। ক'জন এমন কপাল নিয়ে আসে!'

মরিয়া হয়ে প্রকাশ পোদ্দারকেই ধরে বসেন তিমিরবরণ। 'আমাকে হপ্তা দুয়েক লুকিয়ে থাকবার ব্যবস্থা করে দিন মিঃ পোদ্দার। একেবারে নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বেগ জীবন। কেউ জানবে না, চিনবে না। আমি একটু খোলা আকাশের তলায় হাঁটতে চাই। আমি আর পারছি নে, মিঃ পোদ্দার।'

'পাগল!' প্রকাশ পোদ্দার হাসে, ' কোথায় লুকিয়ে রাখব? বিকশিত পুষ্প থাকে পল্লবে বিলীন, গন্ধ তার লুকাবে কোথায়? সিনেমা আর ভিডিওর দৌলতে এখন গাঁ-গঞ্জের পানের দোকানেও মহানায়ক তিমিরবরণের ছবি। কিশোরীদের বইয়ের মলাট। কিশোরদের টি-শার্টের লোগো। যেখানেই যান, যতদূরেই, আপনার আগে আগে আপনার সৌরভ ছুটবে দিকে দিকে। তবুও দেখি, কী করা যায়?'

দিন তিনেক বাদেই স্টুডিয়োতে এল সোমেশ্বর মাহাতো। প্রকাশ পোদ্দার বললেন, 'আমার প্লাস্টিক ফ্যাক্টরির জুনিয়র সুপারভাইজর। আপনার অজ্ঞাতবাসের সারথি।'

সোমেশ্বর মাহাতো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়েছিল তিমিরবরণের দিকে। বিস্ময়ের ঘোর কাটতেই কথাবার্তা শুরু হলো।

সুবর্ণরেখার তীরে সোনা-ধোওয়া ঘাট। ওপারে গভীর শাল-মহুয়ার জঙ্গল। উঁচু ঢেউ খেলানো জমি। সারবন্দী টিলা। টিলার ওপারে পেঁচাবিধা গাঁ। জনা পঞ্চাশেক ঘর মাহাতোর বাস। পাশে অবশ্যি সাঁওতালদের পল্লীও আছে। ঐ গাঁয়ের যারা জমিদার ছিল, তারা এখন সবাই ছড়িয়ে পড়েছে বাইরে। ওদের বিশাল বাড়িখানা ফাঁকা পড়ে থাকে সারা বছর। বুড়ো কান্‌চারাম মাহাতো, ঐ বাড়ির কেয়ার-টেকার, সোমেশ্বরের মামা। ওখানে তিমিরবরণ নির্বিঘ্নে থাকতে পারেন। সোমেশ্বর গ্যারান্টি দিয়েছে, ঐ জঙ্গলের দেশে কেউ ওঁকে চিনবেই না।

কান্‌চারামের বয়েস সত্তরের কম নয়। কিন্তু এখনো বেশ শক্ত-পোক্ত। লম্বা খাঁচা-খাঁচা চেহারা। গাল দুটো ভাঙা। ঠেলে উঠেছে হনু। ঘোলাটে চোখ। অল্প খুঁড়িয়ে হাঁটে। মানুষটি মন্দ নয়। তবে নেশাখোর! বোঝা যায়। সোমেশ্বর আগেই বলে রেখেছিল সে কথা। সন্ধে হলেই নেশায় বুঁদ হয়ে যায় কান্‌চারাম। দুনিয়া থেকে মেন-লাইন অফ্ করে দেয়। কাজ কর্ম যা করে, অভ্যেস বশে। সত্যিই তাই। কাল রাতে তিমিরবরণকে খেতে দিল, বিছানা পেতে দিল, জল ঢেলে দিল। কিন্তু সারাক্ষণ ডুবে ছিল আকণ্ঠ নেশায়। মদ গাঁজা নয়। তাহলে গন্ধ ওগরাতো প্রতিটি বাক্যে। নেশাটা তবে কী? টলোমলো করে না পা। বাজে বকে না জিহ্বা। গন্ধ ছোটে না বাতাসে। অথচ একেবারে মজিয়ে রেখেছে বুড়োকে। জিজ্ঞেস করতে হবে। একটুখানি ভাব-সাব হোক। তিমিরবরণ নিজে নেশাখোর মানুষ। নেশার মর্ম তিনি বোঝেন। নেশা করে আউট হয়ে যাওয়াটা কোনো নেশাই নয়। আউট হলে, নেশার জগৎ থেকেও আউট। ইদানীং ঘনঘন আউট হয়ে যাচ্ছিলেন তিমিরবরণ। কান্‌চারামকে দেখে হিংসে হচ্ছে। আকণ্ঠ চড়িয়েও ওর

পা টলে না, হাত কাঁপে না, কথা জড়ায় না, চোখ ওলটায় না, পিরিতখানা তবে কত গাঢ়. কত প্রাচীন!

দোতলা থেকে সন্তর্পণে নামলেন তিমিরবরণ। বাড়তি সতর্কতা হিসেবে চাদরখানি দিয়ে ঢেকে নিয়েছেন মাথা।

কিশোরীটি উঠোনে ঝাঁট দিচ্ছে তখনো। বারান্দায় বসে চুটায় টান মারছে কান্চারাম। মশকরা জুড়েছে মেয়েটির সঙ্গে, তাতেই হাসির বান ডেকেছে।

পায়ে পায়ে উঠোনে নামলেন তিমিরবরণ। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল কিশোরী। দু'চোখে সীমাহীন বিস্ময়! এই শান্ত সকালে মেয়েটিকে এক ঝলক দেখলেন তিমিরবরণ। ছিপছিপে কিশোরী। শ্যামলা গড়ন। চোখদুটি হীরের কুচির মতো ঝকঝকে। দোয়েল পাখির মতো যেন নেচে বেড়াচ্ছে উঠোনময়। আড়ষ্টতার লেশমাত্র নেই। শহরের 'শো-কেস গার্লদের' দেখে দেখে ইদানীং তিমিরবরণের এক ধরনের বিতৃষ্ণা, বিবমিষা। হাসেন, কথা বলেন, ছোঁন, জড়ান, ইচ্ছে হলে আদর-টাদরও করেন একটু আধটু। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। বুক অবধি পৌঁছোয় না ওসব। ঠোঁটের বস্তু ঠোঁটেই থাকে। কানের বস্তু কানে। ত্বকের বস্তু ত্বকে। মেয়েটিকে দেখতে দেখতে মন জুড়ে অচেনা শিস্। বড়ই কি রূপসী মেয়েটি? কোথায় লুকিয়ে আছে ওর রূপ? দেহে নেই, মুখে নেই, কেশে নেই, নাকে-চিবুকে ঠোঁটে নেই। কোথায় তবে লুকিয়ে রয়েছে তা, এই পবিত্র সকালে মন ভরিয়ে দেবার মতো?

উঠোনে ঝাঁট দেওয়া শেষ করে মেয়েটি এগলো বারান্দার দিকে। ভোমরার মতো গুনগুন করছিল কান্চারাম। কথাবার্তায় যা বোঝা গেল, কান্চারাম পটাচ্ছে মেয়েটিকে, লোভ দেখাচ্ছে এটা-ওটার। রাজি হইয়ে যা টিয়া। না করিস নি। মাথায় টিকলি দুবো। নাকে নোলক। পায়ে খাড়ু। আমার মতন মরদ তুই পাবি নি।

শুনতে শুনতে উঠোনটুকু নিঃশব্দে পার হয়ে গেলেন তিমিরবরণ! পেছন থেকে ঐ কাচভাঙা হাসি। হোলির দিনের পিচকিরি যেন। বেশ খানিকটা রঙ ছিটিয়ে দিল তিমিরববণের পিঠে। মেয়েটির নাম তবে টিয়া!

দু'পাশেব বালির চরে ছড়িয়ে পড়েছে উজ্জ্বল রোদ্দুর। ঘাসের ওপর জমে থাকা শিশিরে রোদ্দুর পড়ে জ্বলছে। সরু একখানি পথ এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে নদীর ঘাট অবধি। দু'ধাবে সবজির খেত।

একটা মহুল গাছের তলায় জনা-চার ছোকরা গুটিসুটি রোদ্দুর পোহাচ্ছে। পিট পিট করে তাকাল! হাই দ্যাখ! ধক করে ছলকে ওঠে তিমিরবরণের বুক। গাঢ় আশঙ্কায় আড়চোখ তাকান। মনে মনে প্রমাদ গোনেন তিমিরবরণ। ধীরপায়ে হেঁটে যান পাশ দিয়ে। ছোকরাগুলো পেছন থেকে দৃষ্টি বিঁধিয়ে দেখতে থাকে।

নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে হাঁফ ছাড়েন তিমিরবরণ। উহ্ ছোকরাগুলো যেভাবে চমকে উঠল! অবশ্য এমন আকাট জঙ্গলে যে-কোনো শহুরে ধোপদুরস্ত মানুষ দেখলেই, ওদের পক্ষে চমকে ওঠাই স্বাভাবিক। তবুও তিমিরববণের মনটা কেন জানি অবিরাম 'কু' গায়। সোমেশ্বর যতই আশ্বাস দিক, নিশ্চিন্ত হতে পারেন না পুরোপুরি। কোনো গতিকে চিনে ফেলে যদি! ভিড় করে আসে যদি চার পাশ থেকে! পালাতেও পারবেন না তিমিরবরণ। এতখানি রাস্তা, তাছাড়া, রাস্তাই বা চিনবেন কী কবে? গতকাল কুঠীঘাট নামক এক বাজার মতো জায়গা থেকে কাঁচা রাস্তায় নেমে পড়েছিল জিপ। চলেছিল,

ঘণ্টাটাক। একঘণ্টায় কত কিলোমিটার চলে জিপ? চল্লিশ-পঞ্চাশ...। কত দূরে এসে পড়েছেন তিনি? পৃথিবীর কোন প্রান্ত-সীমায়? তেমন বিপদে পড়লে, কোন দিকে কত যোজন পথ পেরোলে সভ্য জগতে পৌঁছবেন তিমিরবরণ! ভাবতে ভাবতে বালুচর পেরিয়ে একেবারে জলের পাশটিতে চলে এসেছেন উত্তেজনার বশে। পিছু ফিরে দেখলেন, ছোকরাগুলো গাছের তলায় নেই। দুশ্চিন্তাটা নতুন রূপ নেয়। তড়িঘড়ি গ্রামেই ঢুকল নাকি? শুভ সংবাদটা চাউর করে দিল নাকি এতক্ষণে? মনে মনে বেশ দমে গেলেন তিমিরবরণ। আর তখনি দেখলেন, বালির চর ভেদ করে বহু দূরে হেঁটে চলেছে ওরা। সম্ভবত গন্তব্যস্থল ঐ জঙ্গলটা। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন তিমিরবরণ। প্রথম ফাঁড়াটি কাটল তবে! মনটা ঝরঝরে হয়ে উঠল। তিমিরবরণ পায়ে পায়ে দাঁড়ালেন একেবারে জলের কিনারে। কাচের মতো স্বচ্ছ জল। নিজের ছায়াখানি পড়েছে জলে। তিমিরবরণ পরম প্রশয়ে জলের মধ্যে নিজের মুখখানি দেখতে লাগলেন অনেকক্ষণ ধরে।

নদীর জলে ছাঁকনি দিয়ে চুনো মাছ ধরছে গুটিকয় বাচ্চা। পায়ে পায়ে ওদের পাশটিতে দাঁড়ালেন তিমিরবরণ। চুনো, পুঁটি, চ্যালা মাছগুলো কোঁচড়ের মধ্যে রাখছে ওরা। নিজেদের আনন্দে মশগুল। শীতে অনেক পাখি এসেছে সুবর্ণরেখায়। মাঝনদীতে ভাসছে ওরা। কালো কালো বিন্দু। গ্রাম থেকে গরুর পাল বেরিয়ে আসছে। বালুচর ধরে এগিয়ে চলেছে জঙ্গলের দিকে। পা থেকে শৌখিন কোলাপুরী চটি খুলে হাতে নিলেন তিমিরবরণ। ভিজে বালির ওপর হাঁটতে লাগলেন খালি পায়ে। বহুদিন বাদে একচিলতে মুক্তির স্বাদ! কেমন করে তা উপভোগ করবেন ভেবে পাচ্ছেন না যেন। হাঁটতে হাঁটতে নদীর জলে পা ডোবালেন বার কয়েক। বরফের মতো ঠাণ্ডা জল। ঝিন্‌ঝিন করে ওঠে সারা শরীর। তবুও ভালো লাগে। অনেক দূরে আখের খেত। আখ কাটতে নেমেছে জনা কয়। চিবিয়ে আখ খাওয়ার স্মৃতি প্রায় ধূসব হয়ে এসেছে। তবুও মুখ জুড়ে যেন মিঠে স্বাদ। তিমিরবরণকে কে যেন টানতে লাগল আখ খেতের দিকে।

ন'টা নাগাদ ফিরলেন তিমিরবরণ। শহুরে ভদ্র-সজ্জন বিবেচনায় কয়েক পাব্‌ আখ উপহার দিয়েছে ওরা। ফিরতি পথে তাই চিবিয়েছেন পরম তৃপ্তিতে। না, কেউই চিনতে পারেনি তাঁকে। ব্যাপারটা ভাবতে গিয়ে স্বস্তি জমে বুকে। আহ্, এখানে কেউই চেনে না মহানায়ক তিমিরবরণকে! আহ্!

ঘরে ফিরেই দেখেন, কান্‌চারাম জলখাবার বানিয়ে তৈরি। লুচি-হালুয়া। কেটলিতে চায়ের জল চড়িয়েছে।

'টিয়া রে—।' হাঁক পাড়ে কান্‌চারাম, 'কাপ-পিলেটগুলা লিয়ে আয়।'

উঠোনের পাতকুয়োর পাড়ে বসে চীনেমাটির কাপ-প্লেটগুলো ধুচ্ছিল ঐ কিশোরী। সম্ভবত তিমিরবরণের আগমন উপলক্ষে বহুদিন বাদে পৃথিবীর আলো দেখছে গুগুলো।

'মেয়েটি কে গো, কান্‌চারাম?' নিচু গলায় শুধোন তিমিরবরণ।

'এটা? এটা মোর তৃতীয় পক্ষ।' ভাবলেশহীন গলায় জবাব দেয় কান্‌চারাম। মিটি-মিটি হাসে, 'পর্‌থম্‌টি মর্‌য়েছে। দ্বিতীয়টি লয়াগ্রামে থাকে উর ব্যাটার পাশ। ইটি তৃতীয় পক্ষ। শালী বড্ড ঢ্যামনা। ঘর কত্তে চায় না কিচ্ছোতেই।'

নিঃশব্দে ধোওয়া-ধোওয়ি করছিল টিয়া। এক ঝলক তাকাল। দু'চোখে কপট বোষ।

'কেউ কিছু জিজ্ঞেস করছিল নাকি, আমার ব্যাপারে?' খেতে খেতে শুধোন তিমিরবরণ।

'তেমন কিছো লয়।' কান্‌চারাম শরীর বেঁকিয়ে আড় ভাঙে, 'বলছিল, তোদের ঘরে লোকটা কে বটে? ত' আমি কই, মোর ভাইগ্‌নার স্যাঙাত। গাঁ দেখতে আইছে।'

স্যাঙাৎ! তিমিরবরণ হলেন সোমেশ্বর মাহাতোর স্যাঙাৎ! মনে মনে হেসে কুটিকুটি হন তিমিরবরণ।

বলেন, 'বেশ বলেছ। কী কাজ করে, শুধোলে বোল, বেলেঘাটায় গেঞ্জির কারখানার ম্যানেজার।'

'গেঞ্জির কারখানার মেনেজার বট-অ তুমি!' কান্‌চারাম লুব্ধ চোখে তাকায়। প্রবল শীতে গায়ে একটি খাকী হাফ-শার্ট আর ময়লা চাদর। 'তুমি তাহলে কত গেঞ্জিই না পর সম্বচ্ছর! তুমার কারখেনায় পুরা-হাতা মোটা গেঞ্জি হয়? ললিতবাবু শীতকালে যা পরেন। এক্কেরে গলাতক্ক ঢাকা।'

ঠাট্টা করতে গিয়ে বিপদে পড়েন তিমিরবরণ। কথা ঢাকতে হয়। বলেন, ' তোমাকে একখানা গলা-ঢাকা গেঞ্জি পাঠিয়ে দেব সোমেশ্বরের হাতে।'

'সোমেশ্বর? উ শালাকে দিলে আর পেইছি মুই! তুমি বরং কালাচাঁদকে দিয়ে পাঠাই দিবে। কালাচাঁদ কলকাতায় থাকে। পুলুসে চাকরি করে। মাসে মাসে ঘর আসে। উটা সোমেশ্বরিয়ার মতন অত লাব্বাক লয়।'

তিমিরবরণের ভুরু কুঁচকে উঠেছে ততক্ষণে। কালাচাঁদ বলে একজন আছে নাকি এ গাঁয়ে? যে কি না পুলিসে চাকরি করে! এবং কলকাতায় থাকে! হায় ঈশ্বর!

'কালাচাঁদ কবে আসবে ঘরে?'

'এই তো গেল, দিনা দুই আগে। ফের আসবে মাঘে। ওর মারফত দিও।'

তিমিরবরণ মিষ্টি হেসে মাথা নাড়েন। 'পাঠাব। একজোড়া।'

'এক জোড়া!' চক্‌চক্ করে ওঠে কান্‌চারামের চোখ, 'তাহলে একটা মোর বিয়াইকে দুবো। উ শালা মোর চেইয়েও বুড়া। এই শীতেই বোধকরি টসকাবে।'

'কোথায় থাকে তোমার বেয়াই?'

'অই তো, তামাজোড় গাঁয়। লদীর ওপারে। মোর বড় ঝি'র শ্বশুর।'

কথায় কথায় খোলসা হয়। টিয়া কান্‌চারামের বড় মেয়ের মেয়ে। দু'বেলা আসে দাদুর কাছে। দুধ নিয়ে আসে। ফাই-ফরমাশ খেটে দিয়ে যায়।

খুব মৃদু গলায় কথা বলছিল কান্‌চারাম। চোখদুটি যেন সর্বদাই ঢুলু ঢুলু। যেন মাঝে মাঝেই যোগাযোগ হারিয়ে ফেলছে চলতি দুনিয়ার সঙ্গে।

একসময় ওর নেশার ব্যাপারে শুধোলেন তিমিরবরণ। 'বড় জব্বর নেশা তো হে তোমার! কাল থেকে দেখছি। পা টলে না, গন্ধ ছোটে না, বাজে বকো না, অথচ..।'

কান্‌চারাম হাসে। শিশুর মতো নিষ্পাপ হাসি। অনেক সাধ্যসাধনার পর মুখ খোলে।

'এ আইজ্ঞা, মোদের গরিবের লিশা। পোস্ত খোলার জল। পোস্তদানা যে ফলের মধ্যে থাকে, উই ফলের খোলা। জলে দু'চার ঘড়ি ভিজাই রাইখ্যে জলটুকু খাইত্যে হয়।'

নেশাটার মাহাত্ম্য সাতমুখে বলতে থাকে কান্‌চারাম। বড় জব্বর নেশা। শয়তানটা ঘুমিয়ে পড়ে। শরীরের মধ্যে পাখি-পাখালগুল্যে জেগে ওঠে। কলরব জোড়ে। মনটা পলকা হয়ে শিমল তুলোর মতো উড়তে থাকে। বেজায় ভালো লাগে তখন। তবে, বিপদও আছে। একেবার ধরলে ছাড়া কঠিন। আর, একটা দিনও বাদ দেবার জো নেই।

বস্তুটি একবার চেখে দেখবার সাধ জাগল তিমিরবরণের মনে। দু'একদিন যাক। কথাটা পাড়বেন কান্‌চারামের কাছে।

দুই

দুটো দিন প্রায় শুয়ে বসেই কাটালেন তিমিরবরণ। সকালে লুচি-হালুয়া, দুপুরে মুর্গির ঝোল দিয়ে ভাত। রাতে রুটি। মাঝে মধ্যে নদীর ধারে একটুখানি বেড়িয়ে আসা। মোটা চালের ভাত, মুর্গির ঝোল দিয়ে মেখে ভরপেট খাচ্ছেন। অমন ভুরিভোজ, অমন তৃপ্তি সহকারে, বহুদিন ঘটেনি। অথচ হজম হয়ে যাচ্ছে সবকিছু।

দুপুরে একটুখানি গড়িয়ে নিয়ে, বেরিয়ে পড়লেন। গাঁ-খান চক্কর মারলেন। ছেলে-মেয়ে, বউ-ঝিরা জুলজুল চোখে দেখে। কিন্তু সে জন্যে আর দুশ্চিন্তা নেই মনে। এ দৃষ্টি, সে দৃষ্টি নয়! ভারতের মহানায়ককে এরা চেনে না। এরা দেখছে স্রেফ একটি শহুরে মানুষকে।

গাঁয়ের কয়েকটি ছেলের সঙ্গে আলাপ হয়েছে ইতিমধ্যে। খাঁদা, শুকরা, আর একটি বিদঘুটে নামের ছেলে। ওদের সঙ্গে গতকাল গিয়েছিলেন জঙ্গলটার দিকে। অনেক গাছ-গাছড়ার নাম চেনাল। জঙ্গলের রহস্য আর মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করল শতমুখে। শুকরা নামের ছেলেটি আবার ক্লাস এইট অবধি পড়েছে গোপীবল্লভপুর স্কুলে। বাকি দুটি পাশের গাঁয়ের প্রাইমারি স্কুলে ফোর অবধি: ষোল-সতের বছর বয়স ওদের। ইন্দিরা গান্ধী, জ্যোতি বসুর নাম জানে। কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে লড়াইয়ের ভাসা ভাসা খবর রাখে শুকরা। অথচ তিমিরবরণের নাম শোনেনি জীবনে। মনে মনে খুব হেসেছেন তিমিরবরণ। বেজায় মজা পেয়েছেন। ছেলেগুলো বুঝতেই পারছে না, কার সঙ্গে বেড়াচ্ছে সারা বিকেল। তিমিরবরণ স্থির করলেন, কলকাতায় ফিরে গিয়ে একখানা পত্রযোগে নিজের পরিচয় ফাঁস করবেন ওদের কাছে। গোটা কতক সই করা ফটোগ্রাফও পাঠাবেন। তখন তো সবাই হাত কামড়াবে নিষ্ফল আক্ষেপে। হায় গো, তেন মানুষটি এলেন, রইলেন, চিনতেই পারলাম নি! এমন কপাল কি এ জন্মে আর হবে?

পাড়ার মধ্যে ঢুকে অবলীলায় ঘুরে বেড়ান তিমিরবরণ। কুয়োতলা, পুকুরপাড় ধরে হাঁটেন। একটি বাড়ির সাবেকি দাওয়ায় বসে তাস পিটছে চারজন। এক পাশে বসে ধুয়ো দিচ্ছে আরো চার-পাঁচজন। পাশে একখানি ট্রানজিস্টার বাজছে, এমন পরিবেশে যেন নিতান্তই বেমানান।

তিমিরবরণ গিয়ে দাঁড়ান পাশটিতে। ভুলে গেছেন এসব তাসের খেলা। পিয়ার..., বিন্তি...। জানতেন এককালে। তুখোড় খেলুড়ে ছিলেন। স্মৃতিতে হাতড়ান। ছোকরাগুলো পিটপিট করে তাকায়। শহুরে বাবুকে দেখে অস্বস্তি। তিমিরবরণই যেচে আলাপ করেন। ভাব জমান। কালাচাঁদ মাহাতোরই বাড়ি এটা। এই গাঁয়েরই ছোকরা সবাই। খেতে-মাঠে খাটে-বাটে। হতদরিদ্র অবস্থা সকলের। রেডিওটি কালাচাঁদ মাহাতোর। ওর অবর্তমানে, এখন ছোট ভাই রাইচাঁদের দখলে। কালাচাঁদের রেডিও এখন সারা পেঁচাবিধা গাঁয়ের গর্বের বস্তু।

বাড়ি ফেরার পথে নিমগাছের তলা থেকে জাল বুনতে বুনতে হাঁক পাড়ে এক

থুখুড়ে বুড়ো। কে? যোগেন নাকি? থমকে দাঁড়ান তিমিরবরণ। আজ্ঞে না। ঘোলাটে চোখ দুটো তিমিরবরণের গায়ে ঘসতে থাকে বুড়ো। জালে ফাঁস পড়ে যান্ত্রিক হাতে।

'আমি সোমেশ্বর মাহাতোর বন্ধু। বেড়াতে এইচি।'

'সোমেশ্বর? অই কান্‌চারামের ভাইগ্‌না? কোলকাতায় কুন সিনিমার মালিকের দোরে চাকরি করে? শালা, হাজারবার কইল, কোলকেতা লিয়ে গিয়ে সিনিমা দেখাবে। ধড়িবাজ!'

ফিরতি পথে বহেড়া গাছের তলায় টিয়ার সঙ্গে মুখোমুখি। তিমিরবরণের বুক জুড়ে অকস্মাৎ সেই সোহাগী পাখির শিস্‌। কাছাকাছি হতেই অস্বস্তি, সঙ্কোচ। আশ্চর্য! সারাজীবন, দৈনিক বারো-চোদ্দ ঘণ্টা যাঁর কিনা শুধুই নায়িকা নামক নারী শরীরগুলোর আকণ্ঠ সংস্পর্শ, শরীরে শরীরে শুধু আদিম ঘসাঘসি...। শ্যুটিংয়ের বাইরেও নারীদেহগুলি ফেনায়িত হয়ে ঢেউ ভেঙে আছড়ে পড়তে চায় মহানায়কের শরীরে, অবিরাম...। গাঁয়ে একটা পুঁচকে কিশোরীকে দেখে তাঁর দুচোখে মুগ্ধতা, মনে সঙ্কোচ, কপালে স্বেদ!

'ঘরে ফিরছ বুঝি?' শেষ মুহূর্তে ঠোঁট ফসকে বেরিয়ে আসে কথাগুলো।

মাথা দুলিয়ে সায় দেয় টিয়া, 'ঘরকে যাও জলদি। বুড়া ভাবছে।'

বলেই স্বচ্ছন্দ পদক্ষেপে নদীর দিকে হাঁটতে থাকে টিয়া। পায়ের মল বাজতে থাকে রুমুর-ঝুমুর...।

তিমিরবরণের পাদুটো আটকে যায় ওখানেই। টিয়া চলেছে নদীর দিকে। সোনালী বালিতে তার ছোট্ট দুটি পায়ের ছাপ আঁকা হয়ে যাচ্ছে পলকে। কেমন অলৌকিক মনে হয় তিমিরবরণের। স্বপ্নের মতো লাগে।

একসময় পাদুটো সচল হয়। পায়ে পায়ে নদীর দিকে হাঁটতে থাকেন তিমিরবরণ। নিজের অজান্তে। কী এক ঘোরের মাথায়।

বালি ছেড়ে জলে নেমেছে টিয়া। ডুরে শাড়িখানা তুলে ধরেছে হাঁটু অবধি। কোমল-মৃসণ পা। পায়ের গোছ পুষ্ট হচ্ছে। কাচের মতো জলে উঠছে-নামছে পা। এইভাবে একসময় নদী পেরিয়ে টিয়া চলে যাবে ওপারে!

তিমিরবরণের পায়ের আওয়াজে ফিরে তাকাল টিয়া। হাঁটু জলে থমকে গেল পা। দু'চোখে তীব্র বিস্ময় ও সামান্য কৌতুক।

'ঘরে গেলি নি, বাবু?'

তিমিরবরণ অপ্রস্তুত বোধ করেন। বলেন, 'এই, যাব।'

নদীর ওপারে, টিলার আড়ালে সিঁদুরের টিপের মতো সূর্য ডুবছে। লালচে বালির বুক থেকে উধাও হয়ে গেছে রোদ্দুর। চারপাশ কেমন নিঝ্‌ঝুম হয়ে আসছে। ছায়া-ছায়া। বালির বুকে কিছু শালিখ তখনো কিছু খুঁটে খেতে মশগুল। আকাশ পথে উড়ে চলেছে মরালের দল। মালা গড়ছে, ভাঙছে। নদীটা শুয়ে রয়েছে ক্লান্ত বিবশ ভঙ্গিতে।

'সোনা-ধোওয়া ঘাটটি কদ্দুরে, টিয়া?'

টিয়ার চোখদুটি কৌতুকে ঘন হয়ে ওঠে। ঠোঁটেব কোণে হাসির ঝিলিক।

'সে ইখ্‌নে কুথা গো—? আরো অনেক, নামোতে। একবেলার হাঁটা।'

হাঁটতে শুরু করে টিয়া। জলের মধ্যে অলৌকিক শব্দ তুলে সে একসময় ওপারে গিয়ে ওঠে।

একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলেন তিমিরবরণ। পায়ে পায়ে হাঁটা দেন বাসার দিকে। সূর্য তখন ডুব মেরেছে টিলার আড়ালে।

তিন

পেঁচাবিধার পরের গাঁ ভালুকমুড়া। সেখানে হপ্তায় একদিন হাট বসে। আজ হাটবার।

কান্‌চারাম মাহাতো হাটে যাবে। টিয়াও যাবে সঙ্গে। সারা হপ্তার কেনাকাটা। তিমিরবরণের জন্য এ হপ্তায় বাজার-হাটের বহর বেশি। সোমেশ্বর বার বার বলে গেছে, বাবুর খাওয়া-দাওয়ার যেন ত্রুটি না হয়। কান্‌চারামকে মোটা টাকা দিয়ে গেছে সে বাবদ।

'যাবেন নাকি হাটে?' কান্‌চারাম শুধোয়' 'না, থাক। গাঁ'র হাটে লোক যত, ধূলা তত।'

ইচ্ছে করছিল। তবুও মনে দ্বিধা। হাট মানে, রাজ্যের মানুষের জমায়েত। যদি এক-আধজন আচমকা চিনে-টিনে ফেলে! দু'হপ্তা থাকতে এসেছেন। তিন দিনের মাথায় সুখ-স্বর্গখানি ভেঙে যাবে তবে। আবার, 'মনের মধ্যে চোরা লোভ। দেখলে হয়, কেমন হাট বসে গাঁয়ে। বলেন, 'যাব গো, খুড়ো।'

সারা পথ এক অদ্ভুত ঘোর তিমিরবরণের। সবার আগে টিয়া। লাফিয়ে চলেছে ফিঙের মতো। তার পিছে কান্‌চারাম। সবার পেছনে তিমিরবরণ।

গেরিমাটি রঙের পথ। দু'পাশে অচেনা গাছগাছালি, ঝোপ-ঝাড়। খাল-বিল, খেত-গাঁ,-গাছ-গাছাল চেনাতে চেনাতে চলেছে কান্‌চারাম।

কী সুন্দর সব ল্যান্ডস্কেপ! কি সুন্দর নাম! সোনাধোওয়া ঘাট, লক্ষ্মীকাজল ধান, মৌডাল ছাতু! খেতের নাম মানিকভাসা। গাঁয়ের নাম চোরচিতা। পাখির নাম কোয়ের। আর, কী সব সুন্দর সুন্দর শব্দ ব্যবহার করে এরা! 'বিহনে' শব্দটা ভারি মনে ধরেছে তিমিরবরণের। কেমন যেন বিচ্ছেদ আর বিরহের সৌরভ রয়েছে। উ বিহনে মোর তি-ভবন আঁধার। বলেছিল কান্‌চারাম! টিয়ার প্রতি কপট অনুরাগে। কথাটা তিমিরবরণের মনে গেঁথে গেছে।

'ও, দাদু—।' নাচের ভঙ্গিতে হাঁটতে হাঁটতে দূর থেকে তাড়া লাগাচ্ছিল টিয়া, 'জলদি আইস। বেলা যায়।'

'হাঁ-রে মাগী—। ত'র বরের হাট ফুরাই গেল!' হাঁফাতে হাঁফাতে নাতনিকে গাল পাড়ে কান্‌চারাম,' 'তুই বরং আগে যা। ভালো বর সব বিক্রি হইয়ে গেলে, ত'র ভাগ্যে জুটবে কানা, লুলা...।'

টিয়া বেজায় ক্ষেপে যায়। মুখ ভেংচে, চোখ পাকিয়ে, ডান হাতে মুঠো বানিয়ে তুলে দেয় আকাশে।

কান্‌চারাম হাসে। হাঁটতে হাঁটতে গুনগুনায়। খুব ছোট বেলায় হাটে গেছে টিয়া। কান্‌চারাম ওকে সারা পথ লোভ দেখিয়েছে, হাটে ওকে সুন্দর দেখে একটা 'বর' কিনে দেবে। হাটে পৌছেই বায়না ধরল টিয়া, এবার দাও কিনে বর। বর না নিয়ে ফিরবেই না সে।

সেদিন সারাপথ মায়ের কোলে কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ফিরেছিল। 'বর' না কিনে দেবার অপরাধে কান্‌চারামের সঙ্গে কথা বলেনি হপ্তাটাক।

কান্‌চারাম হাসে।

টিয়া চেঁচিয়ে বলে, 'বর লয়। তুমার তরে একটা সোন্দর দেইখ্যে বউ কিন্যে দুব আইজ।'

'তুই থাইক্‌তে, বউ কিনতে যাব ক্যানে?' চেরা গলায় গান ধরে কান্‌চারাম 'বলি, কাজ কি আমার অন্য ধনে—?'

'আ-হা! তুমার ঘর কত্তে বয়্যে গেছে মোর।' দু'হাতের বুড়ো আঙুল একত্রে নাচাতে থাকে টিয়া।

সহসা কপট রাগে ফেটে পড়ে কান্‌চারাম, 'না কল্লি তো মোর বইয়ে গেল! তা বলে এই গাঁইয়া-হাট থিক্যে কিনতে যাব বউ? বাবুর সাথে চইলে যাব কোলকেতায়। সোন্দরী বউ কিন্যে লিয়ে আইস্‌ব বউবাজার থিক্যে।'

কথার রসখানি চাখতে চাখতেও তিমিরবরণের ভুরু কুঁচকে ওঠে অজান্তে। বউবাজারের নাম জানল কী করে বুড়ো?

'কালাচাঁদ তো অখানেই থাকে।' কান্‌চারাম চোখ বড় বড় করে তাকায়, 'আমরা বলি, সে কি রে কালা? জায়গার নাম বউবাজার! সিখেনে কি তেবে বউয়ের বাজার বসে?'

নিজের রসিকতায় নিজেই মজে যায় কান্‌চারাম।

সুবর্ণরেখার পাড় ধরে মাইল-দুই হাঁটলে, চার-পাঁচখানা মহুল গাছের তলায় ছোট্ট হাট। আলু-পেঁয়াজ, আদা-রসুন শাক-সবজি। দু'তিনটা ফিতে-কাঁটার মনোহারী দোকান। গামছা কাপড়ের দোকানও একটা। দু'তিনজন বসেছে জিয়োল মাঝ আর কুচো মাছ নিয়ে। আর, শুঁটকি মাছের ডাঁই। হাটের একেবারে শেষপ্রান্তে শুয়োরের মাংস ঝুড়িতে নিয়ে বসেছে আদিবাসীরা। লাল চাকা-চাকা মাংস। খানিক তফাতে কুসুম গাছের তলায় মোরগ-লড়াই চলছে। চারপাশে বৃত্তাকারে মানুষের জমায়েত। আকাশ ফাটানো উল্লাস।

বিপুল বিস্ময়ে সবকিছু দেখছিলেন তিমিরবরণ। স্টুডিও-র মধ্যে বানানো 'গাঁয়ের হাট'-এ কতবার সওদা করেছেন তিনি। আজ সশরীরে একেবারে আসল হাটের খদ্দের।

হাটভর্তি গেঁয়ো মানুষ। খাটো ধুতি কিংবা গামছা পরনে। সরলপানা মুখ। বোকা বোকা হাসি। নেশা জড়ানো চোখ। তিমিরবরণকে দেখে সবাই সসম্ভ্রমে তাকায়। বড্ড বেমানান তিনি এমন পরিবেশে।

রাইচাঁদ মাহাতো হাটে এসেছে। কাঁধে ঝুলছে ট্রানজিস্টার। চড়া ফিল্মি গান বাজছে ওতে। চমক খেয়ে শুনতে থাকেন তিমিবরণ। বেশ কয়েকটি গান তাঁরই অভিনীত ছবির। তিনিই লিপ দিয়েছেন। গানগুলোকে নতুন করে শুনতে থাকেন এমন পরিবেশে।

গতকাল সন্ধেবেলাও হয়েছিল অনুরূপ অভিজ্ঞতা। কালাচাঁদ মাহাতোর ঘরে বাজছিল ট্রানজিস্টার রেডিও। ছায়াছবির গান চলছিল উচ্চগ্রামে। দাওয়ায় বসে তাসুড়ের দল শুনছিল কি শুনছিল না। একটুখানি মজা করবার লোভ সামলাতে পারলেন না তিমিরবরণ।

বললেন, 'কোন ছবির গান, জানো?'

মাথা নাড়ে ছোকরাব দল।

'প্রেম যমুনা। যমুনার রোল করেছিল স্বপ্নাকুমারী। আর প্রেমের রোল কে করেছিল, জানো নিশ্চয়ই?'

মাথা নাড়ে ওরা। জানে না।

'সে কি! তিমিরবরণ। নাম শুনেছ নিশ্চয়ই?'

ছোকরার দল মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। একজন হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ে। দু'একজন 'না' সূচক। দু'একজন 'না', 'হ্যাঁ'-র মাঝামাঝি। তিমিরবরণ কিঞ্চিৎ বিরক্তবোধ করেন। না হয় জঙ্গলের মধ্যে অজ গাঁ। না হয়, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন একটি দ্বীপ। না হয়, পনেরো আনা মানুষই অজ্ঞ, দরিদ্র। তা বলে, এই বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রহরে পশ্চিমবাংলায় (নাকি বিহারে? নাকি ওড়িষ্যায়?) এমন অঞ্চলও আছে যেখানে কেউই তিমিরবরণের নাম শোনেনি! আশ্চর্য! এবা যে সত্যিই সেই আদিম যুগেই বাস করছে! বলেন, 'তোমরা কি কেউ-ই জীবনে একটাও সিনেমা দ্যাখোনি।'

বেজায় অপ্রস্তুত হযে হাসে ওরা।

দ'একজন বলে, দেখেছি আইজ্ঞা। ঝাড়েকগ্রামে একবার একটা সিনেমা দেখল্যাম, কী যেন নাম, খোব মারপিট আর ঘোড়-দৌড়। একটা সৌন্দবী মতন মেয়া-ছেইলা খোব চাং চাব্‌ড়াল্যাক আর ল্যাচল্যাক।

'কী নাম বল তো ছবিটার? আঁধার মানিক? বিবর্ণ প্রেম? প্যার কা কসম? হাত-সাফাই?'

'অইগুলোরই একটা হব্যেক বোধ লেয়। আপনি বোধ লেয় খোব সিনিমা দ্যাখেন?'

তিমিরববণ দমে যান। সামলে নেন নিজেকে। কিন্তু বিস্ময়ের ঘোরটা কাটে না কিছুতেই। এ এক আজব রাজ্যে উপস্থিত হয়েছেন তিনি। স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস হতো না।

হাটের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে মানুষজনের সঙ্গে গল্প জুড়লেন তিমিরবরণ। এ অঞ্চলের লোকভাষা তিনি জানেন না। তবে এ-কদিন পেঁচাবিধার লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলে, কথার আদলটা কিঞ্চিৎ রপ্ত হয়েছে। জিনিসপত্রের দাম শুধোন। গাঁ-ঘরের খবরা-খবব নেন। নাম শুধোন, এবং এক সময়ে অনিবার্যভাবে এসে পড়ে সিনেমার প্রসঙ্গ। আসলে, সিনেমার জগতটা সম্পর্কে মানুষজনের এমন সীমাহীন অজ্ঞতা তাঁকে বিস্মিত কবেছে। তিনি এই অজ্ঞতার শেষ দেখতে বদ্ধপরিকর। জনা দশ-বারো জোয়ান ছোকরার সঙ্গে কথা বলে তিমিরবরণের মনে হয়, তাদের প্রত্যেকেই জীবনের কোনো না কোনো সময়ে এক আধটা ছবি দেখেছে। কেউ পৌষ মেলায় ঝাড়গ্রামে গিয়ে, কেউ খড়্গপুরে রাবণপোড়া দেখতে গিয়ে। কেউ বা পুবে খেটে ফিরবার কালে বেলদা বাজারে। কিন্তু সবাইয়েরই ছবি দেখা হলো, ঐ ঘণ্টা তিনেকের হুড়ুম-দুড়ুম ব্যাপার-স্যাপার। সাঁই-সাঁই গাড়ি ছুটছে। ঝলাক-ঝলাক বাজ পডছে। ঢিসুম-ঢিসুম মারপিট চলছে। কোমর দুলিয়ে নাচ চলছে। তারপর একসময় খেল খতম, পইসা হজম। চরম হতাশায় ঘন ঘন মাথা নাড়েন তিমিবরণ। নিজের ছবির ডজন খানেক নাম বলে যান এক নিঃশ্বাসে। মানুষগুলোর মধ্যে কোনো বোধোদয় ঘটে না। এক চিলতে লজ্জা শরমের ছায়াও পড়ে না মুখে।

বলে, 'কে জানে, হবেও বা। দেখেছি হয়তো বা। মনে নাই।'

তিমিরবরণের ভীষণ রাগ হচ্ছিল মনে মনে। পরতে পরতে ক্ষোভ জমছিল বুকে।

স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পরেও বহির্জগতের এক চিলতে আলোও ঢোকেনি এদের জীবনে! আশ্চর্য! প্রায় আদিম যুগে পড়ে রয়েছে মানুষগুলো। সরকার তবে এতগুলো দিন গদিতে বসে করলটা কী? ফিরে গিয়েই সুনন্দকে ফোনে বলতে হবে কথাগুলো। সুনন্দ হলো তিমিরবরণের স্কুল-জীবনের বন্ধু। এখন মন্ত্রী হয়েছে। তথ্য-সংস্কৃতি দপ্তর দ্যাখে। খিস্তি মারতে হবে ওকেই। তোমরা করেছ কী? তোমাদের তথ্যদপ্তর তো দেখছি ঠুঁটো-জগন্নাথ। খোলা আকাশের তলায় পর্দা খাটিয়ে, তিমিরবরণের ছবি না হোক, 'পথের পাঁচালী'টাও একটি বারের তরে পেঁচাবিধা গাঁয়ে দেখাবার সময় হয়নি তোমাদের! এ অঞ্চলের তথ্য-সংস্কৃতি অফিসারকে এক্ষুনি বদলি করা দরকার। নর্থ বেঙ্গলে। ভাবতে ভাবতে ঝাঁ-করে এসে গেল আইডিয়াটা। পেঁচাবিধা গাঁয়ে, খোলা আকাশের তলায় পর্দা খাটিয়ে একটা ওপেন ফিল্ম শো করে দিলে কেমন হয়?

তিমিরবরণের খানদশেক বাছা-বাছা ছবি। ডিস্ট্রিবিউটরদের বলে দিলেই তারা তিমিরবরণের অনারে ফ্রি-তে ফিল্ম দেবে। বিনি পয়সায় তিমিরবরণের ছবি পেলে যাযাবর ফিল্ম-কোম্পানিগুলো তাঁবু পেতে বসে যেতে পারে পেঁচাবিধার ডাঙায়। ডিস্ট্রিবিউটরদের জানাশোনা রয়েছে ওদের অনেকের সঙ্গে। যদি ওরা জানতে পাবে যে তিমিরবরণ চান এটা, বর্তে যাবে। নেহাৎ ওরা রাজি না হলে সুনন্দ আছে। প্রস্তাবটা দিলেই, একটা দু'লাইনের অর্ডার ইস্যু করে দেবে। ওরা ফেল করলে তিমিরবরণই পর্দা, জেনারেটর, প্রজেক্টর ভাড়া করে অপারেটরসহ পাঠাবেন পেঁচাবিধা গাঁয়ে, নিজের খরচে। বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে এত অজ্ঞতা সহ্য করা যায় না! স্রেফ সহ্য করা যায় না।

চার

সকালে জল খাবার পরিবেশন করতে করতে কান্‌চারাম শুধোল, 'বাবু কি সিনিমার লোক?'

খাবার মুখে তুলতে গিয়েও থেমে যান তিমিরবরণ। বুকের মধ্যে হাতুড়ির ঘা পড়ে অকস্মাৎ। সারা শরীর জুড়ে সতর্কতার ঘণ্টা বাজতে থাকে।

মুখ কালো করে শুধোন, 'কী করে জানলে কথাটা?'

নিরাসক্ত গলায় কান্‌চারাম বলে, 'গাঁয়ের ছেইলাগুলাই বলাবলি কচ্ছে। কাল হাটে নাকি তুমি বলেছে, পেঁচাবিধায় একটা সিনিমা কুম্পানি খুলবে? মুই বলল্যাম্, সিট্যা হইত্যে পারে। সোমেশ্বরিয়া সিনিমা-মালিকের থানে চাকরি করে। সে এনেছে বাবুকে। সিনিমা-কুম্পানির লোক হইত্যেও পারে উ' লোক।'

ভয়ে ভাবনায় যে বেলুনটা ফুলছিল, আস্তে আস্তে চুপসে যায়। খাবারদাবারগুলো কেমন বিস্বাদ ঠেকে। হাত গুটিয়ে বসে থাকেন তিমিরবরণ।

এক সময় বলেন, 'আমি কে জানো কান্‌চারাম?'

'জানব নি ক্যানে?' কান্‌চারাম চায়ে দুধ ঢালে, 'তুমি হইলে সোমেশ্বরিয়ার স্যাঙাৎ।'

'আরে না না।' সর্বাঙ্গ দুলিয়ে বলে ওঠেন তিমিরবরণ' 'আমি কে, সেটা জানলে তোমার পিলে চমকে যাবে।'

ঘোলাটে চোখদুটো তিমিরবরণের গায়ে বোলাতে থাকে কান্‌চারাম।

মন্ত্রগুপ্তি ফাঁস করবার ভঙ্গিতে তিমিরবরণ বলেন, 'আমি তিমির—বরণ।'

'অ—।' চায়ের গেলাস এগিয়ে দেয় কান্‌চারাম, 'আজ দুপুরে কী খাবে? ডিম না কুঁক্‌ড়া?'

চরম বিরক্তিতে উঠে দাঁড়ান তিমিরবরণ। হনহনিয়ে বেরিয়ে পড়েন পথে।

গাঁয়ের মধ্যে প্রাচীন তেঁতুল গাছ। তার তলায় বসে বসে শনের দড়ি পাকাচ্ছে এক মধ্যবয়সী লোক। তিমিরবরণ পাশটিতে গিয়ে দাঁড়ান। কি গো খুড়ো, চিনতে পার আমাকে? নামটি বললেই চিনতে পারবে। বাচ্চা শিশুকে নাড়ুর লোভ দেখাচ্ছেন তিমিরবরণ! কাল বলছিলে না, সিনেমা দেখেছ দু'চারটে? তো বলি, আমি তিমিরবরণ। সে-ই বিখ্যাত তিমিরবরণ!

'অ আচ্ছা, আচ্ছা।' লোকটি দড়ির পাকের ওপর নজর রেখে চকিতে তাকায়, 'তুমি সিনিমায় পার্ট কচ্ছ নাকি?'

গুম মেরে যান তিমিরবরণ। তাকিয়ে থাকেন ক্ষণকাল। ধুশ শালা! পা' চালিয়ে হাঁটা দেন শীতলা-মাড়োর দিকে।

এখন শীতলাতলা খাঁ খাঁ। সবাই গিয়েছে সর্বজিখেতে। তিমিরবরণ সবজিখেতে পৌঁছে দেখেন, নিড়ানি দিচ্ছে গণেশ, সুবল, মংলা, বুধুর দল। ওকে দেখে সরলপানা হাসে।

'আর তোমাদের আঁধারে রাখা ঠিক হবে না। নিজের আসল পরিচয়টা দিই। কে বলতো আমি? কে? আমি হলাম তিমিরবরণ। সেই বিখ্যাত সিনেমার নায়ক তিমিরবরণ।' মিটিমিটি হাসতে থাকেন তিমিরবরণ। সাফল্যের সঙ্গে ম্যাজিকটি দেখিয়ে ম্যাজিসিয়ান যেমন হাসেন বিনীত-অহঙ্কারী হাসিটি।

'সতীমার ঘাট, বিবর্ণ প্রেম, কালপুরুষ, আঁধার মানিক, হাত সাফাই—বুঝতে পারছ এবার?' সগর্বে মাথা দোলাতে থাকেন তিমিরবরণ।

গণেশদের মুখে বোকাবোকা হাসি। বটে, বটে। ওরা সবজির গোড়ায় হাত চালায়। নিজেদের মধ্যে গুনগুনিয়ে বাত-চিৎ চালায়। তিমিরবরণ দাঁড়িয়ে থাকেন ঠায়। অভিমানে ফুলে ওঠে বুক। অপমানে তেতো হয়ে ওঠে মন।... এই তো বেশিদিন নয়, বছর দশেক আগে ঝাড়গ্রাম শহরে এসেছিলাম জলসায়। মন্ত্রীর বিশেষ অনুরোধে এক-লাখ-একে রাজি হতে হলো। ছিলাম রাজবাড়িতে। পঁচিশ হাজার লোকের বিশাল প্যাণ্ডেল। মঞ্চের সামনে তিন সারি ব্যারিকেড। পেছনে তিন সারি। গ্রিনরুমের দোর অবধি গাড়ি আনবার ব্যবস্থা, সামনে এস-পি'র জিপ। পেছনে সশস্ত্র বাহিনী। মধ্যিখানে আমার গাড়ি। থামল গিয়ে এক্কেবারে গ্রিনরুমের গোড়াটিতে। ততক্ষণে গ্রিনরুমসহ সারা মঞ্চ ঘিরে রেখেছে পুলিস। প্যাণ্ডেলের তাবৎ পুলিস-ফোর্সকে অ্যালার্ট করে দেওয়া হয়েছে। তিমিরবরণ অ্যাপিয়ারস্‌। সাবধান! আমি গাড়ি থেকে নেমে সোজা চলে গেলাম মঞ্চে। জনতাকে নমস্কার করলাম। একটু হাসলাম। একটা হিট ছবির গান গাইলাম, দু'চার কলি ডায়লগ্‌ ঝাড়লাম। তারপর গট্‌গট্‌ করে নেমে সোজা গাড়ির ভেতরে। স্টার্ট দেওয়াই ছিল। নিবিড় পুলিস-বেষ্টনীর মধ্যে হুশ করে বেরিয়ে গেল আমার গাড়ি। সোজা রাজবাড়ি। পেছনে হাজার হাজার জনতা তখন হল্লা তুলেছে। আমরা আমাদের স্বপ্নের হিরোকে আরও একটুক্ষণ দেখতে চাই...। লাঠি, কাঁদানে-গ্যাস...। সদর থেকে আরো ফোর্স

এল।আমার রাতটা রাজবাড়িতে কাটাবার কথা ছিল। কিন্তু ভরসা পেল না অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। স্পেশাল সিকিউরিটিসহ আমাকে সেই রাতেই ঝাড়গ্রাম ছাড়তে হলো। নইলে রায়ট বেধে যেত।

বেগুন গাছের গোড়াগুলো একমনে নিড়োচ্ছিল গণেশরা। যা বেগুন ফলছে গাছগুলোতে, জবাব নেই। টাইম মতো সেচ পেলে চৈত্র অবধি পয়সা আনবে ঘরে। কাজ করতে করতে সহসা বলে ওঠে সুবল, 'আপনি তেবে আকাশে পাখির মতন উড়তে পারেন লির্ঘাৎ?'

'মানে?'

'মানে, একটা সিনিমায় দেখেছি, রাজকুমারীকে বাঁ-হাতের মুঠায় ধইরে আকাশ পথে পালাচ্ছে দৈত্য। রাজকুমাবও আকাশপথে পথ আগ্‌লিল। দু'জনের বেদম লড়াই। মরার আগে বাঁ-হাঁত থিকে রাজকুমারীকে টুপ কইরে ফেল্যে দিল দৈত্য। পাহাড়ের চূড়ায় আছাড় খাবার আগে তাকে চিলের মতন ছোঁ মাইরে ধরল্য রাজকুমার। তারপর দু'জনে উড়্যে-উড়্যে দেশের পানে।'

চুপটি করে দাঁড়িয়েছিলেন তিমিরবরণ; পাথরের মতো স্থির। চোখের পাতাও পড়ছিল না। সহসা পিছু ফিরলেন তিনি। সোজা এসে হাজির হলেন ডেরায়।

'কান্‌চারাম, একটা গরুর গাড়ি হবে, কুঠিঘাট পর্যন্ত? যত টাকা চায় দেব। আমাকে আজকেই ফিরতে হবে কলকাতায়।'

'সে কি!' মুরগি ছাড়াতে ছাড়াতে হাত থেমে যায় কান্‌চারামের, 'পন্‌দরো দিনের তরে আইলে। আজ ত' মাত্তর চার দিন!'

'আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে কান্‌চারাম। প্লিজ, একটা গরুর গাড়ি জোগাড় করে দাও। এক্ষুনি। পঞ্চাশ টাকা বখশিশ পাবে তুমি। এখানে আর থাকতে পারছি নে এক মুহূর্ত। এখানে নিঃশ্বাস নেবার বাতাস নেই। বোঝ না কেন?'

কান্‌চারাম ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে ক্ষণকাল।

'কিন্তু যাবে কুথা, সিট্যা বল, শুনি?'

'কলকাতায়, নইলে খড়গপুর, কিংবা ঝাড়গ্রামে। নিদেন কুঠিঘাট, ফেকোঘাট, কোলাঘাট...' হাঁফাচ্ছিলেন তিমিরবরণ, 'যে কোনো ঘাটে, যেখানে পাতলা কাগজে সবুজ কালিতে "সগৌরবে চলিতেছে, মহানায়ক তিমিরবরণের অসামান্য দুর্দান্ত ছবি—" গোছের পোস্টার সাঁটা আছে। সমস্ত পান-সিগারেটের দোকানে। ঘরবাড়ির দেওয়ালে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে. গাছ আর ল্যাম্পপোস্ট-এর গায়ে। পায়খানায়-প্রস্রাবখানায়। উঠতি এবং বিগত যৌবনাদের বুকে। এম্নি কোনো এক জায়গায়, যে-কোনো উপায়ে, যে-কোনো মূল্যে, আজ সন্ধের মধ্যেই...।'

ভারি অবাক মানে কান্‌চারাম মাহাতো। কারণটা বলবে তো! এমন আচমকা পলায়নের হেতুটি কী!

কী করে বোঝান তিমিরবরণ! কোন্ বাক্যবন্ধ দিয়ে ব্যাখ্যা করেন মনের বিবশ হয়ে ওঠার কারণটা। বলেন, 'আমার নেশার জিনিসটা ফেলে এসেছি হে...।

...'তুমি তো নেশাড়ী মানুষ, বুঝতেই পার, বিশ বছরের পুরনো নেশা, চার-চারটা দিন সেই নেশা বিহনে কী অবস্থা হয় মানুষের!'

আত্মপীড়ন

এক

—হাঁ বে চুহা, তোর বাপটা তো ছিল বেশ ঢ্যাঙা, গাট্টাগুট্টা গৌরবর্ণ, মাথায় লম্বা লম্বা চুল। তুই শালা, তার পুত্তুর হয়্যা,অমন চামচিকার মতনটি হইলি কি করিয়া রে?

দয়াল পাখিরা 'চুহার বাপ' বলে যার বর্ণনা দিল, সে আর কেউ নয় মদন ঘোষের বাপ দ্বারিক ঘোষ। ধনে-মানে-লাম্পট্যে শুধু নিজ গ্রাম মাগুরিয়াতেই নয়, সারা তল্লাটে সুবিদিত। দয়ালের কথার অন্তর্নিহিত মধুটুকু পেয়েই চুষতে লেগেছে ত্রৈলোক্য আর তিলকদাস। মুখ টিপে হাসছে আর চুহাকে দেখছে। পড়তে চাইছে ওর মনের ভাবগতিক। চুহা চোখে-মুখে নির্বিকার। চুলার মুখে আখের শুকনো ছিবড়ে গুঁজছে। ভাবখানা, যেন শুনতেই পায়নি দয়াল পাখিরার কথাগুলো। শুনলেও গুরুত্ব দেয়নি কানাকড়ি। কিন্তু ত্রৈলোক্য-দয়ালরা জানে, চুহা এখন গুড়শালের উনুনেই কেবল কাঠ ঢোকাচ্ছে না, নিজের বুকের আগুনেও কাঠ ফেলছে নিঃশব্দে। এ হল আসলে প্রলয়-ঝঞ্ঝা শুরু হওয়ার পূর্ব-মুহূর্তের থমথমে ভাব। কাঠ ঢোকাচ্ছে, এটা মনে হল যদি, তো একটু আধটু ফুঁ দিতে হয়। ফুঁ না দিলে আগুন জ্বলে?

'তবে চুলগুলা চুহার 'এক্কেবারেই স্বতন্ত্র।' তিলকদাস ভালা-মাইন্‌ষের-পো'টি সেজে বলে, 'অমন কঁকড়া-কঁকড়া কালো, ঘন চুল। কার মতন, বল দেখি?'

চুহা তার অভ্যস্ত নিরাসক্তির মুখোশ থেকে পলকের জন্য বেরিয়ে আসে বুঝি। আড়চোখে এক ঝলক তাকায়। মাত্র এক ঝলক। পরক্ষণেই উনুনের পেটে কাঠ গুঁজে দেয়। ওই এক ঝলক দৃষ্টিই তার অন্তর্গত রোষের আকার-প্রকার, পরিমাণ বোঝার পক্ষে যথেষ্ট। দাঁত গিজুড়ে হাসে দয়াল পাখিরা, 'কার মতন রে? মুই তো বুঝতে পাল্লাম্ নি।'

তিলকদাস হাসি চেপে শুধোয় ত্রৈলোক্যকে, 'কার মতন, বল্ না রে?'

ত্রৈলোক্যের মুখে পূর্বের বজ্জাতি হাসির রেশটুকু রয়েছে তখনো। বলে, 'মুই জানবো কি করিয়া? চুহাকে জিগা—।'

'চুহা, চুহা রে, তোর মাথায় অমন কঁকড়া চুল কি কইর‍্যা হইলো রে বাপ?' দয়াল পাখিবার অতি নিরীহ গলা, 'তোর বাপের চুল কঁকড়া নয়, ঠাকুরদার নয়, মামা বংশের কারো নয়, তবুও কী কইর‍্যা তোর কঁকড়া চুল হইলো, তার গুহ্য রহস্যটা ভাঙ্ তো বাপ, শুনি।

কাকটা কর্কশ গলায় ডেকেই চলেছে। শীতের সকালে যে ভেজা-ভেজা ভাব ছিল মৃত্তিকার বুকে, তা এখন পুরোপুরি উধাও।

চুহা দ্বিতীয়বারের মতো দৃষ্টি হানে দয়াল পাখিরার দিকে। দুর্বাসার রোষ-কষায়িত

দৃষ্টি। দেখে কৌতুকের সঙ্গে সামান্য ভয় দয়ালদের মনে।

'সরিয়া আয়।' ত্রৈলোক্য চাপা গলায় বলে দয়াল পাখিরাকে, 'ভস্ম হয়্যাবি।'

কথা চলছে ঠারে-ঠোরে। কেউ পুরোটা ভাঙছে না। কিন্তু তিনজনাই বুঝে ফেলছে ষোলো আনা। কথার থেকে মধুটি চুষে চুষে খাচ্ছে। রোজ অমনি খায়। ষড়ানন চন্দের গুড়শালে অষ্টপ্রহর থেকেও তারা গুড় কিংবা আখের রস মুখে তোলে না। তাদের মুখে সর্বদা লেগে আছে অন্য মধু। চুহাকে নিয়ে সারাক্ষণ রগড়। ওকেই সারাক্ষণ নিংড়ানো এবং মধুপান। গুড়শালের কাজটা ভারী বিরক্তিকর একঘেয়ে কাজ। খুব কষ্টসাধ্যও বটে। এখন তাও আখের মহাল। শীতকাল। খেজুর-গুড়ও খানিকটা তাই। তালগুড় হয় বৈশাখ মাসে। আসল কষ্টটা তখনি। তপ্ত মাটি, তপ্ত আকাশ, তারই মধ্যে সারাদিন এক বিশাল আগুনের গা ঘেঁষে বসে থাকা। হলকায় হলকায় জ্বলে ওঠে আগুন। তপ্ত কড়াইতে কিংবা ডেক-এ গুড় ফোটে, গাদ ওঠে। গুড়শাল তখন নরককুণ্ডের সমান। কাজ করতে করতে সারা শরীর ঝলসে যায় তখন। গা জুড়ে লক্ষ লক্ষ ঘামাচি। অঙ্গ যেন সেলাই করা কাঁথা। আর মাথার মধ্যে সর্বক্ষণ এক অগ্নিক্ষরা জ্বলন। দয়ালরা সেই কারণেই চুহার পিছে লাগে। বিরক্তিকর কাজের মুহূর্তগুলিকে রসের ভিয়েনে সুস্বাদু করে তোলা।

মাগুরিয়ার দ্বারিক ঘোষের লাম্পট্য নিয়ে এ তল্লাটে কত যে গল্প-গাথা! ধৃতরাষ্ট্র শতপুত্রের জনক ছিলেন। কিন্তু চারপাশের গাঁ-গঞ্জে দ্বারিক ঘোষের সন্তান-সন্ততির বুঝি সীমাসংখ্যা নেই। এবং এ ব্যাপারে একটি চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া চালু আছে সারা এলাকা জুড়ে। মাগুরিয়া থেকে কোঁতাইগড় অবধি এলাকায় কিছু মানুষ আড়ালে আবডালে দ্বারিক ঘোষের জারজ সন্তান হিশেবে চিহ্নিত। মানুষ সন্দেহ করে, বিশ্বাস করে। তা বাদে কাউকে গালাগাল দিতে গিয়ে দ্বারিক ঘোষের ওই অতুলনীয় কীর্তিরাজিকে স্মরণ করে বহু মানুষ। শালা, দ্বারিক ঘোষের ব্যাটা, দেখিয়া লুবো তোকে, কিংবা দ্বারিক ঘোষের ব্যাটারা সামনে আয় না রে, দেখি একটিবার! সরাসরি জারজ না বলে, দ্বারিক ঘোষের ব্যাটা। কিন্তু গালিগালাজ নয়, সারা মাগুরিয়া গ্রামের প্রায় প্রত্যেকেই বিশ্বাস করে যে চুহা দ্বারিক ঘোষেরই অবৈধ সন্তান। চুহার মা ভুটি ছিল ঘোষেদের বাড়ির গোয়াল-কাড়নী। বিধবা হওয়ার বছর তিনেক বাদে সে অন্তঃসত্ত্বা হয়। দ্বারিক ঘোষই অনুগত লোক মারফৎ ওষুধ-বিষুধ, জুড়ি-বুটি আনিয়ে খাইয়েছিল ভুটিকে গোপনে। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। গর্ভ নষ্ট হল না। তার বদলে ন-মাসে ভূমিষ্ঠ হল চুহা। লালচে স্যাঁতা-পড়া শরীর। সরু সরু হাত-পা। মানুষ নয়, যেন ইঁদুরের ছা-টি। অর্থাৎ চুহার ছানা। কি বললু? চুহার ছানা? পুরুষসিংহ দ্বারিক ঘোষ, তাকে চুহা বলা? বটেই তো। অতএব চুহার ছা নয়, তবে চুহা' সিংহের শাবক চুহা

এ দুনিয়ায় কোনো কথাই গুপ্ত থাকে না। কাজেই চুহার এই জন্মবৃত্তান্ত একান্ত অনুগত মানুষটি তার একান্ত অনুগতকে, সে আবার তার একান্ত অনুগতকে বলতে বলতে, দেখা গেল, কেমন করে যেন মানুষজন জেনে গেছে চুহার জন্মের ইতিহাস। তার চামচিকার মতো গড়নের প্রেক্ষাপট। বড় হয়ে চুহাও জেনেছে তার জন্মকাহিনী। ঠাট্টা-তামাশার পথ ধরে সে সংবাদ চুহার কানেও সেঁধিয়েছে একদিন। এখন চুহাও বিশ্বাস করে, তার জন্মদাতার নাম দ্বারিক ঘোষ। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার এটাও অজানা নেই যে, তাব জন্মকে ঘিরে একটা দুঃসহ লজ্জার ব্যাপার আছে। পাট্টা জমি বিলির

সময় কিংবা ভোটার লিস্ট তৈরির সময় বাবার নাম শুধোন বাবুরা। চুহা এক নিঃশ্বাসে জবাব দিতে পারেনি কোনোদিনও। ওয়াকিবহাল মানুষ হেসে উঠে শুধোয়, বাবার নাম কি লিখব রে? শ্রীকান্ত দাস না কি দ্বারিক ঘোষ?'

চুহা খেপে ওঠেনি। বরং নির্বিকার জবাব দিয়েছে, 'যা হউ একটা লিখিয়া লউন।'

শেষ অবধি দ্বারিক ঘোষের নাম অবশ্যি লেখে না কেউ। পিতা ঈশ্বর শ্রীকান্ত দাস।

রসিক ব্যক্তি হয়তো সঙ্গে সঙ্গেই ফুট কেটেছে, 'লিখিয়া দউন, চুহার জনমের তিন বছর আগেই ঈশ্বর।'

চামচিকার মতো শরীরেও রাগ-রোষ, মান-অপমান থাকেই। চুহাব খুদে খুদে কানদুটি নিঃশব্দে পুড়তে থাকে নিশ্চয়ই। তবে এ নিয়ে বাগ-বিতণ্ডায় যেতে কেউ কখনো দেখেনি ওকে।

এমন সৃষ্টিছাড়া প্রক্রিয়ায় যার সৃষ্টি, অমন কিম্ভূতকিমাকার যার অবয়ব, এমন অস্বাভাবিক যার আচার-আচরণ, মানুষ তাকে ছেড়ে কথা কইবে না। মানুষ বড় বিচিত্র জীব। সর্বদাই মুঠোর মধ্যে লুকিয়ে রাখে লবণ। অন্যের ক্ষতস্থান দেখলেই ছুঁড়ে দেয়। অন্যকে পীড়ন করেই তার পৈশাচিক আনন্দ। শিশুকাল থেকে আজ অবধি চুহা মানুষের ওই আনন্দের শিকার। খেতে-বিলে, হাটে-বাজারে, মেলা-পার্বণে ওকে সারাক্ষণ সবাই খেপায়। চিমটি কাটে। ওর জন্মরহস্য নিয়ে কুৎসিত ইঙ্গিত করে। ওর আকার-অবয়ব নিয়েও। কোঁতাইগড়ে মেলা বসেছে। তৃতীয় দিনে মেলায় গিয়েছে চুহা। খাটো ধুতি, উদোম গা। ওকে দেখেই মানুষ দাঁত গিজুড়ে হাসে, 'কি বে চামচিকা, মেলা যে দেখবি, ট্যাঁকে পইসা কত আছে?'

'অর ট্যাঁকে পইসার অভাব নাই হে।' সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে কোনো স্যাঙাৎ, 'যাব-তার ব্যাটা উ? দ্বারিক ঘোষ নাম। অমন একটা মেলা একলাই কিনিয়া লিতে পাবে।'

ষড়ানন চন্দের গুড়মহালে বলদ দিয়ে আখ-মাড়াই চলছে। পাশে বিশাল চুলোর ওপর লম্বাটে ডেক। আখের রস ফুটছে। গুড়মহালের চারজন কর্মচারীর মধ্যে চুহা একজন। বয়সে তিরিশ পেরিয়েছে। কোল-কুঁজো বাঁটকুল চেহারা। মুণ্ডুখানা যেন ঘাড়ের মধ্যে সেঁধিয়ে বসে গেছে। মনে হয়, লম্বা হওয়ার মুহূর্তে নরম মাটির শরীরটাকে মাথায় চাপ দিয়ে চেপে দিয়েছে কেউ। পাঁচ ফুটের নীচে হাইট। দাড়ি-গোঁফহীন মাকুন্দ। দাউদ-চরা গা, গরমকালে নোনা ঘাম পেলে লাউডগার মতো চারিয়ে যায় সর্বাঙ্গে। বিয়ে দিয়েছিল মা। বউ ভেগেছে। দয়ালরা বউ পালানোর দুটো ব্যাখ্যা দেয়।

ত্রৈলোক্য প্রধানের বাপের মাথায় কোঁকড়ানো চুলের বাহার। তিলকদাসরা চুহার কোঁকড়ানো চুলের জন্য ত্রৈলোক্যের বাপকেই দায়ী করে। ত্রৈলোক্য সেটা শুনে মজাই পায়। দ্বারিক ঘোষের পাশে নিজের বাপকে একাসনে বসাতে পেরে গর্ব হয়। বলে, 'হইত্যেও পারে। মোর বাপ ভুতু পড়ধান তো সারা গাঁয়ে রাত-পাহারা দিত। রাতের আঁধারে সে কুন ঘাটে জল খাইত্যো, তাব ঠিক কি?'

বলতে বলতে চুহার বগলে আচমকা খোঁচা দেয় ত্রৈলোক্য। চুহা স্প্রিং-এর মতো লাফিয়ে ওঠে। দুর্বাসার মতো চোখ পাকিয়ে বলে, 'ভালো হবে নি ক। ভীষণ খ্যারাব হয়্যাবে কিন্তু! চুহার রাগ, কঠিন রাগ!'

নিরাপদ দূরত্বে খাড়া হয়ে হি-হি করে হাসে ত্রৈলোক্য। চুহার বগলে-পেটে যে বেজায় কাতুকুতু সেটা ওদের জানা। সুযোগ পেলেই তিনজনে মিলে প্রবলভাবে কাতুকুতু দেয়

ওকে। হাসতে হাসতে, কাঁদতে কাঁদতে, ত্রাহি-ত্রাহি রব তোলে চুহা। ফাঁসে পড়া নেংটি-ইঁদুরের মতো ছটফটায়। দু-চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। মাঝে মাঝেই এটা হয়। এই বিপজ্জনক মস্করাটিকে তাই যমের মতো ভয় করে চুহা। এই ধরণের মস্করার সামান্যতম সম্ভাবনা দেখা দিলেই সে তাই ভয়ানক হিংস্র হয়ে ওঠে। ত্রৈলোক্যরাও তাই সব রকমের রং-তামাশার পর যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দেয় কাতুকুতু দিয়ে।

'কিন্তু এক শরীরে দ্বারিক ঘোষ আর ভূতনাথ প্রধানের কীর্তির লক্ষণ বইবে কি করিয়া একটা মানুষ?' দয়ালরা পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে আসে।

'ক্যানে?' তিলকদাস প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেশ করে, 'দোআঁশলা কুত্তা তেবে কি করিয়া হয়? সারা শরীর দেশী, লেজ আর কানটি বিলাতি। কালা-ধলা-লাল, তিন রং এক অঙ্গে, কি কইর‍্যা হয়?'

কথাটা কতখানি যুক্তিসংগত হল অত ভাবনা-চিন্তায় রুচি নেই কারো। অন্য দু-জন একযোগে বলে ওঠে, 'ঠিক কথাই তো।'

'সত্যি রে চুহা, তুই এক অঙ্গে ধারণ করছু কত লোকের অবয়ব!' বলে ওঠে দয়াল পাখিরা।

একগোছা আখের ছিবড়ে আখশাল থেকে গুড়শালের দিকে নিয়ে আসছিল ত্রৈলোক্য। চুলার মুখে ছুঁড়ে দেবার অছিলায় ছুঁড়ে দেয় চুহার ওপর। ত্রৈলোক্য একটু আগে ওকে খোঁচা মেরেছে। তার ওপর আখের ছিবড়ে চাপাল। চুহা অকস্মাৎ বেজায় খেপে ওঠে। উঠে দাঁড়িয়ে অশ্লীল গালাগাল জোড়ে। ডেকের মধ্যে ফুটন্ত আখের রস। লোহার বিশাল ডাবুখানা ফুটন্ত আখের রস থেকে তুলে নিয়ে তাড়া করে ত্রৈলোক্যকে। ত্রৈলোক্য ভীষণ সর্তক ছিল। বিপদের আঁচটি পেয়েই সে চক্ষের পলকে উঠে পড়ে চালতা গাছটার ডালে। অপর দু-জনও নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখে।

গাছের তলায় ডাবু হাতে চুহা অনেকক্ষণ গাল পাড়ল ত্রৈলোক্য আর তার বাপের উদ্দেশে—'শালা, নামিয়া আয় রে, তোর রক্তে সিনান করি আজ।'

চামচিকার মতো শরীরখানা নিয়ে অমন আস্ফালন করতে দেখে দয়ালরা তো হেসেই খুন।

চালতা গাছের নিরাপদ উচ্চতায় বসে ত্রৈলোক্য বলে, 'শুধু মাথার চুল নয়, চুহার রাগটিও মোর বাপের মতন। অমনি পিতল-চুঁয়া রাগটি ছিল বটে মোর বাপের।'

হো-হো করে হাসতে থাকে দয়াল পাখিরা আর তিলকদাস। বেজায় খেপে রয়েছে চুহা। ডাবুখানা প্রবলভাবে নাড়তে নাড়তে সে বলে, 'শালা, নামিয়া আয় গাছ থিক্যা। তোর বাপ গাছের তলায় ডাবু হাতে দাঁড়িয়া আছে। নামিয়া আইসিয়া গড় কর্।'

চুহা রয়েছে গাছের তলায়। ত্রৈলোক্য মগডালে। গালিগালাজের তুফান ছুটছে চুহার মুখে। ওদিকে ফুটন্ত গুড়ে গাদ বেরোচ্ছে। তুলে ফেলে দেওয়া দরকার গাদগুলো। এ কাজ ত্রৈলোক্য আর চুহার জন্য বরাদ্দ। তিলকদাস আর দয়াল পাখিরা থাকে আখ-মাড়াইয়ের কাজে।

'গুড়ের গাদ তুলিয়া দে রে, শালা।' তিলকদাস চেঁচিয়ে বলে চুহাকে, 'গুড় খ্যারাব হয়্যালে ষড়ানন চন্দ তোর রক্তে সিনান করবে।'

চুহা তাও খাড়া থাকে গাছের তলায়। গোঁয়ারের মতো তাকায় ত্রৈলোক্যর দিকে। একসময় ধীরে ধীরে পা বাড়ায়। বলে, 'ছাড়িয়া দিলি আজ। বাঁচিয়ালু তোর বাপের

হাত থিক্যা।'

ডাবু হাতে চলে যায় চুহা। গাদ তুলতে শুরু করে লোহার ছানতা দিয়ে। একটু বাদে গাছ থেকে নেমে আসে ত্রৈলোক্য। সতর্ক পায়ে এগোতে থাকে ডেকের উলটোদিকে। দুজনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গুড়ের গাদ তুলতে থাকে। কাজের ফাঁকে হিংস্র চোখে তাকায় চুহা।

ওর মনোভাবটা আঁচ করেই ত্রৈলোক্য সাবধান করে দেয়, 'গাছের তলার ঝগড়া গুড়শালে লিয়া আইসিস না চুহা। তিনজনে ধরিয়া এমন কাতুরকুতুর দিবো যে—।'

ওতেই মন্ত্রের মতো কাজ হয়। চুহা আর বাড়াবাড়ি করে না। আখশালের কাজ চলতে থাকে।

দুই

কাল রাতে নাপিত বউয়ের ঘরে চোর ঢুকেছিল।

কানু পরামানিক মরেছে বছর কয় আগে। রেখে গিয়েছে আগুনের খাপরার মতো বউটিকে। সঙ্গে গোটা দুই বাচ্চা। নাপিত-বউ মাগুরিয়া গাঁয়ের একপ্রান্তে বাস করে। চোর নাকি সিঁদ কাটবার উদ্‌যোগ করছিল, ঠিক সেই সময়ে কোঁতাইগড় থেকে যাত্রা শুনে ফিরছিল গাঁয়ের জনাকয় ছোকরা। ওদের চোখে দৃশ্যখানা পড়তেই চিৎকার শুরু করে। চোর একলাফে কাঁচা বেড়া ডিঙিয়ে হাওয়া। সকাল থেকে সেই আলোচনায় মাগুরিয়া সরগরম।

ষড়ানন চন্দের গুড়শালে কাজ করতে করতে সেই আলোচনাই চলছিল।

ত্রৈলোক্য বলে, 'চোর কী লিতে আইস্‌বে হে? কী আছে অর ঘরে? পাঁচ ঘরে নখ-চাম কাটিয়া পেট ভরায়, চোর আইস্‌বে অর ঘরে! এ অন্য বেপার।'

ত্রৈলোক্যর ইঙ্গিতটা আঁচ করতে পারে অন্যরা। দয়াল পাখিরা বলে, 'বল কি হে? বউটা তো ভালো ছিল, শুনি। আজকাল উসব কামও শুরু কচ্ছে নাকি?'

'কি করবে বল?' ত্রৈলোক্য বিজ্ঞজনের মতো ভাব করে, 'অভাবে স্বভাব নষ্ট। বইস তো বেশি নয়।'

এদের তিনজনের গুলতানির মধ্যে চুহা ঢোকে না কোনদিনও। ওরাও ঢোকায় না। চুহা একমনে জ্বাল দিচ্ছিল চুলায়। বগলের দাদ চুলকোচ্ছিল অলস হাতে। মাঝেমাঝেই দাদ চুলকোয় চুহা। কারণে-অকারণে। ওর দিকে আড়চোখে তাকায় ত্রৈলোক্য। ঠোঁটের কোণে ঝিলিক মারে দুষ্টু হাসি। বলে, 'কাল যে লোকটা লাপিত-বউয়ের ঘরে ঢুকছিল, অকে নাকি অনেকটাই চুহার মতোন দেখতে।'

চুহা সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে ওঠে, 'তাইলে উ শালা তোর বাপ ছিল নির্ঘাৎ। তোর বাপকেও তো অনেকটা চুহার মতোন দেখতে। কঁকড়া-কঁকড়া চুল—।'

'না রে চুহা।' তিলকদাস কথা ঘোরায় অন্য খাতে, 'তুই যাবি ক্যানে? রাত দুফোরে মায়ামানুষের পাশে গিয়া তোর লাভটা কি?'

'ঠিক কথা।' দয়াল পাখির পোঁ ধরে, 'তোর নিজের বউটা তাইলে ঘর করলো নি ক্যানে?'

এ-ও চুহার এক বড়সড় কষ্টের থান। বিয়ের পর বউটা ছ-মাসের বেশি থাকেনি।

নানাজনে নানা ব্যাখ্যা দেয়। দয়ালের দলও সুযোগ পেলেই লবণ ছেটায় সেই ঘায়ে। আখমাড়াই কলে বলদের পিছু পিছু ঘুরছিল তিলকদাস। সহসা সে শুধোয়, 'এ চুহা. তোর বউ ক্যানে বাপের দোরে?'

'শালাদিগের ভোগে দিয়া আইলু নিজের বউকে!' টিপ্পনী কাটে দয়াল পাখিরা, 'তুই তো এক উজবুক রে!'

ত্রৈলোক্য একবোঝা আখের ছিবড়ে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল চুলার কাছে। মাঝপথেই থেমে গেল সে। গুহ্য কথা ফাঁস করবার ভঙ্গিতে বলল, 'চুহার বউ ক্যানে পালিয়াল-অ, জান? চুহা তো জুয়ান বইস্তক বিছানায় মুততো। রাইতে বউয়ের গায় মুতিয়া দিছলো শালা। বউ তো রাত পুহাতেই পালিইতে চায়। চুহার মা বহুত বিনতি কইর‍্যা বউকে আটকায়। পুরুষোত্তমপুর থিকে টোটকা ওষোধে ছ-মাসেও কাজ হইল নি। চুহা রোজ রাইত্যে বউর গায় মুত্তিয়া ভাসিয়া দেয়। আরো থাকে?'

ত্রৈলোক্যর গপ্পোটা এতক্ষণ অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে শুনছিল চুহা কান পেতে। বগলের আশেপাশে হাতখানা থেমে গিয়েছিল। সহসা নখে-চামে খচর-খচর আওয়াজ তোলে চুহা। উন্মাদের পারা চেঁচিয়ে ওঠে, 'শালা, বউর গায় মুতিনি রে, মুতছি তুদের মুহে।'

ঝগড়াটা নিজের দিকে টেনে নেয় দয়াল পাখিরা। সমঝোতার গলায় বলে, 'তোর সাথে ইলচি কচ্ছে রে চুহা। বিছানায়-মুতা রোগ মকরামপুরের সাধুর ওষোধে তিনদিনেই সারিয়া যায়। অটা কিছো কাজের কথা নয়। আসলে, বউ ভাগছে অন্য কারণে।'

ত্রৈলোক্য-তিলকদাস তাকায় দয়াল পাখিরার দিকে। দয়ালের কথায় আরো গাঢ় রহস্যের গন্ধ। দূরে বসে চুহাও উৎকর্ণ হয়। দয়াল পাখিরা গম্ভীর গলায় বলে, 'শালা ছ-মাসের মধ্যেও হেতার তুলতে পারেনি। বলির পাঁঠা ছ-মাস ধরিয়া চিল্লিয়া চিল্লিয়া পা বাড়ালো বাপের ঘরের দিকে।'

তড়াক করে উঠে দাঁড়ায় চুহা। দয়াল পাখিরার দিকে অত্যন্ত অশ্লীল ভঙ্গিমায় দু-পা এগিয়ে আসে। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলে, 'শালা, তোর মা-কে লেই।'

আজ ডোজটা কিঞ্চিৎ কড়া হয়ে গেছে নির্ঘাৎ। নচেৎ দয়াল পাখিরার মাকে নিয়ে এমন অশ্লীল উক্তি এর আগে করেনি চুহা।

দয়ালের ঝাঁ করে রাগ চড়ে গেল। 'কি কইলি? মোর মাকে লিবি? মোর মা তোর মা-র মতোন ইজমালি গো-চর, তাই না? যে খুশি চরিয়াবে দু-ঘড়ি?' বলতে বলতে পায়ে পায়ে চুহার দিকে এগোতে থাকে দয়াল পাখিরা, 'মোর মা-কে কি কইর‍্যা লিবি, দেখি একবার!'

হিংস্র চুহা ততক্ষণে কিঞ্চিৎ আতঙ্কিতও বটে। চুলার ধারে উঠে দাঁড়ায় সে। ভয়-ভয় চোখে তাকায়। ভাঙা গলায় বলে, 'ভালো হবেনি ক। গরম গুড় ছিটিয়া দুবো। বুঝবি তখন। ভালো হবেনি বলতিছি—।'

চুহার সাবধানবাণীকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না দয়াল। সে পায়ে পায়ে এগোতে থাকে। দুরত্ব যত কমে, ততই ভীত ও হিংস্র হয়ে ওঠে চুহা। মুহূর্তে ভয়টাই জয়ী হয়। ডাবুখানা ডেকের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে সে পায়ে পায়ে পেছোয়। ততক্ষণে মজা পেয়ে গেছে ত্রৈলোক্য আর তিলকদাস। তারাও পেছন থেকে এগিয়ে আসতে থাকে চুহার দিকে। চুহা পিছু ফিরে এক লহমায় দেখে নেয় ওদের। দু-দিক থেকে সাঁড়াশি আক্রমণ এগিয়ে আসছে দেখে সে দৌড় মারবার জো করছিল, তার আগেই লম্ফ দিয়ে ওর হাতখানা

ধরে ফেলে দয়াল। বলে, 'শালা, তোর যন্তর দেখবো।'

পেছন থেকে ততক্ষণে ওকে জাপটে ধরেছে তিলকদাস আর ত্রৈলোক্য। এমন সঙ্কটে বহুদিন পড়েনি চুহা। সে হাত দুটোকে চামচিকার পাখনার মতো ঝাপটাতে থাকে। পা-দুটো লটর-পটর করে আছড়াতে থাকে।

শেষ মুহূর্তে আকাশ-ফাটানো আর্তনাদ তোলে চুহা, 'মারিয়া ফেলল গো—। কে আছ, বাঁচাও—।'

ওর চিল-চিৎকারে অন্যদের সাথে স্বয়ং ষড়ানন চন্দ ছুটে আসে গুড়শালে।

'কি? কি হইছে?'

চুহাকে ততক্ষণে ছেড়ে দিয়েছে ওরা। হাসছে। হাঁফাচ্ছে। তিলকদাস বলল, 'কিচ্ছু না গো। চুহার সাথে টুকচার মস্করা—।'

চুহা তখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে সবাইকে। সারা শরীর তার ঠকঠকিয়ে কাঁপছে বাঁশপাতার মতো।

সেই বিকেলে আখশাল ছেড়ে ষড়ানন চন্দের বাড়িতে গেল চুহা।

'এক দিনের ছুটি চাই।'

'ছুটি! এ সময়?' ষড়ানন চন্দ যেন আকাশ থেকে পড়ে, 'আখশাল চলছে পুরাদমে। এখন ছুটি লিবার সময়?'

গোঁয়ারের মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকে চুহা। ষড়ানন চন্দ বিষদৃষ্টিতে তাকায়, 'ছুটি লিয়া কুথা যাবি?'

চুহা বিড়বিড়িয়ে জবাব দেয়, 'বউকে আনতে যাব।'

চমকে ওঠে ষড়ানন চন্দ। বউ! আরে হাঁ-হাঁ, চুহা যেন বছর-কয় আগে একটা বিয়ে করেছিল। আগাম নিয়েছিল। ছুটি নিয়েছিল। তারপরে যে কী হল, সেটা আর খেযাল নেই কারো। কোথায় যেন বিয়ে করেছিল চুহা?

চুহা ফিরল শ্বশুরঘর থেকে। একলাটি। বিষণ্ণ মুখে ফের গুড়শালের কাজে লাগল সে। দয়ালরা ওকে নিঃশব্দে লক্ষ করে। পরশুদিন বিকেল, কাল সারাটা দিন, চুহার বিরহে মুহ্যমান ছিল তিনজনেই। ওকে দেখে এখন তাই পুলকের বান ডেকেছে দয়ালদের মনে।

'বউকে লিয়া আইলি রে, চুহা?' তিনজনে কলকলিয়ে ওঠে একসঙ্গে।

চুহা চুপ। চালতা-গাছের শরীরের একপাশ ভরে গেছে সোনালি রোদ্দুরে। প্রতিটি ডালে, পাতায় সোনা রং। টুপটুপিয়ে শিশির ঝরে পড়ছে পাতা চুইয়ে। চুহা আনমনে তাকিয়ে থাকে সেদিকে। বগলের আশেপাশে মৃদু চিড়বিড়ানি। চুহা অগ্রাহ্য করে।

'শ্বশুরদোরে কি খাইলি রে চুহা?' তিলকদাস শুধোয়, 'খাসিটাসি কাটলো নাকি শালারা?'

'কাটতেই পারে।' ত্রৈলোক্য বলে, 'জামাই গেছে কতদিনের বাদে!'

'খাসি কাটবে!' দয়াল পাখিরা এবার সরাসরি ব্যঙ্গ করে, 'এ শালার পেটে গোটা-কয় লাথ মাচ্ছে অর বউ। অতেই পেট ভরিয়া গেছে অর।'

চুহা নিঃশব্দে হজম করে যায় ওদের বাক্যবাণ। রা-টি কাড়ে না। নিশ্ছিদ্র কাজের

মধ্যে ডুবে গিয়ে রেহাই পেতে চায় ওদের হাত থেকে। দেখেশুনে দয়ালদের রাগ হয়। অপমান হয়। জিদ চেপে যায় মাথায়। ওরা চুহার চুল টেনে দেয়। কান মুচড়ে দেয়। পেছন থেকে ঠেলা মেরে ফেলে দেয় ধুলোয়। চুহা নির্বিবাদে হজম করে সব। দয়ালের দল তাজ্জব মানে। চুহার হল কি? এ চুহা, তোর হইলো কি?

চুহা বসে থাকে চালতা-তলায়। থিরপলকে কাঠ হয়ে যায়। হাতের আধপোড়া বিড়ি নিভে যায় কখন। চুহার হুঁশ থাকে না।

তিন

শীতকালে তালপুকুরের জল জমে বরফ। মধ্যিখানে অতল গহীর। দুপুরবেলায় পুকুরপাড়ে চান করছিল চারজনায়। পাথরে বসে গা ঘষছিল চুহা। একমনে তাকিয়েছিল সামনে। দিঘির জল ভেদ করে সে দৃষ্টি বিঁধেছিল গিয়ে আকাশের গায়ে। শীতের ঝকঝকে নীল আকাশ। তুলোপেঁজা মেঘে হরেক ছবি, আলপনা, কারুকার্য। চুহা নিবিষ্টমনে দেখছিল বুঝি।

আজ সকাল থেকে মনটা বড় খারাপ। বউয়ের মুখখানা বারে বারে ভেসে উঠছে মনের ঘষা আয়নায়। বুকের মধ্যে মোচড় লাগে।

বউটা চুহার সামনেই আসেনি এবারে। শালারাই চুহাকে ভাগিয়ে দিয়েছে উঠোন থেকে। তর্ক-বিতর্কের ফাঁকে দু-একবার ধুপ-ধাপ হেঁটে গেছে বউ। দু-এক ঝলকে ওকে দেখেছে চুহা। আরো ঠাসবুনোট হয়েছে ওর শরীর। আরো রহস্যময়।

একদৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়েছিল চুহা। হাতদুটো যন্ত্রের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিল সারা শরীরে। দয়ালের দল অল্প তফাতে বসে কাক-নজরে লক্ষ রাখছিল ওকে। গা ঘষাঘষির শেষে, যেই না চুহা নেবেছে কোমর অবধি জলে, অমনি ঝম্প দিয়ে পড়ল ওর ওপর। টেনে টেনে নিয়ে গেল গভীর জলে। চুহার সঙ্গে এটাও ওদের এক প্রিয় খেলা। জলের মধ্যে হাবুডুবু খেতে খেতে চুহা গাল পাড়বে, মিনতি জানাবে, আর্তনাদ তুলবে, হাতে-পায়ে ধরবে। ওদের মজা বেড়ে যাবে ততই। প্রাণের ভয়ে চুহা যতই পাড়ের দিকে চলে আসতে চাইবে, ওরা ততই ঠ্যাং ধরে টেনে নিয়ে যাবে গভীর জলে। নাকানি-চোবানি খেয়ে যখন হেঁচকি ওঠা শুরু হল, তখন কিছু কথা কবুল করিয়ে তবেই চুহাকে ছাড়ান দেবে ওরা।

'বাপের নাম বল।'

'দ্বারিক ঘোষ।'

'আরেক বাপের নাম?'

'ভুতু পড়ধান।'

'মদন ঘোষ তোর কে হয়?'

'ভাই।

'তৈলক্য পড়ধান?'

'ভাই!'

'বউ আইসে কি ক্যানে?'

'যন্তর খ্যরাব।'

হো-হো করে হেসে ওঠে তিনজনায়। যা শালা, পাড়ে যা।

পাড়ে পৌঁছে যেন প্রাণ ফিরে পায় চুহা। দৌড় লাগায় মনিবের বাড়ির দিকে। পেছন থেকে দয়াল পাখিরা বলে ওঠে, 'শালা, বলব রে আইজ মদন ঘোষকে। ভাই হওয়াটা বার করবে তোর!'

দৌড়ুনো অবস্থায়ও দয়াল পাখিরার কথাগুলো শুনে বুকখানা কেঁপে ওঠে চুহার। মদন ঘোষ কথাটা শুনতে পেলে পিঠের চামড়া তুলে নেবে। কিন্তু না বলে উপায় ছিল নাকি চুহার? প্রাণ বাঁচাতে বলেছে। নইলে জলের মধ্যে আরো চোবাতো শালারা।

মনিবের বাড়িতে ভাত খেতে বসল ওরা চারজনে। ইতিমধ্যেই বাগান থেকে গোটা বিশ-পঁচিশ ধানিলঙ্কা তুলে শিলনোড়ায় আচ্ছাসে পিষে নিয়েছে ত্রৈলোক্য। লুকিয়ে রেখেছে হাতের মুঠোয়।'

'চুহা, নুনের খুরীটা আন্ কুলুঙ্গী থেকে।' তিলকদাস বলে, 'যা ভাই, সোনা আমার।'

চুহা একটুক্ষণ গোঁ মেরে বসে থাকে। একসময় বারান্দার ও-প্রান্তে চলে যায় নুন আনতে। তৈরি ছিল ত্রৈলোক্য। নিমেষের মধ্যে লঙ্কাবাটাগুলো মিশিয়ে দেয় চুহার ডালের বাটিতে।

নুন আনতেই ভাত ভাঙে চারজনে। ডাল দিয়ে পরিপাটি করে ভাত মাখে চুহা। বড়সড় একখানা গেরাস মুখের মধ্যে গুঁজে দিয়েই আর্তনাদ করে ওঠে সে, মা-গো, মরিয়ালি গো—। চুহা না পারে ভাতগুলো ফেলতে, না পারে গিলতে, না পারে চিবোতে। জিভের মধ্যে ঘা। ঘা-গুলো ধানিলঙ্কার সংস্পর্শে এসে আগুনের মতো জ্বলতে থাকে। চুহা কোঁ-কোঁ জল খায়, সু-সু আওয়াজ তোলে।

অতখানি নীরবতা সন্দেহজনক। তাই মুখ খোলে দয়াল পাখিরা, 'অত সু-সু করু ক্যানে রে? অমন কিছো ঝাল হয়নি তরকারি।'

ষড়ানন চন্দের বউ পরিবেশন করতে এসে চুহার অবস্থা দেখে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে। বলে, 'একঘর লোক খায়্যাল, মায় বাচ্চাগুলোও, কাকেও ঝাল লাগল নি, তোকে ঝাল লাগিয়াল-অ? চুহাটা ঢঙ করতে ওস্তাদ!'

জবাব দেবে কি, চুহার তখন প্রাণান্তকর অবস্থা। উঠে দাঁড়িয়ে দৌড় মারল পুকুরঘাটের দিকে।

ত্রৈলোক্য বলে, 'তুমার রান্নার সুনাম বউদি, যে একবার খাইছে, সে আজীবন নাম করে। এ শালা কুত্তার জাত। সেই বলে না, কুকোরকে ঘি-ভাত, কুকোর কয়, কি ভাত?'

নিজের রান্নার প্রশংসায় স্বয়ং পার্বতীও বশ। ষড়ানন চন্দের বউ চুনোমাছের তরকারির থেকে চুহার ভাগখানা ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। শেষমুহূর্তে ঘুরে দাঁড়াল, 'লে, তোরাই খায়া লে এটা।'

তিনজনে নিঃশব্দে হাসি বিনিময়ে করে। চুহা তখন পুকুরঘাটে হাঁটু-জলে দাঁড়িয়ে মুখভরতি জল নিয়ে কুলকুচো করে চলেছে সমানে। দুচোখ জলে ভরে গ্যাছে ঝালের চোটে।

বিকেলবেলায় সত্যি মাত্রা ছাড়াল দয়াল পাখিরার দল।

মুখখানা ফুলে গেছে চুহার। জিভের গা দগদগে হয়েছে। মুখ জ্বলছে, পেট জ্বলছে। তাও মাথা নিচু করে কাজ করে চলেছে সে।

দেখে খিকখিক করে হাসতে থাকে দয়ালের দল। বলে, 'মুর্‌লা মাছের টকটা যা হইচ্‌লো আজ! চুহা রে, অমন টক তুই বাপের জন্মেও খাউ নি।'

'চুহা খাবে মুর্‌লা মাছের টক্‌!' তিলকদাস ফোড়ন কাটে, 'শ্বশুরঘরের মাংস-পুলাও এখনো অর পেটে গজগজ কচ্ছে। কি বে চুহা ঠিক না?'

চুহা জাবাব দেয় না। মুখে কুলুপ এঁটে কাজ করে যায় সে।

চুহার এই জবাব না দেওয়াটা দয়ালদের কাছে চিরদিনই অসহ্য।

ত্রৈলোক্য বলে, 'কি কি খাইলি রে চুহা, শ্বশুরদোরে? মাছমাংস, পুলাও-কাবাব... বল্‌ না রে, শুনি।'

আর সইতে পারে না চুহা। বুকের মোক্ষম থানে খোঁচা খেয়ে ফেটে পড়ে রাগে। বলে, 'বলিয়া কি হবে? আজ দুফোরে তালপুকুরের পাড়ে রাখিয়া আসসি, খায়্যা লিবি যা।'

'বটে রে! এত বড় কথা! শালাকে আজ বাঁদর-লাচ লাচাইব। ধর তো হে।' বলেই ত্রৈলোক্য এগোতে থাকে চুহার দিকে।

বিপদ বুঝে তড়াক করে উঠে দাঁড়ায় চুহা, 'ভালা হবেনি বলছি। গরম গুড় ঢালিয়া দুবো গায়। আয় দেখি কাছে।'

'কি লিত্যিদিন গরম গুড় ঢালিয়া দিবি বলিয়া ভয় দেখাউ রে শালা?' দয়াল পাখিরা লম্ফ দিয়ে এগিয়ে আসে। গুড়ের ডাবুখানা চক্ষের পলকে কেড়ে নেয় চুহার হাত থেকে। তারপর তিনজনে মিলে জাপটে ধরে ওকে প্রবলভাবে কাতুকুতু দিতে থাকে।

দয়াল পাখিরার মনে হয়তো সত্যিই তেমন ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু চুহার ছটফটানির চোটে বাঁ-হাতের গুড়ের ডাবু থেকে খানিকটা গরম গুড় পড়ে যায় চুহার উদোম পিঠে। গরম গুড় বলে কথা। পলকের মধ্যে চুহার পিঠের চামড়া সেদ্ধ হয়ে কুঁচকে যায়। চুহা হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে, 'মারিয়া ফেলল গো—, বাঁচাও—।'

ছুটে আসে লোকজন। চুহার পিঠের অবস্থা দেখে বিস্ময়ে থ হয়ে যায়। দয়ালরা নানা রকম কৈফিয়ত দিয়েও সামাল দিতে পারে না পরিস্থিতি। বিজাতীয় আওয়াজ তুলে কেঁদে চলে চুহা। মৃত্যুমুখী শুয়োরের গোঙানির মতো সে আওয়াজ।

চার

গেল সন্ধেয় বিচার বসেছিল মাগুরিয়া গাঁয়ে।

আসামি তিনজন। চুহা বাদী।

গত পরশুই পার্টির কানে গিয়েছিল পুরো ঘটনাটা। কানাঘুষোয় অনেকদিন ধরে পার্টির নেতারা শুনছিল চুহার লাঞ্ছনার বৃত্তান্ত। সারাক্ষণ চুহাকে পীড়ন-লাঞ্ছনা করে তিনটে শয়তান। কখনো কখনো তা মাত্রাও ছাড়ায়। তা বলে একটা মানুষের পিঠে বিনা কারণে গরম গুড় ঢেলে দেওয়া! শরীরে তিলমাত্র দয়া-মায়া থাকলে এসব করে কেউ? চুহার মা হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে গিয়েছিল পার্টির নেতা জগত্তারণ দে-

র কাছে। তারই অভিযোগক্রমে এই বিচারের আয়োজন।

দয়ালের দল কিঞ্চিৎ মুহ্যমান ছিল কাল সকাল থেকেই। তাদের নিপীড়নের প্রমাণ দগদগে হয়ে রয়েছে চুহার পিঠময়। সাক্ষীও লাগবে না এটা প্রমাণ করতে। হাতে-পায়ে, পেটেবুকে হলেও একটা সুযোগ নেওয়া যেত। বলা যেত, ও শালা গুড় ঢালতে গিয়া হাত ফসকিয়া নিজের গায় ঢালিয়া দিছে। এখন আমাদেরকে দোষী কচ্ছে। কিন্তু এসব বলা যাবে না। গুড় পড়েছে পিঠে। হাজার অসতর্ক হলেও কারো নিজের পিঠে গুড় পড়বে না।

'পিঠে ক্যানে ফেলতে গেলে বলো তো, দয়ালদা?' ত্রৈলোক্য ব্যাজার মুখে বলেছিল, 'এ এক উদমা ঝঞ্ঝাটে পড়া গেল!'

'মুই কি দেখিয়া বুঝিয়া ফেলছি রে? ধস্তাধস্তির মধ্যে, অসাবধানে—।'

'হাঁ-রে চুহা, নিজেদের মধ্যেকার বেপার, তাকে বিচারের থানে টানিয়া লিয়া গেলি তুই?' তিলকদাস চুহার বিবেকে সুড়সুড়ি দেবার চেষ্টা করে, 'এক মহালে কাজ করি চারজনায়। রং-তামাশা টুকে-আধে করিয়া ফেলি নিজের লোক ভাবিয়া। সেই কথাটা বুঝলিনি তুই?'

সেবার তোর হাত কাটিয়াল-অ, দয়ালদা সাঙে-সাঙ চুন আর সোডা আনিয়া লেপিয়া দিল কাটা থানে। মনে পড়ে না তোর?'

মনে পড়ে না ফের? কাটা জায়গায় চুন-সোডা! একটি পুরো বেলা কাটা পাঁঠার মতো ছটকেছিল চুহা।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' ত্রৈলোক্যর গলায় চাপা হুমকি, 'বিচার বুসবে একদিন। আমাদের সাথে তোকে কাজ কত্তে হবে বারোমাস-তিরিশ দিন। বিচারের থানে উলটাপালটা কথা বলিয়া পার পাবি তুই?'

'তালপুকুরের সিনান কত্তে যাবিনি?' তিলকদাস পাক্কা পোঁ-ধরিয়ে।

চুহা নিঃশব্দে শুনে যায়। রা-টি কাড়ে না। একমনে চুলার মুখে জ্বালানি ঢোকাতে থাকে। মাঝে মাঝে আকাশে সূর্যের অবস্থান নিরীক্ষণ করে অপার নিস্পৃহতায়।

দেখেশুনে ভাবনায় পড়ে যায় দয়ালের দল। ফাঁদে পড়া জন্তুর মতো নিষ্ক্রমণের উপায় ভাবতে থাকে কেবল।

বিকেলবেলায় আখমাড়াই কল বন্ধ রেখেছিল দয়ালরা। তিলকদাস আর দয়াল বসে বসে খইনি ডলছিল চালতা গাছের তলায়। চুহার ঘাড়ে গুড়শালের তাবৎ ঝক্কি চাপিয়ে দিয়ে, ত্রৈলোক্যও ভিড়েছিল ওদের দলে। তালপুকুরের পশ্চিম পাড়ে কমলা রঙের সূর্যটা ঝুলছিল। চালতা গাছের মগডালে কাকটা বসে বসে কর্কশ গলায় ডাকছিল সমানে।

তিনজনে শলা-পরামর্শে মত্ত। সন্ধ্যায় বিচারের থানে কী বলে আত্মপক্ষ সমর্থন করবে, সেই চিন্তায় আকুল। এক-একজন এক-একটা বুদ্ধি বাতলায়। শেষমেষ কোনোটাই ধোপে টেকে না। পালটা যুক্তির চাপে বাতিল হয়ে যায়।

আচমকা দয়ালরা তাকাল গুড়শালের দিকে। এক ডাবু ফুটন্ত গুড় হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে চুহা। আড়চোখে লক্ষ করছে দয়ালদের। ঠিক যেন দৌড় শুরু করবার অপেক্ষায়। দয়ালরা প্রমাদ গোনে। ঝটপট উঠে দাঁড়ায় আত্মরক্ষার তাগিদে।

অকস্মাৎ হাত ঘুরিয়ে পিঠের দিকে ডাবুখানা নিয়ে গেল চুহা। টপাটপ গরম গুড় ফেলতে লাগল নিজের পিঠের ওপর। বিস্ময়ে থ হয়ে যায় দয়ালের দল। এ কি করু

রে চুহা? মরবি নাকি? আরে, আরে থাম, চুহা রে থাম। পাগল হয়্যালি নাকি? আর্তনাদ করে ওঠে তিনজনই।

চুহা উন্মাদের মতো হাসছিল, গরম গুড়ের ফোঁটা টপাটপ ফেলে চলেছে পিঠের নানা জায়গায়। পাছায়, উরুতে। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাচ্ছে মুখ। তার মধ্যেও একচিলতে বিষাক্ত হাসি কোনো মতেই চাপতে পারছিল না সে।

পাঁচ

আজ সকাল থেকেই সবাই চুপচাপ। থমথমে মুখ। কাজ করে চলেছে তিনজনেই। চুহার পেছনে লাগা তো দূরের কথা, ওর দিকে তাকাচ্ছে না কেউ।

গতকাল বিচারের থানে বড়ই নাস্তানাবুদ হয়েছে ওরা। চুহার সারা অঙ্গে ফোস্কা দেখে আঁতকে উঠেছে সবাই। তিনজনকে দড়িতে বেঁধে কড়িকাঠে টাঙানোর প্রস্তাব উঠেছিল। কোনো গতিকে নিস্তার পাওয়া গেছে মদন ঘোষের অনুরোধে। তবে আর্থিক দণ্ড যা হয়েছে, তা ওদের ক্ষমতার বাইরে। চুহার চিকিৎসার ভার তিনজনকে ভাগাভাগি করে নিতে হয়েছে। চুহার একমাস সবেতন ছুটি। এবং ছুটিকালীন বেতন বহন করতে হবে দয়ালদেরই। এছাড়া গ্রামের সর্বজনীন ফান্ডে জমা দিতে হবে জনপিছু আড়াইশো করে টাকা।

চুহার কাজে আসার কথা ছিল না আজ। একমাস ছুটি ভোগ করবে সে। কিন্তু সারা গায়ে ফোস্কা নিয়ে চুহা সাতসকালে গুড়শালে এসে হাজির।

দয়ালরা কেউ ওর পাশ ভিড়ছে না। ওরা ঠিকই করে ফেলেছে, চুহার সঙ্গে আর কোনো রকম রঙ্গ-রসিকতা তো নয়ই, বাক্যালাপও করবে না। চুহা কাজের ফাঁকে ফাঁকে আড়চোখে দেখতে থাকে ওদের। ঠোঁটের কোণে উঁকিঝুঁকি মারে খোশমেজাজি হাসি।

জলখাবারের সময় অবধি চুপচাপ কাজ করল চুহা। চালতা গাছের তলায় বসে জলখাবার খেল একলাটি। দয়ালরা তাদের জলখাবার নিয়ে তফাতে চলে গেল। খেয়েদেয়ে হাত ধুতে ধুতে চুহা মুখ খুলল, 'চোরের সাতদিন, গিরস্থের একদিন। যাবি কোথা? ধর্মের কল বাতাসে লড়ে।'

চুহার কথার জবাব দিল না কেউ। নিঃশব্দে মুখ ধুয়ে কাজে লাগল ফের।

'তবু তো কাল বিচারের থানে সব কথা কইনি। জলে চুবানোর কথাটা কইলে আরো একশো টাকা করিয়া জরিমানা বাড়িয়া যাইত।'

ত্রৈলোক্য একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল। কড়া ধমক লাগাল দয়াল পাখিরা, 'চুপ মার। কথায় কথা বাড়ে।'

'চুপ মারিয়ালু ত' ভারি বয়্যাল-অ মোর।' চুহা মুখ ভেঙিয়ে বলে, ' তোদের সাথে কথা না কইলে মোর যেন আর পেট ভরবে নি! কে কত বীরপুরুষ, কাল তো দেখা গেল! তিনটি মেনি-বাঁদর যেন বুসিয়া আছে বিচারের থানে!'

বলতে বলতে চুহা চলে গেল আখের ছিবড়ে আনতে। ফিরে এসে দেখল, ত্রৈলোক্য গুড়ের গাদ পরিষ্কার করছে। ওকে দেখে দাঁত কিজুড়ে হাসে চুহা, 'অন্যদের ছাড়িয়া, শুধু তোকেই টাঙানো উচিত ছিল কাল। কাল মুহে রা ছিল নি ক্যানে রে? কি পুরিয়া

রাখছুলু মুহের ভিতর?'

ত্রৈলোক্য জবাব দেয় না চুহার কথার। নিঃশব্দে কাজ করে যায়।

একটু বাদে ওরা তিনজনে গেল চালতাতলায়। মাটিতে থাবড়ে বসে বিড়ি টানতে থাকে একমনে। পায়ে পায়ে চালতাতলায় হাজির হয় চুহা। ওদের পাশ ঘেঁষে বসে।

বলে, 'কি হইল রে তোদের? মুহে যন্তর গুঁজিয়া বুসিয়া আছু যে! চুহার পিছে লাগবি নি? কাতুরকুতুর দিবি নি?'

দয়াল পাখিরা বিড়িতে লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ে। বলে, 'ভাই চুহা, ক্যানে শুধুমুদু ঝগড়ার জো খুঁজতেছু? কাজ করতে আস্সি। কাজ করবো, চলিয়াবো। অত কথাবার্তায় কাজ নাই। অত বিচার-পঞ্চায়েতও প্রয়োজন নাই।'

'তাইলে একটা কথা বলি তোদের।' চুহা ঘষটে ঘষটে আরো কাছে আসে ওদের। চারপাশটা চোখ এড়ে দেখে নেয়।

'কি কথা?' দয়ালরা উদ্বেগ মেশানো চোখে তাকায়।

'কথাটা হইলো—।' চুহার চোখের কোণে পলকা হাসি, 'এ শালা ত্রৈলোক্যকে দেখতে ঠিক সুধীর কামিল্যার মতন। ঠিক তেমনই লম্বা গড়ন, কটা চুল, বাঁকা কান...। কী করিয়া হইল বল তো?'

ত্রৈলোক্যর দুচোখ ধক করে জ্বলে উঠল সহসা। বহুকষ্টে নিজেকে সামাল দিল সে। 'জানি নি।' দয়াল পাখিরা উঠে দাঁড়ায়, 'চল রে, কাজে লাগি।'

'আমি জানি।' চুহার ঠোঁটে রসিক-রসিক হাসি, 'ভুতু পড়ধান তো রাতপাহারায় বারিয়া যাইত রোজ। ইদিকে ফাঁকটি বুঝিয়া সুধীর কামিল্যা...। সে শালা তো জাতে স্যাঁকরা, আসল রতনটি চিনিয়া লিতে উস্তাদ..।' বলতে বলতে দয়ালের নিম্নাঙ্গের ওপর চোখ বেলাচ্ছিল চুহা। আচমকা বলে উঠল, 'তুমার যন্তর কুথা গেল হে?'

দয়াল পাখিরার দাঁতের পাটি কিড়মিড়িয়ে ওঠে। চোয়াল শক্ত হয়। বহুকষ্টে চণ্ডাল রাগখানাকে গিলে ফেলে সে। পা বাড়ায় আখশালের দিকে।

'তাই তো ভাবি, দয়াল পাখিরার ছা-গুলান একটাও বাপের মতন দেখতে নয় ক্যানে! তুমার বউয়ের দ্বারিক ঘোষটি কে হে?'

দয়াল নিঃশব্দে চলে যায় আখশালে। পিছু পিছু ত্রৈলোক্য আর তিলকদাস। চুহা একলাটি বসে থাকে চালতাতলায়। ত্রৈলোক্যের ফেলে যাওয়া পোড়া বিড়িখানা তখনো জ্বলছিল। ওটাই তুলে নিয়ে টান মারতে থাকে সমানে।

বেলা বাড়ছে। চালতা গাছের মগডালে কাকটা একনাগাড়ে ডাকছে। রস চোয়াচ্ছে চুহার পিঠের ফোস্কাগুলো থেকে।

একসময় উঠে দাঁড়ায় চুহা। পায়ে পায়ে এগোতে থাকে দয়ালদের দিকে, ' খোব মন দিয়া কাজ কচ্ছু যে রে?' বলতে বলতে আচমকা ত্রৈলোক্যর খাটো ধুতির কোঁচাখানা টান মেরে খুলে দেয় চুহা। পরমুহূর্তে দে দৌড়।

ত্রৈলোক্য শীতল চোখে দেখতে থাকে চুহাকে। ধীরে ধীরে ফের গুঁজে নেয় কোঁচা।

অল্প তফাতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় চুহা। ত্রৈলোক্যর অমন নিরাসক্তি দেখে বুঝি অল্প দমে যায় সে। বলে, 'কি বে শলারা, চুহাকে কাতুরকুতুর দিলি না যে বড়?'

'শুধুমুদু লাগিস নি চুহা।' তিলকদাস ঠাণ্ডা গলায় বলে, 'মরিয়া গেলেও তোর সাথে আর ঠাট্টা-তামাশা করবো নি। এ আমাদের ধনুর্ভাঙা পণ।'

'ই-স!' চুহা ঠোঁট বাঁকায়। পায়ে পায়ে ফিরে আসে গুড়শালে। বলে, 'বিল্লি বলে কিনা, মাছ খাব নি, আঁশ ছুঁবো নি, কাশী যাব! শালা, মেনি-মুহার দল, একদিনের বিচারেই গর্তে সেঁধালু! বিচার আর কারো হয় না দেশে? জরিমানা কেউ দেয় না দুনিয়ায়?'

বলতে বলতে তিলক দাসের পেটে খোঁচা মারে সে। দয়াল পাখিরার ঝাঁকড়া চুলে আচমকা টান মারে। ত্রৈলোক্যকে এক ঠেলা মেরে ফেলে দেয় আখ-ছিবড়ের গাদায়। আচমকা পড়ে গিয়ে ত্রৈলোক্যর কপাল কেটে যায়। রক্ত ঝরতে থাকে। সেদিকে তিলমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে চুহা তিনজনেরই মায়েদের সম্বন্ধে কদর্য অঙ্গভঙ্গি করে বলে, তোদের তিনজনারই মাকে লেই।'

আর নিজেদের থামিয়ে রাখতে পারে না দয়ালের দল। অনেক্ষণ ধরে আগুনটা ধিকিধিকি জ্বলছিল। এবার দাউদাউ জ্বলে ওঠে। হিংস্র হয়ে ওঠে চোখমুখ। শক্ত হয়ে ওঠে কপালের রগ। তিনজনে মিলে সবলে জাপটে ধরে চুহাকে। কিল-চড়-লাথি-ঘুষি মারতে থাকে দমাদ্দম। কাতুকুতু দিতে থাকে সারা গায়ে। মুখ দিয়ে অবিশ্রান্ত খিস্তিখেউড় বেরিয়ে আসে তুবড়ির মতো।

আজ আর 'মারিয়া ফেলল গো---।' বলে চিৎকার জোড়ে না চুহা। চারপাশ থেকে নিঃশব্দে উপভোগ করতে থাকে দয়ালদের সমবেত নিপীড়ন। কিল-চড়ের ফলে ওর গায়ের টসটসে ফোস্কাগুলো পটাপট ফেটে যায। রস চুইয়ে লেপটে যায় শরীরময়।

যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যেতে যেতেও ঝলকে ঝলকে বিষাক্ত হাসি উগরে দিতে থাকে চুহা। মৃত্যুমুখী শুয়োবের মতো গোঙানো গলায় ক্রমাগত উচ্চারণ করে চলে, 'লেই, লেই লেই।'

বিষকপ্পুর

এক

বিকাশ প্রথমে বলেছিল, না।

খুব দৃঢ়ভাবে বলেছিল।

সনাতন খানিকটে থতমত খেয়েছিল। বিকাশ জানে, অমন করে 'না' বলবার কিছু নেই। আমি যাকে কিছু দিলাম, সে ওই দিয়ে কী করলো, সেটা দেখবার ষোলআনা অধিকার আমার আছে। সেটা আমার কর্তব্যও বটে। অতএব 'না' বলবার পেছনে তেমন শক্ত খুঁটি নেই। ওই জায়গায় মানুষের যত অসহায়তা। যুক্তি-বুদ্ধিকে অতিক্রম করে যায় কিছু মানুষ, ঘটনা, পরিস্থিতি।

আচ্ছা, মানুষটা বাসনা বলেই কি বিকাশের অমন জোরালো আপত্তি? বাসনার কেসটা আলোচনার সময় স্থায়ী সমিতিতে প্রবল আপত্তি উঠেছিল। বিকাশই সমস্ত আপত্তি, বাধা, শিমূলতুলোর মতো ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছিল। সবাই জানে, বিকাশ কোনও কিছুকেই যেমন দৃঢ়ভাবে বিসর্জন দিতে পারে না, তেমনি আঁকড়ে থাকতেও নয়। কিন্তু বাসনার ব্যাপারে প্রতিটি স্থায়ী-সমিতির বৈঠকে সে তার প্রস্তাবটিকে প্রবলভাবে আঁকড়ে রইল। অন্য সদস্যরা কি কিছু উল্টোপাল্টা ভেবেছিল? কে জানে! তবে এটা ঠিক, সেদিন বাসনা নাম্নী এক অনাথা বিধবা যুবতীর জন্য বিকাশকে অমন বারংবার ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখে অনেকের চোখের দৃষ্টিতে কিংবা ঠোঁটের হাসিতে তির্যকতা ছিল। তা থাকতেই পারে। মানুষ তার নিজের মানসিক গঠন অনুসারেই অন্যের সম্পর্কে ভাববে।

আসলে, কারো কারো বুক সহজেই হু-হু করে ওঠে। কারো বা কিছুতেই কিছু হয় না। বাসনার প্রথম দিনের মূর্তিখানি দেখে বিকাশের বুকের মধ্যে যে তীব্র মোচড়, তা অন্যের বুকে নাও হতে পারে। এক টুকরো ত্যানায় নিম্নাঙ্গখানি কোনোক্রমে ঢেকে এবং বাচ্চার শরীর দিয়ে ঊর্ধ্বাঙ্গখানি আড়াল করে, একটি যুবতী মেয়ে একটি সুসভ্য দেশের সরকারি অফিসে সাহায্যের প্রার্থনা নিয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষ বলে দাবি করে, এমন যে-কারোর পক্ষে এহেন দৃশ্যে বিচলিত না হয়ে পড়াটাই আশ্চর্যের।

'হুজুর, আমার ছেইলাটাকে বাঁচান হুজুর। আমার এই একমাত্র সন্তান। উয়াকে আপনার পায়ের তলায় রাখল্যাম। বাঁচালে, বাঁচান। লচেৎ পা তুইলে দ্যান পেটে।'

না। কথাগুলো সত্যিই সেদিন বলেনি বাসনা। কিন্তু তার দু'চোখ বলছিল এসব কথা। বাচ্চাটাকে শুইয়ে দিয়েছিল মেঝেতে। বিকাশের পায়ের তলায়। বাচ্চাটা সহসা কনকনে মেঝের ছোঁওয়া পেয়ে ট্যা-ট্যা করে কেঁদে উঠেছিল। অন্যদিকে, বাসনার বাচ্চাহীন প্রায় উন্মুক্ত বক্ষদেশ দেখে বিকাশকে দু'চোখ নাবিয়ে নিতে হয়েছিল।

বয়স কত?

বিকাশের আন্দাজ, পঁচিশ। তার বেশি কিছুতেই নয়। কিন্তু এর মধ্যেই মনে হয়, যেন বিয়াল্লিশের বুড়ি। দু'চোখ কোটরে। চোয়াল ভাঙা। কপালে বলিরেখা। গায়ের চামড়া ঢিলেঢালা আর খরখরে। কাঁসাইয়ের ভরভরন্ত ড্যাম শুকিয়ে এলে যেমন পাথুরে ঢিবি, ক্ষয়া ডুংরি বেরিয়ে পড়ে, বাসনার শরীরের বিভিন্ন অংশে তেমনি করে ঠেলে উঠেছে হাড়।

বাসনার কিন্তু হুঁশ নেই। সে শোকে পাথর। একটি অল্প বয়েসী সাহেব তাকে এতক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে, শরীরে কেবল দারিদ্রের প্রমাণ খোঁজা ছাড়াও যে সে দৃষ্টিতে অন্য কিছু থাকা সম্ভব, সেই বোধটাই বোধ করি লোপ পেয়েছে তার।

বিকাশ বিড়বিড়িয়ে বলেছিল, 'সনাতন, রিলিফ-ইন্‌স্‌পেক্টরকে এক্ষুণি স্টোর থেকে একখানা শাড়ি নিয়ে আসতে বলো।'

খালি গা। পাঁজর-সার বুক। ফুলো পেট। কাঠি-কাঠি হাত-পা। বাচ্চাটার কান্না ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছিল। ক্ষিদেয়, নাকি ঠাণ্ডায় কে জানে!

'তোলো তোলো।' বিকাশ বিব্রত গলায় বলেছিল, 'ঠাণ্ডা লেগে নিউমোনিয়া হবে যে।'

বাসনা কিন্তু মেঝে থেকে তুললো না বাচ্চাকে। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে মুখ গোঁজ করে দাঁড়িয়ে রইল। গভীর কোটরের মধ্যে ওর বিষণ্ণ চোখদু'টোর পানে তাকিয়ে, বিকাশ নিজেই বিষণ্ণ হয়ে উঠল। গাভীর মতো চোখ ওর। অবোলা। করুণ। শুধু চেয়ে থাকে। চেয়েই থাকে। বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না অমন চোখের দিকে।

'গাভীর মতো চোখ।' এছাড়া যেন কোনো উপমাই মানায় না। গাভীরা বড় বিষণ্ণ। অভিমানী। আজীবন সন্তানস্নেহে বিপন্না। জলভরা মেঘের মতো করুণ আর ভারি দু'টি চোখে ওরা প্রতি মুহূর্তে ঝরিয়ে দেয় ওদের আজন্ম লালিত বিষাদ। কিন্তু বাসনার স্বামী তো এই সেদিন মরেছে। বড় জোর বছর খানেক। ওব বিষাদ আর বিপন্নতার বয়েস তো বেশি নয়। অথচ বিকাশের মনে হলো, বাসনাব দু'চোখের এই করুণ বিষাদও গাভীর চোখের মতো, আজন্মের সঙ্গী। কে জানে! হতে পারে! প্রত্যেক মানুষ এক একটি স্বতন্ত্র ইতিহাস।

মেয়েটির এই নগ্ন বিপন্নতা বিকাশকে দারুণ নাড়িয়ে দেয়। বিশেষ করে এই বছর তিন-চারেকের বাচ্চাটি। শুধু মাত্র টিভি-তে 'তিনটিব বেশি মোটেই নয়' বোঝাতেই এমন একটি কংকাল-সার, উদর-সর্বস্ব শিশুকে মায়ের কোলে ড্যাবড্যাব করে তাকাতে দেখা যায়। বিকাশেব চেম্বার, টিউব লাইটের আলো, টেলিফোন, অ্যাশট্রে, ফাইল, কাঁচের পেপার ওয়েট—তার মধ্যে রঙিন ফুল-পাতা, ময়ূরপুচ্ছ, মায়ের কোল থেকে সব কিছুকেই অপার বিস্ময়ে দেখছিল শিশুটি। মেঝেতে শুইয়ে দেবার সাথে সাথেই চিচিঙ্গের মতো হাত- পা নেড়ে কান্না জুড়েছে। বাইরে শীতের শুকনো হাওয়া। শিরীষের শুকনো বীজে ঝনাঝন আওয়াজ। তৃতীয়বারের মতো বাসনার সঙ্গে চোখাচোখি হলো বিকাশের। বিকাশ মনে মনে স্থির করল, সে দেখবেই। তার চাকরিতে হরেক কারণে মানুষকে মিথ্যে আশ্বাস দিতে হয় হরবখত। এটা তার চাকরির শর্ত। এই একটা ক্ষেত্রে বিকাশ না হয় শর্তটা ভাঙবে।

'ওর স্বামী কবে মরেছে, বললে?' বিকাশ শুধোয়।

'বছরটাক আগে স্যার।' সনাতন পরমুহূর্তে গলা চড়ায়, 'উ শালার থাকা না থাকা সমান ছিল স্যার। ইয়াকে দেখতো নাই তো। মর‍্যেছে, আপদ গেছে।' সনাতন অধীর হয়ে উঠেছিল, 'আপনি না দেইখ্‌লে মেয়েটি এক্কেরে মইরে যাব্যেক স্যার। বে-লাইনে গিয়ে লষ্টো হইয়েঁ যাব্যেক।'

'নষ্ট হয়ে যাবে!'

'হুঁ, আইজ্ঞা। পেটের তাড়না দেইখে এখনই অনেকে উয়াকে ঠুগরাতে চায়। অনেক ভদ্র-সজ্জন ব্যক্তি।'

কথাগুলো বাসনার সুমুখে সরাসরি বলল সনাতন। বাসনাও প্রতিবাদ করল না। কথাগুলো শুনে লজ্জার লেশ ফুটল না তার চিবুকে, গালে, নাকের ডগায় কিংবা কানের লতিতে। কিন্তু কথাগুলো বিকাশের মগজে ক্রিয়া করছিল ধীরে ধীরে। এই সুসভ্য দেশে, অন্য কোনও কারণে নয়, কেবল চাট্টি ভাতের জন্য একটি অনাথ যুবতী বহুভোগ্যা হতে বাধ্য হবে! বিকাশ বলেছিল, 'একে বাইরে নিয়ে যাও সনাতন। আমি কথা দিচ্ছি, দেখব।'

বিকাশ দেখেছে। রীতিমত লড়াই করেছে স্থায়ী সমিতিগুলোতে। অনেকে চাপা হেসেছে। কিন্তু স্বয়ং বি ডি ও সাহেব যদি একটা সামান্য কেস নিয়ে অমন আদা-জল খেয়ে লাগেন—। বাসনা রানীবাঁধ বাজার থেকে মাইলটাক দূরে দশ শতক বাস্তু জমির পাট্টা পেয়েছে। বাড়ি তৈরির লোন পেয়েছে। একটা ভালো জাতের দিশি গাই পেয়েছে।

তারপর, প্রায় বছর দেড়েক বাদে, এসেছিল গতকাল। বিকাশ ভুলেই গিয়েছিল ওর কথা। প্রথমটা চিনতেই পারেনি। সনাতন পরিচয় করিয়ে দেবার পর হকচকিয়ে চিনেছে।

বাসনা আমূল বদলেছে। বিকাশের প্রত্যাশা মতোই। খাদ্য আর নিরাপত্তা পেয়ে তার চুপসে যাওয়া গাল দু'টো চালতা ফুলের মতো ফেঁপেছে। গায়ের রঙ উজ্জ্বল হয়েছে। ত্বক কমনীয় আর চিকন। চোখের কোল ভরে গেছে পুরোপুরি। একটা সরু কালোপাড় সাদা খোলের শাড়ি পরেছে ও। গায়ে সাদা ঘটি-হাতা ব্লাউজ। গলায় রুপোর সরু চেন। ব্লক অফিসে আসছে বলেই বোধ করি বাক্স থেকে তোলা শাড়ি বের করেছে আজই। শাড়ি থেকে সস্তা ন্যাপ্থলিনের গন্ধ হাওয়ার ভেসে আসছে! ধাক্কা মারছে বিকাশের নাকে। বাসনা আগেও কম কথা বলত। এখনও তাই। বরং আগে তাব দু'চোখে হাভাতে আকুলতা ছিল। শরীরখানা উদোম থাকলেও লজ্জা ছিল না। এখন তার চোখে মুখে এক ধরনের প্রশান্তি। শুকনো ঠোঁটজোড়া ইদানিং ভিজেছে এবং ফুলেছে! চোখের কোণে হঠাৎ লজ্জা আর আড়ষ্টতা। হতাশার লেশ নেই। তার বদলে খুব চাপা চোরা হাসি আর কৃতজ্ঞতা।

সনাতন বলল, 'বাসনা বড়ই আশা কইর‍্যে আঁইছে, স্যার। না গেলে বড়ই কষ্ট পাবেক্।'

'কী আশ্চর্য!' বিকাশের গলায় বিরক্তি, 'ব্লকের কত মানুষ কত কিছু পেয়েছে। জনে জনে যদি আমাকে নেমন্তন্ন করে, তবে আমি গেছি।'

'সবার সাথে বাসনার তুলনা করবেন নাই, স্যার।' সনাতন হাসে, 'সবার তরে অমন লড়াই আপনি করেন নাই।'

বিকাশ ধাঁ করে তাকায় সনাতনের দিকে। হাসিটা সোজাসাপ্টা তো? না কি সনাতনও

মনে করে...।

অন্য সকলের সঙ্গে বাসনাকে সরাসরি এক করে দেওয়ায় বাসনারও বুঝি কিঞ্চিৎ অভিমান হয়েছে। না, মুখে কিছু বলেনি বাসনা। কিন্তু তার চোখের তারায় ফুটে উঠেছে তার আভাস। আসলে চোখই তো কথা বলে। মনের ভাব যেটুকু সম্ভব, ও-ই প্রকাশ করে। মুখ তো কথা বলে শুধু মনের ভাব লুকোনোর জন্য। আশ্চর্য! একটুখানি আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা পেয়েই মেয়েটার মরা কাতলের মতো চোখ দু'টো কেমন বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে! বিকাশ কল্পনা করল, আপাত নির্বাক এই প্রশান্ত মুখখানির আড়ালে না জানি কত কথা ফুটছে খইয়ের মতো। মন হলো এক খই ভাজবার খোলা। ধান ফেললেই অজস্র খই তোলপাড় তোলে খোলার মধ্যে। চোখ হলো ওই খোলার মুখ। দু-চারটে খই ওই দিয়ে তীব্র উত্তেজনায় ছিটকে আসে। বাসনার ভরাট মুখখানার দিকে তাকাল বিকাশ। ওর এই আমূল বদলে যাওয়াটাকে মনে মনে স্বাগত জানালো। তৃপ্তিতে ভরে উঠল বুক। সে বাঁচিয়ে দিয়েছে এক বিপন্ন নারীকে! এক কংকাল-সার শিশুকে। অচেনা স্রোতের টানে নিশ্চিত তলিয়ে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তেই ধরে ফেলেছে। টেনে তুলেছে। সেই কারণেই আজ বাসনার চোখের কোলে মাখন। ঠোঁটজোড়া ভেজা। দুধ-সাদা সরুপাড় শাড়ির গায়ে ন্যাপ্‌থলিনের ভুরভুরে গন্ধ। বড় প্রিয় বিকাশের। ওই গন্ধটা। যেন শুদ্ধতার প্রতীক! মা এবং দিদিদের শাড়িতে সেই ছেলেবেলা থেকেই পেয়ে আসছে। ন্যাপ্‌থলিনের গন্ধ ভরা মায়ের শাড়ি ঢাকা বুক। মুখ লুকোনোর পক্ষে বড় প্রিয় ছিল বিকাশের।

সহসা বিকাশের মনে হলো, বড় উল্টোপাল্টা ভাবছে সে। ব্যাপারটা নিতান্তই সামান্য। একটা মেয়ে সরকারি অনুদানে গাই পেয়েছে। সেই গাই দুধ দিচ্ছে। বাসনা চায়, বিকাশ একটিবার গিয়ে স্বচক্ষে এসব দেখুক। এনিয়ে অত ভাবনার কী আছে? ফ্রিকোয়েন্ট মনিটরিং তো এসব প্রকল্পের অঙ্গ। বিকাশ বলল, 'ঠিক আছে। যাবো।'

দুই

এই দুনিয়ায় প্রত্যেক মানুষই কোনও না কোনও ভাবে দুর্ভাগ্যের শিকার। পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষটিও এর ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু বাসনা নামে মেয়েটির দুর্ভাগ্যের যেন সীমা পরিসীমা নেই। সনাতনের মুখে শুনতে শুনতে শিউরে উঠছিল বিকাশ।

বাপের বাড়ি ছিল রাজাকাটা গাঁয়ে। দু'বোন ওরা। বাসনা আর করুণা। বাপ-মা ছেলেবেলাতেই গত। বুড়ি ঠাকুরমার কাছে থাকত দু'বোন। নয়নের মণি ছিল বুড়ির। আগের দিনের মানুষ হলেও বুড়ি ছিল বেশ আধুনিকা। নাতনিদের স্কুলে পাঠিয়ে দিত রোজ। রাজাকাটার ইস্কুলে ক্লাস ফোর অবধি পড়েছিল বাসনা। যোগ-বিয়োগের অঙ্ক সে ভীষণ পারত। তার হাতের অক্ষরও ছিল মুক্তোর মতো।

রঘু দাসের সঙ্গে বাসনার যখন বিয়ে হয়, তখন রঘুর পৈতৃক ভিটেটুকুও ছিল না। রানীবাঁধ বাজার থেকে মাইল দেড়েক তফাতে পিচ রাস্তার ধারে ঝুপড়ি। কিন্তু বাসনার ঠাকুরমার তখন বাছবিচারের মতো অবস্থা ছিল না। ঝাঁ-ঝাঁ করে করে বেড়ে যাচ্ছে বাসনার বয়েস। তার নিজেরও। চোখের আলো একটু একটু করে নিভে যাচ্ছে প্রতিদিন। রঘুর বেশ পেটাই শরীর। সে হাজার কিসিমের কাজ-কাম করে পেট চালাত। খুব চৌকস

আর করিতকর্মা ছেলে। ঠাকুমা ওটাকেই পুঁজি করল। অমন চতুর ছগ্‌রা, বাসনা চাট্টি খেইতে পাবেক নির্ঘাৎ। কপালে থাকলে উই ভিটামাটিহীন ছগ্‌রা দোতলা কঠাবাড়ি তিয়ার করবেক রানীবাঁধ বাজারে। পুরুষ-মাইন্‌ষের হাত-পা'ই তো লক্ষ্মী। শোনা যায়, আগে নাকি একবার বিয়ে করেছিল রঘু। সে বহুকাল আগে। সে মাগির কোনও হদিস নেই ইদা।ং। রঘু দাসকে জিগালে সে সরাসরি অস্বীকার যায়। কাজেই ঠাকুমা কথাটাকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছে। শরীর-স্বাস্থ্যটি ভালো বলে বাসনারও রঘুকে ভালো লেগেছে। ঠাকুমার দিক থেকে মোক্ষম যুক্তি ওইটি। মিঞা-বিবি রাজি, তো কী করবেক কাজি। ঢ্যামনা-ঢেমনিতে ভাব থাইক্‌লে, শুক্‌না ডাঙায়ও দশ-সেরি শোল মাছটি ধইরে ফেলবেক।

বাসনার বিয়ের পর আর একটি মাত্তর গলার কাঁটা রইল বুড়ির। করুণা। ক্লাস ফোর পাশ করে সে বসেছিল বছর তিন-চার। রঘুই জেদ করে তাকে ভর্তি করে দিয়েছে রানীবাঁধ গার্লস হাইস্কুলে। সে এখন ক্লাস সিক্‌স-এ পড়ে। রানীবাঁধ থেকে রাজাকাটা না হলেও পনেরো কিলোমিটার। বাসনার ঝুপড়িতে একটি মাত্তর খুপরি। করুণা তাই থাকে স্কুলের হোস্টেলে। রঘু কাকে যেন ধরে হস্টেল খরচ ফ্রি করে নিয়েছে। রঘু তা পারে। দুনিয়ার হেন কম্মো নেই, যা তার অসাধ্যি। তাছাড়া করুনা পড়াশুনোয়ও ভালো।

রঘু দাস হাজার ধান্দায় ঘুরে বেড়ায় দিনরাত। ঘরে থাকে কম। রাস্তার ধারে ঝুপড়ির মধ্যে একলাটি দিন কাটে বাসনার। ভয় করে। মাঝে মাঝে হস্টেল থেকে দু-এক ঘণ্টার ছুটি নিয়ে করুণা আসে। মুড়ি-টুড়ি খায়। দু'দণ্ড গল্প-স্বল্প করে চলে যায়! দৈবাৎ কোনওদিন রঘু ঘরে থাকলে দৌড়ে গিয়ে তেলেভাজা কিনে আনে। খেতে খেতে শালীর সাথে রঙ-তামাশা জোড়ে।, সময়টা ভালোই কেটে যায়। করুণা সর্বদাই জামাইদার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। মনে মনে হাসে বাসনা। লোকটার এই এক বিরাট গুণ। মানুষ বশ করায় সে ওস্তাদ।

রোজ দিনই অনেক রাত করে ঘরে ফেরে রঘু। কোনো রাতে ফেবেই না। ও যে ঠিক কী কাজ করে, বাসনার জানা নেই। একবার শোনে, জমি-জিরেতের দালালি। ফের শোনে, ঠিকেদারকে লেবার সাপ্লাই। গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে নাকি গরু-ছাগল কেনে পাইকারের হয়ে। ওইসব সাত-সতেরো ধান্দায় কোথায় কোথায় যে টো-টো ঘোরে, বাসনা তার অন্ধিসন্ধি পায় না।

ছেলে হওয়ার পর বাসনার শরীরটা মোটেই ভালো যাচ্ছে না। বিয়োবার পর তিনচার মাস শয্যাশায়ী ছিল। রঘু ডাক্তার-কোবরাজ করায় অল্প সেরেছে। কিন্তু শরীর ভারি দুর্বল। মাঝে মধ্যেই কম্প দিয়ে জ্বর আসে। মাথার মধ্যে প্রবল যন্ত্রণা। উঠে দাঁড়ানো দায়। প্রথম প্রথম করুণা আসত। সেও আজ ক'মাস আসছে না। ঠাকুমা নাকি শয্যাশায়ী। নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই। করুণা হস্টেল থেকে গিয়ে এখন বুড়ির কাছেই আছে। রঘুই খবরাখবর আনে। বাসনা শোনে। কাঁদে। ওর শরীরে একতিল শক্তি নেই। বাচ্চাকে কাঁখে নিয়ে সে পিচ রাস্তা অবধি হেঁটে যেতে পারে না। কী করে যাবে সে পনেরো কিলোমিটার পথ। কাজেই বাসনার এখন রঘুই ভরসা।

'আনাগোনার ফাঁকে একটিবার রাজাকাটা হইয়েঁ আইসো গো।' বাসনা প্রায় দিনই মিনতি করে, 'উখ্যেনে একটা ঘাটের বুড়িকে লিয়ে একটা বাচ্চা মেয়া একলাটি থাকে।'

'রাজাকাটা কি ইখ্যেনে! কম পক্ষে দশ-বারো মাইল পথ। যাও বইল্লেই যাওয়া যায়?' রঘু গজগজ করে।

তবে রঘুর একটা গুণ আছে। বাসনার আঁকড়ে ধরা অনুরোধগুলো সে ফেলে না। রাজাকাটায় সে সময় পেলেই যায়। ফিরে এসে বাসনাকে খবর পেশ করে। বুড়ির অসুখ বেইড়েছে আজ। কম্প দিয়ে জ্বর আঁইছে। পরের দিন বলে, ওযোধ দিয়ে এল্যম। ভালা হইয়্যে যাবেক। মাঝে মাঝে ওখানে খাওয়া-দাওয়াও সেরে আসে। করুণা এখন বেশ গিন্নি হয়েছে। জামাইদাকে বেশ যত্ন করেই খাওয়ায়। মাঝে মধ্যে বাসনার তরেও এটা-ওটা পাঠিয়ে দেয়।

একদিন বাসনা রঘুর কাঁধ-ব্যাগ হাৎড়াতে গিয়ে আবিষ্কার করলো দু'প্যাকেট সাদা-বড়ি।

'এ গুলান কী গ'?' বাসনা শুধোয়।

'বিষকপ্পুর।' রঘু জবাব দেয়, 'তুই বিষকপ্পুর চিনিস নাই?'

বাসনা লাজুক হেসে মাথা নাড়ে'

'কাপড়-চিপড়ের বাক্সে রাইখ্লে বাস ছাড়ে। পকা নাই কাটে।' রঘু বিষকপ্পুরের মহিমা কীর্তন করতে থাকে, 'করুণা চেইয়েছে। উয়ার বাক্সোতে নাকি কাপড়-চিপড় পকায় কেইট্যে শেষ কইব্যে দিচ্ছে।'

বাসনা একটা প্যাকেট নাকের সুমুখে মেলে ধরে। আঘ্রাণ নেয়। একটু উগ্র, কিন্তু গন্ধটা নতুন।

একটা প্যাকেট ব্যাগে রেখে দিল বাসনা। অন্যটা হাতে নিয়ে বলল, 'ইট্যা আমি লিল্যম। করুণার তরে একটা পেকেট লিয়ে যাও।'

নিজের কাপড়ের পুঁটলিতে বড়িগুলো রেখে দিয়েছিল বাসনা। মাস দুই বাদে রানীবাঁধ-বাজারে যাত্রা হলো। ওই দিন পুঁটলি খুলে একখানা তোলা শাড়ি পরেছিল বাসনা। সারা শাড়িতে কেমন নেশা ধরানো গন্ধ। সারাক্ষণ লেপটে থাকে সর্বাঙ্গে। ভুরভুর করে। শাড়িখানাকে কেমন নতুন নতুন লাগে। নিজেকেও। যেদিন মণ্টু জন্মেছিল, সেদিনও নিজেকে নতুন লেগেছিল। কিন্তু এ যেন এক আলাদা অনুভূতি।

মণ্টুর বয়েস যখন বছর দুয়েক, একদিন রোগা শরীর নিয়ে পা-পা করে রানীবাঁধ বাজারে এলো বাসনা। বাড়িতে তেল-মশলা কিছুই ছিল না। ওই কিনতেই আসা। দোকানওয়ালি খামরুমাসি বাসনাকে চেনে। দেখেই আঁতকে উঠলো খামরুমাসি। বললো ঃ 'কী লো বাসনা, কাঁচা গায় ঘুরু ক্যানে? তুয়ার তো ইখনো ষষ্ঠীও কাটেনি।'

বাসনা মাথা মুণ্ডু বুঝতে পারে না। খামরুমাসির উম্বর ঢের। মাথায় অল্প ছিট। চোখে ইদানিং দেখে কম।

বাসনা হেসে বলে, 'মাসি গো, তুমার বইস কত হল্যাক গো? মাথাটা ত' এক্কেরে গেছে। পেটে একটা ধইরেছিল্যম বটে। তেবে তা দু'বচ্ছরটাক আগে। সে ইখন হেঁইট্যে বেড়ায়। তুমি ভাবছ সিদিনের কথা।'

'থাম্ মাগি! মস্করা করিস নাই।' খামরুমাসি ঝামরে ওঠে, 'দিন কয় আগেই ত' আমার ঠিক্যে এক পুয়া দুধ লিয়ে গেল রঘু। বইল্ল্যাক, বাসনা হসপিটালে। বিইয়েছে। ত' আমি জিগাই, কি বিয়াল্যাক রে? উ বইল্ল্যাক, বিটিছেইলা। ত' আমি বলি, ভালাই। আগেরটি ছিল ছেইলা। এবারেরটি বিটিছেলিয়া। বলল্যম, ইবার কারখেনা বন্দো কর্

বাপ। গেরিবের অধিক ঘড়ারোগ ভালা লয়। আমরা ত' সারাটা জীবন খালি বিয়াঁই বিয়াঁই ঝাঁঝরা হইয়েঁ গেল্যম।'

খামরুমাসির শেষের কথাগুলো একতিল সেঁধাচ্ছিল না বাসনার কানে। তার চোখের সুমুখে তখন আবিশ্ব টলোমলো। থরথরিয়ে কাঁপছে ঠোঁট।

বিড়বিড়য়ে শুধোলো, 'তুমি ইলচি কচ্ছো নাই ত' মাসি?'

খামরুমাসি তার ঘোলাটে চোখজোড়া তাক করলো বাসনার চোখের ওপর। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো অনেকক্ষণ। ওর পা থেকে মাথা অবধি ঝাপসা চোখের তুলি বোলালো বার-দুই। বললো, 'তুয়াদ্যার ঠ্যাটের ব্যাপার-স্যাপার নাই বুঝি বাবু। ইবার মরতে পেলেই বাঁচি। হাসপিটালে যা তেবে। কার ছা হইল্যাক, দ্যাখ্।'

বাসনা সেটা আগেই স্থির করে ফেলেছে। খামরুমাসি বলা মাত্তরই হাঁটা দিলো রানীবাঁধ হাসপাতালের দিকে। মনটা নানান্ 'কু' গাইছে। কে ছা' বিয়ালেক হাসপিটালে? কার তরে দুধ লিয়ে গেল রঘু? তবে কি আগের পক্ষেরটি এখনো বহাল তবিয়তে আছে? রঘু কি তাহলে দু'জায়গায় সংসার পেতেছে? বীজ বুনে চাষ করে চলেছে দু'টি জমিনেই? হায় ভগমান!

তিন

রানীবাঁধ হাসপাতালে প্রসূতিদের ঘরে ঢোকামাত্রই মাথা ঘুরে গেল বাসনার। কোনোক্রমে দেওয়াল ধরে সামাল দিলো নিজেকে। ঘরের এক্কেবারে কোণের বেডে নিশ্চুপ মেরে শুয়ে রয়েছে করুণা। পাশে ফুটফুটে শিশু।

বাসনাকে দেখামাত্তর উথালি-পাথালি কেঁদে বুক ভাসালো করুণা। ওর বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদলো। বাসনা সান্ত্বনার ভাষা খুঁজে পায় না। তারই স্বামী একটি নাবালিকা মেয়ের সর্বনাশ করেছে, এ দুঃখটা সে রাখে কোথায়!

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওকে শুধোয় বাসনা। সবকিছুর তত্ত্বতালাশ নেয়। ক্লাস এইটে পড়াকালীনই মেয়েটার পিছু নিয়েছিল রঘু। কিংবা তারও আগে থেকে। হস্টেলে থাকাকালীন হাজার ছলে ওকে নিয়ে সময় কাটাতো। অনেক কিছু খাওয়াতো। টেলারিং শপের দোতলার কুঠরিতে নিয়ে গিয়ে বসাতো। শুধোলে বলতো, ইট্যা আমার আপিস-ঘর যে। বেব্সা চালাতে হয় না?

জামাইদার এসব ক্নোনও কাজেই কোনও মন্দ আঁচ করেনি করুণা। বলতে বলতে দিদির সুমুখে তার গলা ধরে আসে। নিজের মাথার রুখা চুলগুলোকে সে বারবার মুঠো করে ধরে। বাসনা ওর পিঠে হাত বুলোতে থাকে নিঃশব্দে। তার ভেতরে তখন ঝড় বইছে। নিদারুণ ঝড়।

করুণা এক সময় কান্না থামায়। বিড়বিড়য়ে বলে, 'বাচ্চাটাকে উ লষ্টো কইরে দিতে চায়। লচেৎ বিকে দিতে।' বলতে বলতে আর এক পশলা কান্না নামে তার দু'চোখ বেয়ে।

রঘুর প্রস্তাবটা নিষ্ঠুর হলেও বাস্তবসম্মত মনে হয় বাসনার। করুণা এখনো নাবালিকা। বিয়ে হয়নি। এখন থেকে একটিকে গলায় বেঁধে সে কী মরবে? করুণাকে

সে কথা বলায় তার দু'চোখে গাঢ় আঁধার নেমে আসে। ফের হু-হু করে কাঁদতে থাকে সে। বাসনার ভুরু জোড়া কুঁচকে ওঠে অলক্ষ্যে। পরক্ষণেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে। মেয়েদের কত পাকেই না বেঁধেছেন ঈশ্বর! এই যে, এই মায়ের প্রাণ, অবুঝ, পরিণামহীন, এ-ও এক বাঁধন।

বাসনা আর কথা বাড়ায় না। ঘরে তার এক চিলতে ছা শুয়ে আছে একলাটি। দু'টাকার তেল-মশলা কিনতে এসে, শ'টাকার ঘড়া হারিয়ে ফিরছে।

বাসনার মুখোমুখি হওয়ার আগেই রঘু জেনে ফেলেছিল সকালের পুরো বৃত্তান্ত। বাসনার দু'চোখ সাপের মতো জ্বলছিল।

রঘু হালকা হেসে বলে, 'আর শোষ দেখাতে হব্যেক্ নাই। বাচ্চাটাকে হাপিস কইর্যে দুবো। করুণার বিয়া দিয়ে দুবো। পাত্র আমার ট্যাঁকে। ব্যস, মিটে গেল ঝামেলি।'

'তুমি হাসপিটালের খাতায় আমার নাম দিয়েছ ক্যানে? সক্কলকে আমার নাম বইলেছ ক্যানে? বলো। ক্যানে? ক্যানে?' সাপের মতো হিসহিসিয়ে ওঠে বাসনা।

'পড়ালিখা মেইয়া, ইট্যা আর বুঝলি নাই?' রঘু দাঁত বের করে হাসে, 'করুণার নাম লিখানো যায়? উয়ার বইস আঠরো হয় নাই ইখন তক্ক। তা বাদে উয়ার একটা ভবিষ্যৎ আছে। বটে কিনা? উয়ার নাম প্রসূতির খাতায় লিখালে উয়ার আর বিয়া-থা হব্যেক?' রঘু পাক্কা উকিলের ঢঙে ব্যাখ্যা করে পুরো ব্যাপারটা।

বাসনার চোখের পাতনি পড়ে না। সে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে রঘুর দিকে। তার সর্বাঙ্গে লক্ষ বিছার দংশন। কোনো গতিকে পালিয়ে বাঁচে রঘুর সুমুখ থেকে।

সেই বিকেলেই মণ্টুকে কোলে চড়িয়ে রাজাকাটায় হাজির হয় বাসনা।

ঠাকুমা সব শুনে কিছুক্ষণ পাথর হয়ে যায়। তারপর অঝোরে কাঁদতে থাকে। বাসনা তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টাই করে না।

অনেকক্ষণ বাদে বাসনাকে সব খুলে বলে বুড়ি। করুণা এসেছিল প্রায় মাস ছ'সাত আগে। দিন দু'তিন ছিল। মাঝে মাঝেই বমি করতো। বড়-এলাচ, মধু দিয়ে দিয়ে খাইয়েছিল বুড়ি। চলে গেল দিন কয় বাদে। আর আসেনি। রঘু কখনো বলতো, বাসনার শরীর খারাপ! করুণা দিদির পাশেই আছে। কখনো বলতো, সামনে ওর পরীক্ষা, দিদিমণিরা ছাড়ছে নাই।

যতক্ষণ ছিল বাসনা, একটিও কথা বলেনি বুড়ির সঙ্গে। পরের দিন ফিরে এসেছিল রানীবাঁধে।

দিন কয় বাদে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেল করুণা। বাসনাই তাকে সেধে নিয়ে এলো নিজের ঘরে। রাতের আঁধারে। পাড়া-পড়শি সব জানলোই। কিন্তু রানীবাঁধ বাজারের অনেকেই, যাদের সঙ্গে মাখামাখি নেই, শুধু হাটে-বাজারে মুখের আলাপ, তারা জানলো না গুহ্য খবরটা। তারা পথে-ঘাটে দেখা হলেই খোঁটা দেয়. কী লো বাসনা, বহুৎ দিন দেখি নাই ক্যানে? শুনল্যাম নাকি বিটিছেইলা হয়েছে তুয়ার? মিঠাই পাবো নাই?

বাসনা প্রতিবাদ করে না। ম্লান হাসে। বলে, 'হয়্যেছে তো বিটিছেইলা। উয়ার তরে ফের মিঠাই?'

তাও দু-একজনকে মিঠাই খাইয়ে দিলো বাসনা।

করুণা শুধু কাঁদে, 'দিদি রে, আমি আর বাঁচবো নাই।'

বাসনা বলে, 'বাঁচবি, বাঁচবি। দিন কতক ইখ্যেনে থেইক্যে, ফিরে যা রাজাকাটায়। ঘুণাক্ষরেও কারুকে বলবি নাই কিছো। বাচ্চা রউ মোর পাশ। তুয়ার বিয়া দিয়ে দুবো জলদি। পাত্র রয়েছে তুয়ার জামাইদা'র হাতে।'

শুনে হাপুস নয়নে কাঁদে করুণা। বাচ্চার বুকের ওপর অবিরাম হাত বোলায়।

এত করেও শেষ রক্ষা হলো না। মাস কয় বাদে, ঠাকুমা চোখ বোজার সঙ্গে সঙ্গেই রঘু বিয়ে করলো করুণাকে। বাচ্চাকে নিয়ে করুণা আর রঘু রইলো রাজাকাটায়। ঠাকুমার ভিটেয়। তখন করুণার সংসার নিয়েই মশগুল রঘু। বাসনা পড়লো অগাধ জলে। সে পড়ে রইলো ওই পিচ রাস্তার ধারে রঘুর বানানো ঝুপড়িতে। দু'বেলা দু'মুঠ ভাত জোটাতে সে প্রায় নরকে নামতে চললো। ভিক্ষে করা, পরের বাড়িতে ধান কোটা, জঙ্গলের হত্তুকি-বহেড়া-নিমবীজ কুড়িয়ে বিক্রি করা—এত কিছুর পরেও দু'টি প্রাণীর পেটের ভাত জোটাতে পারে না কিছুতেই। ছেলেটা খাদ্য বিহনে কাঠি-সার হতে থাকে। বর্ষার রাতে ফুটো চাল বেয়ে ঝুপড়ির মেঝে ভেসে যায়। রুগনা বাচ্চাকে বুকে চেপে ঝুপড়ির কোণে বসে বসে রাত উজাগর করে বাসনা। এক সময় তার দরজায় কাক-চিলের দল হাজির হয়। তারা ওকে খাদ্যের বদলে ঠোক্‌রাতে চায়। কংকালসার বাচ্চাকে নিয়ে উপোসি মেয়েটা যখন নরকের পথে পা বাড়াতে চলেছে, ঠিক সেই সময়েই দেবদূতের মতো হাজির হলো সনাতন।

সব শুনতে শুনতে থ' হয়ে যায় বিকাশ। বললো, 'কিন্তু রঘুটা অত জলদি মরে গেলই বা কী করে?'

'পাপ, হুজুর। পাপে আর বেলিয়মেই মইর্‌ল্যাক লোকটা। শেষের দিকে উয়ার শরীরখান্ হয়েছিল্যাক এক ব্যাধির মন্দির।' সনাতন তীব্র ঘৃণায় মুখ বিকৃত করে, 'অমন পাষণ্ডর মরাই উচিত, স্যার। লচেৎ আরো কত মেয়ার যে সর্বনাশ হইত্যো!'

চার

বাসনার ঘরের সুমুখ অবধি জিপ গেল।

বিকাশ জিপ থেকে নামে। সনাতন তড়িঘড়ি গিয়ে ডাক দেয় বাসনাকে। বিকাশ বাসনার ছিমচাম আগড়ে হাত রাখে।

আকাশে আজ ছানাকাটা মেঘ। তার মানে বৃষ্টি হবে না। কিন্তু কালরাতে হয়েছিল। কাঁচা রাস্তায় কাদা রয়েছে। খানা-খন্দে জল। বাসনার ঘরখানি দেখে ভালো লাগে বিকাশের। মাটির দেওয়াল। খড়ের চাল। একফালি বারান্দা। সামনে এক চিলতে উঠোন। উঠোনের মধ্যিখানে মাটির বেদির ওপর হৃষ্টপুষ্ট তুলসী গাছ। বারান্দা, উঠোন, সব ঝকঝক করছে।

বাসনা ঘরের মধ্যেই ছিল। গাড়ির আওয়াজ শুনে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে আসে। বিকাশকে দেখা মাত্রই, এই প্রথম, বাসনার ঠোঁটে একচিলতে তৃপ্তির হাসি উঁকি মারে। মাথায় অল্প ঘোমটা দিয়ে সে দ্রুতপায়ে এসে আগড় টেনে ধরে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে বিকাশের নাকে ভেসে আসে ন্যাপ্‌থলিনের সুবাস। বাসনার শাড়ি থেকেই আসছে গন্ধটা। যদ্দুর মনে পড়ে, কালকের ওই শাড়িখানাই আজ পরেছে বাসনা।

বারান্দার এক প্রান্তে একটি দড়ির খাটিয়া। বাসনা মৃদু গলায় বসতে বলে বিকাশকে। সনাতনকে মেঝেতে আসন পেতে দেয়।

বিকাশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চৌহদ্দিটা দেখতে থাকে। ভিটের একদিকে কিছু সবজির গাছ। বর্ষার জল পেয়ে ডগোমগো বেড়েছে। উল্টো দিকে গোটা কয় বেলিফুলের ঝাড়। একটা রক্ত জবা। অজস্র ফুটেছে।

কাচের গেলাশে পরিপাটি করে শরবত নিয়ে এলো বাসনা। সসম্ভ্রমে ধরে দিলো বিকাশের সামনে।

'আবার শরবত কেন?'

'খান।' বাসনা মিহিগলায় বলে, 'ঘরের গাছের লেবু। ভালা লাইগ্‌বেক্‌।'

'ঘরে আবার লেবু গাছও লাগিয়েছ নাকি? জমি তো পেলে মাত্তর বছর দেড়েক।' বিকাশ শরবতে চুমুক মারে।

লাজুক হাসি বাসনার ঠোঁটে। বলে, 'কলমের গাছ। ফল্যেছেও ঢের।'

বিকাশের সন্দেহ থাকে না, সংসারখানা বেশ গুছিয়ে নিয়েছে বাসনা। সত্যি, মেয়েরা সব পারে। বিকাশ খালি গেলাশখানা এগিয়ে দেয় বাসনার দিকে।

মণ্টু খেলাধুলো করে ফিরলো বুঝি। সারা গায়ে কাদা। বিকাশ দেখতে থাকে বাচ্চাটাকে। একেই বাসনা বছর দুয়েক আগে শুইয়ে দিয়েছিল বিকাশের পায়ের তলায়। তখন ও ছিল একটি কঙ্কাল। যে কোনও মুহূর্তে মরে যেতে পারতো। সেই বাচ্চাকে এখন চেনা দায়। বছর ছয়েক বয়েস। স্বাস্থ্যটি বেশ হয়েছে। চোখ দু'টিও ঝকঝকে।

বাসনা সস্নেহে হাসে। বলে, 'নমো কর এঁকে।'

মণ্টু অবাক বিস্ময়ে দেখছিল বিকাশকে। মায়ের কথায় ঝুপ্‌ করে প্রণাম করেই চলে যায় মায়ের আড়ালে।

বিকাশ হাসে। বলে, 'পড়াশুনো করছে?'

মাথা দুলিয়ে সায় দেয় বাসনা। মণ্টুকে বলে, 'যা, সিলেট বই আইন্যে সাহাবকে দেখা। ইঁয়ার তরেই আইজতক্‌ বাঁইচ্যে আছু।'

'কী যে বলো!' বিকাশ লজ্জা পায়, 'আমি বাঁচিয়ে রাখার কে?'

বাসনা মুখে প্রতিবাদ করে না। শুধু তার দু'চোখ কৃতজ্ঞতায় ভারি হয়ে আসে।

দেখতে দেখতে উদাস হয়ে যায় বিকাশ। সেদিনের লড়াইগুলোকে সার্থক মনে হয়। মৃত্যুমুখী একটি শিশুকে সঠিক অর্থে তার মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেওয়া। কম কথা নয়।

বাসনা দাওয়ার ওপর আসন পেতে খাবার সাজায়। ফল, মিষ্টি, সাথে পাথরের বাটিতে জমাট দই।

বিকাশ দু'চোখ কপালে তোলে 'এসব কী করেছো?'

'কিছো লয়।' বাসনা মৃদু গলায় বলে, 'আপনি আমার অন্নদাতা। আপনি না থাইক্‌লে ছেইলাটাকে লিয়ে ভেসে যেথ্যম্‌ কবে।'

অল্প কিছু মুখে দেয় বিকাশ। দইটা খায় বেশ তৃপ্তিভরেই। জমাট দইয়ের মধ্যে কারো সাফল্যের স্বাদ পায় যেন।

বিকেল গড়িয়ে এলো। কমলা রঙের রোদ্দুর পড়েছে বাসনার ঘরের চালে।

বিকাশ বলে, 'তোমার গাইটাকে তো দেখলাম না।'

বাসনা হাসে, 'গাই-বাছুর পিছু-প্যাঁদাড়ের ডাঙায় চইর্‌ছে।'

'চলো, গাইটাকে দেখি।'

বিকাশের উৎসাহ দেখে বাসনার মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

খিড়কির মাঠে সবুজ চাপড়া চাপড়া ঘাস। বর্ষার লকলকিয়ে বেড়েছে। গাইটা বাঁধা রয়েছে মাঝমাঠে। বেশ হৃষ্টপুষ্ট। পাশে দৌড়ে বেড়াচ্ছে কচি বাছুরটা। সরলপানা চোখ।

বাসনা হাসছিল। বললো, 'দু'বেলায় চার সের দুধ দেয়।'

'দু'বেলাই দোও নাকি?' অনভিজ্ঞ বিকাশ শুধোয়।

'না দুইলে একবেলার দুধ লোকসান।'

'সব দুধটাই বেচে দাও?'

'এক সের ঘরে রাখি। মণ্টু খায়। টুকচান দই পাতি। ঘোল মুয়ে ঘি করি। তিন সের বিকি।'

বাছুরটা ইতস্তত দৌড়ে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে মুখ দিচ্ছে মায়ের বাঁটে। পরক্ষণে সরিয়ে নিচ্ছে মুখ।

'বাছুরটাতো চরছে না।' বিকাশ বলে।

'চরবার বইস হয় নাই।' বাসনা বিকাশের অজ্ঞতায় হাসে, 'মাত্তর তো এক মাসেরটি হইল্যাক।'

'ও তবে কী খায়?'

'মায়ের দুধ।'

'কই, খাচ্ছে না তো মায়ের দুধ।'

বাসনা একটুক্ষণ চুপ করে থাকে। বলে, 'খাবেক। টুকচান্ বাদে। যখন গাই দুইবো। উ দুধ না খেইলে বাঁটের দুধ পানাবেক নাই।'

বাছুরটাকে কেমন রোগারোগা লাগছিল। পেটখানা যেন ঢুকে গেছে ভেতরে। গায়ে হাড়-পাঁজরাও প্রকট।

বিকাশ বাছুরটাকে লক্ষ করছিল। বারবার মায়ের বাঁটে মুখ ছোঁয়াচ্ছে বটে, কিন্তু দুধ না খেয়ে ফিরিয়ে নিচ্ছে মুখ। চোখ দুটি দেখে ভারি মায়া জাগে। বড় করুণ ছলোছলো চোখ।

সহসা গাইটার বাঁটের দিকে নজর পড়ে বিকাশের। কালোপানা কিছু রয়েছে বাঁটের গায়ে। কাদাজাতীয়। এখন, এই বর্ষাকালে মাঠময় কাদা। কখনো যদি শুয়ে থাকে কাদাভরা মাঠে, তবে বাঁটে কাদা লেগে যাওয়া অসম্ভব নয়।.

বাসনাকে বলতেই সে মুখ টিপে হাসে। সাহেবের অজ্ঞতায় কৌতুক বোধ করে। বলে, 'কাদা লয়। সক্কালব্যালায় দুধ দুইবার পর বাঁটে পুরু কইর‍্যে গোবর লেপা আছে।'

'কেন?

'লচেৎ বাছুরতো দুধ খেইয়ে লিব্যাক্। গোবরের গন্ধে উ' বাঁটে মুখ দিতে লারে।'

শুনতে শুনতে ঈষৎ কেঁপে ওঠে বিকাশ। কথাগুলো যেন খুচরো পয়সার মতো ঠং ঠং আওয়াজ তুলতে থাকে মগজে। বাছুরটার পেটের ভেতর অবধি চোখ চারায় সে। এবং দেখে, পেটে একবিন্দু রস নেই।

গাইটার চোখদু'টোকে আরো করুণ লাগছিল। ছলোছলো চোখের কোণে যেন বিন্দুবিন্দু জল দেখতে পায় বিকাশ। এ যেন, দু'বছর আগে বাসনার সেদিনের সেই

চোখদু'টি। যেদিন একমাত্র কঙ্কালসার সন্তানকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানোর আকুতি নিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল এক হাড়-জিরজিরে মা।

বাছুরটা ক্ষিদের জ্বালায় বারবার মুখ ছোঁয়াচ্ছিল মায়ের বাঁটে। তার বারংবার সেই ব্যর্থ প্রয়াস দেখতে দেখতে বাসনার দু'চোখ ভরে যায় কৌতুকে।

সহসা সর্বাঙ্গ কাঁপিয়ে বমি আসে বিকাশের। পেটের মধ্যে সবটুকু দই যেন প্রবল আর্তনাদ তুলে বাইরে বেরিয়ে আসতে চায়।

'চলো, এবার ফেরা যাক।' কথাগুলো কোনোক্রমে উচ্চারণ করে বিকাশ হাঁটা দেয়।

বাসনার ঘরের বারান্দায় ফিরে আসে বিকাশ। পান সেজে রেখেছিল বাসনা। রেকাবিতে সাজিয়ে ধরে দেয়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও একখানা তুলে নেয় বিকাশ। চিবোতে চিবোতে অল্প আরাম বোধ করে।

'দুধটা বাড়ছে নাই ক্যানে, সনাতনদা?' বাসনা শুধোয়, 'কত চরে-বুলে। খোল-জাবনা খায়। তব্বো দু'খেপে মাত্তর চার সের দুধ।'

'দেশি গাই, ইয়ার চে' বেশি কি আর দিব্যাক্?' সনাতন বলে।

'কী এক ইনজিক্শান আছে না কি?' বাসনার দু'চোখে সরল জিজ্ঞাসা, 'দুই্বার আগে গাইয়ের গলায় ফুঁইড়ে দিলে নাকি দুধ বাড়ে?'

'আছে বটে।' সনাতন নিশ্চিত নয়। বলে, 'পরশু একটিবাব বলক-অফিসে যাস দিখি। ভিটিনারি সাহাবকে বইল্বো। যদি থাকে তো দিবা করাবো।'

'পরশু হব্যেক নাই সনাতনদা।' বাসনার ঠোঁটে কুণ্ঠিত হাসি, 'পরশু বাঁকুড়া কোর্টে মোর মামলা।'

'তোমার মামলা?' বিকাশ অবাক হয়, 'তোমার আবার কার সঙ্গে মামলা?'

বাসনা কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিত বোধ করে। অল্প দম নেয়। মৃদু গলায় বলে, 'করুণার সাথে।'

'কেন?'

একটুক্ষণ চুপ করে থাকে বাসনা। বলে, 'লিজের বিটিছেইলাটিকে ফেরত চেইয়ে মামলা রুজু করেছি মুই।'

সনাতন সব কিছুই জানে। মিটিমিটি হাসছিল সে। বললো, 'উই টুকুন মেয়ার কী বুদ্ধি আইজ্ঞা। সাক্ষীসাবুদ, হাসপাতালের নথি—সব জোগাড় করেছে। মেয়া জন্মাবার কালে কাকে কাকে যেন মণ্ডা খাবাঁইছিল, উয়ারা সব সাক্ষী দিচ্ছে এখন।'

বিকাশের সর্বাঙ্গে অকস্মাৎ বিদ্যুৎ প্রবাহ! দু'চোখে পলক পড়ে না। স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে থাকে সে। বাসনাকে তার জলজ্যান্ত রহস্য বলে মনে হয়।

একটু বাদে গম্ভীর গলায় শুধোয়, 'মামলাটার কী অবস্থা এখন?'

বাসনা ঘোমটাখানি অল্প টেনে দেয়। মৃদু গলায় বলে, 'সাক্ষী হইয়্যেঁ গেঁইছে। উকিল বইলেছে, জিত হব্যেক্ই।'

বাসনার কথাগুলো নিঃশব্দে পরিপাক করছিল বিকাশ। বলে, 'জিত হলো, মেয়ে পেলে, কী করবে ওই পরের মেয়েকে নিয়ে?'

সাহেব মানুষের অতখানি কৌতূহল দেখে ভীষণ লজ্জা পায় বাসনা।

মৃদুস্বরে বলে, 'সন্সারে কাজকর্মেব অভাব? রান্নাবান্না, ঝাঁট-পাট, খেতখামারের কাজ, গাই-বাছুরের লাড়াঘাঁটা...। তা বাদে, কিছো টাকা রেখেছি বহুৎ কষ্টে। ভাদ্দর-আশ্বিনে মানুষ অভাবে গরু-বাছুর বিকে দেয় কম দরে। উই টাইমে আরো একটা গাই

কিনবো। ইতোসব ঝঞ্ঝাট কে সামলাবেক হুজুর? মন্টু ত' ইস্কুলে যায়। পাইভেট পড়ে দু'বেলা। একটা লোক নাইলে আর চলবেক নাই।'

বিকাশ নির্বাক। মস্তিষ্কের কোষে কোষে তার নিদারুণ রায়ট বেধেছে। সুমুখে মূর্তিমতী রহস্য হয়ে খাড়া রয়েছে বাসনা। বিকাশ স্তম্ভিত শুধোয়, 'অ্যাদ্দিন বাদে মামলা করলে কেন?'

'অ্যাদ্দিন ত ভাসছিল্যাম অকুল সায়রে।' বাসনা থমথমে গলায় বলে, 'লিজে যখন টুকচান কূল পেল্যাম, উকিলবাবু বইল্‌ল্যাক, সবুর ধর, উই মেয়া ইস্কুলে ভর্তি হউ। জন্ম তারিখটা নথিবদ্ধ হউ ইস্কুলের খাতায়। কেসটা পাকা হব্যেক।' বিবেচক উকিলের মতো ব্যাপারটা প্রাঞ্জল করে বোঝায় বাসনা।

বিকাশের মাথাটা ঝিমিঝম করছিল। প্রায় টলতে টলতে জিপের দিকে এগিয়ে গেল সে।

জিপে ওঠার আগে বাসনা ভক্তিভরে প্রণাম করলো বিকাশকে। সেই মুহূর্তে তার শাড়ির ন্যাপ্‌থলিনের গন্ধটা শেষবারের মতো ঝাপটা মারলো বিকাশের নাকে। নিঃশ্বাস চেপে বিকাশ তড়িঘড়ি উঠে পড়লো জিপে।

মনে মনে হাহাকার করে ওঠে বিকাশ। এই দুনিয়ার আরো একটি প্রিয় গন্ধও বিষাক্ত হয়ে গেল।

রিং

এক

যাহ্! আচমকা লড়াইটা শেষ হয়ে গেল। হঠাৎই। চকিতে শুরু, চক্ষের পলকে শেষ। তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করবার সময়ই পেলুম না।
পাশের ঝুলে-থাকা যাত্রীটি হাঁটুতে ঠেলা মেরে বলল, ও মশাই, ' লেডিজ' দাঁড়িয়ে রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন না?

আমি হুঁশে এলুম। তড়িঘড়ি উঠে দাঁড়ালুম। বেশ ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি করে এগিয়ে এসে ধপাস করে বসে পড়ল, 'লেডিজ'। আমি এপাশ-ওপাশ তাকালুম।

ঝুলতে ঝুলতে সহযাত্রীটি আড়চোখে দেখছিল আমাকে। লজ্জা পেয়ে চোখ নাবিয়ে নিলুম। ভাবতে লাগলুম আপন মনে, আহা, বেড়ে জমেছিল লড়াইটা! আহা! এমন লড়াই জীবনে একটা জিতলেও প্রাণ কানায় কানায় ভরে ওঠে। বার্ন কোম্পানির ঝানু অ্যাকাউন্ট্যান্ট, আমার শ্রদ্ধেয় শ্বশুরমশাই, যিনি আমাকে পোকামাকড় গোছের ভাবেন, কেমন ক্রমশ সিঁটিয়ে যাচ্ছিলেন আমার সামনে? দেখে নয়ন সার্থক।

—আপনার ধারণা, আপনার বেঁচে থাকবার ধরনটাই একমাত্র ধরন। ওটাই আপনার প্রথম ভুল।

—তুমি আমায় ইনসাল্ট্ করছ?

—আমি আপনাকে সুস্থ হবার ওষুধ বাতলাচ্ছি।

—সে অধিকার তোমায় দিইনি হে ছোকরা।

—অধিকারের পরোয়া করিনে আমি। আপনার তৈরি পাপ যখন বেনারসী পরে আমার চৌকাঠ মাড়িয়েছে, তখন এ তিরস্কার আপনার প্রাপ্য।

আরো মজা হত, সামনে কেতকী থাকলে। বাপের চেয়ে বড়সড় মানুষ তো সে জীবনে দেখেনি। চোখ-নাক-চিবুকে সর্বদা একটা বিজয়িনীর দেমাক লেগে থাকে কেতকীর। দুনিয়ার সব কিছুকে অবজ্ঞা করা যায় সে ভঙ্গিতে। আমাকে দেখে তার চোখমুখ থেকে যে অবজ্ঞা ঝরে পড়ে, তা দেখে কেঁচোটি হয়ে যাই আমি। পাইনসাহেবও এক কিস্তিতে চোখেমুখে অতখানি তাচ্ছিল্য ফোটাতে পারেন না। আমি যেমনটি ছেলেবেলায় লজেন্স খাবার জন্য বাবার পকেট থেকে পয়সা চুরি করেছি, কেতকীও তেমনি ছেলেবেলা থেকেই ওর বাবার কাছ থেকে চুরি করেছে একটু একটু দেমাক। কেতকী আর তার বাবার কাছে আমি তাই সিঁটিয়ে থাকি অষ্টপ্রহর। সেই জন্যেই লড়াইয়ের রিং-এর মধ্যে মুখোমুখি পেলে আমি ওদের ছাড়িনে। শতগুণ উশুল করে নিই। এই যেমন আজ। আহা, তোফা জমেছিল লড়াইটা! মনে মনে ভাবি, এমনিভাবে কোনোদিন যদি কোনোগতিকে চিন্টুকে একটিবার পেয়ে যাই রিং-এর মধ্যে! সেদিন ওর দুঃখে কুকুর-শেয়াল কাঁদবে। তেইশ পল্লীর চিন্টু মিত্তির, তুমি সেদিনই টের পাবে,

অন্যের ঘরে নিরন্তর অগ্নিসংযোগের পরিণাম কী ভয়ংকর।

পাশের সিটের যাত্রীটি আড়চোখে লক্ষ করছে আমাকে। আমি ঠোঁট নাড়াচ্ছিলুম? হতেও পারে। মাঝে মাঝে এরকমটা হয়। ডুবন্ত রিং-এর থেকে কথাগুলো ভেসে ভেসে মুখের দরজায় ঘা মারে। দরজার পাল্লাদুটো আলতো নাড়িয়ে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যায় বাইরে। মনের কথাগুলো মুখের কথা হতে চায়। এ তো ভারী বিপদ! কোনোদিন না সর্বনাশ হয়ে যায় আমার!

বাসটা থেমে গিয়েছে খানিক আগে। সামনে একটা হইচই, জটলা। কিছু লোক নেবে গেল মজা দেখতে। বাকি সব বাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেদ্ধ হতে লাগল। অফিস টাইমের বাস। একবার যখন কোনোগতিকে উঠতে পারা গেছে, তখন আর নামানামি নেই। মন চলো ডালহাউসি।

—কিসের জটলা? কিসের জটলা দাদা?

—চাপা পড়েছে।

--কে চাপা পড়ল?

—কে জানে! কত ফেকলুপার্টি ঘুরে বেড়াচ্ছে রাস্তায়।

একজন চাপা পড়েছে তাহলে। একটুখানি নড়েচড়ে বসল সবাই। ঢুলতে লাগল পুরোনো ছন্দে। কেবল আমার মনটাই ভরে গেল অচেনা বিষাদে। আহা, কে আবার চাপা পড়ল, এই জোয়ারের বেলায়?

পাশের যাত্রীটি এখনো মিটিমিটি তাকাচ্ছে আমার দিকে। কি ভাবছে, কে জানে! পাশে বসে লোকটা সমানে ঠোঁট নাড়িয়ে চলেছে! কত ছিটেল লোক যে ঘুরে বেড়াচ্ছে সমাজে, সংসারে! ভারী অস্বস্তি হচ্ছিল। লোকটির সঙ্গে আর একবার চোখাচোখি হবার আগেই নেবে পড়লুম।

আসলে, ব্যাপারটা হল, আমার একদল নিদারুণ শত্রু রয়েছে। তাদের সঙ্গে আমি কিছুতেই পেরে উঠছিনে। ওরা আমায় মেরে মেরে কাহিল করে এনেছে। পালটা মার দেওয়া তো দূরের কথা, মারটা ঠেকাতেও পারিনে আমি। তাই একখানা লড়াইয়ের রিং বানিয়েছি ইদানীং। পথে-ঘাটে, সমাজে-সংসারে যাদের কাছে মার খেয়ে আধমরা হয়ে রয়েছি, ওই রিং-এর মধ্যে তাদের এক্কেবারে তুলো ধুনে দিই। একেবারে মার মার ধুন্দুমার। ওদের একেবারে গো-হারান হারিয়ে দিয়ে নিজেকে চমকে দিই বার বার। বুকটা কান্নায় কান্নায় ভরে ওঠে তখন। জীবনে কাউকে কোনোদিন চমকে দিতে পারিনি আমি। কোনো পরীক্ষায় রেকর্ড নম্বর পেয়ে, গোলের পর গোল দিয়ে কোনো হারা খেলা জিতিয়ে দিয়ে, কিংবা দারুণ সুন্দরী কোনো মেয়ের সঙ্গে জমজমাট প্রেম করে কাউকে তাক লাগাতে পারিনি। ইদানীং তাই চমকের পর চমক লাগিয়ে চারপাশের মানুষের চোখ ধাঁধিয়ে দিতে আমি বদ্ধপরিকর। হঠাৎ আই-এ-এস পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়ে গেলুম। কিংবা তাতাবানিয়ার সঙ্গে ভারত যখন গো-হারান হারছে, তখন ম্যানেজমেণ্টকে বলে হঠাৎই মাঠে নেমে পড়লুম। তারপর সে এক কাণ্ড! সেণ্টার লাইন থেকে একা একা বল নিয়ে গিয়ে অনেক দূর থেকে শট নিচ্ছি। আগুনের গোলার মতো সাঁই সাঁই করে ছুটছে বল। ধনুকের মতো বেঁকে বেঁকে উড়ছে আকাশে। উড়তে উড়তে অদ্ভুত ভঙ্গিতে গোলের মধ্যে ঢুকছে একের পর এক। সতেরো-আঠারো-বাইশ-পঁচিশ। কর্মকর্তারাই টেনে নিয়ে এলেন মাঠ থেকে। আর নয়। হাজার হোক বেদেশী দল।

ইনসাল্টেড ফিল করতে পারে। তারপর আমাকে নিয়ে সারা দেশের সে এক কাণ্ড! ছবি-খবর-সংবর্ধনা। হঠাৎ আবিষ্কার করি, একটি দারুণ সুন্দরী মেয়ে হঠাৎই লেপটে গিয়েছে আমার গায়ে। ভালোবেসে-বেসে আমাকে একাকার করে দিতে চায়। তার হাত হাতের মধ্যে নিয়ে আমি বসে থাকি এক যুগ। তখন আর রিং-টা সাজাতে ইচ্ছে করে না। সবাইকে অকপটে ক্ষমা করে দিই তখন। চিন্টুর কাজ-কর্মগুলোকেও ছেলেমানুষি বলে উড়িয়ে দিতে চাই।

বাসের সামনে থেকে ছেলেটাকে তুলে এনে শোয়ানো হয়েছে ফুটপাথে। কপাল ফেটে রক্ত ঝরছে। নিশ্বাস বইছে মৃদু। ফুটপাথের তপ্ত সিমেন্টের আঁচ পেয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে শরীরের উদোম জায়গাগুলো। পরনে ছেঁড়া ময়লা প্যান্ট আর হাওয়াই শার্ট। গলায় সাঁইবাবার চাকতি। পায়ের চপ্পল ছিটকে পড়েছে দূরে। দেখেশুনে নিষ্কর্মা বলেই মনে হয়। কাজের মানুষের চেহারা এমনতরো হয় না। হন্তদন্ত হয়ে হাঁটছিল নাকি? তাড়া ছিল? না কি অন্যমনস্ক ছিল ভীষণ? মাথার মধ্যে চিতা জ্বলছিল নাকি কোনো কারণে?

অফিসযাত্রী কাজের মানুষগুলো গজগজ করছিল।

—অফিস টাইমে এ এক উটকো ঝামেলী মাইরি!

—তোদের তো কাজকর্ম নেই, সটান শুয়ে পড়লি বাসের তলায়। এখন একবাস মানুষের হাজ্‌রে-খাতায় ঢেরা পড়ে যাবে যে!

—এদের পানিশমেন্ট হওয়া উচিত। ভ্যাগাবণ্ডদের মুভমেন্টের ওপর আইন হওয়া উচিত।

আমি ভাবছিলুম অন্য কথা। ভাবছিলুম, প্রতিদিন, রোজ রোজ, কত কাজ-না-থাকা মানুষকে দু'পায়ে পিষতে পিষতে এগোই আমরা, কাজের মানুষেরা, কাজ করতে। এটা ওর একধরনের প্রতিবাদ নয়তো? আ সিম্বলিক্ প্রোটেস্ট্! নিজের জীবনের বিনিময়ে অন্তত একদিনের জন্যও একবাস কাজের মানুষের গতি রুখে দেওয়া! তাদের দেরি করিয়ে দেওয়া! আশ্চর্য! কেবল আমিই বোধ করি এমনতরো আজব কথা ভাবতে পারি। সেই কারণেই বুঝি অফিসের সাপ্লাই সেকশনের মনোময় দত্ত বলে, বুঝলে ভায়া ভাবুক দাস, কবি-দার্শনিকেরা দুনিয়ার এক নম্বর জঞ্জাল।

ছেলেটার চারপাশে লোক জমে গিয়েছে। ওর উপকারার্থে নানাবিধ জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিচ্ছে জনগণ। যদিও ছেলেটির জ্ঞান নেই এই মুহূর্তে। রাস্তা ফাঁকা করে নিয়ে বাসটা ফের স্টার্ট দিল। হুড়মুড়িয়ে উঠে পড়ল সবাই। আমি কেবল দাঁড়িয়ে রইলুম। বাস চলে গেল। আমি থেকে গেলুম।

কিন্তু কেন থেকে গেলুম? এখন তো আমার তড়িঘড়ি অফিস পৌঁছনোর কথা। সাত-সকালে হন্তদন্ত হয়ে সেই কারণেই তো বেরিয়েছি ঘর থেকে। কিছু জরুরি ফাইল পাইনসাহেবের টেবিলে দেওয়ার কথা ছিল আজ। আচমকা নেমে পড়লুম কেন? ভাবতে ভাবতে ভিড় এড়িয়ে হাঁটছিলুম আমি। আসলে আমি ভেবে দেখেছি, সারাজীবন নিয়ম মানতে মানতে একেবারে নিয়মের দাস বনে গেছি। সেই ছেলেবেলা থেকে সময়ে বিছানা ছেড়েছি। খেয়েছি, ঘুমিয়েছি। একটু-আধটু পড়াশুনো, খেলাধুলো। সবই সাধারণ। নিয়মমাফিক। জীবনে কখনো বেচাল হয়ে উঠতে পারিনি। নিয়মের বেড়া ভেঙে কখনো বড়সড় লাফ মারিনি। তাই এই পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে পৌঁছে কেমন যেন গোবেচারা

বনে গিয়েছি। হাতে শেকল, পায়ে শেকল, চোখে শেকল, মুখে শেকল, সর্বইন্দ্রিয়ের দরজায় শেকল টেনে বসে আছি। আজ তাই আচমকা একটা ছোট্ট নিয়ম ভেঙে ফেলেই কেমন অস্বস্তিতে ভুগছি। নিদারুণ অস্বস্তি। ভয়।

হাঁটতে হাঁটতে চলে এলুম কার্জন পার্কের এক কোণে। গাছ-গাছালির ছায়ায় হাঁটতে হাঁটতে একসময় নেবে পড়লুম রাস্তায়। মাথার ওপর চড়া রোদ উঠেছে। দু'পাশ দিয়ে কাতারে কাতারে যাত্রীবোঝাই বাস-মিনি-ট্রাম ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। কলকল করছে অফিসযাত্রী মানুষ। আমি রাজভবনকে ডাইনে রেখে আকাশবাণীর দিকে পা বাড়ালুম। মাথার ওপর গনগনে আগুনের তাল। ব্রহ্মতালু পুড়িয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু আমি তেমন গা করলুম না।

দুই

আকাশবাণীর পাশ দিয়ে হাঁটছিলুম আমি। দূরে চৌরঙ্গি—পার্ক স্ট্রিট এলাকায় বিশাল সব অট্টালিকা আকাশ ছুঁয়েছে। কারা যে বানায় এত বাড়ি! কারা যে থাকে সেখানে! মাঝে মাঝে সাঁই সাঁই করে হাওয়া কেটে কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে সুন্দর রঙের গাড়িগুলো। রাস্তার ওপর পিছলে যাচ্ছে যেন। দেখতে দেখতে ভারী রাগ জমে ওঠে মনে। কিছু লোভী মানুষ সর্বদাই তৎপর, এটা বুঝি। ওরাই সর্বত্র বানায় এই প্রাসাদতুল্য বাড়ি। ওরাই গঙ্গার পাড়ে মার্বেল পাথরের আকাশ ছোঁয়া মন্দির বানায়। ঈশ্বরকে বন্দী করে রাখে সেখানে। ওরাই আমার সামনে দিয়ে হুল্লোড়ে ভেঙে পড়তে পড়তে হুস্ করে বেরিয়ে যায় লম্বাটে পিচ্ছিল গাড়ি চড়ে। ওরাই গটগটিয়ে বেরিয়ে আসে 'গ্র্যান্ড' থেকে, শ্বেতপাথরের দারোয়ানদের সসম্ভ্রম কুর্নিশ উপেক্ষা করে। ওরা আমাদের প্রাণগুলোকে ভোমরার মতো পুরে রেখেছে অগণিত কৌটোয়। আমি মাঝে মাঝেই ওদের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকি বোকার মতো। ওদের গায়ে হাতটি ছোঁওয়ানোর সাধ্যি নেই আমার। আমিও যে রয়েছি অজস্র কৌটোর একটিতে। তাই তো একদিন যাদুঘরের কাছাকাছি সাজিয়ে ফেলেছিলুম রিং। হাঁটতে হাঁটতে আচমকা শুরু হয়ে গেল লড়াই। অভিনব লড়াই। 'এন্ড কোরাপশন্ সেল' নামে আমার নেতৃত্বে এক গুপ্ত সংস্থা। সংক্ষেপে ই-সি-সি। আমায় কেউ দেখেনি। চেনে না। অথচ আমারই ইঙ্গিতে কৌশলে পৃথিবীর থেকে সরে যাচ্ছে শেঠ চুরণলাল, যমুনাপ্রসাদ, বিন্দর সিং, ভাট অ্যান্ড বর্মা এণ্টারপ্রাইজের ডিরেক্টর চন্দ্রেশ্বর ভাট—মানুষেব দুর্দশার যারা কারণ, একে একে সবাই। পুলিশ আমার টিকিটি ছুঁতে পাবছে না। হাজার হাজার পোস্টারে ভরে দিচ্ছি শহর। কেন মারলুম চুরণলালকে। কেন মারব জয়মল কংকোরিয়াকে। দেখেশুনে সারা শহর তোলপাড়। অপরাধীবা আতঙ্কিত। সাধারণ মানুষ উল্লসিত। গুদোম থেকে বেরিয়ে আসছে চাল-ডাল-আটা-তেল-কাপড়-ওষুধু-দুধ, বাচ্চার খাবার, ছেলের চাকরি, স্ত্রীর প্রেম, সবকিছু। থরে থরে সাজানো হচ্ছে খোলা দোকানে, মানুষজন কিনছে পরমানন্দে। দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করছে ই-সি-সিকে। লড়াইটা সেদিন হয়তো আরো খানিক চলত, কিন্তু তার আগেই আমাকে ছিটকে পড়তে হল রাস্তায়। টুকটুকে লাল রঙের চ্যাপ্টা গাড়িটা হুস্ করে বেরিয়ে গেল আমার সর্বাঙ্গে একরাশ কালো ধোঁয়া ছেড়ে। তেমন কিছু নয়, গোটা দুয়েক মাত্র স্টিচ্। কিন্তু লড়াইটা সেদিন আর জমল না নতুন করে।

কেতকী সঙ্গে থাকলে লোভীর মতো তাকিয়ে থাকে ওই গাড়িগুলোর দিকে। ফস্ করে নিঃশ্বাস ফেলে। চিন্টুটা মাঝে মাঝে গাড়ি নিয়ে আসে। কেতকীকে লোভ দেখায়। চল বউদি, একটুখানি গঙ্গার ধারে বেড়িয়ে আসি। কি সারাদিন বসে থাকো ঘরে! দাদা তো অফিস থেকে ফিরবে সেই আটটায়। সারাদিন একা একা তোমার যে কী কষ্ট! দিন দিন নতুন নতুন গাড়ি যে কোত্থেকে পায় চিন্টু সেটাই আমার কাছে এক রহস্য। পাড়ায়-বেপাড়ায় গুণ্ডামি মস্তানি ছাড়া আর কোথাও কিছু করে বলে তো শুনিনি কস্মিনকালে। কিন্তু কেতকী কেমন ডিম-ভরা মাছের চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকে। বড় অনিচ্ছেয় বলে, আজ থাক ভাই। অন্য দিন। শ্বশুরমশাই মেয়ের কষ্টটা বোঝেন। এমন অপোগণ্ড ছেলে জানলে...। মাঝে মাঝে আমাকে বুঝিয়েও দেন সেটা। আকারে ইঙ্গিতে নয়। একেবারে সোজাসুজি। ফুঁসে উঠেছিলুম একদিন। তীক্ষ্ণ গলায় বলেছিলুম, 'মেয়েকে তো মানুষ করেছেন আলগা পয়সায়।'

'তাতে তোমার কি হে?' গর্জে উঠেছিলেন শ্বশুরমশাই।

'কিছুই না আমার।' মাথার ফুরফুরে চুলের গাছি যথাস্থানে ফিরিয়ে আনতে আনতে আমার জবাব। হিন্দি ফিল্মের নায়কের (প্রেফারেব্লি রাজকুমার: ইয়ে বাচ্চো কা খেল নেহি। কাট্ জায়েগা তো খুন নিকল্ যায়েগা.) ভঙ্গিতে, 'তবে এর ফলে আমার জীবনে একটা চরম দুর্ঘটনা ঘটে গেল কিনা! আপনার ওই আকাশের চাঁদ চাওয়া কন্যাটি আমার সহধর্মিণী যে!'

'সেটা আমারই ভুল। তোমার মতো অপদার্থের সঙ্গে—।'

'ঠিক।' নায়কের মতো মাথা দুলিয়ে আমার জবাব, ' কোনো লোহার কারবারীর সঙ্গে বিয়েটা জমত ভালো। কিংবা অরিন্দম সেনের মতো এক ব্যবসায়ী অধ্যাপকের সঙ্গে।'

'তোমার চেয়ে লোহার কারবারীর ক্ষমতা শতগুণ বেশি। তুমি অরিন্দম সেনের চাকর হবারও যোগ্য নও।'

'বটেই তো!' চোখ মটকে তাকিয়েছিলুম আমি, 'তাই তো আপনার মেয়ে মোটেই দেখতে পারে না আমায়। আমার মতো সৎ, মুখচোরা, গো-বেচারা মানুষ দেখলে তার নাকি বমি আসে।' চোয়াল শক্ত করে বলেছিলুম, 'আপনাকে খুন করা উচিত।'

'ক্যা-ক্যা-ক্যানো?' ততক্ষণে তোতলাতে লেগেছেন শ্বশুরমশাই।

'মেয়ে সাজিয়ে একটা আখমাড়াইয়ের কলের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন আমার, তাই।'

শ্বশুরের নিবে আসা দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে আমার চোখ দুটো বাঘের মতো জ্বলছিল। বার্ন কোম্পানির ঝানু অ্যাকাউন্টেন্ট আমার শ্বশুরমশাই কেমন কুঁকড়ে যেতে লাগলেন আমর দৃষ্টির সামনে। মজাটা তারিয়ে উপভোগ করবার আগেই ভেঙে গেল লড়াইয়ের আসর। শুনতে পেলুম হাড় ফুটো করা গলা, 'কি হল? আর ভাত দোব কিনা বলবে তো! পাথরটি হয়ে থেকে কাকে দেখাচ্ছ তোমার রাগ।' রাগে গরগর করতে করতে কেতকী বলল, 'মাছটা-আশটা কিছুই আনবে না তুমি। আর খাওয়ার সময় আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকবে।'

দু'হাতা ভাত ঠেলে দিয়ে চলে যেতে যেতে ও বলে চলে, 'জিভে নোলা আছে ষোলো আনা। মুরোদ নেই একতিল। কী যে জ্বালায় পড়েছি তোমার সংসারে এসে!' বিরক্তিতে চোখমুখ বিকৃত করে রান্নাঘরে চলে যায় কেতকী।

আমি কেবল ভাবছিলুম, আহা! বেড়ে জমেছিল লড়াইটা। আহা!

কেতকীর অমন মুখ-ভেঙানো বিরক্তিটা সব সময়ে থাকে না। চিন্টু এলে তো কথাই নেই। চায়ে-ওমলেটে, মিষ্টি হাসিতে কেতকী তখন অন্য মানুষ। তাছাড়া সন্ধের সময় টুকুনের অঙ্কের মাস্টার সমরেশ আসে। ফরসা কপাল, ধারালো নাক, পাতলা ঠোঁট, শাদা ঝকঝকে চোখ, চাবুকের মতো চেহারা। সমরেশের ভারী খাতির এ বাড়িতে। প্রমিসিং ইয়ং ম্যান! ব্রিলিয়ান্ট! এমন ছেলেদের ঠেকিয়ে রাখা যায় না। এদের কখনো পঁয়ত্রিশ বছর বয়েসে সুপারভাইজারের চাকরি করতে হবে না। সমরেশ যখন টুকুনকে পড়ায়, কেতকী তখন কিস্তিতে কিস্তিতে আনাগোনা করে টুকুনের পড়ার ঘরে। চা-জলখাবার দিয়ে যায়। খালি প্লেট সরিয়ে নেয়। 'স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাচ্ছে' বলে অনুযোগ করে সমরেশকে। তখন, সারাক্ষণ, কেতকীর চোখদুটো রুপোলি চিতল মাছের মতো উলটিপালটি খায় সমরেশের গায়ে, কপালে, চিবুকে। ওর মাথার চুলের মধ্যে কেতকীর চোখদুটো ঘুরে বেড়ায় সারাক্ষণ। যেন সারা গায়ে শ্যাওলা জড়িয়ে ফলুই মাছের খেলা। টুকুনকে পড়িয়ে একসময় উঠে দাঁড়ায় সমরেশ। উঁচু হিলতোলা জুতোয় মৃদু অহঙ্কারী ছন্দ তুলে নেমে পড়ে রাস্তায়। কাছেপিঠে কোথাও সন্তর্পণে নিঃশ্বাস ফেলে কেউ। সে নিঃশ্বাসের শব্দ কেবল আমিই শুনতে পাই।

তাই তো একদিন টুকুনের পড়ার শেষে গিয়ে বসলুম সমরেশের সামনে।

'টুকুনের পড়াশুনো কেমন চলছে?'

'ভালোই তো।' সমরেশের দেমাকি জবাব।

'তোমার সাবজেক্টটা আমি ঠিক জানিনে। কারণ টুকুনের মা-ই রিক্রুট করেছে তোমায়।'

'ইক্নোমিক্সে এম-এস-সি করছি।'

'অনার্সের রেজাল্ট কেমন?'

'ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিলুম।'

চোখ দিয়ে সমরেশের শরীরখানা এফোঁড়-ওফোঁড় করতে করতে শুধোলুম, 'বলো তো, কোন বাজারে ক্রেতার চেয়ে বিক্রেতা বেশি?' থতমতো খেল সমরেশ। বিড়বিড় করে কী যেন বলবার চেষ্টা করল। আমি থামলুম না। প্রশ্নের পর প্রশ্ন। চমকের পর চমক! লেসাফেয়ার ইকোনমি কাকে বলে? মনোপলিস্টিক্ কম্পিটিশন বলতে কি বোঝ? মনোপ্সনি কি? ব্যাড মানি ড্রাইভ্স্ অ্যাওয়ে গুড্ মানি—ডিসকাস। হোয়াট ইজ মাইক্রো-প্ল্যানিং? হোয়াট ইজ ল' অব্ ডিমিনিশিং ইউটিলিটি?' হু ওয়ন নোবেল প্রাইজ ইন ইক্নোমিক্স লাস্ট ইয়ার? প্রশ্নগুলো সমরেশের নাকের ডগায় ফাটাতে লাগলুম বোমার মতো! একের পর এক। সমরেশ গলগলিয়ে ঘামছে। ওর পাতলা ঠোঁট ঝুলে পড়েছে। চাবুকের মতো শরীরটা নুয়ে পড়েছে লজ্জায়। কুঁজো লাগছে সমরেশকে। স্পষ্ট বুঝতে পারছি, কেতকী এসে দাঁড়িয়েছে আমার পিছনে। পলকহীন দেখছে দৃশ্যখানা।

উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললুম, ' তোমাদের ইউনিভার্সিটির ব্রিলিয়াণ্ট লেকচারার অরিন্দম সেনের চেয়ে আমি অন্তত একশো নম্বর বেশি পেয়েছিলুম বিএ-তে।'

সেদিন কেতকীর বিস্ময়ে বোবা হয়ে যাওয়া চোখদুটো দেখে কি যে মজা পেলুম! ওটাই যেন জীবনের সেরা লড়াই ছিল আমার।

তিন

আকাশের দিকে তাকিয়ে আন্দাজ করলুম বেলা। আকাট দুপুর। অফিস নিশ্চয়ই জমে উঠেছে এতক্ষণে। পাইনসাহেব আমাকে নিশ্চয়ই ডেকে থাকবেন বারকয়েক। ডেকে না পেলে পাইনসাহেবের চোখমুখ কেমন হয়ে ওঠে তা জানি। এই আধা উলঙ্গদের দেশে উনি পুরোপুরি সাহেব। ঠোঁটের কোণে পাইপ চেপে ঘড়ঘড়ে গলায় শব্দের গোলা পাকিয়ে ছুঁড়তে থাকেন সামনে। চোখের মণিজোড়া সারা চোখময় ছুটে বেড়ায়। এক নিঃশ্বাসে অনেক কথা বলে চলেন পাইনসাহেব। একটি বর্ণও ঠিক ঠিক বোঝা যায় না। তবুও কানের লতি লাল হয়ে ওঠে। সম্প্রতি ওঁর বিদেশে যাবার চান্সটা কূলে এসে ডুবে গেল। তাই নিয়ে কী আফশোস তাঁর! পান থেকে চুন খসলে তাই ইদানীং বিপজ্জনক হয়ে ওঠেন পাইনসাহেব। হাঁটতে হাঁটতে পাইনসাহেবের কথাই ভাবছিলুম আমি। ভাবতে ভাবতে মনে মনে কেঁপে উঠছিলুম বারবার। লোকটা আমাকে দেখে যেন কেমন চোখে তাকায়। অত অবাক চোখে আমাকে দেখবার কি আছে, বুঝিনে। সেবার যখন লটারির ফার্স্ট প্রাইজটা পেলুম, চুয়াল্লিশ লক্ষ টাকা, টাকাটার বিলি-বন্দোবস্ত করতে করতে অফিসের শেষ বেলাটা পুরো কাটল। সবরকমে ওটার যখন একটা গতি করা গেল, তখন পাঁচটা বেজে তেরো। মনে পড়ল, যে নোট-টা পাইনসাহেব সাড়ে চারটেয় দেখতে চেয়েছিলেন, সেটা তৈরিই হয়নি। ভয়ানক ভয় পেয়ে গেলুম। অসহায়ের মতো চাইলুম এদিক-ওদিক। পাইনসাহেবের লাল লাল চোখের অদৃশ্য চাউনিতে একেবারে কুকুরের ল্যাজের মতো কুঁকড়ে গেলুম আমি। পাইনসাহেব অবশ্য আমাকে ডাকলেন না সেদিন। কিন্তু ওই কুঁকড়ে যাওয়ার যন্ত্রণাটা আমাকে একেবারে কাবু করে ফেলল। দিন সাতেক বাদে একদিন টিফিন পিরিয়ডে অপ্রত্যাশিতভাবে রিং-এর মধ্যে পেয়ে গেলুম ওঁকে। মুহূর্তের মধ্যে জমে উঠল লড়াই। এমনিতে পাইনসাহেব গড় গড় করে বকে যান সাহেবি কায়দায়। ঠোঁটের জায়গাগুলো ঘনঘন ভাঙচুর হতে হতে মুখ পালটায় অবিরাম। আমি কোনেরকমে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে গিয়ার মেরে মেরে এগোই। ছোলা-কাঁকর চিবোনোর ভঙ্গিতে কথা বলি দু-চারটে। আই স্যাল ট্রাই এগেইন স্যর। আই প্রমিস স্যর।... বাইরে বেরিয়ে এসে ঘাড়, কপাল, চোখের কোল মুছতে মুছতে সারা গায়ে কেমন যেন ব্যথা অনুভব করি। কেমন লাথি খাওয়া কুকুরের মতো মনে হয় নিজেকে। সেদিন কিন্তু রিং-এর মধ্যে পাইনসাহেবকে পয়লা চটকায় কাবু করে ফেললুম। পাইপের ধোঁওয়ায় তাকাতে পারছিলেন না পাইনসাহেব। চোখের কোনাদুটো কুঁচকে ফার্স্ট অ্যাটাক করলেন তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে।

'বি সিয়োর, অ্যান আনউইলিং হর্স মে বি হুইপ্‌ড্‌। বাট আ ডেড হর্স শুড বি কিক্‌ড্‌ অফ।'

'আই ডোণ্ট ওয়াণ্ট টু হিয়ার দ্য স্টোরি অব আ ডেড হর্স ফ্রম আ হাংরি ভালচার, ফর, ইট অলওয়েজ ফাইন্ডস আ হর্স ডেড।' কোমরে দু'হাত তুলে দাঁড়ালুম আমি। ধর্মেন্দ্র! 'অ্যান্ড মোর ওভার, আ হর্স ইজ মোর আর্ট ফুল ইন কিকিং দ্যান আ ম্যান।' আমি পাইনসাহেবের চোখে চোখ রাখলুম সরাসরি।

থরথরিয়ে কাঁপছিলেন পাইনসাহেব। মুখ থেকে সরিয়ে নিয়েছেন জ্বলন্ত পাইপ। চোখজোড়াকে জ্বলন্ত অঙ্গার বানিয়ে বললেন, 'আই কাণ্ট বিলিভ! ডু য়্যু অ্যাকচুয়ালি

মিন দ্যাট!'

চোখের কোণে বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়ে বললুম, 'হ্যাভ য়্যু এনি ডাউট? লেট মি প্রুভ ইট বাই অ্যাকশন।' আমি এক-পা এগিয়ে গেলুম।

পাইনসাহেবের চোখ-মুখ মুহূর্তে বদলে গেল। ভয়ে আতঙ্কে দুচোখ ছানাবড়া করে রিভলভিং চেয়ার পিছিয়ে নিতে লাগলেন ক্রমশ। আমি দু-পা এগিয়ে পকেটের থেকে খামটা বের করে কাচের টেবিলের ওপর ফেলে দিলুম রঙের টেক্কা দিয়ে তুরুপ করবার ভঙ্গিতে।

'দিস ইজ মাই রেজিগনেশন।'

গটগট করে চলে এলুম কাচের দরজা ঠেলে।

পেছনে পাইনসাহেব আকুল গলায় ডাকছিলেন, মিঃ বোনার্জি, প্লিজ স্টপ। লিশন টু মি। প্লিজ, মিঃ বোনার্জি।

আমি তখন অফিস ছাড়িয়ে রাস্তায়। মুক্ত বিহঙ্গ আমি। নিজেকে জড়িয়ে ধরে আদরে আদরে ভরিয়ে দিতে লাগলুম। অপু, এমন ইংরেজি তুমি কোথায় শিখলে সোনা? কোন স্কুলে? অমন চোখা ডায়েলগ তোমায় কে শেখালে? আহা, তোর জিভখানা সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখতে ইচ্ছে করছে রে! আরো অনেক কথা বলার ইচ্ছে ছিল আমার অপুকে। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে তাকালুম মনোময় দত্তের গলা শুনে। কি হে ভাবুক দাস, ল্যাম্প পোস্টের তলায় দাঁড়িয়ে কি ভাবা হচ্ছে। ওদিকে টিফিন টাইম যে কাবার! বলেই তার বহু উচ্চারিত হাড় জ্বালানো ঠাট্টাখানা যান্ত্রিক গলায় আউড়ে গেল মনোময়। ভেবে ভেবে, ভেবে দেখলুম, ভেবে কোনো লাভ নেই। কারণ ভাবতে ভাবতে কোনোদিনও ভাবনার কূল পাব না। তাই ভেবেছি, ভাবার চেয়ে না ভাবাই ভালো। চোখ মটকে মনোময় বলল, কি ব্রাদাব. কথাটা ভাবায়? আমার মনটা বি-রি করছিল ঘেন্নায়। কিন্তু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে হাত-পা হিম হয়ে এল। কথা না বাড়িয়ে সেকশনের দিকে পড়ি কি মরি দৌড় লাগালুম।

মনোময় যে তলে তলে আমার কত ক্ষতি করছে, তা আমি বুঝি। কিন্তু কিছুই করতে পারি নে। আমার আজকের ডুব মারার চান্সটা কি ও নেবে না? 'এইসব ইর্‌রেসপনসিব্‌ল লোকদের নিয়েই আমাদের কোম্পানি! দেখুন, হয়তো নুন শো-তে সিনেমা দেখছে।' পাইনসাহেবের কানে এতক্ষণে কথাগুলো নির্ঘাৎ ঢেলে দিয়েছে মনোময়। হুহ! নুন শো-তে সিনেমা দেখবে কি না অপরেশ ব্যানার্জী। যে কিনা এই পঁয়ত্রিশ বছর বয়েস অবধি একটাও নিয়ম ভাঙতে পারল না। কিন্তু আমি জানি, পাইনসাহেব তাই বিশ্বেস করবেন। মনোময়ের কথা বিশ্বেস করার জন্য পাইনসাহেব উঁচিয়ে থাকেন। অফিসে যতটা পারেন বিশ্বেস করেন। বাকিটা সন্ধেবেলায় মনোময়েব বাড়িতে চা খেতে খেতে। মনোময়ের একখানা দারুণ খানদানি বউ আছে। সে নিজের হাতে চা এগিয়ে দিলে মনোময়ের যে-কোনো কথা বিশ্বেস করতে হয় পাইনসাহেবকে।

হাঁটতে হাঁটতে এলুম গঙ্গার ধারে। খানিক দূরে আউটরাম। এখন দুপুর গড়তির দিকে। তাও রোদ্দুরে ঝাঁঝ আছে বেশ। আমার সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে সগসপে। উস্কোখুস্কো চুল হাওয়ায় উড়ছে। এলাকাটা এখন বেশ নির্জন। গাছের ডালে দু-চারটে কাক কিংবা শালিখ। একেবারে পাড় বরাবর দাঁড়ালুম। পায়ের নীচে অনেক তলায় আছড়ে পড়ছে জল, ছলাৎ ছলাৎ। আশেপাশে ভাজাওয়ালা আর বাঁদরওয়ালারা ঘুরঘুর করছে।

সিমেন্টের বেঞ্চিগুলোতে নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছে ভবঘুরের দল। কেতকীকে নিয়ে এসব জায়গায় বারকয়েক হেঁটেছি আমি। গঙ্গার টানেই আসতুম। নদীর কাছে চিরদিন আমি নতজানু।। কেতকীকে নিয়ে গঙ্গার পাড়ে বেড়াতে ভালোই লাগত প্রথম প্রথম। খুব মান্‌জা দিয়ে বেড়াতে বেরোত (এখনো বেরোয়, তবে আমার সঙ্গে নয়) কেতকী। খুব স্মার্ট লাগত ওকে। চারপাশে জোড়ায় জোড়ায় স্মার্ট যুবক-যুবতীর মেলা। নিজস্ব গো-বেচারা ভাবখানাকে ঢাকবার জন্য একখানা খোলশ পরে থাকতুম আমি। ঔদাসীন্যের খোলশ। একটা ছড়ানো-ছেটানো এলোমেলো ভাব। যেন এক আপনভোলা মানুষ। সেটাই যে কেতকীর এত অপছন্দ ছিল, তা তখন বুঝিনি। মাঝে মাঝে ঝাঁঝিয়ে উঠত কেতকী, কী যে ক্যাবলার মতো হাঁটো! তোমার সঙ্গে হাঁটাই ঝকমারি।' দিনকতক বাদে কেতকী মুখে কুলুপ আঁটল। সারাক্ষণ রাস্তার দু-ধারে চোখ ফেলতে ফেলতে নির্বিকার হেঁটে যেত সে। স্মার্ট ছেলেগুলোর দিকে হ্যাংলার মতো তাকাত, চোরা চোখে। কিছুদিনের মধ্যেই আমি আবিষ্কার করলুম, আমরা দুজন থেকেও নেই দুজন। পাশাপাশি, কিন্তু একা একা, আলাদা আলাদা হাঁটছি আমরা। শুধু রাস্তায় নয়, ঘরেও আমাদের ইদানীং পাশাপাশি অথচ নিঃসঙ্গ বসবাস।

কেতকী কিন্তু সর্বদাই মুখে কুলুপ এঁটে থাকে না। চিণ্টু বাড়িতে এলে হঠাৎ যেন উচ্ছল হয়ে ওঠে সে। চিণ্টু আসে। কশেরুকা টানটান করে ঘরে ঢোকে। চওড়া ছাতি চিতিয়ে সোফায় বসে। কেতকীকে চায়ের ফরমায়েশ করে।

কেতকী অবশ্যি ততক্ষণে চায়ের জল চড়িয়ে দিয়েছে। গলায় চাপা অভিমান, 'অ্যাদ্দিনে বউদির চায়ের কথা মনে পড়ল? ইদানীং আস না কেন? রাগ করেছ?'

তার উত্তরে চিণ্টু চোয়াড়ে চোখে হাসে। রকের ভাষায় কতকিছু অনর্গল বকে যায়। কায়দা করে সিগারেট ফোঁকে। কেতকীর দুচোখে তখন একজোড়া চকচকে ছোরা আড়াআড়ি বসানো। ছোরাদুটো অবিরাম ঘুরতে থাকে। এদিক-ওদিক, এদিক-ওদিক। একএকদিন শরীরের তাবৎ রক্ত মাথায় এসে জমে। কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে চিণ্টুর সামনে গিয়ে কাঠকাঠ হয়ে দাঁড়াই।

আমাকে দেখে কেমন আজব ভঙ্গিতে হাসে চিণ্টু। বলে, 'বউদি, অমন স্মার্ট মেয়ে তুমি, দাদার মতো ক্যাটাভেরাস লোকটাকে কি করে পছন্দ করলে বলো তো? তোমরা মেয়েরা মাইরি মিস্টিরিয়াস।'

শুনে ভারী অদ্ভুত গোছের হাসি খেলে যায় কেতকীর ঠোঁটে।

চিণ্টুর কথার একখানা জুতসই জবাব দেওয়া যেত, কিন্তু কি হবে! খুব ভারী কিংবা সূক্ষ্ম কথা ওর মগজ অবধি পৌঁছুবে না। ওকে সমঝাবার একটাই উপায়। ঢিসুম্ ঢিসুম্। সেটা আমার ঠিক আসে না। এলেও প্রয়োগ করবার উৎসাহ পাইনে। কারণ কেতকীর ওই হাসি। ওই হাসিখানা দেখলেই চোখের সুমুখ থেকে নিবে যায় জগতের সব আলো। অন্ধকার পেলে শরীরের তাবৎ কোষ ঘুমিয়ে পড়তে চায়। মনে মনে হাজার বার প্রশ্ন করি, অমন হাসি তুমি হাসো কি করে কেতকী? কেন হাসো অমন আশ্চর্য হাসি?

চার

রেসকোর্সের কাছাকাছি পৌঁছুতে বিকেল পড়ে এল। এর মধ্যে আমি অনেক সবুজ ঘাস দু-পায়ে দলেছি। চিনেবাদাম খেয়েছি ঝাল-নুন দিয়ে। ঠা-ঠা রোদ্দুরে বরফজল। এখন কোথায় যাওয়া যায় ভাবছি। এক্ষুনি বাড়ি ফেরা চলবে না। রোজ আমি আটটা নাগাদ বাড়ি ফিরি। আজ জলদি ফিরলে কেতকীর ভুরু ধনুকের মতো বেঁকে যাবে। অনেক প্রশ্ন, জেরা, অনেক অবিশ্বাস, সন্দেহ আমাকে ঝাঁঝরা করতে থাকবে যতক্ষণ না কেতকীর পুরোপুরি সন্দেহ মোচন হয়। তা ছাড়া গিয়েই-বা লাভ কি? কোন আনন্দটা ওত পেতে রয়েছে সেখানে? বরঞ্চ বলা যায় নিজের ঘরখানা আমার কাছে একটি বিপদসংকুল অরণ্য। নির্জন অথচ ভয়ংকর। নির্জন অরণ্যের চেয়ে জনারণ্য ভালো। আমি রেড রোড ধরে হাঁটতে লাগলুম। পার্ক স্ট্রিট কিংবা চৌরঙ্গির ভিড়ে খানিকক্ষণ হারিয়ে যাওয়া চলে।

মাত্র কয়েক পা হেঁটেছিলুম। আচমকা সামনের রাস্তায় চোখ পড়তেই ভূত দেখার মতো চমকে উঠলুম। সারা দেহে তাৎক্ষণিক বিদ্যুৎ প্রবাহ! মস্তিষ্কে ধাতব শিহরণ। কেতকী পায়ে পায়ে হেঁটে আসছে সামনের রাস্তা দিয়ে। খুব সুন্দর একখানা ভয়েলের শাড়ি পরেছে কেতকী। সুন্দর করে সেজেছে। ভারী খুশিখুশি পায়ে রঙিন বেলুনের মতো ভাসতে ভাসতে চলেছে ও। পাশেই একখানা বিশাল বট। এক লাফে গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়লুম আমি। জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে থাকি। পরমুহূর্তেই দেখি লারেলাপ্পা গান গাইতে গাইতে উলটো দিক থেকে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে চিন্টু। কেতকীর থেকে ওর দূরত্ব পঞ্চাশ-ষাট ফুটের বেশি নয়। আমি গাছের গুঁড়ির এক্কেবারে পাশাপাশি চলে আসি।

কেতকী লঘুচ্ছন্দে ,হেঁটে যায় আমার পাশটি দিয়ে। উলটোদিকে থাকবার দরুন আমাকে দেখতে পায় না। ওর বেগুনি ছাপা শাড়ির আঁচল পতপতিয়ে উড়ছিল হাওয়ায়; তার মৃদু সৌরভ আমার নাকে ধাক্কা মারে। আমার সহসা ভীষণ বমি পায়। গাছের গুঁড়ির গায়ে প্রাণপণ মিশে গিয়ে আমি চোখ বুঁজি। ভাবি, ঠিক এমনি ভঙ্গিমায় ক্রুশবিদ্ধ হয়ে কোন এক কালে এক অপমানিত মানুষ বিশ্বের তাবৎ অপরাধীর হয়ে ক্ষমা ভিক্ষে করেছিলেন ঈশ্বরের কাছে।

'আরে বউদি যে!' চিন্টুর উল্লসিত গলা শুনতে পেলুম আমি।

'চিন্টু! তুমি এখানে?'

'আমি তো বিকেলের দিকে এই তল্লাটেই থাকি। কিন্তু তুমি এই নির্জন রাস্তায় একাকিনী? ঠিক মনে হচ্ছে যেন শ্রীরাধিকের মতো অভিসারে চলেছ।'

'বাহ্! তুমি তো বাংলা ভালোই জানো।'

'আমি অনেক কিছুই ভালো জানি। কিন্তু চান্স কই?'

'জায়গাটা খুব নির্জন। তাই না? কেমন ভয় ভয় করছিল। ভাগ্যিস তুমি এলে। বুকে দম এল।'

'তাই বুঝি?' চিন্টু আত্মপ্রসাদের হাসি হাসে, 'কিন্তু চলেছে কোথায়?'

'এই, একটু গঙ্গার ধারে। ওই ওদিকটায়। আমার দুজন বান্ধবী আসবে। আমরা ফি-বুধবার এখানে এসে আড্ডা মারি বিকেলে। সেই কলেজের অভ্যেস।'

'তাই বুঝি? চলো, আমিও তোমার সঙ্গে যাই।'
'যাহ! কি যে বলো! ওখানে আমার বান্ধবীরা থাকবে।'
'থাকলোই বা। ওদের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেবে। দেবে না?'
'দেব। কিন্তু আজ নয়। অন্য দিন।'
'না, আজই।'
'না, অন্যদিন। চিণ্টু প্লিজ।'
'আচ্ছা আমার একটা কথা শোনো।'
'বলো।'
'আজ থেকে তুমি ওই পুরোনো অভ্যেসটা পালটাও। আমি তোমাকে একটা নতুন অভ্যেস শেখাব'
'কি?'
'আমরা ফি-বুধবার আড্ডা মারব গঙ্গার ধারে। ফুর্তি করব। ওখানে আমার এক মক্কেলের একটা দারুণ ফারনিসড ফ্ল্যাট রয়েছে। ঠিক তলায় গঙ্গা। দারুণ হবে, তাই না? চলো, আজই তোমায় ঘরখানা দেখিয়ে আনি।'
'আজ নয়, আর একদিন।'
'আর একদিন কেন? আজই।'
'না, আজ নয়।'
'তুমি, মাইরি, বড্ড বোকা মেয়ে। এই জন্যেই ওই ক্যানটাংকারাস লোকটার সঙ্গে অ্যাদ্দিন আছ। আমি হলে কবে পাছায় লাথি কষিয়ে ভেগে যেতাম। মাঝে মাঝে আমার কি মনে হয় জানো?'
'কি মনে হয় চিণ্টু?'
'মনে হয়, লোকটাকে একদিন চাকু চালিয়ে দিয়ে তোমায় নিয়ে কাটি।'
কেতকী হেসে ওঠে, 'সত্যি? অতখানি ভেবে ফেলেছ?'
'বিশ্বেস হচ্ছে না তোমার? বলো তো আজ রাতেই প্রমাণ করে দি।'
'এই চিণ্টু, আমি চলি ভাই। আমার মাথাটা খুব ধরেছে।'
'কোথায় চললে?'
'আমি বাড়ি ফিরব।'
'ধুশ। তুমি না মাইরি বড্ড বেরসিক। চলো, চলো। গঙ্গার দিকের ব্যালকনিতে বসে তোমার মাথা টিপে দোব আমি।'
'হাত ছাড়ো চিণ্টু। আজ তুমি অনেক অসভ্যতা করে ফেলেছ।'
'তুমিও মাইরি একটু বাড়াবাড়ি করছ আজ। চিণ্টু মিত্তির মেয়ে-মানুষের অত ছেনালিপনা সহ্য করে না।'
'আমি কিন্তু চেঁচাব।'
'চেঁচাবে? তারপর বাড়ি ফিরবে না? পাড়ায় থাকবে না? চিণ্টু মিত্তির কারো লাল চোখ দেখে না। শোন মেয়ে, আমি হাঁটছি। তুমি লক্ষ্মী মেয়ের মতো আমাকে ফলো কর। ওই যে শাদা বাড়িটা, আটতলা, ওখানেই যাব আমরা। আমার সঙ্গে এলে তো ভালোই। নইলে,... নইলে মিস্টারকে আজ সন্ধ্যেবেলায় আর বউয়ের কোলে ফিরতে হবে না।'

বিচ্ছিরি গোছের হাসি হেসে চিণ্টু হাঁটতে লাগল ধীর পায়ে।

কেতকী পাথরের মতো দাঁড়িয়েছিল।

বলল, 'তুমি আমাকে খুব ভুল বুঝে ফেলেছ চিণ্টু। বাড়িতে তোমাকে আদর করে চা-টা খাওয়াতুম বলে—। যাগ্‌গে, আমি চললুম। আমার স্বামীর ঘরে ফেরার সময় হল।'

'এই বোকা মেয়ে—।' চিণ্টু কেতকীর দিকে দু-পা এগিয়ে এল, 'ওই বিটকেলে লোকটা ঘরে ফিরলেই-বা কি, না ফিরলেই-বা কি, বলতে পারো? অরিন্দমদা বলে, তুমি একটি রামবোকা। নইলে—।'

'এ সব কথার জবাব দিতে আমার রুচিতে বাধছে। তবুও বলি, তুমি তো কোন ছার, তোমার অরিন্দমদা তো কোন ছার, তোমার, আমার, আমাদের দেখা অনেক তাবড় তাবড় মানুষও ওই বিটকেল লোকটার নখের যুগ্যি নয়। নেহাৎ ওর কপাল খারাপ, তাই—।' বলতে বলতে পিছু ফিরে হাঁটতে লাগল কেতকী। সহসা একটা চলন্ত মিনিবাসে প্রায় ঝাঁপিয়ে উঠে পড়ল ও।

অল্প দূরে দাঁড়িয়ে ফ্যাল ফ্যাল চোখে সে দৃশ্য দেখল চিণ্টু। তারপর পায়ে পায়ে চলে গেল গঙ্গার দিকে।

গাছের আড়াল থেকে আমি নিঃশব্দে বেরিয়ে এলুম।

পুরো ব্যাপারটা যেন অবিশ্বাস্য লাগছিল। একটা জমজমাট নাটকের দৃশ্য যেন অভিনীত হল আমার সামনে। আমি সহসা বুশ শার্টের দু'খানা বোতাম খুলে দিলুম। গঙ্গার উদ্দাম হাওয়া এসে খেলা করতে লাগল আমার বুকের চারপাশে।

খানিকক্ষণ এলোপাথাড়ি হাঁটলুম আমি। লক্ষ্যহীন। একখানা প্রিয় রবীন্দ্রসংগীতের কয়েক লাইন গুনগুনিয়ে গাইলুম। একটা মিছিল চলেছে সামনের রাস্তা ধরে। লড়াকু মানুষের মুষ্টিবদ্ধ মিছিল্। তাদের উচ্চকিত কণ্ঠস্বর বিকেলের উদ্দাম হাওয়াকে ছিন্নভিন্ন করছে। ওদের উচ্চারিত শব্দগুলো আমার মস্তিষ্কের পাকযন্ত্রে সুসিদ্ধ হতে থাকে। আমার ডান হাতখানা সবার অলক্ষ্যে উঠে যায় আকাশে, স্বর্গের কাছাকাছি।

মিছিলের সঙ্গে ভিড়ে যাবার তাল করছিলুম আমি। ঠিক তখনই দেখলুম, দূরে, বেশ খানিকটে দূরে চিণ্টুকে। একটি মেয়ে ত্রস্ত পায়ে হেঁটে চলেছে। চিণ্টু ওর পিছু পিছু আসছে। হাত-পা নেড়ে কত কিছুই বলছে। আমাকে কে যেন তাড়িয়ে নিয়ে চলল মেয়েটির দিকে।

কাছাকাছি আসতেই চিণ্টুর গলা পেলুম, 'রাগ করো না ডার্লিং। আমি তোমাকে একটুখানি ভালোবাসতে চাইছি। ফিরে তাকাও খুকুমণি।'

আমি চিণ্টুর সামনেটিতে গিয়ে দাঁড়ালুম।

আমাকে দেখে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল ও। বলল, 'কি হে অপরেশবাবু, তোমার তো এখন অফিসে থাকবার কথা। তুম্মো কি মেয়ের খোঁজে বেরিয়েছ মাইরি?'

আমি সহসা ওর তলপেটে লাথি কষালুম। চিণ্টুর দশাসই শরীরখানা ছিটকে পড়ল।

'বাব্বা, তোমার পায়ে তো জোর মন্দ নয়।' ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল চিণ্টু, 'বুঝতে পারিনি। তো, এবার আমার পায়ের জোরটা একটু দেখ।'

আমি ততক্ষণে কোমরের বেল্ট খুলতে শুরু করেছি।

'আরে ব্যস! তুমি বেল্টও বাঁধো নাকি? আমি তো ভাবতুম দড়ি দিয়ে পেণ্টালুন

পরো।'

আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিল চিণ্টু, তার আগে আমার বেল্টের প্রচণ্ড আঘাত সশব্দে আছড়ে পড়ল ওর মুখে। ওর ডান গাল, নাক, বাঁ-চোখ ও কপাল জুড়ে একটা পুরোনো তেঁতুলে-বিছেকে শুয়ে থাকতে দেখলুম আমি। আমার সর্বাঙ্গে এক ধরনের জ্বালা। মনে হচ্ছিল, একটা আগুনের কুণ্ডে স্নান সেরে যেন এইমাত্র উঠে এলুম আমি। গা থেকে ফোঁটা ফোঁটা গলিত অগ্নি যেন ঝরে ঝরে পড়ছে এখনো।

মেয়েটিকে বললুম, 'আপনি আর থাকবেন না। বাড়ি চলে যান।'

চিণ্টু ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। যন্ত্রণায়, ক্রোধে ওর মুখখানাকে কদাকার লাগছিল। আচমকা কোমর থেকে চকচকে ছুরিখানা বের করে ডান হাতে বাগিয়ে ধরল ও।

আমি চকিতে চারপাশের চৌহদ্দিটা দেখে নিলুম। এদিকে গঙ্গা, ওদিকে শহিদ মিনার। মধ্যিখানে কেবল আমি আর চিণ্টু মিত্তির।

রিং-এর মধ্যে দাঁড়িয়ে তৈরি হলুম আমি। কল্পিত নয়, জীবনের প্রথম সত্যিকারের রিং।

পুত্রেষ্টি

এক

সন্ধ্যাবেলায় বেড়ার আগড় ঠেলে পুরুষালি গলা, 'পল্লাদ আছু রে?'

শেষ কার্তিকের জ্বর-জ্বর সন্ধ্যা। ঘরের মধ্যে চুপটি করে শুয়েছিল পার্বতী। গলা শুনেই বোঝে, কংসমামা।

খিড়কির সরু গাং-দিয়ালিতে বসে মহুলের পচাই গিলছিল প্রহলাদ তুঙ। গিলছিল, আর আকাশের তারা দেখছিল একমনে। কৃষ্ণপক্ষ। আকাশের নিকষকালো চাঁদোয়ায় অসংখ্য তারা। যেন অসংখ্য বাচ্চার দুষ্টু চোখ। ওদের সঙ্গে চোখে-চোখে কথা কইতে কইতে রোজ প্রহলাদ তুঙ-এর নেশাটা গাঢ় হতে থাকে। রাত বাড়ে। কংসাবতীর বুক থেকে ধেয়ে আসে হিমেল হাওয়া। প্রহলাদ তুঙ গাং-দিয়ালিতে মাথা ঠেকিয়ে একসময় ঘুমিয়ে পড়ে। গভীর রাত্রে পার্বতী ওঠে। ওকে জাগিয়ে তুলে নিয়ে যায় ঘরে।

কংসমামার ডাকখান প্রহলাদ শুনতে পেল কিনা বুঝতে পারে না পার্বতী। একবার মনে হয়, উঠে বসে। বাইরে এসে একটা সাড়া দেয়। কিন্তু ইচ্ছে করে না। ইদানীং শুলে আর উঠতে ইচ্ছে করে না। বুকের ভেতরটা বোধ লেয় পোড়কুলের মজা দহ। ওপরে জল আছে, তাই মনে হয়, না জানি কত গহিন দহের বুক! আসলে হাতটাক গহিন। বাকিটা বালি-কাদা, ইসিড়-বিসিড়ে ভরে এসেছে অলক্ষ্যে।

'ও ভাগ্‌না-বউ? পল্লাদ নাই?' কংস তুঙ চলে এসেছে দাওয়ার কাছাকাছি। অগত্যা পার্বতীকে গা নাড়া দিতে হয়। রাগটা উথলে ওঠে প্রহলাদের ওপর। রোজ রোজ উই পিছ-প্যাঁদাড়ে পচাই গিলে বেহেড হয়ে থাকবে। আর সন্ধ্যাটি বাজলেই কোনো-না-কোনো বাহানায় চলে আসবে কংস। জানে, ভাগনা তার পচ্ছিমের গাং-দিয়ালিতে বেহেড, তবু সোজা চলে আসবে পার্বতীর ঘরের দোরগোড়ায়। চাপা গলায় ডাকবে, 'ও, ভাগনা-বউ। পল্লাদ নাই?' নেশা কাটলে প্রহলাদ রেগে কাঁই হয়। দ্বাপরের কংসমামার শুধু ভাগনার উপরই জাতক্রোধ ছিল। এ শালা কলির কংসমামার লজর ফের ভাগনা-বউয়ের দিকেও। আড়াল পেলেই মায়া-কাঁদনা কাঁদে শালা। আহারে, তুয়াকে দেইখ্যে বড় দুখ লাগে রে ভাইগ্‌না-বউ: আবাদি মাটি। শুধু বীজের অভাবে পতিত বইল্যাক্ সারাজনম। পল্লাদের বীজগুলান সব মরা। বলতে বলতে দাওয়ার ওপর জাঁকিয়ে বসে কংস তুঙ। মহাভারতের গল্প জোড়ে। দ্রৌপদীর পাঁচ-ভাতার থাইক্‌বার কারণ বিশ্লেষণ করে। উপমা দেয়। কুন্তীর তো পাঁচ ছেইলাই পাঁচ জনার। তব্বো ইয়ারা শাস্তর মতে সতী। আসলে, জমিন যাতে অফলা না থাকে। এখনো নাকি পাহাড়িয়া দেশে একাধিক পুরুষের একটি মাত্তর রমণী। কাজেই রমণী নামক জমিনে এক কিসিমের বীজ জাত না হলে, দুস্‌রা কিসিমের বীজ বোনাটা যে শাস্ত্রসম্মত, এটাই কংস তুঙ প্রাণপণে বোঝাতে চায় পার্বতীকে। শুনতে শুনতে সারা গা কেঁপে-কেঁপে ওঠে পার্বতীর। ক্ষীণ গলায় বলে,

'তুমার ভাইগ্না, উই পচ্ছিমের গাং-দিয়ালিতে। পচাই খাচ্ছে।' কংস তুঙ সেটা বিলক্ষণ জানে। সেই কারণেই আরো জাঁকিয়ে বসে।

আজ কংসমামা দাওয়ায় পা-খান তুলবার উপক্রম করতেই প্রমাদ গুণল পার্বতী।

দরজার মুখে এসে খটখটে গলায় বলল, 'তুমার ভাইগ্না উখ্যেনে।' পার্ব্বতীর গলায় কিছু ছিল। কংস তুঙ পলকের তরে থমকে দাঁড়িয়ে রইল এক ঠ্যাং তুলে। তারপর গাং-দিয়ালির দিকে পা বাড়াল। পার্বতী ফের গিয়ে শুয়ে পড়ল ঘরে।

আজ অনেকখানি খেয়েছে প্রহলাদ। কিন্তু কেন জানি, নেশাটা আজ ঠিক জমছে না। আকাশের তারাগুলো বাচ্চাদের চোখের আদল নিচ্ছে না কিছুতেই। প্রহলাদের কাছে এ এক যন্ত্রণার সময়।

পাশে বসে প্রহলাদের পিঠে হাত রাখল কংস তুঙ। বলল, 'ভাইগ্না রে, তুয়ার কপালটা বোধ লেয় ইবার খুলল্যাক।'

বুজে আসা চোখ অল্প অল্প খোলে প্রহলাদ। ভুরু কুঁচকে তাকায়। সহসা দু'চোখ জ্বলতে শুরু করে প্রহলাদের। বলে, 'ফের কুথাও হত্যা দিতে হবেক পার্বতীকে?'

সে কথায় বড় দাগা পেল কংস তুঙ। শালা, এ দুনিয়ায় কাবো ভালোটি করতে নাই। আসলে, পার্বতীকে দেখা অবধি ভাগনা-বাড়িতে আনাগোনা জুড়েছিল কংস তুঙ। ভাগনা-বউটিকে দেখে চোখ ফেরানো দায়। কিন্তু আহারে, অমন চৈতালি ডিংলার মতন রূপ-গতর বুঝি বৃথাই যায়। অমন সুপুরুষ্ট বৃক্ষ, একটা ফল ধরল নাই বলে মনস্তাপে শুকাতে লেগেছে ডগা থেকে। দেখে ভারী কষ্ট হয় কংস তুঙ-এর। মাঝে মাঝেই তার মনস্তাপের কথা জানায় পার্বতীকে।

ভাগ্না-বউকে পুত্রবতী করবার জন্য চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখেনি কংস তুঙ। রানীবাঁধের পাশে বামনাসিনি পাহাড়ে নিয়ে গেছে পার্বতীকে। হত্যা দিইয়েছে দু-দিন দু-রাত। ঢেলা বাঁধিয়েছে বিষ্টুপুরের কুরবানতলায় পীরের থানে। ডিহরের বাবা ষাঁড়েশ্বরকে মানত করেছে। রাজ্যের জড়ি-বটি, কবচ-তাবিজ এনে বেঁধে দিয়েছে ভাগনা-বউয়ের অঙ্গে।

বছর দু-তিন আগে খাতড়ার মশক পাহাড়ের গুহায় এক ত্রিকালজ্ঞ সন্নিসী থাকতেন। তন্ত্রমতে শক্তির সাধনা করতেন তিনি। কংস তুঙ পার্বতীকে সেখানেও নিয়ে গিয়েছিল। দেবীর থানে হত্যা দিয়েছিল পার্বতী। তৃতীয় রাতে স্বপ্নাদেশ হল, গত জনমে কংস তুঙ তুয়ার সোয়ামী ছিল। উয়াকে সুখ দিতে পারিস নাই। এ জনমে উয়াকে খুশি কর। তেবে তুয়ার বাজাঁ নাম ঘুচবেক।

ভোখে-শোষে, আধো-চেতনায় কথাগুলো কানে গিয়েছিল পার্বতীর। পরদিন থেকে কেমন যেন লিশ্চুপ হয়ে গেল মেয়া। ধীরপায়ে মশক পাহাড় থেকে দাঁড়শোলের দিকে পা বাড়াল সে। পিছু পিছু হাঁটতে থাকে কংস তুঙ, 'কি আদেশ পেইলি রে মা? বল্। বল, আমাকে।'

লা কাড়ে নি পার্বতী। কিছুতেই তার মুখ থেকে বাক্যি খসাতে পারেনি কংস তুঙ।

এরপর বহুবার বহু দেবতার থানে নিয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করেছে কংস তুঙ। পার্বতীকে এক চুল নড়াতে পারেনি কিছুতেই। মেয়্যার অমন ভাবান্তরের কারণটা কংস তুঙ বোঝে। শালা সন্নিসী, গলাটা খেলাতেই পারে নাই সেদিন। স্বপ্নাদেশ দিবার গলা হল সিদ্ধ গলা। দৈবী স্বর বারাবে তা থিক্যে। এ শালা সাধুটা ছিল দু-লম্বরি।

কিন্তু খরচ-খরচা কম হয়নি এ সবের তরে।

অমন সোনার প্রতিমা ভাগ্‌না-বউয়ের ডালেপালায় এক-আধটা কুঁড়ি ধরাবার আশায় কোনো খরচকেই খরচ বলে মনে করেনি কংস তুঙ। বারেকের তরে কোনোদিন চায়নি সে পয়সা প্রহলাদের কাছে। এখন মনে মনে নিজেকে বাখান দেয় কংস তুঙ। শালা, খোব আশায় আশায় ছিলি রে চাষা! জলের মতন পয়সা ছড়ালি। ভাগ্‌না-বউ কিন্তু একতিল সুখ দিল নাই উয়ার 'পুর্ব-জনমের সোয়ামী'কে।

প্রহ্লাদের কথাটা তাই খচ করে বিঁধল কংস তুঙ-এর বুকে। দেবতার থানে যাওয়া নিয়ে এর আগেও বারকয়েক বিঁধেছে প্রহ্লাদ। পার্বতী নিশ্চয় সব কথা বলেছে ওকে। কংস তুঙ যেন শুনেও শোনে না ভাগ্‌নার কথা। কিন্তু বুকের মধ্যে চিনচিন করে ওঠে। মনে মনে ওই নকল সাধুকে বাখান পাড়ে। শালা, ঢ্যামনা সাধু! মুরাদ নাই তো অমন কাজ ধর ক্যানে হে?

'অরে লয় রে লয়।' কংস তুঙ বিকারহীন গলায় বলল, 'তুয়ার নামে হেলিয়াজোড়ার ইস্কিমটা যে মঞ্জুর করেছিল বেঙ্ক, আজই শুনে এল্যাম খাতড়ায়, উয়ারা সামনের শনিবার ঘোড়াধরার হাটে গরু কিনে দিবেক তুয়াকে।'

প্রহ্লাদ অল্প নড়েচড়ে বসে। দু-চোখ পুরোপুরি খোলে। বোতলটা এগিয়ে দিয়ে বলে, 'খাও মামু।'

দুই

কী এক আজব ইস্কিম এসেছে গো বলকে! লোক বেছে বেছে গরু দিচ্ছে, ছাগল দিচ্ছে, ভাচাতির জন্য টাকা দিচ্ছে। সেচের তরে পাম্প মিশিন। পঞ্চাতই পাইয়ে দিচ্ছে এসব। মেটালা, দাঁড়শোল, পাটপুরের বহুত মানুষই পেল। খবর পেয়েই পঞ্চাৎ অফিসে গিয়ে হামলে পড়েছিল প্রহ্লাদ তুঙ। আমার আইজ্ঞা জমিন নাই, জিরাত নাই, দেড় কাঠা ভিটা বাদে কিচ্ছো নাই। আমাকে একটা ইস্কিম দ্যান আইজ্ঞা।

পড়ধান বাবু কয়, 'কী স্কিম লিবি?'

প্রহলাদ কয়, 'যা হক দ্যান একটা, বেবেচনা কইর‍্যো।'

বার পাঁচ-ছয় ঘোরাঘোরির পর পড়ধানবাবু বলল্যাক, 'তুই হেল্যা পাবি। টিপ দে ফরমে।'

তদ্দিনে চক্ষুদুটি অল্প ফুটেছে প্রহলাদের।

বলে, 'হেল্যা লিয়ে কী কইর্‌বো আইজ্ঞা? বচ্ছরে ক'দিন বা হাল খরিদ করে মানুষ? বড় জোর মাস-চারেক। বাকি আটমাস উয়াদ্যার খাবাবো কি? মাঝের থিক্যে উই হেইল্যা জোড়াকে চরাতে-বুলাতে মাগ্-ভাতারের একজনের খাটালিতে যাবা বন্ধ হবেক।'

'তেবে কি চাস তুই?

'হেল্যার সাথে একটা গাড়ির ইস্কিমও দ্যান। আমি গাড়ি চালাব, বউ খাটতে যাবেক। এ তল্লাটে বারোমাসই গাড়ির চাহিদা অঢেল।'

'গরুর গাড়ির 'কুটা' শেষ। এ বচ্ছর আর হবেক নাই।'

'তাইলে ছাগল দ্যান্।'

'ছাগল। সে আর অদ্দিন থাকে!'

সত্যি। ছাগল লোনটার বড় চাহিদা। বাবুরা বলেন, গুটারি। তো, সেই গুটারি-লোনে কোনো ঝক্কি নাই। ট্রাক ভরতি ছাগল নামবেক পঞ্চাৎ আপিসের সামনে। যাও। টিপ-ছাপ দিয়ে এগারোটা ছাগল লিয়ে এসো ঘরে। পরের দিনই তোমার ঘরে পাইকার এসে হাজির। বেচে দাও অর্ধেক দামে। তারপর খাতড়া বাজারে যাও। শশী কশাইয়ের সামনে ঝনাৎ করে ফেলে দাও বাইশটা টাকা। ইদানীং শশী কশাইও কিনেছে একখানা কান ফুটো করার 'সেকেন হ্যান্ড' মিশিন। এগারো জোড়া ছাগলের ফুটো-করা কান কিনে নিয়ে সোজা চলে যাও বেঙ্কে। সেখানে লোনবাবুকে কাটা কান দেখাও। কিছু মানসিক করো। এবার টাকা শোধ করবার দায় 'ইনসোর' কুম্পানীর। বেঙ্কের সাথে উয়াদ্যার চিঠি-চাপাটি চলবেক। তুমি পায়ের উপর পা দিয়ে বসে থাক মজাসে। ইস্কিমটা বড় ভালো। সেই কারণেই সইন্‌ঝা পহরেই ফুইর‍্যে গেছে।

নেবু লিংড়াতে লিংড়াতে তিতা হয়। একসময় তাই বাঘের ঝাপট নিলেন পড়ধানবাবু, 'ভূমিহীন খেতমজুর তুই, ঘরে হাল আছে,—হেল্যা জোড়া দিতে চাইল্যাম। বলিস, চষবার ঠাঁই নাই! শালা, তুয়াকে কি ইন্দ্রের ঐরাবত কিনে দিতে হবেক?'

পড়ধানবাবুর ধমক খেয়ে কথাটা বলেই ফেলল প্রহ্লাদ, 'আমাকে হালের বলদ দিলে, যতিদাকে শ্যালো-পাম্পটা দ্যান।'

পড়ধানবাবু তেরচা চোখে তাকালেন। ভুরু কুঁচকে বললেন, 'বড়লোকের তরে দরদ যে উথলে পড়ছে রে! কি বেপার? শিকলি কাটবার তাল করছু নাকি?'

'লয় আইজ্ঞা।' প্রহ্লাদ এক্কেরে হামলে পড়ে। ব্যাপারটা বিতাং করে বোঝায়।

একচাকে বিঘা আটেক জমি আছে যতি মোহান্তর। যতির সঙ্গে ভাব-ভালোবাসা আছে প্রহ্লাদের। উ শ্যালো-পাম্পটা পেলে আট বিঘা জমিন তিন-ফসলা হত। প্রহ্লাদের হাল বলদও স্বম্বচ্ছর কাজ পেত সেখানে। বউটাও খাটালি পেত।

পড়ধানবাবু বাখানটা দিল্যাক বটে। কিন্তু 'শ্যালো-পাম্প' এর ইস্কিমটা পাঠালেক খাতড়ার বলক আপিসে।

বেঙ্ক বলল্যাক, 'শেলো দুবো নাই। শুধু পাম্প মিশিন দুবো।'

'সে কী হে। শুধু পাম্প মিশিন কুন কামে লাগবেক?'

বেঙ্ক বলল্যাক, 'সে জানি নাই। তবে, শেলো দুবো নাই। মাটির তলায় জল আছে কিনা তার রিপোর্ট চাই।'

'তো, সেই রিপোর্ট আইবেক কবে?'

'ভয় নাই। সার্ভে পাটি ঢুকে গেছে জেলায়। এখন কাজ চলছে তালডাংরা, শিমলাপাল এলাকায়। তারপর রাইপুর, সারেঙ্গা, করে খাতড়ায় ঢুকে যাবে বছর দু-তিনেকের মধ্যে।'

'কি বলেন আইজ্ঞা! তিন বচ্ছর বাদে?'

'সার্ভের পর কি হবেক?'

'মাটির শাম্পুল পাঠাবেক কোলকাতায়। কোলকাতার বাবুরা পরীক্ষা করে দেখবেক। রিপোর্ট লেখা হবেক। ছাপা হবেক! সেই অনুযায়ী মাটির তলার ম্যাপ আঁকা হবেক। সে ম্যাপ সতেরো হাত ঘুরে জেলায় আইবেক জেলা থেকে বলকে।'

'ই যে আইজ্ঞা এক চিঁড়ার বাইশ ফের!' পড়ধানবাবুর মুখে পুরো পদ্ধতিটা শোনবার পরে বলে ওঠে যতি মোহান্ত।

'অন্য একটা উপায় অবশ্যি আছে। টেস্ট বোরিং করাও নিজের গাঁটের থিক্যে হাজার

দুয়েক খচ্চা করে। যদি মাটির তলায় জলের জোগান ভালো থাকে তখন বেঙ্ক শেলো দিবার কথা ভাববেক।'

'যদি জলের জোগান ভালো না থাকে?'

'তাইলে তুমার দুহাজার টাকা বোরিং-এর নল বেয়ে চল্যে গেল মাটির তলায়।'

শুনতে শুনতে সিঁটিয়ে গেছে যতি মোহান্ত। শেলো আর চাই নাই আইজ্ঞা। ঢের হয়েছে। শেলো পাবার আগে কল্কি অবতার নেম্যে যাবেক ধরাধামে। কারণ তদ্দিনে কলির শেষ।'

শেষমেষ যতি মোহান্তর 'শেলো-পাম্প' হল না। প্রহলাদের হেইল্যা জোড়াটি হল।

কংসমামা একান্তে বলে, 'হাতের নক্ষী পায়ে ঠেলিস নাই ভাইগ্না। হেইল্যা জোড়াই লে তুই।'

শুনে খেপে যায় প্রহলাদ, 'অঘ্রান মাসে হালের বলদ লিয়ে কি পাছায় পুরবো? পুরা চাষের টাইম গেল, শালারা দিলেক নাই। এখন কী খাবা হেইল্যাকে? কুথায় চরাব? টুকচান গোচর খালি নাই ত্রি-সংসারে।'

কংসমামা চোখ টিপে হাসে, 'আমার ভাইগ্না হইয়েঁ তুয়ার অমন জড়বুদ্ধি রে! হেইল্যাকে তুই খাবাবি ক্যানে? উয়ারা কিঁ তুয়ার ঘরে থাক্বেক?'

'তেবে?'

'উ হেইল্যা থাইক্বেক আমার ঘরে।' কংসমামা ব্যাপারটা খোলসা করে এবার, 'আমার হেইল্যা জোড়াটাই কিনবি তুই আটশো টাকা দিয়ে। ঘরে ফিরে তুয়ার চারশো, আমার চারশো। আর হেইল্যা জোড়া আমার গুয়ালে।'

কংসমামা মিটিমিটি হাসতে থাকে।

শুনতে শুনতে কেমন ভয় হচ্ছিল প্রহলাদের। বেঙ্কের বাবুরা যদি তত্ত্ব-তালাশ লেয়? যদি 'ইদকুঁয়ারি' করতে আসে আচমকা?

কংসমামা দন্ত ছিরকুটে হাসে। বলে, 'আঠারোশো টাকার ইস্কিমে হেইল্যা জোড়ার দাম বলা আছে চোদ্দশো। দুশো 'কেরিং'। বাকি দুশো খইল-জাবনা, ওষুধ-বিষুধ বাবদে। উয়ার মধ্যে আটশো যাচ্ছে গরু কিনতে। লগদে তুয়াকে দিবেক গোটা পঞ্চাশেক। বাকি টাকা?' বলতে বলতে বারকয়েক ভুরু নাচায় কংসমামা, 'ইয়ার পরও ইদকুঁয়ারি কইর্তে আইবেক্ শালারা? লজ্জা নাই?'

কংসমামার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস হচ্ছিল না প্রহলাদের। তাই কখনো হয়? গরমেন্টের আইন নাই?

কংসমামা বুঝতে পারে ভাগনার মনের কথা। বলে, 'আচ্ছা, তুই দ্যাখ ভাইগ্না। মেটালা, পাটপুর, সিঁদুরপুর, দাঁড়শোলের কম লোক তো পশুলোন পেইলো নাই। ক'জনার ঘরে মাল আছে?'

বটে তো। কথাটা মিছা লয়। কাল একবার ভালো কইরে হাল-হদিশ লিতে হবেক ব্যাপারটার। গুহ্যতত্ত্বটা জাইন্ত্যে হবেক। মুখে বলে, 'দেখি। বউকে জিগাই।'

'তুই শালা শুকনা ডাঙায় মরবি।' তেতে ওঠে কংস তুঙ, 'একে মেইয়ার জাত। বারোহাত কাপড়েও ল্যাংটা। উয়ার উপর ফের বাঁজা। শেষকালে দুনিয়াময় ঢোল পিটাবেক মাগি। তুয়ার কোমরে দড়ি পড়বেক।'

কংস তুঙ-এর ওই 'বাঁজা' শব্দটা প্রহলাদের পিঠের ওপর সপাং করে আছড়ে পড়ল।

চকিতে পার্বতীর মলিন মুখখানা ভেসে উঠল চোখের সম্মুখে। বুকখানা ঘুণে ধরা ফোপরা বাঁশের পারা কোঁ-কোঁ আওয়াজ তুলল। প্রহলাদ অলক্ষ্যে তাকাল আকাশের দিকে। কিন্তু হায়, নেশাটা কেটে যাওয়ার দরুন আকাশে একটি বাচ্চারও চোখ দেখতে পেল না সে।

তিন

ঘোড়াধরার হাট

হাইস্কুলের পেছনের মহুল গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পা কাঠ হয়ে আসছিল কংস তুঙ-এর। চারপাশে চিল-নজর রাখতে রাখতে চোখের জল মরে আসে। প্রহলাদ তুঙ-এর আর দেখা নাই। পাশেই রাজপুত্তুরের মতন দাঁড়িছে রয়েছে হেইল্যা জোড়া। অলস চোখে জাবর কাটছে দুটোতেই। কিন্তু এরা আসে না কেন? কী মুশকিল! শেষমেষ কি তারিখ পালটালেন বেঙ্কের বাবুরা? সেটা উয়ারা পারেন। যখন-তখন, কথা নাই বার্তা নাই, ডুব মেরে দিতে পারেন অক্লেশে। চাষির হয়রানি? সেটা বাবুদের কাছে কিছো লয়। চোখেমুখে নিদারুণ বিরক্তি কংস তুঙ-এর। পেছনের দিকে ধনুকের মতো বেঁকে যায়। মটামট আওয়াজ তোলে কোমরে। বাদ্যি তোলে দু'হাতের আঙুলের গাঁটে গাঁটে। সশব্দে চাপ্পড় মারে বলদজোড়ার পিঠে। আর তখনি দেখতে পায়, প্রহলাদ তুঙ হাটের মধ্যে ঢুকছে। সঙ্গে রয়েছে বেঙ্কের বাবু, 'ইনসোর' কুম্পানীর বাবু, ভিটিনারি, ব্লকের 'লোন সাহেব' আর পঞ্চাতের মেম্বর কালোশশী দাস। ঘোড়াধরা বিশাল হাট। বাঁকুড়া জেলার সবচেয়ে বড় পশু-হাট। রাস্তার দু'ধারে শয়ে শয়ে গাই-বলদ, বক্‌না-কাঁড়ার সমাবেশ। বাবুরা সব চোখ চারাতে চারাতে এগোচ্ছিলেন হাটের গভীরে। প্রহলাদের নজরটা ছিল কেবল হাইস্কুলের পেছনের মহুলতলার দিকে। ওইখানেই কংসমামার বলদসহ থাকবার কথা।

মহুলতলাটার দিকে তাকাতেই কংসমামার সঙ্গে নীরব চোখাচোখি হল প্রহলাদের। কংস তুঙের চোখেমুখে অতি মাত্রায় বিরক্তি দেখল সে। কিন্তু প্রহলাদের দোষ কি? দেরি তো সে স্ব-ইচ্ছায় করেনি।

বাবুদের কথামতোই বেলা নটার আগেই প্রহলাদ আখখুটার মোড়ে হাজির হয়েছে। বাবুরা এলেন দেরিতে।

আখখুটার মোড় থেকে ঘোড়াধরার হাট দু-তিন মাইল তফাতে। পিচ রাস্তাটা সোজা চলে গেছে হলুদকানালি হয়ে রাইপুরের দিকে। রাস্তার ডানপাশে হাইস্কুলের পাশ ঘেঁষে মূল হাট। বাড়তে বাড়তে এখন চারিয়ে গেছে রাস্তার বাঁ-পাশেও। হাটের লাগাও পঞ্চাৎ আপিস।

আজ শনিবার। মূলহাট আজই। কিন্তু হাট বসে গেছে কাল থেকে। চলবে রোববার দুপুরতক। প্রহলাদ দেখল বেশ জমে উঠেছে হাট। আজকের আমদানিটা যেন কিঞ্চিৎ বেশি।

রাস্তার মুখে দু-এক জোড়া চোখসই বলদ দেখে থমকে দাঁড়ালেন বাবুরা। বললেন, 'কি রে প্রহলাদ, এগুলোর থেকে পছন্দ হয়?'

বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নজর করতে থাকে প্রহ্লাদ। তার আসল নজর তো পড়ে রয়েছে মহুলতলায়।

একটুক্ষণ বাদে বলল, 'ভালাই তো ঠেকছে আইজ্ঞা। দাম কত?'

'আঠারোশো' বেপারি হাঁকে।

প্রহ্লাদ বাবুদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, 'এ জোড়াটা খোব ভালো।'

দাম শুনে পিছিয়ে গেলেন বাবুরা। বললেন, 'সামনে চল। ভালো জিনিস পাব।'

প্রহ্লাদ সেটা জানতই। তাঁদের বিচিত্র হিশাবমতো প্রহ্লাদের গরু কেনা বাবদ আটশোই ধরা আছে। তার বেশি হলেই বাতিল। এ খবর প্রহ্লাদের নয়, কংসমামার।

একটু বাদে মহুলতলার পাশে এসে দাঁড়াল পুরো দলটা। কংসমামা কান কামড়ে বলে দিয়েছে, 'খোব সাবধান ভাইগ্না। বাবুদের শাগ্নার দৃষ্টি। টুকচান মু আলগা হলেই ধইরে ফেলবেক চ্যালাকি।'

কাছে গিয়ে তাই একটু বেশিমাত্রায় সতর্ক হল প্রহ্লাদ। কংস তুঙকে যেন দেখতেই পায়নি সে। চলে যাচ্ছিল উলটোদিকে। বেঙ্কের বাবুই ডাকলেন ওকে, 'ওহে প্রহ্লাদ, দেখে যাও, এ জোড়াটা কেমন।'

প্রহ্লাদ যেন অনিচ্ছা সহকারে ফিরল। কাছে এসে বলদজোড়াকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। পিঠে চাপড়-টাপড় মারল। ল্যাজের গোড়া ধরে মোচড়াল। মুখ ফাঁক করে দাঁত পরীক্ষা করল। তারপর আবেগহীন গলায় বলল 'মন্দ লয়। তেবে দুটোই কালো যে।'

শুনে হেসে উঠলেন বাবুরা।

পঞ্চাতের মেম্বর কালোশশী দাস বলল, 'শালা কিনছু হেইল্যা গরু, উয়ার ফের রং-বিচার! ই কি বিয়ার কইন্যা নাকি রে?'

ভীষণ লজ্জা পেঁয়ে যায় প্রহ্লাদ। বলে, 'দু'টা দু'রঙের হইল্যে ডাকতে সুবিধা। হারাই গেলে খুঁজত্যে সুবিধা। এই. আর কি।'

বেঙ্কের বাবু এগিয়ে গিয়ে দাম শুধোলেন।

কংস তুঙ দাম হাঁকল, 'হাজার।'

শুনে আশা জাগে বাবুদের মনে। হাজারকে নামিয়ে আটশো করা সম্ভব। কাজেই, একদিকে শুরু হল ভিটিনারি চেকিং। অন্যদিকে দরাদরি।

দর নিয়ে টানাহেঁচড়া চলবেক অনেকক্ষণ। সেই ফাঁকে একটা বিড়ি খাওয়া যেতে পারে। বাবুরা সঙ্গে আছেন বলে ছেদ্দা-ভক্তিতে প্রায় ঘড়ি দুয়েক বিড়ি খেতে পারেনি প্রহ্লাদ। নেশা কেটে জল। প্রহ্লাদ বেঙ্কবাবুকে 'পেস্তাব করে আসি,' বলে চলে এল পঞ্চাৎ অফিসের পেছনে। ফস্ করে বিড়ি ধরাল। আর তখনই দেখতে পেল তুং-চাঁড়রো গাঁয়ের রামেশ্বর শীলকে। রামেশ্বর জাতে নাপিত। কিন্তু জাত-ব্যবসা ওর সয় না। তা বাদে আর সবকিছু করে বেড়ায়। জমির দালালি, মামলার তদবির, বাড়িঘর, গাছগাছাল, গরু-ছাগল বেচাকেনা। ওইসব নিয়ে ধান্দা করে বেড়ায় চারদিকে। গতবছর পোড়কুলের টুসু-মেলায় আলাপ হয়েছিল প্রহ্লাদের সঙ্গে। আলাপ থেকে ক্রমে ঘনিষ্ঠতা। বড় এলেমদার আর দিলদরিয়া মানুষ বলে মনে হয়েছিল ওকে। প্রহ্লাদকে টেনে নিয়ে গিয়ে চা আর তেলেভাজা খাইয়েছিল অকারণে। ছোলাগড়ায় লোটনের ভাটিখানায় দেশী মদ খাইয়েছিল দু'তিন বার। সেই থেকে রামেশ্বরের সঙ্গে বড় ভাব হয়ে গেছে

প্রহ্লাদের।

প্রহ্লাদকে দেখে রামেশ্বর হাসে। বলে, 'স্যাঙাৎ যে বড় ঘোড়াধরা হাটে? গরু কিনতে নাকি?'

লাজুক হেসে মাথা দোলায় প্রহ্লাদ, 'বেঙ্কবাবুরা কিনে দিচ্ছে সরকারি ইস্কিমে।'

'বটে, বটে!' রামেশ্বর বেশ খুশি হয়। এ-কথা সে-কথার পর বলে, 'লোটনের ভাটিখানায় আজ মাংসের ঘুঘনি করেছে হে সাঙাত। সাথে এক লম্বর পাঁইট।'

শুনতে শুনতে জিভে জল এসে যাচ্ছিল প্রহ্লাদের। কিন্তু পয়সা কোথায় মাল খাওয়ার? দিনদিন তো আর রামেশ্বরের পকেট খসানো যায় না। অলেহ্য কাজ হবেক্ সিট্যা। মনে পড়ল, কংস তুঙ-এর বচন। হেইল্যাজোড়া বাদেও উয়ারা নাকি পঞ্চাশ টাকা দিবেক।

হলদে দাঁত বের করে হাসে প্রহ্লাদ। বলে, 'তাইলে আজ লোটনের দোকানে যাবা হবেক।' রামেশ্বর শীল মোলায়েম হাসে। বোঝে, মাছির পা আটকে গেছে গুড়ে।

বেঙ্কবাবু জিগালেক, 'নিজের গরু তো?'

কংস তুঙ মাথা নাড়ে।

'বেচছো কেন?'

'মেয়ের বিয়া আইজ্ঞা। কন্যাদায় তুল্য ঠেকা নাই।'

'তা বটে। প্রহ্লাদের সাথে কোনো সম্পর্ক আছে তোমার?'

কংসমামা ভুরু কুঁচকে নিরিখ করে প্রহ্লাদকে। বলে 'ঘর কুথায় হে তুমার?'

শেষ অবধি দাম দাঁড়াল আটশোই। বেঙ্কবাবু কানের কাছে মুখ এনে বললেন, 'যাহ্ শালা, জলের দামে পেয়ে গেলি পাহাড়ের মতো গরু!'

শুনে প্রহ্লাদ গদগদ হাসে। ডানহাত দিয়ে অকারণে চুলকোয় মাথার চুল।

কংস তুঙকে দরদাম মিটিয়ে বেঙ্কবাবু প্রহ্লাদের হাতে গুঁজে দিলেন গুটিকয়েক নোট; অন্তরালে গিয়ে গুনে দেখল প্রহ্লাদ, পঞ্চাশ নয়, পঁচিশ টাকা; তাই সই। ভিক্ষার চাল, উয়ার ফের কাঁড়া-আকাঁড়া! লোটনের ভাটিখানার খরচটা উঠে যাবেক এতে।

প্রহ্লাদের ঘ্যাঙা মিটিয়েই বাবুরা গেলেন অন্যদের মাল কিনতে। দু'হাতে দুটো গরু ধরে টানতে টানতে হাটের বাইরে এল প্রহ্লাদ। অল্প তফাতে দাঁড়িয়ে উশখুশ করছিল কংস তুঙ। বেঙ্কের বাবুরা চোখের আড়ালটি হতেই সে ছুটে এল কাছে।

বলল, 'কই রে ভাইগ্না, চল্।'

'তুমার সাথ?' আঁতকে উঠলো প্রহ্লাদ, 'বেঙ্কের বাবুরা লজর রাখছে নাই? দুজনার কোমরেই দড়ি পড়বেক মামু।'

কথাটা ঠিক। কোনো মতে শালাদের সন্দেহ হলেই আর দেখতে হবে না। সরকারকে প্রতারণার দায়ে জব্বর সাজা হবেক। শালারা অনেক সময় জিপ থামিয়ে ঘাপটি মেরে বসে থাকে রাস্তার ধারে।

চাপা গলায় প্রহ্লাদ বলল, 'তুমি মামু লিরানন্দে চইল্যে যাও ঘর। সইন্ঝায় সইন্ঝায় গরু লিয়ে ঠিক পৌঁছে যাব আমি।'

উপায় নাই। আলগা পায়ে এগোতে এগোতে কংস তুঙ বলে, 'বেশি দেরি করিস নাই, বাপ আমার। গেলে ফের জাব্না খাবেক ইয়ারা।'

চার

ছোলাগড়াতে লোটনের ভাটিখানা। আজ হাটবারে বেজায় ভীড়। মানুষের হাতে কাঁচা পয়সা আসে কতভাবে। খরচ করবার তরে নিশপিশ করে।

লোটন খদ্দের সামলাতে হিমসিম খাচ্ছিল। তবে, এ ভাটিখানায় রামেশ্বর শীলের আলাদা খাতির। ওকে দেখা মাত্তরই দড়ির খাটিয়া এল। পাতা হল কুসুমগাছের তলায়। শালপাতার পুরু ঠোঙায় এল মাংসের ঘুগনি। বোতলে ধানি মদ। প্রহ্লাদ আর রামেশ্বর শীল পা তুলে বসে গেল খাটিয়ার ওপর। বলদদুটো বাঁধা রইল অল্প তফাতে।

ইদানীং অল্প খেলেই নেশা ধরে যায় প্রহ্লাদের। মাথার মধ্যে লক্ষ পোকা কিলবিলিয়ে ঘুরে বেড়ায়। বুকের ভেতরটা কেমন ফাঁকা হয়ে আসে। মগজে ঘুরে বেড়ায় অজস্র ছবি, কথা, মানুষজন। ভেসে ওঠে পার্বতীর মুখ। পোয়াতি গাইয়ের মতো অবোলা করুণ চোখ।

রামেশ্বর শীল প্রহ্লাদের বেদনার জায়গাটা চেনে। ভুলেও কখনো আঁচড়ায় না সে থান। বরং সম্ভব হলে আলতো হাত বোলায়। বলে, 'কুম্ভস্থলির থেকে মাদুলি এনে সাঙাত-বউকে পরাও। অব্যর্থ কাজ।'

মাটি থেকে চোখ তোলে না প্রহ্লাদ। তেতো গলায় বিড়বিড়িয়ে বলে, 'কুম্ভস্থলি, মণ্ডলকুলি, ডিহরের ষাঁড়েশ্বর, বিষ্টুপুরের কোরবানতলা, বামনাসিনি, মশক পাহাড়—কিছো বাদ নাই।'

'শুগ্‌নিবাসার নানক শুনিন?'

'তিনবার।'

'তেবে আর কুনো উপায় নাই। এ শিবের অসাধ্যি।'

রামেশ্বরের মুখের শেষ কথাটা শুনে কেমন ভাবলেশহীন হয়ে এল প্রহ্লাদের মুখ। সহসা মদ খাওয়াটা বাড়িয়ে দিল সে। কপালে জমতে লাগল বিন্দ-বিন্দু ঘাম।

ততক্ষণে অনেক তারা ফুটেছে আকাশে।

বেশ খানিকক্ষণ নিঃশব্দে খাওয়ার পর ফের মুখ খুলল রামেশ্বর শীল, 'আর বাকি রইল উই একটি থান। উই ধন্বন্তরি ডাক্তার।'

সে কথায় চোখদুটো অল্প খুলল প্রহ্লাদের। মনে পড়ে গেল মাস ছয়েক আগের ঘটনা। রামেশ্বর শীলই দিয়েছিল খবরটা। বাঁকুড়ায় নাকি এক ধন্বন্তরি ডাক্তার আঁইছে। সে নাকি বাঁজা গাছে ফুল ফুটাচ্ছে এন্তার। বিশ বচ্ছরের বাঁজা মেয়াও বাচ্চা ধরেছে পেটে। রামেশ্বর শীলের পীড়াপীড়িতে পার্বতীকে নিয়ে গিয়েছিল প্রহ্লাদ। দেখেটেখে রায় দিয়েছিলেন ডাক্তারবাবু। একটা অপারেশন করল্যে বাচ্চা হবেক নির্ঘাৎ। কুনো ভুল নাই। তেবে খরচ পড়বেক হাজারটি ট্যাকা! একটি পয়সা কম লয়। 'হা-জা-র টাকা!' প্রহ্লাদ বলেছিল, 'মুই আইজ্জা হাজার টাকা বাপের জম্মে এক সাথে দেখি নাই চোখে।'

ভাবতে ভাবতে আজ এ্যাদ্দিন বাদেও মনটা বেজায় তেতো হয়ে আসে প্রহ্লাদের। ধন্বন্তরি ডাক্তারের পাশ অপারেশনটা করালেই পার্বতীর কোল জুড়ে বাচ্চা আসে। কিন্তু এক হাজার টাকা প্রহ্লাদের মতো মানুষ কোথায় পাবে, হায়!

রামেশ্বর শীল স্যাঙাতের মনের কষ্টটা বোঝে। উপায় খোঁজে সেও। খানিক আমতা

আমতা করে বলে, 'তুই এক কাজ কর স্যাঙাত। এই হেইল্যা জোড়াটা আমাকে বিকে দে হাজার টাকায়।'

শোনা মাত্তরই ধক্ করে ওঠে প্রহলাদের বুক। এ যে কংস মামার হেইল্যা। দু-হাজার টাকার গরু আটশো টাকায় বিকেছে দু-তিন ঘন্টার তরে।'

রামেশ্বর শীল হো-হো করে হাসে, 'মামার হেইল্যা কি আর মামার আছে? এতক্ষণে তুয়ার নামে উঠে গেছে বেঙ্কের খাতায়।'

'কিন্তু মামা ফেরত চাইলে, কি বইল্‌ব?'

'বলবি, গরু টেনে টেনে সবে পুয়াটাক রাস্তা আঁইছি, সহসা উয়ারা দিল ঘরের পানে টান। একলা মানুষ। ধইরে রাখতে লারি অমন পাহাড়ের মতন দু-দুটা গরু। আমার হাত ছাড়িয়ে উয়ারা দৌড় মারল নামো-মেটালা নিশানা করে। ঘরে পৌছায় নাই উয়ারা?'

'যেদি বিশ্বাস না করে? যেদি থানায় গিয়ে কেস দিয়ে দেয় কংস তুঙ?'

'পাগল! উয়ার নামেই উলটা কেস হবেক তাইলে।'

মাথাটা টলমল করছিল প্রহলাদের। ভাবনা-চিন্তাগুলো বাগড়ুলুং পোকার মতন ফুরফুরে হয়ে উড়ে বেড়াচ্ছিল মগজের মধ্যে। রামেশ্বর শীলের কথাগুলো শুনতে শুনতে সহসা ভারী ফুর্তি বোধ হল প্রহলাদের। সত্যি তো, বেশ কঁ্যাচালে পড়েছে কংস তুঙ। নিজের হক্কের গরু। কিন্তু সর্বসমক্ষে এখন আর দাবি করতে পারবে না। চোরের মায়ের মতন অবস্থা। ভাবতে ভাবতে ভারী মজা লাগছিল প্রহলাদের। ভেতর থেকে ঠেলে বেরোতে চাইছিল কুলকুলিয়ে হাসি। শালা কংস তুঙ, লিজের ভাগনা-বউকে ভোগ কইর্‌ত্যে চেয়েছিল দৈববাণীর ফিকির করে। প্রতিদানটা ইবার লাও হে সুমুন্দির পো! খুশির তোড়ে এক নিঃশ্বাসে কয়েক ঢোক ধেনো গিলে ফেলল প্রহলাদ। গরুজোড়াটা বেচে দিলেই হাজার টাকা। অর্থাৎ পার্বতীর চিকিৎসা ধন্বন্তরী ডাক্তারের কাছে। ন্যায়নীতিকে আড়াল করে আরো একটি তীব্র বোধ ক্রমাগত চাবলাচ্ছিল ওকে। সহসা একটি শিশুর মুখ প্রবলভাবে নৃত্য জুড়ে দেয় প্রহলাদের চোখেব সুমুখে। কচি কচি হাত দিয়ে সে বারবার জড়িয়ে ধরে প্রহলাদের গলা। পার্বতীর মুখ থেকেও বেরিয়ে আসে পাহাড়ি ঝরনার মতন ঝলকে ঝলকে হাসি।

হাজার টাকা বুঝে নিয়ে একসময়ে টলোমল পায়ে বিদায় নিল প্রহলাদ। রামেশ্বর শীল ফের মনে করিয়ে দিল, 'হেইল্যার কথা জিগালে বলবি, ছুইটে গেছে নামো-মেটালার দিকে।'

ছোলাগড়া থেকে পিচ রাস্তা ধরে মাইল-দুই পশ্চিমে হাঁটলে বার-গাঁ। ওখানেই কাঁচা রাস্তা ডাইনে। রাস্তার একেবারে শেষে কাঁসাইয়ের ধূ-ধূ চড়া। চড়ার মধ্যে বিশাল দ'। দহের চারপাশে পোড়কুলের টুসু-মেলা বসে পৌষ সংক্রান্তির দিনে। ওই পথ দিয়ে হাঁটলে অনেক সোজা হয় পথ। কাঁসাই নদী পেরোলেই মুখুজ্জ্যাদের ইটভাটা। তারপরই উপর-মেটালা হয়ে দাঁড়শোল। কিন্তু পোড়কুলের রাস্তায় জনমানব নাই এখন। ট্যাকে আছে এক হাজার টাকা। তাছাড়া কংস তুঙ-এর বাড়ি নামো-মেটালায়। উ শালা প্রহলাদের আশায় ইটভাটায় বসে থাকতেও পারে। অনেক ভেবেচিন্তে পিচ রাস্তা ধরে আখখুঁটার দিকেই এগোতে লাগল প্রহলাদ।

হাঁটতে হাঁটতে ধন্বন্তরি ডাক্তারের মুখখানা মনে পড়ল প্রহলাদের। কেমন রাগী রাগী

মুখ। মাসছয়েক আগে দেখা। প্রহ্লাদ করল কী, তার দেখা একজন দেবতুল্য মানুষের প্রশান্ত মুখের আদলে গড়ে ফেলল ডাক্তারের মুখ। নির্জন রাস্তায় তার সাথে প্রাণের কথা জুড়ে দিল। অনেক কথা, আবদার, দাবি।

আখখুঁটার মোড় থেকে ডাইনে রাস্তা বেঁকে গেছে খাতড়ার দিকে। অল্প এগোলেই কাঁসাইয়ের ওপর ক্যাচান্দার ঘাট। এতক্ষণ রাস্তাটা ছিল পুতনা রাক্ষসীর মতো নিকষ। পঞ্চমীর চাঁদ এই মাত্তর উঠল। চারপাশে ঘষা কাচের আলোর সঙ্গে পাতলা কুয়াশা মিশেছে। কাঁসাইয়ের চওড়া পেটে মাথা তুলে বসে রয়েছে কালো কালো পাথরের চাঙড়। মাঝখান দিয়ে সরু জলের কালো স্রোত। একটা কংক্রিটের নামো পুল হয়েছে কাঁসাইয়ের ওপর। প্রহ্লাদ টলোমলো পায়ে পার হয়ে গেল পুলটা।

ক্যাচান্দার ঘাট পেরোলেই রাস্তাটা চড়াই। অল্প এগোলেই দূরে সাহেববাঁধের উচু পাড় দেখা যায়। জায়গাটা নির্জন। ট্যাকের ওপর অজান্তে হাত চলে যায় প্রহ্লাদের। হাঁটার গতিও বেড়ে যায়। সাহেববাঁধের পাড়ে সারবন্দী তালগাছগুলো জ্যোৎস্না চিরে মাথা তুলেছে আকাশে। দূর থেকে মনে হয় যেন একদল মানুষ তাদের রোগা রোগা হাতগুলো তুলে দিয়েছে স্বর্গের কাছাকাছি।

পাশাপাশি আসতেই বাঁধের পাড়ে বটতলার আঁধারে ও কে? নেশার ঘোরে থাকলেও প্রহ্লাদের দেখায় কোনো ভুল নাই। একজন কেউ নিঃশব্দে বসে রয়েছে গাছের তলায়। কংস তুঙ? নাকি অন্য কেউ? ট্যাকে করকরে হাজার টাকা। ভয়টা সেই কারণেই চকিতে বাসা বাঁধে মনে। অনিশ্চিত পায়ে সাহেব-বাঁধের দিকে এগোচ্ছিল প্রহ্লাদ। পা গুনে গুনে হাঁটছিল। গাছের তলায় মূর্তিটা আচমকা উঠে দাঁড়াল। হনহনিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল ওর দিকে।

'অতক্ষণে ফিরল্যে যে? আমি সেই সইন্ঝা থিক্যে বইসে কাঠ হয়ে গেল্যম গাছের তলায়।' পার্বতীর গলায় ঈষৎ ভৎর্সনা ছিল। কিন্তু সেটা গায়ে মাখল না প্রহ্লাদ। গম্ভীর পায়ে হেঁটে গেল বাড়ির দিকে।

বাড়িতে পৌঁছেই প্রথমে টাকাগুলোকে সযত্নে লুকিয়ে রাখল চালের বাতায়। ঢকঢকিয়ে জল খেল। উঠোনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ থিরপলকে তাকিয়ে রইল আকাশের দিকে। হু-হু হাওয়া বইছে। ঘষা ঘষা চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে। মাথার ওপর অসংখ্য শিশুর উজ্জ্বল চোখ। দেখতে দেখতে নেশাটা আরো গাঢ় হয়ে এল প্রহ্লাদের। দাওয়ায় বসে থাকা পার্বতীর কাছে পায়ে পায়ে গিয়ে দাঁড়াল। অনেকক্ষণ ধরে দেখল তার অবোলা করুণ চোখদুটি। সহসা প্রবল উচ্ছ্বাসে পার্বতীকে দু'হাত দিয়ে জাপটে ধরল প্রহ্লাদ। অলৌকিক গলায় বলে উঠল, 'শালি, মা হচ্ছু রে তুই।'

ঠিক সেই মুহূর্তে বেড়ার বাইরে কংস তুঙ-এর গলা।

'প্রহলাদ ফিরেছু রে? প্রহলাদ?' বলতে বলতে আগড় ঠেলে ভেতরে ঢুকল কংস তুঙ। চোখ মুখ থমথম করছিল তার। পার্বতী আর প্রহলাদকে ওই অবস্থায় দেখে হকচকিয়ে গেল সে।

কংস তুঙকে দেখে ফিক করে হাসল প্রহলাদ। বড় নির্দোষ হাসি। দেখে কংস তুঙ-এর শরীরের তাবৎ রক্ত হু-হু করে মাথায় চড়তে থাকে। তীক্ষ্ণ গলায় শুধোয়, 'আমার গরু কুথা?'

প্রহলাদের বুকের মধ্যে তখন স্বর্গীয় পুলক। রামেশ্বর শীলের শেখানো কথাগুলোর ধারপাশ দিয়েই গেল না সে। এখন আর কোনো মিছে কথার পাঁকে ডুবতে চাইছে না মন।

দরাজ গলায় জবাব দিল, 'বিকে দিছি।'

শোনা মাত্তর যেন বাজ ভেঙে পড়ল কংস তুঙ-এর মাথায়। দু-চোখ জ্বলে উঠল ধুনুচির মতো। উঠোনময় দাপাতে লাগল সে।

'শালা লিজের লোক হইয়োঁ অমন শত্রুতাটা কইর্‌লি তুই? কুথা বিকলি? কাকে বিকলি? বল্‌ শালা, বল্‌। তা নাইলে পুলুশে দুব তুয়াকে। বারো বচ্ছর জেলের ঘানি টানাব।'

কংস তুঙ যত শাসায়, প্রহলাদ ততই হাসতে থাকে।

নিরুপায় কংস তুঙ একেবারে খ্যাপা কুকুরের মতন আচরণ করতে থাকে। সহসা দু-হাত দিয়ে টিপে ধরে প্রহলাদের গলা। গাঁ-গাঁ আওয়াজ তোলে প্রহলাদ। ছুটে আসে পার্বতী। টেনেহিঁচড়ে ছাড়ায় কংস তুঙকে।

কোনো বিকার নেই প্রহলাদের মুখে। সে হাসতে থাকে। বড় অকপট উদার হাসি।

নিজস্ব স্থাবর-অস্থাবর তাবৎ সম্পত্তি নিঃশেষে দান করে দেবার ভঙ্গিতে বলে, 'তুমি দাদু হচ্ছো গো মামু। ভাইগ্‌না-বউয়ের কোলে ছা দেইখ্‌বার লেগে তুমি কত কাণ্ডই না কইরেছো! মিছা লয়, ইবার সত্যিসতিই দাদু হচ্ছো তুমি।'

ইন্দর যাগ

লোকটা মাঝে মাঝেই বড় আচানক কথা কয়!

দাবি করে, সে আকাশ ঝেঁপে বৃষ্টি নাবাতে পারে। বলে, হুকুম করুন হুজুর। আগাশ ফাইট্যে হুদহুদিয়ে পানি লামাই আইজ্ঞা।

লম্বা কেঁদ গাছের গুঁড়ির মতো মিশকালো শরীরখানা তখন প্রায় আকাশের গায়ে ঠেকে যায়। শিক্র্যা পাখির চঞ্চুর মতো বাঁকানো নাক ফুলে ফুলে ওঠে। চুলার ঝুঁটার পারা চোয়াল কাঠ-কাঠ হয়ে যায়। ভিন গাঁয়ের গণ্যিমান্যি মনিষ্যিদের কাছে উজমুদ্দা হাজির হয় সে। আসামির উৎকণ্ঠা নিয়ে চেয়ে থাকে এক চিলতে হুকুমের জন্য।

এখন বিশ্বজুড়ে নিদারুণ খরা। গেল-বর্ষায় আকাশ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল বারকয়েক। তাতে ধরিত্রীর বুকের ফাটগুলোই বোজেনি। বছর ঘুরে গেল। আষাঢ় মাসের শেষ। এক ফোঁটাও বৃষ্টি নেই। ভোর না হতেই, সূর্যের লালি না কাটতেই, রোদের দাপট শুরু হয়। দিনভর অগ্নিবৃষ্টি চলে। ঝলা বাতাস বয়। তপ্তনীল আকাশে চক্কর মারে ডোমচিলের দল। দ্বারকেশ্বরের ধু-ধু বুক। ঝুঁঝকা প্রহর থেকে গিয়ে বালির মধ্যে উনুই খোঁড়ে মেয়েরা। ভরদুপুরে আধ গড়্যা জল কাঁকালে নিয়ে উজুউজু ঘরে ফেরে। এমনি সময়ে আকাশ ফাটানো বৃষ্টির কথায় ওরা লোভী চোখে আকাশের পানে তাকায়।

দেখতে দেখতে ভারী উতলা হয়ে ওঠে লখিন্দর। নিজের মাথার একরাশ বালিবর্ণ চুল দুহাতে মুঠো করে ধবে ঝাঁকি মারতে থাকে সমানে।

সর্বক্ষণের চেলা মাদল বাউরি শোনায় আর এক বৃত্তান্ত। 'উস্তাদ' নাকি মাঝে মাঝেই পাগলের পারা ব্যাভার করে। জানকী নাকি শয়নে-স্বপনে-লিশি-জাগরণে সুমুখে এসে দাঁড়ায়। হাঁটু মুড়ে বসে। আঁজলা পেতে ধরে লখিন্দরের দিকে। আকণ্ঠ জল চায় জানকী।

বাবুরা চোখ কপালে তুলে শুধোন, 'কী কইব্যে বিষ্টি লামাবি রে, লখিন্দর?'

'তার উপায় আছে হুজুর। তন্ত-মন্ত-উপাচার আছে।' লখিন্দর বাচ্চা ছেলের মতো অধীর হয়ে ওঠে, 'আপনি শুধু হুকুমটা দ্যান না একটিবার।'

লখিন্দরের গাঁয়ের মানুষকে শুধোলে তারা আধা-অবিশ্বাসে হাসে। এ সবের বারো আনাই বুজরুকি আইজ্ঞা। বেশিরভাগই ভেল্কি ছো। তেবে আছে। পৃথিবীতে বিদ্যা আছে। ভোজবিদ্যা, কুহকবিদ্যা, মধুবিদ্যা, ডাকিনীবিদ্যা, কাকচরিত্র—কতই না বিদ্যা আছে এ দুনিয়ায়! সঠিক থানে, আসল গুরুর কাছে পাঠ নিলে আর প্রক্রিয়ামতো সাধন করলে বিদ্যা ফলে বইকী। অবশ্যি শুধু সাধন করলেই হয় না। আধারটি ভালো হওয়া চাই। আর জন্মাঙ্কুর থাকা চাই। লচেৎ লয়। এই নিয়ে দীর্ঘক্ষণ তর্কাতর্কি চলে। শেষমেষ সাব্যস্ত হয়, সব আছে। ভালা-খ্যারাব, আসল-নকল, উস্তাদ-ধড়িবাজ—এ দুনিয়ায় সব আছে। তেবে লখিন্দরটা কিছো জানে। হব্যেক্ই তো। উয়ার শুরুটাই যে আলাদা। মা মরেছে সাত বচ্ছরে। বাপ শালা ফের বিয়া কইর্ল। দ্বিতীয় পক্ষেরটি খাণ্ডার। লখিন্দর

সেই থেকেই বিবাগী। সেই থেকেই শ্মশান-মড়াচির উয়ার পিয়ারের থান। কুম্ভস্থলীর দশরথ পছালির পাশ হাতেখড়ি। হাট-গাঁ—কিষ্টোলগরেও ছিল। পায়রাচালিতেও বিদ্যে লিয়েছে। সিখ্যেনে শাঁখারিদের বাস। উয়ারা সাপের কাজকাম করে আজ সাত পুরুষ। সাতপাটি-মণ্ডলকুলিতে ছিল সাত বচ্ছর। সে কুথায়? বহুৎ ধুর আইজ্ঞা। শিলদা থিক্যে ফুলকুসমা যাবেন, সিখ্যেনে তারাফিনি লদী। লদী পেরিয়ে ডানদিকে কুনুইমোচড় ঘুরলেই সাতপাট্টি-মণ্ডলকুলি গাঁ। সিখ্যেনে সিদ্ধক নামে এক জাতি বাস করে। উয়াদ্যার মেয়াদ্যার পাশ আছে বিদ্যা। সাতপাট্টি-মণ্ডলকুলি গাঁয়ে ঘরে ঘরে কুহকবিদ্যা জানে। সিখ্যেনে উস্তাদরা তারাফিনি লদীর জলের উপরে পায়ে হেঁট্যে পারাবার হয়। সিখ্যেনে এঁকটা মই আর একটা আগুনের বুঁদি উড়িয়ে উড়িয়ে সারা গাঁয়ের চাষা ব্যাভার করে ক্ষেতে। উই গাঁয়ে গিয়ে পড়বা মাত্তর বইস্‌তে দিব্যেক বাঁশমুগরা সাপ। ক্যানে? পরীক্ষা লিব্যেক আপনার ছাতির পাটা কত। অন্য কেউ হইল্যে গায়ের রক্ত বাদুড়চুষা হইয়্যেঁ মইর্‌তো। কিন্তু লখিন্দর এক কৌশল ফেঁদেছিল। গাঁর মধ্যে যে মেয়ার উম্বর সব চে বেশি, উয়ার শনের মতো ধবল কেশ, তেলগিনার মতো চোখের কোটর, রসুন কোয়ার মতো দাঁত, মেয়াদ্যার মধ্যে সব চে' বড় উস্তাদ উই বুড়ী, লখিন্দর উয়ার ধরম্‌ ব্যাটা হইয়্যে ছিল সিখ্যেনে। কুহকবিদ্যাটা উ কিছো জানে।

নিজের কথা কেউ বলতে থাকলে লখিন্দর লা কাড়ে না। ঝিম মেরে বসে বসে শোনে, শুনতে শুনতে নেশাটা গাঢ় হয়। তখন অল্প অল্প মাথাটা নাড়াতে থাকে তারিফ করার ভঙ্গিতে।

চারপাশের জমায়েত কলকলিয়ে ওঠে। কুহকবিদ্যার ক্ষমতা নিয়ে জোর রগড় বাধে। হাওয়া উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। উসব লোগ কি নাই পারে? মরাইয়ের ধান উড়ায়। পোক্‌রের মাছ উড়ায়। গাইয়ের বাঁটের দুধ উড়ায়। বাণ মেরে মুখে রক্ত তুলে। মারণ-তাড়ন-সম্মোহন-উচাটন—কুন্‌ বিদ্যাটা উয়াদ্যার অজানা? সাপে কেইটেছে? হাতে একখান কড়ি লিয়ে তিনবার ফুঁ দিয়ে ফাবড়াই দিব্যেক্‌ ওঝা ঈশান কোণে। খানিকবাদে সাপ সুড়সুড় কইর‍্যেঁ হাজির হব্যেক অঝার পাশ। মাথায় জোঁকের মতোন টেইস্যে বইস্যে থাইক্‌ব্যেক কড়ি। যোবতী মেয়া মানুষকে বশ করতে চান? মন্তরপড়া লাল জবা ফুল আলতো শুঁকে উই মেয়াকে দেখান পর পর তিনদিন, উ মেয়া তখন ঠিক ফেতি-কুত্তার মতোন ঘুরব্যেক আপনার পিছে পিছে। খাণ্ডার সতীন। দিনভর কাইজ্যা করে। বাণপর্ণী গাছের পাতা ছেঁচে দধি ও জলের সাথে মিশিয়ে, মন্তর পড়ে, সতীনের শয়নস্থানের উপরে ও নীচে ছিটিয়ে দিন, সতীন তখন ঠিক য্যান মায়ের পেটের বোনটি। কথায় কথায় কুম্ভস্থলীর দশরথ পছালির প্রসঙ্গ ওঠে। এ তল্লাটে অতবড় গুনিন বিরল। কুম্ভস্থলীতে এখনো একটা বিশাল গাছ রয়েছে। আজতক ওটার জাত চিনতে পারেনি কেউ। কী করে পারব্যেক? সে কি এ দেশের গাছ? দশরথ পছালি কাউর-কামাখ্যা থেকে উড়িয়ে এনেছিল সে গাছ। উই গাছে চড়ে পছালি নাকি বিশ্বভুবন ঘুরে বেড়াত রাতেভিতে। ভোরের আগে আবাব যেখানকার গাছ সেখানে। ক্ষমতা ছিল লোকটার। শুধু চরিত্র দোষে লষ্ট হইয়্যেঁ গেল। তাই নাকি? লয়? শেষের দিকে তার প্রতি রাতে একটি লৈতন মেয়ার সাথে সহবাস করা চাই। কোথায় পেত অত মেয়ে? উয়ার আবের মেয়ার অভাব আইজ্ঞা! গাছে চড়ে যিখ্‌নে খুশি চইল্যে যেত গহীন রাতে। উঠানে গাছ খাড়া রেইখ্যে মাছি হইয়্যেঁ সেঁধাতো যে কোনো যোবতী মেয়ার ঘরে। মন্ত্রবলে লিদ্রায় অচেতন

কইর‍্যে দিতো সক্কলকে। সহবাস অন্তে গাছে চইড়্যে ফিরে আঁইত শেষ পহরে। উসব সাধন করা অঙ্গ অত বেলিয়ম সয়? মুয়ে রক্তো উইঠ্যে মইর‍্ল্যাক আকালে। এসব কথা শুনলে ভদ্রজনের অবিশ্বাসী মন ইল্‌চি করে ওঠে। আবার ভেতরে ভেতরে কৌতূহলও বাড়ে।

বাবুরা শুধোন, 'কি হে লখিন্দর? এ সব বিদ্যা তুমি জানো নাকি? তুম্মো কি গাছ উড়্যাতে পার?'

লখিন্দর লা কাড়ে না। সে শুধু শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে অগ্নিবর্ষী আকাশের দিকে।

অবিশ্বাসী বাবুরা গাঁয়ের লোককে ইল্‌চি কেটে বলেন, 'উয়াকে একটা ডবকা ছুগরী দেইখ্যে বিয়াটিয়া দাও হে তুমরা। খাগুার বউ এইল্যে দু-দিনেই উয়ার উসব ভোজবিদ্যার লিশা টুইট্যে যাব্যেক।'

শুনে ওরা কলকল করে ওঠে। লখিন্দরের বিয়ার গপ্পো জোড়ে সাতকাহন করে।

সাতপাটি-মণ্ডলকুলি গাঁ থেকে বছর পঁচিশেক বয়েসে দেশে ফিরেছিল লখিন্দর। দিনরাত শ্মশানে-মশানে থাকত। গাঁজা-ভাঙ খেত। সাপ-খোপ ধরত। মাদুলি-কবচ দিত। জ্যৈষ্ঠ মাসে মেঘবাত উঠলে সাপেরা ডিম পাড়ে। তারপর এলে-বেলে ঘুরতে থাকে। লখিন্দর দিনরাত সাপ ধরে কাটায়। ভাঁদ্রে বিষ্টুপুরের দরবারে মনসার ঝাঁপান হয়। সেখানে রাজ্যের ওঝা আসে সাপ নিয়ে। হরেক মুদ্রায় নাচে শয়ে শয়ে সাপ। লখিন্দর ওঝা মধ্যমণিটি হয়ে দাঁড়ায়। দু'কান কামড়ে ঝুলতে থাকে একজোড়া দুধিয়া খরিশ। জিভ কামড়ে ঝুলে থাকে উদয়লাগ। লখিন্দরকে নিয়ে তখন সারা তল্লাটে সব হাড় কাঁপানো গল্প। সে নাকি একটা লাল গুলাচের ফুল দেখিয়ে মানুষকে কুত্তা বানিয়ে ফেলে চক্ষের নিমিষে। তারপর 'তুতু' করে ডেকে নিয়ে চলে যায়। সে নাকি দৃষ্টি ফেলবা মাত্তর টসটসে আমের গুটি, কচি ডাব শুকিয়ে আংরা হয়ে যায়। পানেরডাঙর থেকে বাণ মেরে সে নাকি গুলুকপাহাড়ির ভব কাইতিকে মুখে রক্ত তুলে মেরেছে। কার আজ্ঞায়? মহিষখোঁয়াড় মৌজার ভুজঙ্গ বাগের আজ্ঞায়। দুনিয়ার হেন কুহক নাই যা উ জানত না।

পানেরডাঙরের পরশমণি তুঙ্গ তখনও বেঁচে ছিল। নব্বুইয়ের ওপর উম্বর তার। প্রাণের অধিক ভালোবাসত লখিন্দরকে। লখিন্দরের আওল-বাওল ভাব দেখে সে কী আক্ষেপ বুড়ার। ছেইলাটার কাঁচা বইস। এই কি তার কুহকবিদ্যা কইর্‌বার সময়? বুড়ার বড় সাধ জাগল ছেইলাটাকে সংসারী দেখে যায়। হিংজুড়ির কৈলাস নামহাতার মেয়ে জানকীকে ভারী মনে ধরেছে বুড়ার। পান পাতার তুল্য মুখ! নাক-চোখ সব যেন ছাঁচে তোলা। দিন স্থির হল। সবার অনুনয়ে লখিন্দর নৈতন কাপড় পরে, কাঁড়া গাড়ি চড়ে বিয়ে করতে চলল।

কৈলাসের উঠোনে বিয়ের বেদি। দু-একটা বাতি জ্বলছে টিমটিম। দুয়োরে দু-চার জন মাতব্বরের ভিড়। হেনকালে ঘরের মধ্যে ত্রাহি ত্রাহি আর্তনাদ। মেয়া-মাইন্‌সের আছাড়ি পিছাড়ি কান্না। লখিন্দর বেদিতে বসে তাকায়। তার তখন হাড়সর্বস্ব খালি গা। মাথায় পাটালিবর্ণের ঝাপুড়ঝুপা বেণীবদ্ধ জটা। আংরা জ্বলা চোখ। সে বড় ভয়ংকর রূপ।

একসময় জানকীকে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে এল মেইয়া-ছেইয়ার দল। তার চিৎকারে তখন কান পাতা দায়। বলির পাঁঠার মতো কাঁপতে কাঁপতে সে বেদিমূলে এল বটে,

কিন্তু বরের দিকে এক পলক তাকিয়েই তার গোঙানি উঠল। টলতে টলতে ঐখানেই লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

এসব প্রায় একযুগ আগের কথা। কিন্তু এখনো লখিন্দরের বিয়ের কথা উঠলে এলাকার লোক দন্ত-ছিরকুটি হাসে। হাঁ—সে এক বিয়া বটে!

তারপরও বারকয়েক বিয়ের কথা উঠেছিল। কিন্তু লখিন্দরকে আর বিয়ের আসনে বসাতে পারেনি কেউ।

কুলডাঙরের ভৈরব গাঙ্গুলি পূজ্যমান ব্যক্তি। তিন তিনটে ধানের গোলা। বাঁশের ঝাড়, ফল-ফুলারির বাগান. হাস্কিং মিল। বিষ্টুপুর কোর্টে তার ডজন খানেক মামলা চলে সম্বৎসর। এলাকার লোকজন ওঁকে ভয়ভক্তি করে চিরকাল। তবে কিনা, দিনকালের রং বদলাচ্ছে দ্রুত। মানুষ কেমন বেপরোয়া হয়ে উঠছে দিন দিন। ছোটলোকেরা দল বাঁধছে। বহুকাল আগে ভেস্ট হয়ে যাওয়া তিরিশ বিঘে জমিন অ্যাদ্দিন দখলে ছিল। গেল-বছর পাট্টা নিয়ে সেগুলোর দখল নিয়েছে বাউরিরা। বিষ্টুপুর থেকে নেতা এসে মিটিং করে গেছে বাউরিপাড়ায়। গণেশ মণ্ডল বিঘে-কতক জমিন কিনে, আর বড় ছেলেটাকে কম্পাউন্ডারি পড়িয়ে এনে সাপের পাঁচ-পা দেখেছে। সবার মাথায় চড়তে চায়। দরিদ্রের পুত্র যদি পায় রাজ্যভার, তৃণসম জ্ঞান করে এ তিন সংসার। দুনিয়ার এই দ্রুত পরিবর্তনগুলো ভৈরব গাঙ্গুলিকে ভারী ভাবায়। সেই কারণেই চুপিসারে লখিন্দরকে প্রস্তাবটা দিয়েছিলেন ভৈরব গাঙ্গুলি। বইস্ তো হল হে ঢের। ছাড়া ষাঁড়ের পারা আজ ইখ্যেনে কাল সিখ্যেনে করে লাভ কী? সাধন-ভজনের জন্য একটা থায়ী ডেরা তো চাই। আমার বাড়ির লাগোয়া ভিটেটাতেই থাকো না তুমি। খালি তো পড়েই আছে। একখানা ঘর না হয় বানিয়ে দিচ্ছি। সাধন-ভজন কর লিরানন্দে। মাথার উপব মুই তো রইল্যমই। গাঙ্গুলির কথায় ভারী আশা জেগেছিল মনে। সেই আশাতে বুক বেঁধে গাঙ্গুলির ভিটেতে ডেরা বেঁধেছিল লখিন্দর। গাঙ্গুলিও একখানা বড়সড় অস্তর পেয়েছিল হাতে। তখন লখিন্দর ওঝার ভারী নামডাক। সর্পাঘাত, বজ্রাঘাত, গর্ভপাত, সম্মোহন-উচাটন, বাণ-মারা, মামলা জয়—এসবে তার তখন দুনিয়াজোড়া নাম। এমন শক্তিমান মানুষটি যার আশ্রিত, বলতে গেলে হাতের মুঠোয়, তাকে বিভিন্ন কারণে ভয়ভক্তি করতেই হয়। বলা যায় না, সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে, গাঙ্গুলি লখিন্দরকে দিয়ে কীভাবে তার শোধ নেয়। এমন উদাহরণ তো চোখের সুমুখেই রয়েছে। কালো বাউরি নাকি কার কথায় ভুলে গাঙ্গুলির জমিখানা বর্গা-রেকর্ড করবার জন্য ঘনঘন সদরে যাচ্ছিল। গাঙ্গুলি একদিন কালোকে ডেকে সর্বসমক্ষে বলেছিলেন, 'এমন অলেহ্য কম্মো করিস নাই রে কালো। সাত পুরুষের বিশ্বাসটা ভাঙ্গিস নাই। মাথার ওপর চন্দ্র সূর্য্যি বিদ্যমান। তুয়.র বউয়ের পেটে বাচ্চা রইয়েছে। অত মহাপাপ সইব্যেক নাই।' কালো শুনলো না। ফল কী হল? চার মাসের মাথায় পেটের মধ্যে বাচ্চা পচে ফুলে ঢোল। অকালে মরল বউটাও। এই ধরনের ছোটখাটো উদাহরণ আরো রয়েছে যে।

আছে। ওই ডেরাতেই আছে লখিন্দর। আশায় আশায় আছে। ধীরে ধীরে ওর বয়েস বেড়েছে। মাথার পাটালিবর্ণ জটা শাদাটে হয়েছে। আরো কংকালসার হয়েছে শরীর। চোখের রং হয়েছে ঘোলাটে। গায়ের চামড়া কোঁচকাতে শুরু করেছে। ষাটের কোঠা পেরিয়ে আজও লখিন্দর আশা ছাড়েনি। বাবুদের দয়া-দাক্ষিণ্যে এই রাঢ়ের দেশে বৃষ্টি নাবিয়ে তবেই পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে সে।

গাঙ্গুলিরা ওর ওপর আকছার জুলুম করে। বাড়িতে বন্ধু-বান্ধব-আত্মীয় এলেই লখিন্দরের ডাক পড়ে। সাপের খেলা দেখাতে হয়। হরেক কিসিমের আজব আজব প্রশ্নের জবাব দিতে হয়। তাবিজ-মাদুলি বানিয়ে দিতে হয় বিনে পয়সায়। গাঙ্গুলির বখাটে ছেলেটা—তিলক না কী যেন নাম—সে প্রায়ই এসে জুলুম করে। মেয়া বশ করবার বিদ্যেটা ওকে শিখিয়ে দিতেই হবে। যে বিদ্যায় লাল রুমালখানা দেখালেই যত দেমাকি মেয়াই হোক, ফেতি কুত্তার মতো পিছু পিছু ঘুরবেক। তিলক গাঙ্গুলি বিষ্টুপুর কলেজে পড়ে। কী যে পড়ে তা ওই জানে। কিন্তু ওর জ্বালায় লখিন্দরের তিষ্ঠোনো দায়। ভেতরের গরগরাণি রাগটা বহুকষ্টে চেপে লখিন্দর বলে 'ভালো কইর্যো লিখ্যাপড়া কর খোকাবাবু। এ সব গু'খাবা বিদ্যা শিখ্যে কী লাভ হবেক তুমার?'

'অতো জ্ঞান কে চাচ্ছে হে?' তিলক গাঙ্গুলি ধমক দেয়, 'তুমি বিদ্যাটা শিখাও দেখি।'

রাগে জ্বলতে জ্বলতেও মুখে কেঠো হাসি ফোটানোর চেষ্টা করে লখিন্দর। শান্তগলায় বলে, 'মেয়া কি কুহকবিদ্যায় বশ হবার চিজ আইজ্ঞা? মেয়া বশ হয় ভালোবাসায়।'

তিলক গাঙ্গুলি রেগে কাই হয়। চাপা গলায় একটা খিস্তি করে। লখিন্দর চুপ করে হজম করে যায়।

মাদল বাউরি মাঝে মাঝে ক্ষেপে যায়। ইখ্যান্ থিক্যে ডেরা উঠাও উস্তাদ। ইয়ারা তুমার হাড়মাস খাব্যেক।

লখিন্দর গুম মেরে বসে থাকে। ভাবে। বলে, 'এই, বুড়া বইসে আর কুথাকে যাব রে? কুথায় ফের বাসা বাঁধব এই শেষ পহরে!'

মুখে বার্ধক্যের যুক্তিটা দেখায়। ভেতরে গুমরাতে থাকে। ওই এক আশা। বাবুদের দয়া-দাক্ষিণ্যে এই খরার দেশকে সুশ্যামল করে দিয়ে যাবে সে।

তল্লাটের তাবৎ মানুষ নিষ্পলক তাকিয়ে রয়েছে আকাশের দিকে। দিন গুনছে। আকাশের লক্ষণ বিড়ছে'। ইতিমধ্যে সমস্ত বাঁধ-জোড় শুকিয়ে কাঠ। পাতকুয়াতেও জল নেই। ধুর-ধুরান্ত থেকে কাঁড়াগাড়িতে করে আসছে জল। সকাল না হতে কিষ্টোবাঁধের পাড়ে একশো কাঁড়া গাড়ি। রাঢ়ের কল্লাচ মাটি ক্রমশ নিদয়া হতে শুরু করেছে। কোদালের ঘা মারলে আগুন ছুঁড়ে শোধ নেয়।

মুরুব্বিরা তাঁদের পুরোনো দিনের বরষা-বাদলের গল্প জোড়েন জুত করে। তখন আকাশ জুড়ে সে কী কালো মেঘের ঘনঘটা! দশদিক অন্ধকার। দিনভর রাতভর মুষলধারে বরষা। দ্বারকেশ্বর উপচ্ছিয়া ঘোলাটে জল। গোপালপুর, গোঁসাইপুর, মধুবন ভেসে যায়। বাঁধগাবা আব হেঁড়ে পর্বতের খুইল্যাগুল্যান টইটম্বুর। কিষ্টোবাঁধের মোয়ান ছাপিয়ে হেজ মারে ঘোলা জল। ছুটে চলে আঁইসবাড়ির দিকে। তখন সারারাত কী ঝমঝম আওয়াজ! গুড়গুড় করে ফাটতে থাকে মেঘ। অবিরাম বিজলাতে থাকে আকাশ। সোঁ-সোঁ হাওয়া বয়। একটানা ব্যাঙের ডাক। চরাচর ভেসে যায় একরাতে। রাতভর দু-চোখের পাতনি এক হয় না ভয়ে তাড়াসে।

চারপাশের রোদ-তবড়া মানুষগুলো লোভীর মতো শুনতে থাকে আগের দিনের বরষার গল্প। যেন এক সুস্বাদু রান্নার সুবাস পায় নাকে। সেসব দিন গেছে। এখন জেলায় বছর বছর খরা।

হবেই তো। এ জেলায় রাঢ়-টাড়-কল্লাচ মাটি। বৃষ্টির ফোঁটাটি পড়েই নাচতে নাচতে ছুটতে থাকে নীচালি বেয়ে। জোড়ে-নদীতে পড়ে চলে যায় সমুদ্দুরের পানে। এক ফোঁটা

জলও অন্তরে পথ পায় না। রুখা মাটি রুখাই থাকে। ভুখাই থাকে। এ দেশে খরা হব্যেক নাই তো কুথায় হব্যেক?

ইস্কুলে পড়া ছগরারা বলে, 'খরা তো হব্যেকই। সব জঙ্গল যে কেইটো সাফ কইর‍্যে দিল্যেক। জঙ্গল না থাইক্‌লে মেঘ জমে? বিষ্টি হয়? ইখন্‌ও সতর না হইল্যোঁ ঝাড়ে-বাঁশে মইর‍্ব্যেক ই জিলা।'

বোকাসোকা মানুষগুলো ভুলভুল করে তাকায়। হয়তো অল্পস্বল্প ভাবেও। পরমুহূর্তে রাশিরাশি গাছ কেটে পেটের চিতায় ফেলতে থাকে। খিদের কাছে ইহকাল-পরকাল মিথ্যে হয়ে যায়।

বড় ইস্কুলের মাস্টারবাবু কাঠের ওজন বুঝে নিয়ে জলের দামে কেনেন। পয়সা গুনে দিতে দিতে বলেন, 'এই সরকার আছে বলেই বেঁচ্যে আছিস ছেইল্যা-পুইল্যা লিয়ে। উই সরকার থাইক্‌ল্যে গাছ কাটাটা বারাতো। খাঁকি এইস্যে হুড়কা সেঁধাতো পাছায়।'

মানুষগুলো মাস্টারবাবু আর সরকারের প্রতি গদগদ হয়ে গোল্‌দারি দোকানের দিকে ছোটে।

লখিন্দরকে শুধোলে সে দুর্জ্ঞেয় হাসি হাসে। বলে, 'বাবুরা সব পড়ালিখ্যা শিখ্যে দিগ্‌গজ হইয়্যোঁছেন। দুনিয়ার সব বিদ্যা উয়াদ্যার কিতাবে রইয়্যোছে! আসলে হল আইজ্ঞা, পাপ। মহাপাপ। মা বসুমত্তা রাগে-শোকে পাথর। জীবের তরে আর এক ফোঁট্টা মমতা নাই উয়ার অন্তরে।'

'তেবে উপায়?'

'উপায় আছে আইজ্ঞা। মাইন্‌ষের হাতে সব আছে। গাইয়ের বাঁটের দুধ উড়াবার বিদ্যাও আছে। আবার আগাশ ফাইট্যে অমৃত ঝরাবার বিদ্যাও উয়ার হাতে মজুত।'

'উপায়টা তেবে খাটাও না হে।'

দপ্‌ করে জ্বলে ওঠে লখিন্দরে চোখ। বলে, 'হুকুমটা দ্যান্‌ দিখি।'

হুকুমেব মাহাত্ম্যটা বোঝে সবাই। হুকুম দেওয়া মানেই খরচটা জোগানো।

টুঙ্গর বাউরি বলে, 'তেবে ডাকা হউক ষোলো আনা। সিখ্যেনে সার-ধার হউক। বড়কত্তাকে গিয়ে বলি চল সব।'

আকাট দুপুরে মাদল বাউরি এসে দাঁড়াল লখিন্দরের উঠোনে। ঠা ঠা রোদে মাঝ-উঠোনে পদ্মাসনে বসেছে লখিন্দর। চোখদুটো বোজা। দু-কানে ঝুলছে দুটো কালচিতি। জিব কামড়ে ঝুলছে একখানা ঘোড়ালাগ। কাঠের গুঁড়ির মতো কালো-কর্কশ শরীরখানা স্থির।

ওস্তাদকে ডাকতে সাহস হয় না মাদল বাউরির। থম মেরে দাঁড়িয়ে থাকে আগড়ের বাইরে।

খানিকবাদে চোখ খোলে লখিন্দর। ভাবলেশহীন দৃষ্টি। আস্তে আস্তে পাথরের দেহে প্রাণসঞ্চার হয়। স্থির মণিজোড়া কেঁপে কেঁপে ওঠে।

মনটা আজ ভালো নেই মোটেই। বড় কষ্ট ভেতরটায়। সকালের দিকে তিলক গাঙ্গুলি এসেছিল। বলে, 'তুই তো কিছোতেই বিদ্যাটা শিখিয়ে দিলি নাই। একটা কাজ অন্তত কইর‍্যে দে মোর।' বলেই তিলক জামার পকেট থেকে বের করেছিল একখানা ভারী সোনার বালা। বলেছিল, 'ইট্যা টুকচান্‌ মন্ত্রিয়ে দে। যেন যার হাতে থাইক্‌ব্যেক,

সে পুরোপরি বাগ মানে।'

বালাটির দিকে থির পলকে চেয়েছিল লখিন্দর। চাপা গলায় বলেছিল, 'এ কার বালা?'

'সিট্যা জেনে কাম কী তুয়ার? যিট্যা বলছি সিট্যা কর্।'

লখিন্দর মুহূর্তে বুঝে ফেলে ব্যাপারটা। মায়ের গয়না নির্ঘাৎ চুরি করেছে তিলক। নিয়ে যাচ্ছে বিষ্টুপুর। কোনও মেয়াকে পরাবে।

লখিন্দরের চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে। বলে, 'ইসব বিদ্যা মুই আর নাই কইর্‌বো আইজ্ঞা। ইসব কাজে ক্ষমা দাও মোকে।'

একমনে বিড় বিড় করতে থাকে লখিন্দর, 'আসল বিদ্যাখান লিদাই রইল্যেক বক্ষের পেড়িতে। ইসব ভুলকি ছো কইর‍্যে কইর‍্যে খুয়ার হল সাধের জনম্!'

তিলকের মুখ মুহূর্তে হিংস্র হয়ে ওঠে। লখিন্দরের সামনে ভারী বালাখানা ঠক করে নাবিয়ে রেখে বলে, 'কাল সক্কালে বিষ্টপুর যাব মুই। তার আছে যেন কাজটা হইয়্যে যায়। লচেৎ ফল উলটা হব্যেক।'

নিঃশব্দে বেরিয়ে যায় তিলক গাঙ্গুলি। লখিন্দরের শীর্ণ কপোল বেয়ে দীর্ঘ জলের ধারা গড়িয়ে পড়ে।

মনের মধ্যে কষ্টটা গাঢ় হলে ইদানীং লখিন্দর দুনিয়া থেকে সাময়িক ছুটি নেয়। কেবল নাক ছাড়া মুখমণ্ডলের বাকি ইন্দ্রিয়ের দুয়ারগুলিতে পাহারা বসিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে অন্দরে।

মাদল বাউরি সেই ঘুমখানা ভাঙিয়ে দিল। অল্প বিরক্ত হয় লখিন্দর। সাপগুলো খুলে খুলে পেড়িতে ভরে। শুধোয়, 'কুত্থেকে এলি তুই?'

'হিংজুড়ি থিক্যে।'

ভীষণ চমকে ওঠে লখিন্দর। আশঙ্কায় কালো হয়ে ওঠে মুখ।

'জানকীটা উন্মাদ হইর‍্যে গিছে উস্তাদ।' মাদল বাউরির গলা কেঁপে কেঁপে ওঠে।

লখিন্দর ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে। কথাগুলো যেন মাথায় ঢোকে না।

মাদল বাউরি ধীরে ধীরে খোলসা করে, 'আইজ হিংজুড়ি গেছলাম। শুনলাম, জানকী আর আগের মতোনটি নাই। ইদানীং খিলখিলিয়ে হাসে। হাউমাউ কাঁদে। আবোলতাবোল বকে। আকমবাকম করে। বিশ্ববম্মাণ্ড উদোম-সুদোম ঘুইর‍্যে বেড়ায়।'

লখিন্দর নিষ্পলক শুনে যায়।

'উয়ার বাপটা মোর ছামুতে আছাড়িপিছাড়ি খেঁইয়্যে কাঁইদ্‌ল্যাক। বলে, 'সোনার বন্নো মেয়া মোর, কী তার আবেস্তা'।

শুনতে শুনতে একসময় হুঁশে ফেরে লখিন্দর। চেরা গলায় বলে, 'তুই কি ইট্যাই বইল্‌বার লেইগ্যে ছুইট্যে আইছিস এই অবেলায়?'

মাদল বাউরি অপ্রস্তুত বোধ করে।

ফের আনমনা হয়ে যায় লখিন্দর। জানকীর দুঃখী দুঃখী মুখখানা ভাসত থাকে চোখের সুমুখে। হিংজুড়ি গাঁয়ের মধ্য দিয়ে আনাগোনা আছে লখিন্দরের। অনেকদিনই গাঁয়ের মধ্যে ঢুকবা মাত্তর লখিন্দরের চোখদুটো অবাধ্য হয়ে ওঠে। পায়ের গতি শ্লথ হয়ে আসে অজান্তে। সরু পগারটা ডিঙোতে গিয়ে আচমকা হোঁচট খায়। মাদল বাউরি সঙ্গে থাকে। সব বোঝে সে। ছল করে বলে, 'গাছের ছাওয়ায় টুকচান বসবে উস্তাদ? জলটল

খাবে?' শুনেই মাথা নেড়ে হাঁটাটা বাড়িয়ে দেয় লখিন্দর। এক সময় প্রায় ছুটতে থাকে।

মনমেজাজ ভালো থাকলে চেলার সাথে অনেক সুখ-দুঃখের কথা চালাচালি হয়। ভাট পুকুরের জলো হাওয়ায় ভিজে আসে মন।

মাদল বাউরি মনের বিস্ময়টা চেপে রাখতে পারে না। বলে, 'তুমি তো সম্মোহন-উচাটন কতো বিদ্যাই না জানো উস্তাদ। মেইয়াটার মনটা ঘুরাতে পারো না তুমার দিগে?'

লখিন্দর নিঃশব্দে মাটির ওপর আঁক্‌চিরা কাটে। বলে, 'উসব বিদ্যা লিজের ভোগে লাগালে অশুদ্ধ হইয়্যেঁ যায় রে। সুবিদ্যা হল কপ্পুরের পারা চিজ। অশুদ্ধ হইলেই উড়্যেঁ যাব্যেক।'

অথচ তার সেই বিদ্যাগুলোকে অশুদ্ধ করার তরে কত চেষ্টাই না করছে মানুষ। কত প্রলোভন। লখিন্দর ভেবে পায় না, কী করে সে মানুষের আকণ্ঠ লোভ থেকে বাঁচিয়ে রাখবে বিদ্যাকে।

মাদল বাউরি সরে পড়তে চাইছিল। লখিন্দর হাত তুলে থামাল তাকে। বলল, 'থেইক্যে যা। আইজ সইন্‌ঝায় ষোলো-আনার মিটিন।'

ভৈরব গাঙ্গুলির উঠোনে আজ ষোলো-আনার মিটিং বসেছে। কুলডাঙরে তিন পাড়া মিলে ঊনষাট ঘর বামুন-কায়েত, তেলি, বাগদি-বাউরি। আজকের ষোলো আনার বৈঠকে কেউই গরহাজির নেই। এ যে ভারী জরুরি বিষয়। জীবন-মরণ সমস্যা। আগামী দিনের বংশধরদের বাঁচিয়ে রাখবার প্রশ্ন। মাদল বাউরিকে নিয়ে লখিন্দর একটি কোণে চুপ মেরে বসে থাকে। কঙ্কালসার আমসিমুখো মানুষগুলোকে দেখতে থাকে। আশা-নিরাশায় দুলতে থাকে মন।

ভৈরব গাঙ্গুলি এখনো অন্দরমহল থেকে বেরোননি। উনি এলেই মিটিং শুরু হয়। সবাই জানে ওঁর একটু দেরি হবেই। চা খেতে খেতে রেডিওয় সন্ধের খবরটা না শুনে বেরোবেন না উনি।

আসন নিতে নিতে ভৈরব গাঙ্গুলি বললেন, 'আইজ্‌কার খবরে বইল্‌ল্যাক, বিষ্টির কুনো আশা নাই।'

পাথরের মতো মুখগুলোতে কোনো বাড়তি ছোপ পড়ে না। কেবল নাভিমূলের চারপাশ সুড়সুড় করে ওঠে এক অনাগত আতঙ্কে।

সবাই একনাগাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে লখিন্দরের ওপর। 'তুমি বিদ্যমানে এ কি হাল হে, লখিন্দর?'

'তুমার কত ক্ষ্যামতা। কত তেজ। চতুর্দিকে শতেক যোজন তুমার নাম।'

'তুমাকে দ্বিতীয় ভগমান ভেইব্যে কত ধুর-ধুরান্ত থিক্যে পাপী-তাপী এইস্যে ভালো হইয়্যে ফির্যে যায়।'

'বিষ্টুপুর দরবারে তুমি অঝা চূড়ামণি। তুমি মহাদেবের গহনাকে সর্বাঙ্গে জইড়্যেঁ বইস্যে থাক।'

'তুমাকে তো মোরা মনুষ্যরূপী মহাদেব বলেই জানি হে।'

'তুমি থাইক্‌তে মোদের অতো দিগদারি?'

লখিন্দরের অলৌকিক ক্ষমতার বাখান দিতে থাকে সবাই। ঘটনার পর ঘটনা। কাহিনীর পর কাহিনী। রাত বেড়ে যায়। শুনতে শুনতে অধীর হয়ে ওঠে লখিন্দর।

এসব আলোচনায় লখিন্দর চিরদিনই নীরব শ্রোতা। কিন্তু আজ আর সামলে রাখতে পারল না নিজেকে। হাত জোড় করে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'মোকে ক্ষমা দেন বাপ সকল। উসব ছা-ভুলানো কাজে মন আর নাই ভরছে আইজ্ঞা। বাণ মারা, তেল মন্ত্রানো, মেয়া ভুলানো, ভূত ছাড়ানো, সাপ লাচানো, গর্ভপাত—ইসব কুনো বিদ্যা লয় আইজ্ঞা। হুজুর, ইসব হইল্যাক পাতাল-বিদ্যা। মইর্‌বার পর এ বিদ্যা যাবেক পাতালে-লরকে।'

'সে তুমি যাই বলো হে। পাকা পাকা জাত সাপগুলানকে ধইর্‌বার মনিষ্যি তুমি ছাড়া আর কোউ নাই এ তাল্লাটে।'

'হঁ, সিট্যা মাইন্‌ত্যেই হব্যেক।' অন্যজন ধুয়ো ধরে।

লখিন্দর ম্লান চোখে তাকায়। ধরা গলায় বলে, 'এই দুনিয়ার মানুষ আটাগুলা জলকে দুধ বলে খেঁইয়ে মচ্ছে আইজ্ঞা। আসল দুধ চাখে নাই। মিছা কথা নাই বইল্‌ব হুজুব। উসব দু-লম্বরি বিদ্যা। সাপ ধরাটা কিছো কঠিন কাম লয়। শুধু আইজ্ঞা সাহস আর হাতের কৌশল।'

চমকে ওঠে মাদল বাউরি। উস্তাদ কি পাগল হয়ে গেল! বিদ্যার গুপ্ত কথা ভাঙে কেউ? এ সব বিদ্যায় মানুষের বিশ্বাসটাই আসল। বিশ্বাস ভাঙলে ধ্বন্বন্তরীও ঠুটা জগন্নাথ। *ফিসফিসিয়ে ওস্তাদকে থামাতে চায় মাদল বাউরি।*

'আরে, থাম্‌রে।' এক ধমকে মাদল বাউরিকে থামিয়ে দিয়ে লখিন্দর বলে চলে, 'সাপ হইল্যাঁক হুজুর বক্কার জাত। বাঁ হাতে উয়ার ল্যাজ ধইর্যে ডান হাতে মুদ্রা কইরল্যেঁ, উ ভাবে কি, ডান হাতখানি বুঝি আর এক সাপ। উ শালা ত্যাখন ডান হাত থিক্যে নাই সরাব্যেক লজর। বাঁ হাতে চোট মাইর্‌বার কথাটা বারেকের তরেও মনে ঘাই মারে না উয়ার। সেই কারণেই, যত সাপুড়্যা মরে, সব ডান হাতে চোট খেঁইয়্যেই মরে। অবশ্যি দ্রব্যগুণও বইঁছে। আর আছে বাসুকীর কির্‌পা। তেবে, যেদিন আপনার দিন ফুরাব্যেক, সেদিন শিকড়-বাকড়, জড়ি-জটকা কিছোতেই চেৎ নাই মানব্যেক। সেদিন উই জড়ি-জুটকার বটুয়াটা খুঁইজে খুঁইজে হয়রান হইয়্যেঁ আপনি। কিন্তু উটা সেদিন আর নাই মিলব্যেক।'

'আর অন্য বিদ্যাগুলান? তেলপড়া, জলপড়া, বাণমারা, ভূত ছাড়ানো?'

'সবই এক হুজুর।' লখিন্দর অকপটে স্বীকার করে, 'কিছো দ্রব্যগুণ, কিছো হাতের কৌশল। বেশির ভাগই মানসিক চিকিচ্ছা। মনটাই তো আসল হুজুর। মনেই রোগ জন্মায়। মনেই সারে।'

'তো ইসব তুমার দু-লম্বরি পাতাল বিদ্যা। স্বর্গবিদ্যা তালে কুনটা বটে?'

'আছে হুজুর। সে মোর বক্ষের পেড়িতে ঘুমন্ত রইয়েঁছে জনমভর। সে বিদ্যার প্রয়োগে চতুর্দিকে বাণ ছুইট্‌ব্যেক। শুরু হব্যেক সূয্যিদেবের সাথে ইন্দর দেবের লড়াই। লড়াইয়ে সূয্যিদেব হেইর্যে মুখ লুকাবেন অস্তাচলে। আকাশময় গুরুলে উঠব্যেক মেঘ। শুরু হব্যেক অবিরাম বর্ষণ। চরাচর ভাইস্যে যাব্যেক। জোড়-বাঁধ-লদী হব্যেক টইটুম্বুর। বিক্ষো হব্যেক সবুজ। সোনার বন্ন্যো ধান ফইল্‌ব্যেক খেতে। জোড়ে-বাঁধে অফুরান মাছ। গাইয়ের বাঁটে বট আঠার মতোন গাঢ় দুধ। মেইয়াদ্যার প্যাটে সুসন্তান। সে হইল্যাক হুজুর আগাশবিদ্যা। মইর্‌বার পর সে বিদ্যা দ্যাবতার রূপ ধইর্যে স্বর্গে যায় আইজ্ঞা। স্বর্গের চিজ, স্বর্গে ফিইর্যেঁ যায়।'

এক অলৌকিক অপার্থিব কণ্ঠস্বর লখিন্দরের গলা চিরে ঝলকে ঝলকে বেরিয়ে

আসে। বিস্ময়ে বোবা হয়ে যায় তাবৎ জমায়েত। লখিন্দরকে যেন কত দূরের মানুষ বলে মনে হয়। ওর চোখ, মুখ, নাক, বক্ষের খাঁচা—বড় অচেনা লাগে।

নিশুত রাতে ভাল্কি বাঁশের ন্যাড়া ঝাড় কড়কড় আওয়াজ তোলে লক্ষ দাঁতে। একটা অবিশ্রাম রিঁ রিঁ আওয়াজ কান্নার মতো ছড়িয়ে পড়ে বাতাসে। লখিন্দর উৎকর্ণ হয়ে শোনে। চমকে চমকে ওঠে। কপালের তাবৎ বলিরেখা জাগ্রত হয়ে ওঠে। ফিসফিসিয়ে বলে, 'উই শুনুন হুজুর, মা বসমন্তা কেমন জলবিহনে কাঁদতে লেইগেঁছেন। আর ধেরী কইর্ল্যে একটা কীটপতংও নাই বাঁইচ্ব্যেক আইজ্ঞা।'

লখিন্দরের আকুতিটা সব্বাইকে ছুঁয়ে যায়। জমায়েত কলকলিয়ে ওঠে, 'তো, কি কইর্তে হব্যেক, বল না শুনি। বিষ্টি লামাতে কী কী চাই?'

'সে আনেক চিজ আইজ্ঞা। আনেক তার উপাচার। বড় জটিল প্রক্রিয়া।' লখিন্দর খানিকটে আভাস দেয়।

খাঁটি ঘি, কালি গাইয়ের দুধ, ধুনা, গুগগুল, শুট, পিপুল, ধনুশ পাখির হাড়, রুদ্রাক্ষ, মড়াচিরের মাটি, কালপেঁচার নখ, আরো শতেক চিজ। রুখা প্রান্তরের মধ্যিখানে শালকাঠ দিয়ে বৃত্তাকারে সাজানো হবে ন-খানা ধুনি। ওই ধুনি জ্বলতে থাকবে একনাগাড়ে। সারা গায়ে খাঁটি ঘি মেখে ওই জ্বলন্ত ধুনির বৃত্তের মধ্যে বসে অষ্টপ্রহর বীজমন্ত্র জপ এবং তৎসহ নানান উপাচার, মুদ্রা, অনুষঙ্গ চলবে, যতদিন না আকাশ ভেঙ্গে অঝোর ধারায় বৃষ্টি নামে। বৃষ্টি জলেই নিভবে ধুনির আগুন। অন্য কোনো উপায়ে নয়। ধুনির আগুনে ঘন ঘন ঘি ঢালতে হবে প্রক্রিয়া মতো। গায়েও ঘিয়ের জমাট প্রলেপ। আগুনের সংস্পর্শে গায়ের ঘি গায়েই গলবে। সূর্যের আর চারপাশের আগুনের তেজে ভাজা ভাজা হবে শরীর। শুকিয়ে আমসি হবে গায়ের চাম। সে সময় এক ফোঁটা থুথুও গেলা যাবে না। সে এক ভয়ানক ক্রিয়াকাণ্ড।

লখিন্দরের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শোনে সবাই। বলে, 'কত খরচ হব্যেক?'

ফর্দ তৈরি হল। হিশেব হল। সাকুল্যে অন্তত পাঁচ হাজার টাকা খরচ। হব্যেক্ই তো। এ তো বজ্জাত্কে মাদুলি পরিয়ে মামলা জেতানো কিংবা কুমারী মেয়ের গর্ভপাত করার বিদ্যা লয়। এ হল অমৃত ঝরানোর বিদ্যা। সে যুগে শুধু রাজা-রাজড়া ছাড়া কেউ এ কাজে নাবতে সাহস পেত?

'আজকাল তো আর রাজা-রাজড়া নাই হে!'

'ইখন হল গণরাজ।'

ভৈরব গাঙ্গুলি বলেন, 'পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা বিছানী হোক ষোলো আনার মধ্যে।'

আর্থিক অবস্থার নিরিখে চাঁদা বিছিয়ে সবচেয়ে বেশি ধরা হল গাঙ্গুলিদের পাঁচশো টাকা। সবচেয়ে কম কালো বাউরির, তিরিশ টাকা।

মানুষগুলো পিটপিটিয়ে তাকায়। হাই তোলে। মটমটিয়ে গাঁট ফোটায়। কেউ কেউ অনর্গল কাশতে থাকে। কাশতে কাশতে উঠে পড়ে। যাই, রাত হইল্যাক। চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা তো দূরের কথা এখন চল্লিশটা পয়সাও যেন স্বপ্ন। সরকার মাঝে মাঝে জি-আর দেয়। লঙরখানা চলে হপ্তায় দু-দিন। ওইসব দিয়ে বেঁচে থাকা। বেঁচে থাকা না বলে, বলা যায়—না মরা।

ভৈরব গাঙ্গুলির চোখেমুখে ছলাৎ ছলাৎ নাচতে থাকে চাপা হাসি।

'উঠল্যে কি কইর্যে চইল্ব্যেক হে? বাঁইচত্যে তো হব্যেক।'

ভৈরব গাঙ্গুলি ইলচি করছেন কিনা বুঝতে পারে না গাঁয়ের মানুষ। ফ্যান্-আমানি খেয়ে দিন কাটছে যাদের, তারা কিনা পঞ্চাশ টাকা চাঁদা দেবে!

'তা'লে কি পাঁচটি হাজার টাকা আগাশ থিক্যে ঝরব্যেক হে?' ভৈরব গাঙ্গুলির গলায় বিদ্রূপ।

মানুষ জবাব খুঁজে পায় না। খালি উশখুশ করে।

লখিন্দর সারাক্ষণ ব্যাকুল নয়নে তাকিয়ে থাকে ষোলো-আনার মুখের পানে। সেই কবে কোন ছেলেবেলায় খরা-পীড়িত এই জেলার কোন এক অজগাঁয়ে রামায়ণ গানের আসরে ইন্দ্রযজ্ঞের কাহিনী শুনেছিল সে। চতুর্দশ বৎসর অনাবৃষ্টি চলছে। জগৎ সংসার পুড়ে খাক। প্রজাদের হাহাকার আর আর্তনাদে আকাশ-বাতাস ভরে আছে। যজ্ঞ শুরু করেছেন রাজা। ইন্দ্রযজ্ঞের শেষ দিনে চরাচর কাঁপিয়ে বৃষ্টি। অবিরাম, অবিশ্রাম। সে বৃষ্টিতে ধরিত্রী শীতল হলেন। চাষের খেত ফের সবুজ হল। গাছে গাছে ফল। বনে বনে পাখি। মানুষের মুখে ফের ফুটল হাসি। শুনতে শুনতে যেন স্বপ্ন বলে মনে হয়। সেই স্বপ্নটা বুকে পুষে লখিন্দর কত যুগ বেড়িয়েছে, কুম্ভস্থলী থেকে কাঁউর-কামাখ্যা। এক ওস্তাদ থেকে আর এক ওস্তাদের পায়ের তলায়। বিদ্যাটা শেখা হয়েছে। কিন্তু স্বপ্ন-সাধটা পূরণ হল না আজও। সেই কারণে লখিন্দর আজ ব্যাকুল নয়নে উদগ্রীব, শুধু এক চিলতে হুকুমের জন্য।

বহুৎ লেবু কচলানোর পর ষোলো আনার বৈঠক ভেঙে গেল। গভীর রাতে শ্রান্ত অবসন্ন হতাশ মানুষ মিলিয়ে গেল আঁধারে।

উঠোনের এককোণে একখানা কাঠের গুঁড়ির মতো নিশ্চল বসে থাকে লখিন্দর। পাশে মাদল বাউরি। চোখে পলক পড়ে না। খালি নিঃশব্দে ওঠানামা করতে থাকে বুকের খাঁচা।

এক সময় উঠে দাঁড়ায় লখিন্দর। পায়ে পায়ে এগোতে থাকে সদর ফটকের দিকে। আচমকা পেছন থেকে ডাক আসে।

ভৈরব গাঙ্গুলি বলেন, 'আয়। বোস। কথা আছে।'

লখিন্দররা ফিরে গিয়ে বসে ভৈরব গাঙ্গুলির পায়ের কাছে।

'তুয়ার বিদ্যায় সত্যি বরষা লামব্যেক?'

'লামব্যেক আইজ্ঞা।' লখিন্দর উতলা হয়ে মাটিতে চাপড় মারে, 'গুরুর বচন মিছা হবার লয়।'

'কিন্তু খরচ-খরচা করেও যেদি বিষ্টি নাই লামে?'

'চন্দ্র-সূয্য যেদি ঠিক থাকে, তেবে গুরুর বচন ফল্‌ব্যেক্‌ই হুজুর।' উত্তেজনায় থরথরিয়ে কাঁপতে থাকে লখিন্দর, 'বিশ্বাসই সার কথা। উই বিশ্বাসের জোরেই না ভক্ত পল্লাদ হাতির পা'তলে শুয়্যে ছিলেন আইজ্ঞা।'

ভৈরব গাঙ্গুলি পলকহীন চোখে দেখতে থাকেন লখিন্দরকে। অন্ধকারের মধ্যে মিটমিটিয়ে জ্বলতে থাকে চোখ। কী আশ্চর্য মানুষ! কেবল বিশ্বাসের জোরেই সর্বাঙ্গে অগ্নিবেষ্টিত হয়ে আকাশ থেকে বৃষ্টি ঝরাতে চায়!

'অনেক টাকার ব্যাপার যে রে। অ-নেক টাকা।' ভৈরব গাঙ্গুলি যেন নিজেকেই শোনান কথাগুলো।

'টাকাটা কিছো লয় হুজুর।' আচমকা ভৈরব গাঙ্গুলির পা দুটো জড়িয়ে ধরে লখিন্দর,

'আগাশের ছাতিটা যদি ফাটে, তেবে মাইন্‌সের যে উব্‌কার হব্যেক, সে তুলনায় টাকাটা লগণ্য। আপনি বিচারক মানুষ, বিচার করুন।'

ভৈরব গাঙ্গুলি নিরুত্তেজ গলায় শুধোন, 'তুয়ার বিদ্যায় কি সর্বত্র বরষা হব্যেক?'

'বিদ্যা যেদি কাজ করে হুজুর, তেবে হুকুম মাফিক বরষা হব্যেক। চরাচর ভাইস্যেঁ দিবা যাব্যেক। ফের সামিয়ানা-আনজাদ জায়গায় বরষা ঝইর‍্যেঁ দিবাও যাব্যেক।'

কথাটা মনে লাগে ভৈরব গাঙ্গুলির। বামাক্ষ্যাপার বৃষ্টি ঝরানোর গল্প মনে পড়ে যায়। লখিন্দরের দিকে ঝুঁকে পড়েন তিনি। চাপা গলায় বলেন, 'যদি উপকরণ দিই, তেবে শুধু মোর জমিনের উপর বিষ্টি ঝরাতে পারবি? অন্য কারো লয়, শুধু মোর জমিনের ওপর?'

অসম্ভব চমকে ওঠে লখিন্দর। চোখের ভাষা নিমেষে পালটে যায়। গাঙ্গুলির পা থেকে আলগা হয়ে যায় হাত। লম্বা করে মাথা নাড়িয়ে বলে, 'উটি কইর‍্ত্যে লারব হুজুর। আমার এ বিদ্যা কারো গুলামি নাই কইর‍্ব্যেক।'

'বাহ্' ভৈরব গাঙ্গুলি ঈষৎ বিরক্ত হন, 'খরচা কইর‍্বো মুই, আর দুনিয়ার লোক জল পাব্যেক!'

লখিন্দর ঘোর লাগা চোখে হাসে। বলে, 'সুবিদ্যা হুজুর সোগন্ধ ফুল। একজনার বাগিচায় ফুইট্‌ব্যেক। তার সুবাস পাব্যেক বিশ্বচরাচর।'

চোখমুখ লাল হয়ে ওঠে ভৈরব গাঙ্গুলির। চোয়াল কাঠ হয়ে যায়। কষকষে গলায় বলেন, 'তেবে ভাগ।'

গাঁটে গাঁটে আওয়াজ তুলে উঠে দাঁড়ায় লখিন্দর। ধীর পায়ে ফটকের দিকে হাঁটতে থাকে।

'শুন্' পেছন থেকে বলে ওঠেন ভৈরব গাঙ্গুলি, 'এ ভিট্যায় আর তুয়ার থান হব্যেক নাই। আজ রাতেই তুই মোর ভিটা ছাড়বি।'

লখিন্দর জবাব দেয় না। ট্যাঁক থেকে সোনার বালাটা বের করে ছুঁড়ে মারে বারান্দার ওপর।

গাঙ্গুলির পায়ের কাছটিতে বারদুই আর্তনাদ করে থেমে যায় ওটা। লম্বা লম্বা পা ফেলে দেউড়ির বাইরে বেরিয়ে যায় লখিন্দর। ঘৃণায় রি-রি করে ওঠে মন। শালারা সব কুত্তার জাত। যতই ঘি-ভাত খাবাও, গুয়ের লোভ যাবেক নাই। মনের মধ্যে যত রাজ্যের পচা পাঁক। পা দিলেই বুজকুঁড়ি ওঠে।

গভীর রাতে তৈরি হল লখিন্দর। পেড়ির মধ্যে বন্দী সাপগুলোকে ছেড়ে দিল ভিটেয়। তারপর মাদল বাউরিকে সাথে নিয়ে অন্ধকারে পথে নাবল।

গাঁ ছাড়ালেই ভৈরব গাঙ্গুলির আঠারো বিঘে শোল জমিনের চাক। ধরনের দিনে জমিনের মাঝবরাবর পায়ে চলা পথ। ওই পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে আচমকা দাঁড়িয়ে গেল লখিন্দর। তারপর মাদল বাউরির চোখের সুমুখেই আলগা করে দিল কোমরের কষি। গেরুয়া লুঙ্গিখানা টুপ করে খসে পড়ল মাটিতে। সম্পূর্ণ উলঙ্গ মানুষটা মাদলের দিকে পেছন ফিরে প্রস্রাব করতে লাগল সারা জমিন।

মাদল বাউরি ত্রস্ত চোখে দেখছিল ওস্তাদের কাণ্ডকারখানা। তাই দেখে এক সময় খলখল করে হেসে উঠল লখিন্দর। দাঁতে দাঁত চেপে পিশাচের গলায় বলল, 'শালা গাঙ্গুলি, কেবল লিজের জমিনে বিষ্টি ঝরাবার চেঁইয়েছিল। ঝরাই দিল্যাম বৃষ্টি। শালা

ফসল ফলাক ইবার। রাজা হউক।' পিশাচের মতো হাসতে থাকে লখিন্দর। গভীর রাতে তার আকাশ কাঁপানো হাসি শুনে মাদল বাউরির বুকের কলিজা কেঁপে কেঁপে ওঠে। লখিন্দরের উন্মাদ হাসি আর থামে না।

ঠিক সেই মুহূর্তে ভেসে ওঠে কালো কালো মানুষের ছায়া মূর্তি। গাঁয়ের গাছ-গাছালির আঁধার ফুঁড়ে শয়ে শয়ে এগিয়ে আসে তারা। লখিন্দরের সামনেটিতে চাপ চাপ জড়ো হয়। পোড়াকাঠের মতো শরীরগুলো ভেদ করে কেবল এক জোড়া করে আলোর ফুটকি জ্বলতে থাকে আঁধারে।

কালো বাউরি এসে লখিন্দরের পাশটিতে দাঁড়ায়। উথলে ওঠা গলায় বলে, 'গাঁয় ফিরো চল উস্তাদ।'

'মোদের ভিটায় ঘর বেঁইধ্যে দুবো তুমার। মোদ্যার সর্বস্ব দিয়ে, দুয়ারে দুয়ারে ভিখ মেইগ্যে, দরকার হইল্যে লিজেদ্যার বিক্রি কইর্যো তুমার ইন্দর-যাগের খরচ তুইল্যে দুবো মোরা। তুমি ফিইর্যে চল।'

লখিন্দর জবাব দেয় না। সে শুধু নিষ্পলক চেয়ে থাকে কালো মানুষগুলোর দিকে। সেই অগ্নিবর্ষী আকাশে ধীরে ধীরে জমতে থাকে মেঘ। একসময় দুচোখ ফাটিয়ে কপোল বেয়ে ঝরতে থাকে বৃষ্টি। অবিরল ধারায় চলে সে বৃষ্টি। একদণ্ডও থামে না।

ঝোরবন্দী

বহু কষ্টে ওপরের দিকে তাকাল গগন। চোখদুটো আবার ধাঁধিয়ে গেল তার। ঝকঝকে কাঁসার থালা বলে মনে হল আকাশটাকে।

ভেতরটায় ভ্যাঁপস্যা গুমোট। প্যাচপ্যাচে কাদা। থিকথিকে কালো আঁধার। একটা গোল কালো সুড়ঙ্গ...। একটা ময়াল সাপের পেট যেন।

ওই ময়াল সাপের পেটের মধ্যে ঠায় দাঁড়িয়েছিল গগন। ভকভকে পচামাটির গন্ধে পেটের মধ্যেটা পাক দিয়ে উঠছিল থেকে থেকে। গন্ধটা পেট থেকে বের করবার জন্য বারকয়েক ঢেঁকুর তুলল গগন! মুখটা তার গ্যাঁজালো টক জলে ভরে গেল।

অথচ আজ সকালেই গগনের চারপাশে ছিল কত গাছগাছালি...ঘরদোর...সামনের উঠোনে রোগাটে লম্বা নিম গাছের তলায় বাঁধা কালী গাই...। দুলি...খুকনীরাও ছিল। মাথার ওপরে ছিল নীলচে কড়াইয়ের মতো ছড়ানো আকাশ।

এখন গগনের মনে হচ্ছে সে সবই মিছে। স্বপ্নের মধ্যে দেখা ধোঁয়া-ধোঁয়া ঘসাঘসা ঝাপসা কাচের মতো অস্বচ্ছ লাগছে সেসব দৃশ্য। এখন দুনিয়া বলতে যেন, কেবল সে এবং হাত পঞ্চাশেক লম্বা একটা ময়াল সাপের পেট। তাবপরেই ঢাকা দেওয়া ঝকঝকে কাঁসার থালাটি।

চোখদুটো নামিয়ে নিল গগন। ধাঁধিয়ে যাওয়া দুচোখে এখন শুধুই অন্ধকার।

অনেকক্ষণ থেকে পা'দুটো অবশ হয়ে আসছিল। আমল দেয়নি সে। আমানির ঢেঁকুরটা বন্ধ হবার পরও এক যুগ কেটে গিয়েছে। পেট জুড়ে খিদে আর বুক জুড়ে তেষ্টা। তাই নিয়ে সে দু-হাত চালিয়েছে সমানে। তারপর এক সময় নিথর হয়ে পড়েছে। হাত পঞ্চাশেক ওপরে যেখানে ঝকঝকে কাঁসার থালার মতো গোল আকাশটা থমকে দাঁড়িয়েছে, সেখানে দু-চারটে ছায়া ছায়া ঝাপসা মুখ উঁকি-ঝুঁকি মেরেছে। গলা ফাটিয়ে ডাক পেড়েছে তারা। দড়ি বেড়ে উপরে উঠে যাবার জন্য গগনকে পীড়াপীড়ি করেছে অনেক গলা। তারপর দল বেঁধে ছুট মেরেছে সবাই।

গগন জানে, ওরা কেউ তার কাছাকাছি পৌঁছুতে পারবে না। ময়াল সাপের পেটে ঢোকার সাহস ওদের কারুর নেই। সে কাজ পারে কেবল টিয়াকাঠির গগন। আর ডাইনমারির নাটু পাত্র।

একজন এখন কুঁয়োর তলায় এক হাঁটু কাদার মধ্যে থাবড়ে বসে, হাঁ করে নিঃশ্বাস টানছে হা-ভাতের মতো। অন্যজনকে খুঁজে পেতে আনার জন্য ছুট মেরেছে সবাই। সময়মতো যদি পায় নাটুকে, তবে হয়তো কোনোক্রমে এ যাত্রা টিকে যাবে গগন। নইলে...।

গা-টা কেন জানি গুলোচ্ছিল সকাল থেকে। হাতে-পায়ে যেন জুত পাচ্ছিল না সে। দুলি শুনে জিদ ধরেছিল বাচ্চা মেয়ের মতো। এককাট্টা হয়ে বলেছিল "কাজ লাইকো

আজ কামে গিয়্যা। শুয়ো থাকো ঘরে।''

সজনে গাছের গুঁড়ি ঘেঁষে দাঁতন করছিল গগন। দুলির দিকে তাকিয়ে বিড়বিড়িয়ে বলল ''তা হয় লারে বউ। পাঁচ হাত জল জমে যাবে এক রেতে। ঝোর লেবেছে ইখুন।''

দুলি বোবা চোখে তাকিয়ে ছিল গগনের দিকে। গগনকে সে আজীবন চেনে। এ সময় তাকে ঠেকিয়ে রাখার মানুষ নেই এ দুনিয়ায়। এ এক নেশা। তেষ্টায় 'বেশ্ব-ভবন' যখন আইটাই করছে, মা বসুন্ধ্রার বুকখান ফাটো ফাটো, তখন গগন কিনা মা বসুন্ধ্রার বুকে সরু অন্ধকার সুড়ং বানিয়ে টেনে আনল পাতালগঙ্গার টলটলে জল...। সে জল খেয়ে ধড়ে প্রাণ ফিরে এল তাবৎ প্রাণীর। দু-হাত আকাশের দিকে তুলে তারা বলল, ''হ, মরদ বটে একটো গগন সাউ। পাথর কাট্যে রস বার করে আনে সে, হাতের যাদুতে।'' এ খেলায় গগনকে হেরে যেতে বলার সাহস দুলিরও নেই।

মানুষটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে রাগটা গনগনে হয়ে উঠল শ্বশুরের উপর। ''ইতো কাম থাইক্‌তে, কাম এ্যাকখান শিখায়ে গ্যাছে বটে প্যাটের ছা'রে। যমের ঘরের দখিন দোরের কাম। এমন শত্রুতাও মাইন্‌সে করে, প্যাটের ছ্যালের সাথে?'' খসে পড়া ঘোমটাকে ফের মাথায় তুলতে তুলতে রান্নাঘারের দিকে চলে গেল দুলি।

বাপের ওপর দুলির রাগ দেখে মনে মনে হেসেছিল গগন। বাপের মাহাত্ম্য বুঝবে কী করে ওইটুন মেয়ামান্‌ষে! সে কেবল জানে গগন। সারাজীবন শয়ে শয়ে কুয়ো কেটেছে গগনের বাপ। তার ছাতির তলায় একটা ঝোর ছিল। গগনই কেবল খোঁজ রাখত সেই পাগলা ঝোরার। নেশাটা ছোঁয়াচে রোগের মতো টানছিল গগনকে। ফাঁসের মতে টেঁসে বসেছিল গলায়।

কুয়া খুঁড়োচ্ছে অবিলাশ পড়ধান। জমিজিরেত, তৈজসী-মহাজনি—সব মিলিয়ে মা লক্ষ্মীকে বেঁধে ফেলেছে দোরগোড়ায়। এখন ধর্মেকর্মে মতি জেগেছে। কুয়ো কাটিয়ে প্রতিষ্ঠা করবে মায়ের নামে। সিমেন্টের চাতাল বানিয়ে কুয়োর গায়ে খোদাই করে দেবে মায়ের নাম... ধাম ইত্যাদি।

খবরটা শুনে হইহই পড়ে গিয়েছিল গাঁয়ে। ''কাম একটো করতিছে বটে পড়ধানের পো। এমন সুসন্তান গব্যে ধরেও সুখ।''

গগন বুঝেছিল, কাজটা তাকেই করতে হবে। অর্ধেক মজুরিতে কাজটা হাসিল করতে চায় অবিলাশ পড়ধান। বাকি অর্ধেক এদিক-সেদিক থেকে কেটে নেবে যে-কোনও অছিলায়। ''তোর ধার... তোর বাপের ধার... দুদিন বাদে তোর ছেলের ধার...। ক্যাবল সুদটুকু নিলেও তো পুরা মজুরিটাই যায় রে। নেহাৎ পুণ্যের ব্যাপারখান্ রইয়েছে—মিনা শূন্যে কাম করালে ষোলো আনা ফল ফলবে না—তাই।''

তা, শুরু করেছিল গগন কুয়ো কাটার কাজ। বেশ দাপটেই। সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে মোট পাঁচজনা। হাত দশেক পর্যন্ত চুয়া ছিল সাথে। পালা করে ওঠানামা করছিল দুজনে। তারপর থেকে ওঠানামার পালা চুকেছে। তখন থেকেই গগন একা।

সাত সকালে খাদে নামত গগন। বেলা দুপুর অবধি একনাগাড়ে কেটে যেত মাটি। সাঙ্গপাঙ্গরা ওপর থেকে নামিয়ে দিত টিন। কালো কুচকুচে মাটি, লাল লাল বালি—, শাদাটে চুন রঙের ঘুটিং--! গগন ভরে ভরে দিত। কপিকল বেয়ে ঘড়ঘড়িয়ে উঠত-নামত টিন। দিনভর চলত এহেন কাণ্ড-কারখানা।

ধীরে ধীরে গর্ত নামতে লাগল পাতালে। আঠারো হাত, বাইশ হাত, পঁচিশ হাত, ভারী হতে লাগল ভেতরের বাতাস। ঘন হতে লাগল আঁধার। ওপরের ঝকমকে আকাশটা ছোট হয়ে ঝুঁকে পড়তে লাগল সুড়ঙ্গের মুখে।

গগন ক্রমশ তলিয়ে যেতে লাগল নীচে, আরো নীচে...।

পঁচিশ হাত কাটবার পরও যখন জল বেরল না, তখন সত্যিসত্যিই ভাবনায় পড়ে গেল গগন। সারাটা জীবন কুয়ো কেটে কেটে হাতে কড়া ফেলল সে, এমন বেকায়দায় তো জীবনে পড়েনি। মাটির রং আর বালির দানা চিনে চিনে সে নির্ভুল বলে দেয়, কোথায়, কতদূরে জল। গগনের সব হিশেব যে মিথ্যে হয়ে যাবার জোগাড়!

পাতালের কালচে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে দম টানতে টানতে দাঁত কিড়মিড়িয়ে গগন গাল পাড়ে অবিলাশকে।

"শালা, সারা জেবন মহাপাপ করে গেলি এক লাগাড়ে। ইখন মায়ের লামে কুয়া খুঁড়াবার শখ! পুণ্যি অর্জন!" কপালের ঘাম গামছার খুঁটে মুছতে মুছতে বলে "য্যাতোই কাটতিছি, ত্যাতোই লাবতিছেন মা গঙ্গা। পাপীরে মুখ দেখাবেন তিনি? ছোঃ।" গগন থোক করে থু-থু ফেলে।

কিন্তু গগনের দেমাকেও যে দিয়েছেন বড়সড়ো ঘা। এ তল্লাটে এত বড় কুয়োকাটিয়ে গগন। সে কিনা পিছু হটবে শেষমেষ! সব ছেড়েছুড়ে উঠে আসবে ওপরে? শুকনো পাতালের বুক খাঁ-খাঁ করবে সারাদিন। যে দেখবে সেই হাসবে। "দ্যাখে যা একবার গগ্‌নার কাণ্ডখান! সার্কিসের মরণ-কুয়া কাট্যেছে শেষমেষ। জল লাইকো এ্যাক চোল।"

ছিঃ ছিঃ, এমন টিটকিরি শোনার আগে এই কুয়োর তলায় পড়ে মরে যাবে গগন। জিদটা সহসা শতগুণ বেড়ে ওঠে গগনের। উথলে ওঠা দুধের মতো। একটা দেমাকি নিঃশ্বাস বইতে থাকে বুকের মধ্যে। হাতদুটো চলতে থাকে পাগলের মতো। ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ...। গগন থকে পড়ল এবার। অন্ধকারের মধ্যে হাঁফাতে হাঁফাতে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলল, "মরুভুঁইয়ে কুয়া কাটতিছেন পড়ধানের পো। মা গঙ্গা ই-তাল্লাটে লাই গ। পড়ধানের পো-রে জল না দিবার অছিলায় চলে গিছেন একেবারে পাতালে।"

সাঙ্গপাঙ্গরা ভুলভুল চোখে তাকায়। "কি হবে তালে?" অন্যমনস্ক গগন বিড়বিড়িয়ে বলল, "কি হবে... কি হবে...?" পরমুহূর্তে যেন নিজের মধ্যে ফিরে এল সে। "মুই বি যাব পাতালকে। গে' বলব, মা জননী, চলো গো, অবিলাশ পড়ধান এত্তেলা পাঠ্যেছে। উর মাকে সগ্যে পাঠাবে যে। চল মা, জলদি।" দম নেবার ফাঁকে ফাঁকে হাসে গগন। ঘামে ভেজা নোনতা ঠোঁটদুটো চাটতে থাকে।

অবিলাশ পড়ধানের মুখেও চিন্তার রেখা ফুটল। একটা কুয়ো কাটাতে যে দুটো কুয়োর খচ্চা পড়ে যাবার জোগাড়।

"কি হে, ক্যামনি তরো কুয়া কাটতিছ তুমি? জল যে আর বারায় লাকো।" গগনকে শুধোয় অবিলাশ।

গগন তেতো হাসি হাসে। বলে "কয্যে মা গঙ্গার পূজা লাগাও পড়ধানের পো। কুদিষ্টি লাগিছে এ থানে। এমন কুয়া বাপের জন্মেও কাটি লাই মুই।"

গঙ্গাপূজা হল। আর এক দফা গচ্চা গেল অবিলাশের। মুখখান ভার হয়ে এল তার। পুরোহিত বিদায় করে অন্দরে ফেরার মুখে আপন মনে মাকে গাল পাড়লো খানিক। "তু লাকি সগ্যে যাবি! তর কীর্তি কে লা জানে, এ গেরামে?"

পঞ্চান্ন হাতের মাথায়—চোত মাসের ঝাঁ-ঝাঁ দুপুরে—পাতালের অন্ধকার থেকে আচমকা চেঁচিয়ে উঠল গগন। আহ্—। আকাশফাটানো চিৎকার। চারপাশের দেওয়ালে সে আওয়াজ হাজার গুণ হয়ে ফিরে এল।

ভয়-তরাসে ওপরের মানুষজন উঁকি মারল চকিতে। অন্ধকার পাতালপুরীতে কি ঘটছে, দেখবার চেষ্টা করল তারা।

গগন প্রাণপণে মাটি আঁচড়াচ্ছিল পাগলের মতো। হাঁটুর ওপর ভর করে গড় হয়ে হাতদুটো চালিয়ে যাচ্ছিল সমানে।

ওপরের দিকে তাকিয়ে ফের চেঁচিয়ে উঠল সে! "জল বারাচ্ছে গ'—ঝোর লাবতিছে।"

উল্লাসে ফেটে পড়ল মানুষজন। অবিলাশ পড়ধান ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল চিলের চোখ নিয়ে।

মুহূর্তের মধ্যে পাশাপাশি চারখানা টিন বেঁধে প্রস্তুত হল গগনের সাঙ্গপাঙ্গরা।

শুরু হল শেষ খেলা। জলের সঙ্গে মানুষের হাতাহাতি লড়াই।

এখন আর দম নেবার ফুরসৎ নেই। চারপাশের ঝোর বেয়ে জল নেবে আসছে অবিরাম। তার আগে যতটা সম্ভব কাদামাটি খুঁড়ে ওপরে তুলে দিতে হবে। মাঝে মাঝে দড়ি দিয়ে টিন নাবিয়ে ছেঁচে ফেলতে হবে জল। আবার জমে যাবার আগে খুঁড়ে ফেলতে হবে খানিকটা মাটি।

পাগলের মতো চলছে গগনের দু-হাত। বুনো মোষের মতো একেবারে ফুঁসে উঠেছে সে।

এ সময়টা রাত যেন কাটতে চায় না আর। সারারাত চমক চমক ঘুম হয়। সর্বক্ষণ ওই এক চিন্তা! ঝোর নামছে...। জল জমছে...।

ভোর না হতেই কপিকল তাই ঝনঝনিয়ে ওঠে। ছলাৎ ছলাৎ... চলকে পড়ে জল।

সারাদিন একনাগাড়ে হাত চালালে কাজটা আজই মোকাম হবার কথা ছিল। তখন মিষ্টি জলের ফোয়ারাগুলো ছেড়ে দিয়ে গগন ভারী ভারী পা ফেলে উঠে আসত ওপরে।

সারারাত জল ঝরত অঝোরে। আগামী কাল সকালবেলায়, পাড়ার কাচ্চা-বাচ্চা এসে উঁকি মারত কুয়োর মধ্যে। টলটলে জলের ওপরে নিজেদের ছায়া দেখে চমক লাগত তাদের। কৌতুকে ঘন হত কচি কচি মুখগুলো। কুয়োর মধ্যে মুখ নামিয়ে শব্দ করতো "কু..."। সে শব্দ শতগুণ হয়ে ফিরে আসত, ঝাঁকে ঝাঁকে। হতে পারত এ সব-কিছুই...।

ঝোরের জল ক্রমেই জমছে, পাতালপুরীর সুড়ঙ্গের তলাটিতে। হাত খানেক জল-কাদার ওপর পা ছড়িয়ে বসে রয়েছে গগন, ওপরের পানে দৃষ্টি চারিয়ে। হাঁ করে নিঃশ্বাস টানছে সবলে।

দুলির মুখখানা ছায়া হয়ে দুলছে চোখের সামনে। আজ ভীষণ মানা করেছিল দুলি। গগন তখন হেসেছিল মনে মনে। পোয়াতি মেয়েমানুষ, মাস-পুরানির সময় এটা। এ সময়টা মেয়া মাইন্‌ষের বড্ড একলা মনে হয়—। নিজের মানুষকে আগলে রাখতে চায় সাত হাতে।

রওনা দেবার কালে দু-চোখ ছলছলিয়ে দুলি বলেছিল, "খ্যারাব নাগলে উঠে আস।

পাখাল-ভাত পাঠায়ে দুব দুফ্‌রে।"

ততক্ষণ আর সময় হল না...। তার আগেই গগনের সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে এল। তেষ্টায় শুকিয়ে এল ছাতি। দু-চোখে অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে লাগল ক্রমশ।

গগন এক দৃষ্টিতে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিল ওপরের দিকে। ঝোরের জল উঠে এসেছে তার বুক অবধি।

ওপরে কতকগুলো মুখ উঁকি-ঝুঁকি মারছিল। খুদে খুদে, ঝাপসা। কাউকেই চিনতে পারল না গগন। হয়তো দুলি এসে দাঁড়িয়েছে। হয়তো কোলের বাচ্চাটাও বোবা চোখে দেখছে বাপকে। সে হয়তো বুঝতেই পারছে না, পাতালে, সুড়ঙ্গের তলায় দম আটকে কুঁকড়ে মরছে একটা মানুষ। পোকামাকড়ের মতো।

কাল রাতেই গগন কতই না আদর করেছে দুলিকে। গলা জড়িয়ে ধরে দুলি বলছিল, "বুঝতে পারতিছ কিছু?"

অন্ধকারে জোনাকির মতো চোখ জ্বালিয়ে গগন বলছিল, "হু—। ব্যাটা।"

সঙ্গে সঙ্গে দুলির গায়ের কাঁপুনিটা টের পেয়েছিল গগন। দুলি ফিসফিসিয়ে বলেছিল, "আমি পূজা দিব শিবের থানে।"

বাচ্চা মেয়েটাকে কথা দিয়ে রেখেছে গগন। কুয়াটা মোকাম হলেই তাকে নিয়ে যাবে গাজনের মেলায়। চড়কের 'উড়া' দেখাবে সারা বিকেল।

কিন্তু কিছুই হল না এসব। কেমন যেন সব ওলোট-পালোট হয়ে গেল।

অসহ্য যন্ত্রণায় গগনের ভেতরটা ক্রমশ নীল হয়ে আসছিল। ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য কত কথাই যেন উঁকি-ঝুঁকি মারছিল ভূতুড়ে ছায়ার মতো।

শরীরের নীচের অংশটা কাদায় বসে গিয়েছিল। পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মতো গগন কেবল কোমরের উপরের দিকটা মোচড়াতে লাগল এপাশ-ওপাশ। দু-হাত দিয়ে পচা কাদার তালগুলোকে আঁকড়ে ধরে প্রাণপণে পিষতে লাগল মুঠোর মধ্যে।

বাপের কথা মনে পড়ছিল গগনের। তুখোড় কুয়ো-কাটিয়ে হিশেবে নাম ছিল তার। বাপের কথাগুলো এখনো গগনের কানে বাজে। "যে যাই বলুক, আসল পুণ্যি তর্‌ রে। বসমন্তার ছাতি ফাটায়ে তিষ্টার জল আইন্‌বার বাড়া সুকম্মো লাইকো এ সন্‌সারে। এক গঙ্গার জন্যে সগর রাজার যাট হাজার ছাওয়াল-নাতি সগ্যে গ্যাছে। তুই আনতিছিস কিনা থানে থানে গঙ্গা।"

আধো আঁধারে ঝিমমারা গগনের মনে হল যেন তার বাপ এসে দাঁড়িয়েছে পেছনে। গোঙানো গলায় যেন কত কিছু বলছে গগনকে। নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই, কেবল চোখদুটো চারিয়ে গগন চারপাশে খুঁজে বেড়াতে লাগল তার এক যুগ আগে মরে যাওয়া বাপকে।

অন্ধকার পাতালপুরীতে অসহায় গগন পাখির ছানার মতো কঁকিয়ে কেঁদে উঠল এক সময়। "সারাটা জেবন বসমন্তার বুক চিরে জল খাবালাম মানুষজন্‌রে। কি পাপে মোরে খাবার লাগিছ গ' মা বসুন্দ্রা? গগ্‌না তুমার কুন পাপটা কইর্‌লো? বলো মা, বলো মোরে। শুনে যাই একটিবার যাবার বেলায়।"

দুলি সত্যিই এসে দাঁড়িয়েছিল ওপরে। কোলের বাচ্চাটাকে কাঁখের ওপরে তুলে আছাড়িপিছাড়ি করছিল।

"কি হল গ' তুমার? কথা বলতিছ না ক্যানে? কি হল গ..." কান্নাভেজা গলায় কঁকিয়ে উঠছিল দুলি।

কোলের বাচ্চাটা অস্থির হয়ে উঠছিল বার বার। কালো সুড়ঙ্গের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছিল থেকে থেকে,—"বা যাব। ওমা, বা যাব—।"

নিজেকে ও বাচ্চাকে সামলাতে গিয়ে দুলির একেবারে আগল-বাগল অবস্থা। আলু-থালু চুলে খালি একে-ওকে খামচাতে লাগল সে। "অ-গ' দ্যাখো লা-গ', লাটু পাত্তর আর কতদূর?" হাঁউমাউ করে কাঁদতে লাগল দুলি কোলের বাচ্চার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।

দুলির বুকফাটা কান্নাটা বোধ করি গগনের কানে গিয়ে পৌঁছুল। কিন্তু তখন তার কিছুই করার নেই। সর্বাঙ্গ তখন অসাড়। বুক বরাবর কাদা-জলে ভরে গিয়েছে। তারই দু-চোল খাবার জন্য সে প্রাণপণে আকুলি বিকুলি করছিল। দুলির কান্নাটা কানের পরদায় ঘা মারতেই বহুকষ্টে চোখদুটো ওপরে তুলল গগন। ঝকঝকে কাঁসার থালার ওপর দুলির ছায়া পড়েছে যেন। পুতুলের মতো লাগছে ওকে।

কাঁসার থালাটা দুলছিল গগনের চোখের সামনে। দুলিও যেন দুলছিল। গগন অনেকক্ষণ চোখ মেলে দেখতে লাগল সেই দৃশ্য।

অনেকক্ষণ সাড়া না পেয়ে দুলি চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল আবার, "কতা বলতিছ না ক্যানে গ'? অমন কইর্‌লে ঝাঁপ মারব মুই।" দুলির চিল-চিৎকার ঝনঝনিয়ে বেজে উঠল আঁধারের সরু সুড়ঙ্গে।

গগনের তখন কথা বলার শক্তি ছিল না একটুও। শুকনো কাঠের মতো ঠকঠকে হয়ে উঠছিল তার ঠোঁট, জিভ ও তালু। অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে বসে সে তার মুখটাকে সুড়ঙ্গের মতো সরু করে তুলে ধরল ওপরের দিকে এক চিলতে হাওয়ার জন্য। দুলির চিৎকারে কয়েক পলকের জন্য তার সমস্ত শরীর থরথরিয়ে কেঁপে উঠল। বহু কষ্টে সে হাতদুটোকে তুলে ধরল ওপরের দিকে। ঠিক যেন বাচ্চা ছেলে যেতে চাইছে মায়ের কোলে।

ঘণ্টা দুয়েক বাদে গগনের শরীরটা তোলা হল ওপরে। কাদায় জলে মাখামাখি। চোখদুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে বাইরে। ঝুলে পড়েছে জিভ। বিকট দর্শন। বরফের মতো ঠাণ্ডা মেরে গিয়েছে শরীর। কাঠের মতো ফ্যাকাশে।

বুক ডোবা জলের মধ্যে বসে মরুভূমির স্বাদ পেতে পেতে গগন কখন চলে গিয়েছে ওপারে।

সেই মুহূর্তে অঝোর ধারায় ঝোর নেমেছে কুয়োর তলায়। ধূসর রিং-এর গা বেয়ে ঝলকে ঝলকে উঠে আসছে থই থই জল। ধীরে ধীরে ভরে যাচ্ছে পাতাল গহ্বর। মায়ের মতো এক বুক করুণা নিয়ে উথাল-পাথাল মিঠে জলের স্রোত উচ্ছ্বসিত কলকণ্ঠে হাসতে হাসতে, এগিয়ে আসছে ওপরে। হয়তো বা গগনের মুখের কাছটিতেই।

সে ফেরেনি

উনুনে জল চড়েছে। মাটির হাঁড়িতে। ফুটছে।

হাঁড়ির ওপর মাটির সরা ঢাকা দেওয়া। জটার বউ মাঝে মাঝে শুকনো পাতা, কাঁটা-খোঁচা এনে ঢুকিয়ে দিচ্ছে উনুনের পেটে। কোলের বাচ্চাটা কান্না থামিয়ে ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে রয়েছে হাঁড়ির দিকে।

তিনবছর বাদে ঘরে ফিরছে মানুষটা। গা-গতর কেমনটি আছে, কে জানে! পড়শীরা বলে, জ্যালে গ্যালে মাইন্‌ষে ম'টা হয়। পরিচিত চোখ-মুখ, গা-গতরে বাড়তি মেদ-চর্বি লাগলে মানুষটার আদল কেমনটি দাঁড়াবে, সেটা আন্দাজ করার চেষ্টা করল জটার বউ।

জটা যখন জেলে যায় বউ তখন সাত মাসের পোয়াতি। যাবার সময় জটা কাঁপা কাঁপা গলায় বলে গিয়েছিল, ডরাস লারে বউ। কোবরাজ মশায়কে বলিস, য্যান, কিছো ট্যাকা দ্যান। বলিস, জটা ফিরে আসলে পাট খাটে শুধে দিবে। উই ট্যাকা দে' উকিল-মুক্তার করিস।

হারিন কোবরেজ টাকা দেয়নি। ফলে জটারও আর ফেরা হয়নি। হাজত থেকে জেলে চলে গেছে কোর্টের রায়ে।

একবার, কাঠগড়া থেকে হাজতে ফিরে যাওয়ার সময় গাঁয়ের শশী ভুঁইয়ার ব্যাটার সাথে ভেট হয়েছিল। জটা খবর পাঠিয়েছিল তার হাতে, বউ য্যান একটিবার আসে।

জটার বউয়ের বলে তখন যমে-মানুষে লড়াই। কাঁচা গা'। কোলের বাচ্চাকে নিয়ে খাটা-বাটারও উপায় নেই। ওদিকে পেটে অষ্টপহর চিতার আগুন জ্বলছে। সারা গায়ে খোস-পাঁচড়া বাসা বেঁধেছে। চোখের কোল অবধি। মাথার চুল যেন বাবুই পাখির বাসা। সদরে যাবার ভাড়াও কম নয়। যেতে আসতে পাঁচ টাকা। পাঁ-চ টাকা!

বাচ্চাটা ফের বায়না ধরে অ' মা, বাত্‌ দে' না, বাত্‌।

মাটির হাঁড়িতে জল ফুটছিল টগবগিয়ে। মাটির সরায় ধাক্কা মারছিল ভাপ। সেদিকে আঙুল দেখিয়ে জটার বউ ভোলাতে থাকে ছেলেকে। ভাত ফুটতিছে তো। ফুটুক। লরম হউক। সবুর ধর বাপ্‌।

কোলের বাচ্চাকে দুপুর গড়তির মুখে এমন কথা বলতে বুক ফেটে যায়। কিন্তু এ ছাড়া উপায়ও নেই। বাচ্চা ছেলের পেটের আগুন শুধু মুখের কথায় নিভবে না।

এতক্ষণে হয়তো ঝাপটে আসছে লোকটা। জটার বউ থির হয়ে ভাবতে থাকে। করাতডাঙার বুক ফেঁড়ে কিংবা মহিষডোবার পাড় ধরে পড়ি কি মরি করে ছুটছে। পা মাটিতে পড়ছে কি পড়ছে না। মানুষটার ঘরের টানটা তো জটার বউ জানে। যত দূরেই, যার ঘরেই খাটতে যাক, সন্ধ্যার পর বেঁধে রাখলেও থাকবে না কোথাও। সেই মানুষটা আজ তিনবছর ঘরছাড়া। ওর বুকের পাঁজরগুলো কি আব আস্ত আছে? ভাবতে

ভাবতে বউয়ের চোখে জল এসে যায় সহসা। কোলের বাচ্চার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে সামলাতে থাকে নিজেকে।

ছেলেকে বসিয়ে রেখে জটার বউ ওঠে। ঘর-দোরে একটুখানি ঝাঁটা বোলানো দরকার। দুয়োরটা একটু গোবর দিয়ে নিকিয়ে দিলে ভালো হয়। মানুষটা আসছে।

এমন বোকাসোকা মানুষ যেন কারুর ভাগ্যে না জোটে। এ যুগে এমন মানুষও হয়? চট করে বুঝে ওঠে না কিছুই। ফ্যালফ্যাল করে দেখে খানিকক্ষণ। তারপর ধীরে-সুস্থে চলে, বলে, অঙ্গ নাড়ায়। ওকে নিয়ে সারাটা জীবন জটার বউয়ের কি যে দিগ্‌দারি!

বড্ডো মাথাখাটো লোক। পাঁচের কথায় ভুলে আকমবাকম করে ফেলে। সামলাতে পারে না শেষ অবধি। তা নালে সব্বাই গেল পার্টির কথায় দাঙ্গা করতে, কেবল এ গাঁয়ের জটা দন্‌পাটের নামেই ওয়ারেন্ট বেরুল কেন? খবর পেয়ে সব্বাই ছুট লাগাল, তুই পারলি না? আসলে ওই যে, বুঝতে, ভাবতে, চলতে, ফিরতে, সময় চলে যায়।

তবু কেমন মায়া হয়। মানুষটা তো ভালোই। বড় ন্যাওটা বউয়ের। মুখ ঝামটা মারলে, বোকার মতো তাকিয়ে থাকে, অনেকক্ষণ। তারপর বিনা বাক্যে মেনে নেয় বউয়ের বুদ্ধিসুদ্ধি। চোখের আড়ালে হেসে গড়িয়ে পড়ত বউ। ভাবত, এমন উদার লোক যে কী করে জুটল ভাইগ্যে?

ওই নিয়ে আবার রাগও হয় মাঝে মাঝে। মাথায় রক্ত চড়ে যায়। গলা চড়িয়ে কাঁদতে মন লাগে। সামনে ধপ করে পান্তার জামবাটি নাবিয়ে দিয়ে রাগরোষ দেখাতে হয়।

আচ্ছা, পুরুষ মানুষের এ কামগুলান সহ্য করা যায়? আফিসারের সুমুখে সক্কলে বলল, রঘু ঘোষালের জমিন আধি করি মোরা, আজ পাঁচ বচ্ছর। ভাগ রেকর্ড হয়ে গেল সক্কলের নামে। তুঁই আর বলতে পারলি নি কথাটা? মাথাটাও লাড়ে দিতে পারলি নি, সক্কলের সাথে? ইটুক বুদ্ধিও জুগালো নি তু'র মাথায়?

জগা মিস্তিরি উঠোনে থাবড়ে বসে কত আক্ষেপ করল। "কত করে পাইক পড়া পড়ালাম গ' মামী, কাজ্যকালে বিপরীত কাম কইর্‌লেন মামু মোর। কত হাত-ইশারা কইর্‌লাম আপিসারের পিছু থিকে, কত চোখ ঠারলাম। মামুর মোর মাথাটা যদি টুকচার খ্যালে!"

লাভ হল কি? সক্কলে জমিনের ধান কাট্যে ঘরে লে গেল, আর তুমার জমিনে রাত পুহাতেই মুনিষ লামায়ে দিল রঘু ঘোষাল।

অথচ মাথাটা টুকচার লাড়ায়ে দিলেই, জমিনটা তুমার। ভাগ-রেকর্ড তুমার নামে। তুমি কাটতে পারতে দ্যাড় বিঘা জমিনের ধান। পঁচিশ-পঁচাত্তরে ভাগ পাতে কম করেও বারো মনটাক। তাথিকে দু-মণ জগা মিস্তিরি লিতো। লিতো তো লিতো। তব্বো থাকে দশ মন ধান। ছা' ছাওয়ালের প্যাটে দুদিন খুঁদ-কুঁড়া ঢুকত তো। মানুষটা কথা বুঝল লাকো কুনো দিন। সেই অবোধটি রয়্যে গেল চেরটা কাল।

এমন মানুষ যে জেলের মধ্যে কী করে কাটাল তিনটে বছর, বউ ভেবে পায় না। সেখানে তো শুধু চোর-ছ্যাঁচোড়-ধড়িবাজদের আড্ডা। সহজ সরল 'উদার' মানুষটাকে যে কত লতি-লাঞ্ছনা করেছে সবাই মিলে। ভাবতে ভাবতে ভারী হয়ে আসে বউয়ের মন। চোখের কোনা ভিজে আসে।

বড় মেয়েটার বোঝার বয়েস। তাকে সামলে সুমলে রাখতে হিমশিম খেতে হয়।

জেলে যাওয়ার কথাটা চাপা-চোপা দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করে বউ। এটা-সেটা বানিয়ে বলে। পড়শীরা ইলচি করে কত কথা কয়। সব কথার পালটা কথাটি মজুত রাখতে হয়।

"বাপ আলে ধৌড়ে যাস্ না কাছে।" বউ সাবধান করে দিয়েছে মেয়েকে, "খাটে' খুটে' আ'লো। জিরাবে, দম লিবে...তারপর...।"

মেয়ে পিটপিট করে তাকায়, "বাবা কী আনবে সাথে?"

"আহ্। লক্ষ্মীছাড়ি! জিব দে' য্যান্ লাল্য ঝরতিছে এক্কেরে।" মুখঝামটা দেয় বউ, "মানুষটা বলে আসতিছে কদ্দিন বাদে, সেদিকে লজর নাইকো। কী আনবে সেই ভাবনা মেয়ার।"

বউও ভাবে। কত কিছু আশা মনে। জেলে নাকি মাইনে দেয় রোজকার। সেসব নাকি জমা থাকে জেলবাবুর কাছে। ছাড়া পেলে সেসব পাবে জটা। এসব কথা শশী ভুঁইয়ার ব্যাটার মুখ থেকে শোনা। জেল-কাচারীর বিত্তান্ত সে জানে খোব। কত টাকা পাবে কে জানে? আনতেও পারে কিছু বাচ্চাগুলানের তরে। সে সব গুণ আছে মানুষটার। ভোখে-শোযে থেকেও ছা' ছাওয়ালের তরে কোঁচড় ভরে আনত খই-মুড়ি, ফল-ফুলারি, চেয়েচিন্তে। বড় দয়া মানুষটার পেরাণে।

সকাল থেকে জটার মেয়েটা নেংচাচ্ছিল। বঁইচির কাঁটা বিঁধেছে পায়ে। দেখে ভারী রাগ হয় বউয়ের। জ্বলে ওঠে মেয়ের ওপর "আহ্হা, ঢপী। লেংচাছিস ক্যানে?"

"কাঁটা ফুটিছে না?"

"কে কয় কাঁটা ফুটিয়ে আনতে?" ধমকে ওঠে বউ।

গতকাল মণ্ডলদের ছাগল চরাতে গিয়েই তো এ হেন বিপত্তি। খাসিটা ঢুকল বঁইচির ঝোপে। বেরোয় না আর কিছুতেই। সূয্যি ডোবে ডোবে। বাধ্য হয়ে ঝোপের মধ্যে ঢুকে, খাসিটাকে বার করতে গিয়ে পায়ে গোটাকতক কাঁটা বিঁধল পটাপট। রক্ত ঝরল অনেক। বালি চেপে ধরে রক্ত বন্ধ করতে হল। কিন্তু রাত পোহাতেই ব্যথা।

বউ এসব শুনতে চায় না। গাল পেড়ে বলে, 'এক্কেরে ল্যাংচাবি নাকো মানুষটার সম্মুখে। খরায় খরায় বলে আসতিছে কদ্দুর থিকে। সামনে ল্যাংচে ল্যাংচে ঢং দেখানো...।"

দুপুর পড়তির মুখে এক হাঁটু ধুলো নিয়ে উঠোনে পা দিল জটা। কাঁধের পুঁটলিটা নামিয়ে ধপাস করে বসে পড়ল দাওয়ায়। দরজার আড়াল থেকে জটাকে একদৃষ্টিতে দেখছিল বউ। বেশ খানিকক্ষণ। তারপর এনামেলের ঘটিতে জল এনে নামিয়ে দেয় সম্মুখে।

জটা এক চিলতে ভারী অদ্ভুত হাসি হাসে বউয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে। "কি র‍্যা, তুরা সব ক্যামন ছিলি?"

প্রশ্নটা যেন কেমন ঠেকে বউয়ের কানে। বড় ঠশরা গলা। তিনটে বছর তিল তিল করে, কি ভাবে যে সংসারটা টেনে টেনে নিয়ে গেছে বউ, কি করে যে দুঃখের রাতগুলো পুয়েছে একের পর এক, তা একমাত্র সে-ই জানে। আর জানেন, যিনি দিনকে রাত করবার 'মালেক'। কত লতি-লাঞ্ছনা, লাথি ঝাঁটা, কত লোভ-প্রলোভন...। সব গিলে নিয়েছে বিষের মতো। মানুষটার সোজা-সাপটা প্রশ্নটার জবাব কী করে দেয় সে? কোন বাক্যি দিয়ে বোঝায় তার চোখের জলে ভোর হয়ে যাওয়া রাতগুলোর কথা?

"ভালা।" খুঁটির গায়ে মুখ চেপে মৃদু গলায় বলে জটার বউ, "তুমি বারায়েছিলে কখন?"

"সক্কাল বেলায়। সেকেন বাসে।" বলতে বলতে এনামেলের ঘটিটা মুখের ওপর তুলে ধরে জটা। ঢকঢক করে জল ঢালতে থাকে শূন্য থেকে।

বউ আড়চোখে তাকিয়েছিল জটার দিকে। পলক পড়ছিল না তার। এত দিনের বুভুক্ষু চোখদুটো যেন বাগ মানে না! শরীরের জীর্ণ পাঁজর ভেদ করে বেরিয়ে আসতে চায় আর এক উপোসী নারী।

জটার গা-গতরের দিকে তাকিয়ে প্রথম ভাবনাটা ঘোচে বউয়ের। শরীরটা ভেঙে পড়েনি। বরং যেন অল্প চেকনাই খুলেছে। গলার হাড়গুলো মোলায়েম। গা'টা বেশ সোসর। আগের সেই কাকতাড়ুয়া গোছের চেহারাটার অল্প রদবদল হয়েছে। জটার বউয়ের মনটা ঠাণ্ডা হয়। জ্যালে আজকাল খাতে পরতে দেয় তা'লে।

ঘটিটা নামিয়ে রেখে বারকয়েক জোরে জোরে নিঃশ্বাস দেওয়া-নেওয়া করে জটা। তারপর পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে ফুঁ' লাগায় জোরসে।

বিড়ির ধোঁওয়া ছাড়তে ছাড়তে জটা সহসা বলে, "বুঁচি কুথা রে? দেখতিছি না তারে?"

"মণ্ডলদ্যার ছাগলগুলান লিয়ে বেইরেছে।" বউ খাটো গলায় জবাব দেয়।

বউকে চাল বাছার মতো করে দেখছিল জটা। বলে' "তোর শরীলখান তো ভাবী খ্যারাব হয়ে গিছে রে! কণ্ঠির হাড় যে বেইরে পড়িছে এক্কেরে!"

এ কথায় জটার বউয়ের বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে ওঠে। খুঁটির গায়ে মুখ চেপে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে সে থির পলকে।

জটা সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। চারপাশের গাছপালা, ঝোপ-ঝাড়, খানা-খন্দ—সব কিছুকে জরিপ করছিল দুচোখ দিয়ে।

'ইখানকার লিম গাছটা কুথা গেলরে?" ভুরু কুঁচকে শুধোয় জটা।

বউ উশখুশ করে খানিক। তারপর মাটির দিকে নজর রেখে বলে, "উটা কাট্যে লে' গ্যাছে মণ্ডলরা।"

"ক্যানে?" রুক্ষ গলায় শুধোয় জটা।

"কি করব? ষোলো ট্যাকায় ব্যাচে দিলাম উটায়।"

জটা চুক্‌চুক্ করে ওঠে মুখে। "ইস, অত বড় গাছখান।"

ভীষণ কান্না পাচ্ছিল বউয়ের। ওই ষোলো টাকা না পেলে বংশের একমাত্র ছা'টা বাঁচত? কি করে সে বোঝায় এটা মানুষটাকে!

খানিক বসে নীরবে বিড়ি টানার পর এক সময় নিজের মনেই পুঁটলিটা খোলে জটা। বউ ঠায় দাঁড়িয়েছিল পাশটিতে। আলগোছে চোখ পুরছিল পুঁটলিটার মধ্যে। বুকের মধ্যে কত আশা বাসা বাঁধছিল অজান্তে। উবুর ডুবুর পানকৌড়ি...।

পুঁটলি থেকে জিনিশগুলো বের করে একে একে সাজিয়ে রাখে জটা। একটা গামছা, রবারের চিরুনি, একটা তাঁতের শাড়ি, ছিটের জামা, গাঁজার কলকে, প্লাস্টিকের বিড়ি-কৌটা, তাসের প্যাকেট, মাটির ঘোড়া, পুতুল...আরো অনেক কিছু। জটার বউ ডাগর চোখে দেখছিল চিজগুলো। চোখের কোণে বোবা বিস্ময়।

লাল পুতুলটাকে হাতে তুলে নিয়ে জটা এদিক-ওদিক তাকায়। "উটা কুথা রে?"

বউয়ের বুকটায় যেন হাওয়া করছিল কে। কান্নায়, লজ্জায় যেন ভেঙে পড়তে চায় এবার। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় ঘরের ভেতরটা। "নিদাল্‌ছে।"

জটা পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় ঘরের দিকে। ছেলেকে বুকের কাছে তুলে নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে। বলে, 'ইস, ই যে চামচিকার পারা বদনটি রে!" পরক্ষণে বউয়ের দিকে তাকিয়ে তেলতেলে হাসি হাসে, "ভাবিস নি, ইবার খাবায়ে দাবায়ে কোঁদলটি করে দুব এক্কেরে।" দাঁত বের করে হাসতে থাকে জটা।

বউ মৃদু গলায় বলে, "লাড়াচাড়া কোরো না উরে। কাঁচা লিদ ভাঙে গেলে আবের ভাতের তরে কাঁদন জুড়বে।"

ছেলেকে শুইয়ে দিয়ে, খেলনাটাকে পাশে রেখে বাইরে আসে জটা। নিজের জিনিশগুলিকে ফের পুঁটলির মধ্যে পুরে ফেলে। বাকি জিনিশগুলোর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, "এ গুলান লিয়ে যা, ইখান থিকে।"

বুঁচি ফেরে বেশ খানিক বাদে। দূর থেকে বাপকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। পলকহীন চোখে দেখতে থাকে। রুক্ষ্ম চুলগুলি বাবুয়ের বাসার মতো ফুরফুরিয়ে উড়ছিল এক চিলতে কপালের ওপর। সরু কাঠির মতো হাত-পা আর পিঁজরার মতো বুকখানা যেন নিজের অজান্তে কাঁপছিল তিরতিরিয়ে! জটা হাতের ইশারায় ডাকে। পায়ে পায়ে এসে পাশটিতে দাঁড়ায় বুঁচি।

পকেট থেকে একটা ছোট্ট পাউরুটি বের করে জটা।

"এই নে।" জটা রুটিখানা এগিয়ে দেয় বুঁচির দিকে। বলে, "লে! খা। ভাইকেও দিস।"

আহলাদে ডগোমগোটি হয়ে বুঁচি ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে ঢুকে যায় ঘরে।

খানিকটে দেঁতো হাসি হাসে জটা। বলে, "আসার সময় কাশের মিএ্যা রুটিখান পুরে দিল পাকিটে। বলল, লে যা রে জটা। ঘরে ছা ছাওয়ালরে দিস।" পরক্ষণে গলার স্বরটা পালটে যায় জটার, "শালা দাগী খুনি হলেও পেরাণে মায়াদয়া আছে। অবিশ্যি, কম বিড়ি আর গ্যাঁজা তো খায়নি মুর থিকে। আসার টাইমে যা পালাম তার থিকে দশ ট্যাকা দিতে হল শালারে। কাড়ে কুড়েই লিল। তেবে বাঁচায়ে দিত শালা, বেপদের টাইমে। ঘটির মুয়ে দুধ খাতে গে' যেদিন ধরা পড়ে গেলাম হাতেনাতে ছুটুবাবুর সুমুখে, সেদিন কাশের মিএ্যা না থাইক্‌লে হাড়মাস এক হয়ে যাতো মুর।" জটা বলে, আর দাঁত ছিরকুটে হাসে।

বউয়ের সামনে ুত করে জেলের গল্প জোড়ে জটা। কত চুরি-জোচ্চুরির সাক্ষী ছিল সে জেলের ভেতরে। কত ন্যক্কারজনক কাণ্ড-কারখানা না ঘটত 'ফিমিল ওয়াডে'! কি করে নেশা-পানি আনাগোনা করত জেলের মধ্যে, কেমন করে ভাগ-বাটোয়োরা হত, অবেলায় বসে বসে জটা খোলসা করতে থাকে চার দেওয়ালের মধ্যেকার সেই সব রোমাঞ্চকর কাহিনী!

বউয়ের মুখটা ক্রমশ হাঁ হয়ে যাচ্ছিল জটার ‍থাবার্তা শুনে। চোখদুটোতে পলক পড়ে না!

জটার চোখদুটো নাচছিল। "বড় আজব জা'গা রে বউ। গ্যালে বুঝতিস তু'ও।"

বউয়ের বুকখান কেঁপে কেঁপে উঠছিল জটার কথায়, হাসিতে।

একটু বাদে পায়ে পায়ে ঘরের মধ্যে চলে যায় বউ। জটার হালকা হালকা কথাগুলো

শুনতে ভালো লাগছিল না তার।

জটা আবার একটা বিড়ি ধরায়। আকাশের দিকে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে গান ধরে গলা ছেড়ে, "ইন্‌রাজের গাড়িতে ম'র কিসের পেরজন। হায়রে ম'র অবোধ মন।"

জটার বিকট গলা শুনতে শুনতে ঘরের মধ্যে চোখ ছাপিয়ে জল আসে বউয়ের। তিন বছরে তিলে তিলে গড়ে তোলা বুকখানা ভেঙে চুরমার হতে থাকে অলক্ষ্যে। ছেলেকে বুকে চেপে অনেকক্ষণ কাঁদে সে। কাঁদতে কাঁদতে ভাবে, জ্যাল কি এমনই থান?

তিনটে বছর তিল তিল করে জগতের সাথে লড়াই চালিয়ে সংসারটাকে টিকিয়ে রেখেছে সে। মানুষটা আসবে। খাটা-বাটা শুরু করবে ফের। দুজনে উদয়াস্ত খেটে, আবার খাড়া করবে মুখ থুবড়ে পড়া সংসারটাকে। এইটুকু আশা নিয়েই না!

প্রথমবারে মেয়ে হল বলে মানুষটার আক্ষেপ ছিল। সেই কাঁটা বুকে বিঁধিয়ে দিন কাটাচ্ছিল বউ। তারপর একদিন উথাল-পাথাল বর্ষার রাতে গোঙাতে গোঙাতে সে মানুষটার সাধ পূর্ণ করেছে, অঘ্রানের পাকা ধানের মতো সুঘ্রাণ ছড়িয়ে দিয়েছে সংসারে। জটা তখন কত দূরে! কচি ছেলেকে আলের ওপর গাছতলায় শুইয়ে দিয়ে, কচি চারা রুইতে রুইতে, আকাশ-ভরা কালো মেঘের পানে তাকিয়ে আগল বাগল হয়েছে মন। ধান কাটার ফাঁকে ফাঁকে বাচ্চার কান্না থামিয়ে এসেছে বুকের নিঃশেষিত রসটুকুর ছলনা দিয়ে। সবকিছুর ফাঁকে ফাঁকে কেবল একটি ভাবনাই সোনালি রোদ্দুরের মতো গাঢ় হয়েছে দিন দিন। সেই ভাবনায় কাটিয়ে দিয়েছে বিষণ্ণ প্রহরগুলি। রাতে কড়কড়ে ভাতের থালা সামনে রেখে চোখের জলে ভিজিয়েছে বুক।

সেই মানুষটা এমন হয়ে ফিরে এল কেন? কেন অমন হাওয়ায় ভাসিয়ে কথা কয়? চোখ কেন থির থাকে না কোনখানে? ঘুমন্ত বাচ্চাটাকে বুকে চেপে অনেকক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে বসে থাকে বউ।

"ত্যাল-ট্যাল দিবি, না বসে রইবো ঠায়?" দুয়োর থেকে কষ্‌কষে গলায় হাঁক পাড়ে জটা, "এ ক্যামনধারা ব্যাভার ত'র?"

ছেলেটাকে সাত তাড়াতাড়ি কোল থেকে নামিয়ে উঠে দাঁড়ায় বউ। কুলুঙ্গির দিকে হাত বাড়িয়েই সরিয়ে আনে হাত। মাথার জন্য তেল চাইছে মানুষটা! আহারে...সে কি করে জানবে, মাথার তেলের পাট কবে উঠে গেছে এ সংসার থেকে! আছাড়ি পিছাড়ি খেয়ে কাঁদতে সাধ যাচ্ছিল বউয়ের। বুকের মাঝখানটা দলতে ইচ্ছে করছিল। বাঁশের আগড়ে হাত ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে পাথরের মতো।

খানিক বাদে উঁকি মেরে অবাক হয়ে যায় বউ। জটা কখন পোটলা-পুঁটলি নিয়ে চলে গেছে। দাওয়ার দিকে অনেকক্ষণ এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। তারপর এক সময় ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে গিয়ে উনুন থেকে নামিয়ে দেয় জলভরা হাঁড়িটা। হাঁড়ির মধ্যে ফুটে ফুটে মরে এসেছে জল। কোলের ছেলেকে ভাতের লোভ দেখিয়ে ঘুম পাড়াবার আয়োজন চলছিল এতক্ষণ। বাচ্চার পেটের আগুন নেভাতে, উনুনের পেটে আগুন জ্বালানো।

ঘুমন্ত বাচ্চার কচি পেটটা ওঠা-নামা করছিল। শীর্ণ হাত-পাগুলো নিথর হয়ে পড়েছিল কাঠির মতো। তাই দেখে সহসা গুম মেরে যায় বউ। পায়ের তলায় শিকড় পুঁতে গাছ হয়ে যেতে চায়, যতক্ষণ না ঘুম আসে চোখ জুড়ে...।

সন্ধের আগে আগে ঘরে ফিরল জটা। দাওয়ার ওপর নামিয়ে দিল দু-তিনটে পুঁটলি। "এই লে। লে' যা সব।"

বউ অবাক চোখে তাকায়। বিস্ময়ের বাঁধ ভাঙে বুঝি দু-চোখে!

মুচকি মুচকি হাসছিল জটা। বলে, "গোলপানা চোখ কর‍্যে কি দেখিস রে? চাউল, ডাল, আলু, পেঁজ—রাঁধ দিকি জুৎ কর‍্যে। পেট পুরে খাই।"

দাওয়ার ওপর বসে ঘসর ঘসর করে গা চুলকোতে থাকে জটা। বিষম শব্দ করে হাই তোলে বারকয়েক। তারপর নাকিসুরে গান ধরে ইনিয়ে বিনিয়ে, 'ইন্‌রাজের গাড়িতে ম'র কিসের পেরজন। হায়রে ম'র অবোধ মন...।"

"শালা হাজরার পো' ভাবেছেল, ফকটে লিবার চাতিছি মাল।" দু-চোখ শানিয়ে ব'লে জটা, "কথা কানেই লেয় না শালা। বার করুনু দশ ট্যাকার লোট্। শালার চোখ্ 'এক্কেরে ট্যারা।"

খিক্ খিক্ করে হাসতে থাকে জটা বউয়ের দিকে তাকিয়ে।

ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি ফোটাবার আপ্রাণ চেষ্টা করে বউ। চোখদুটোকে স্বাভাবিক রাখার জন্য ঢলঢলে চোখে তাকায় জটার পানে। তবুও বউয়ের ভাব-গতিকটা দৃষ্টি এড়ায় না জটার।

"এ র'ম প্যাঁচার পারা বদনটি করে রইচিস ক্যান্‌রে তুরা?" ভুরু কুঁচকে শুধোয় জটা, "মুই ঘরে আসতে বিপদ হল নাকি তুদের?"

আচমকা বউয়ের মাথায় একখান পাথর খসে পড়ে বুঝি। কোনোরকমে নিজেকে সামলে পুঁটলিগুলো তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি লুকিয়ে পড়ে রান্নাঘরে।

জটা নিজের মনে হুঙ্কার ছাড়ছিল দাওয়ায় বসে। "সব শালাকে চিনা আছে ম'র। সব কুটুমকে দেখা সারা। পার্টির সাথে দাঙ্গা বাধাবার লেগে ডাকুক না আরেকবার ফের, মু'য়ের মতন জবাবটি দুবো সুমুন্দিদ্যার। শালা...জটা দন্‌পাটের জেবনটাকে আঁটকুড়ির বাত্তিক-বাড়ি ঠাউরেছে সব!"

কাঁটা-খোঁচাগুলো উনুনের পাশে ফেলে রেখে বাইরে আসে জটার বউ। চালের বাতা থেকে কয়েকটা ভাঁজ করা কাগজ বের করে এগিয়ে দেয় জটার দিকে।

"কি এ' গুলান?" জটা নির্লিপ্ত মুখে শুধোয়।

"জেলারো আফিসের চিটি। লুনের নুটিশ।" জটার বউ বিড়বিড়িয়ে বলে।

কাগজগুলো উলটেপালটে দেখছিল জটা। চোখের কোণে ঝিলিক মারছিল তাচ্ছিল্যের হাসি।

কাগজগুলোকে ফের চালের বাতায় গুঁজতে গুঁজতে হালকা গলায় বলে, "লুন আর এ যুগে শোধ করে কেটা? ফেলে দে' ইসব জঞ্জাল।" লুঙ্গিটা কোমরের সঙ্গে কষে বাঁধতে বাঁধতে বলে, 'টাইম করে একটিবার ভেট করে আসা লাগবে আপিসের বড়বাবুর সাথে। চা-বিস্কোট খাবায়ে আসা লাগবে। উর পাশেই তো সব।"

ঘরের মধ্যে বসে বসে শুনছিল বউ সব কথা। লোকটার মুখে অমন কথা কে শুনেছে কবে! কত বোকাসোকা ছিল! কত না বাঁদর-লাচ লাচাতো পাঁচজনায় মিলে!

আষাঢ়-শ্রাবণে মাঠভরা থই থই জল। কচি ধানের চারা মনের আনন্দে দোল খায়। বেনা বনের চুড়োয় ফিঙে বসে ন্যাজ দোলায়। ভিতরমাজনার উঁচু পাড়ে তালের সারি কালচে হয়ে ওঠে পেছনের মেঘের সাথে। জটা তখন মনের আনন্দে ঘাই বেঁধে চলেছে

অন্যের জমির আলে। সন্ধের কালি গায়ে মেখে রাত নামে, তবুও মানুষটার ফেরার নাম নেই। বউ গঞ্জনা দিত, "লিজের জমিনে কেউ থাকে নাকো ইখনতক্। তুমি কিনা পরের জমিনের ঘাই বাঁধতিছ সইনঝা-পহরে। বলি, মজুরি কি কিছো বেশি মিলবে?"

সরল মুখে আলগা হাসির ফুল ফুটিয়ে জটা মেয়েটাকে তুলে নিত কোলে। বলত, "জলগুলান্ সব বারায়ে যাবে যে রে! চারাগুলান শুকায়ে মরবে দুদিনে।"

মানুষটা সারাক্ষণ ভাব করে থাকত যেন কি এক মহা দোষ করে ফেলেছে। মেলার থেকে দশ নয়ার ফুলুরি—তাই মেয়েকে কোলে বসিয়ে আদর করে খাওয়াত।

ঘুমের মধ্যে বউয়ের গায়ে আলতো হাত বুলনো জটার অনেক দিনের অভ্যেস। প্রথম প্রথম ভারী অস্বস্তি লাগত বউয়ের। সরিয়ে দিত হাত। খানিক বাদে বোকা বোকা মোলায়েম গলায় ফিসফিসিয়ে শুধোতো মানুষটা, "রাগ করিছিস্ ম'র পরে?"

শেষের দিকে হাত বোলানোটা বড় গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল বউয়ের।

শুধু একহাতের পাঁচটা আঙুল দিয়ে মানুষটা বুকের সব সোহাগ চারিয়ে দিতে পারত অন্যের শরীরে।

সবই ভালো, সবই সুখের। কেবল মানুষটা যদি একটু চালাক-চতুর হত! যদি নিজের ভালোটা বুঝত আগেভাগে। শুধু এটাই অষ্টপ্রহরের কামনা ছিল বউয়ের।

পুরোনো দিনের কথাগুলো ভাবতে ভাবতে উনুন জ্বেলে ভাত চড়িয়ে দেয় বউ। মাপের চেয়ে কিছু বেশি চালই ঢেলে দেয় হাঁড়িতে। ছেলেটা জেগে ওঠার আগে কোনো গতিকে ফুটে গেলে হয়। গরমা-গরম ফ্যানে-ভাতে ধরে দেবে সামনে। ভাত রাঁধার নামে শুধু হাঁড়িতে জল ফোটানোর দীর্ঘ ছলনাটা সত্যি হয়ে উঠবে ছেলের সামনে। ভাবতে গিয়ে বুকটা যেন ভরে যাচ্ছিল তার।

ঘসর ঘসর করে নখ দিয়ে গা আঁচড়াতে আঁচড়াতে রান্নাঘরের সামনে দাঁড়ায় জটা। চোখ পাকিয়ে বলে, জগা মিস্তিরির সাথে কথাবাত্তা পাকা করে আলাম। সামনের হপ্তায় আজ্জি পেশ হবে। রঘু ঘোষালের দেড় বিঘার ভাগ-রেকর্ডটা করতে লাগবে ইবার। কাঁচা গুটিটা ইবার পাকায়ে লিতে হবে যে-কুনো গতিকে। জটার চোখদুটো লোভে চকচক করছিল। পায়ে পায়ে শোবার কুঠরিতে ঢোকে সে। ঘুমন্ত বাচ্চাটাকে তুলে নেয় কোলে। রান্নাঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়। রঙ-তামাসা জোড়ে বউয়ের সাথে।

"জ্যালের ফিমিল ওয়ার্ডে একটা মেয়া ছিল, এক্কেরে তু'ব মতোনটি।" জটা দাঁত বের করে হাসে। "দ্যাখতে দ্যাখতে মুই তো অবাক! এক্কেরে তু'র পারা গা'র রং, ত্যামনই হাঁটাচলা। ভাবি, বউ আবের কুন্ ক্যাসের আসামি হয়্যে আলো?"

বউ মুখ ফিরিয়ে একপলক দেখে নেয় জটাকে। তাবপর কষে ফুঁ দিতে থাকে উনুনে।

খানিক চুপ করে থেকে জটা বলে, "ভাবছেলাম ফিরে আসে তুরে দ্যাখতে পাবো কিনা।"

চেরা চোখে তাকায় বউ। "ক্যানে?"

"আরে, বলা তো যায় লাকো কিছো।" রসিকের মতো হাসে জটা, "হয়তো বা জটা দন্‌পাটের আশা ছাড়ে দিয়ে অন্য ঘাটে লা'খান্ বাঁধলি ফের।" হো হো করে হেসে ওঠে জটা, "কতোই তো দেখলাম সিখানে, কতোই শুইন্‌লাম।"

বুঁচি উনুনের পাশটিতে শুয়ে কাদা। ওর দিকে এক ঝলক দেখে নিয়ে বউ শক্ত চোখে তাকায় জটার দিকে।

জটা আবার হো হো করে হেসে ওঠে।

উনুনের পেটে কষে ফুঁ দিচ্ছিল বউ। ধোঁয়া লাগা লাল চোখে জল জমছিল ক্রমশ। হাঁড়ির উথলে ওঠা শাদা শাদা ফ্যান ভুরভুরে গন্ধ ছেড়েছে। গরম ভাতের গন্ধ! ছেলেটা দোল খাচ্ছে বাপের কোলে। পেটের মধ্যে বহু যুগের জমানো দুর্ভিক্ষের খিদে যেন আড় ভেঙে জেগে উঠছে।

একটা শক্তপোক্ত গাছ যেন ডালপালা ছড়িয়ে দিয়েছে মাথার ওপর। তাই বেয়ে লতার মতো বেয়ে উঠতে চায় বউয়ের মনটা। শীর্ণ শরীরের খাঁজে খাঁজে পাঁচটা আঙুলের সোহাগের নরম অনুভূতি। শিউরে উঠতে চায় প্রতিটি লোমকূপ।

কিন্তু বুক জুড়ে কান্নাটাও জমছে। এই চালাকচতুর, রসে টইটুম্বুর মানুষটা তার বড়ই অচেনা। জেলে যাওয়া মানুষটা ফিরে আসেনি।

এ এক অন্য মানুষ! মানুষটার সারা গায়ে একটা সোঁদাসোঁদা গন্ধ ছিল। গন্ধটা বড় উত্তেজিত করত বউকে। সেটা বেমালুম হারিয়ে এসেছে কোথায়।

গরম ভাতের গন্ধটা ক্রমশ বিস্বাদ ঠেকছিল নাকে। রাতের আঁধারে এমন একটা চালাক মানুষের সঙ্গে লেপটে শুয়ে থাকতেও ভয়!

সেই ভয়টাই ক্রমশ সাপের মতো পাক দিয়ে উঠছিল বুকের দিকে।

কদমডালির সাধু

শতচ্ছিন্ন কাঁথাটায় বহুদিন রোদ না লাগার দরুন ভ্যাঁপ্সা গন্ধ। তার ওপর চিত হ'য়ে শুয়ে সাধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রয়েছে ওপরের দিকে।

চোখদুটো ঘোলাটে। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়িগোঁফ বেড়েছে আগাছার মতো। মুখের চামড়া ঝুলে পড়েছে। হাত-পাগুলো শীর্ণ কাঠির মতো। সাধুর বয়েস এখন নব্বুয়ের ওধার।

ডান হাতখানা তুলে ধরলো সাধু চোখের সামনে। হাতের আঙুলগুলোকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো অগাধ বিস্ময়ে। এই দশটা আঙ্গুল দিয়ে সাধু একদিন বিশ্ববিজয় করেছে।

সাধু। সাধুচরণ দলুই। সাধুর স্নেহময়ী জননীই সাধ করে নাম রেখেছিলেন। কিন্তু সারাটা জীবন সাধু নামের লোকটি তার সাধুতার কোন নজিরই রাখেনি। কদমডালির ডাকসাইটে চোর চূড়ামনি শশী গুচ্ছাইতের ভাগ্নে সাধুচরণ। সার্থক তার মামার নাম। শশী। রাত্রি গভীর হ'লে শশীর উদয় হোত গেরস্তের ঘরের আনাচে কানাচে। এ ব্যাপারে আকাশের চাঁদের মতো তিথির বাচবিচার ছিলো না তার। সেই শশী গুচ্ছাইতের ভাগনে সাধু। যোগ্য শিষ্যও বটে।' ছেলেবেলায় মা মরার পর মাত্র চোদ্দ বছর বয়েসে সাধু চলে এসেছিলো কদমডালিতে মামার কাছে। মামার কাছেই সাধুর হাতে খড়ি। মামার জীবদ্দশায় ওর বাড়-বাড়ন্ত, নামডাক।

শশী গুচ্ছাইত ভাগনেকে একান্তে ডেকে বলেছিল- "বাপ আমার, তোর হবে। আমি পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তুই পারবি। মামার মুখ উজ্জ্বল করবি তুই। তোকে আমার সব দিয়ে যাব রে। মা লক্ষ্মী দম আটকে মরতিছেন দালানে-প্রাসাদে। সুড়ঙ্গ কাট্যে, পথ করে, তাঁকে বের করি আনতি হবে। খোলা হাওয়ায় দম লিয়ে তিনি তোকে আশীর্বাদ করবেন, বাপ আমার।"

তারপর একদিন শশী গুচ্ছাইত মরলো পায়ে গেরস্তের ফাঁস লাগিয়ে। পরিপাটি করে সিঁদটি কেটে শশী ডান পা'টি ঢুকিয়েছিলো পরখ করবার জন্য। গেরস্থ সজাগ ছিলো। যেই না পা'খানি সেঁধানো, অমনি লাগিয়ে দিলে ফাঁস। আধ ঘন্টাটাক টানা হেঁচড়ার পর ফাঁস যখন টেঁসে গেলো শক্ত হয়ে, তখন নিরুপায় সাধু মৃদুকণ্ঠে 'জয় মা চোর কালী' বলে এক কোপে শশীর মুণ্ডুখানা কেটে নিয়ে দে দৌড়। গোঁসাই-ডুবির সোঁতায় মামার মুণ্ডু পুঁতে দিয়ে ভোরের আগেই কদমডালিতে ফিরে এসেছিল সাধু। তখন সাধুর আর কত বয়েস, বড় জোর বছর বিশেক!

তারপর থেকে সাধু একা। সারাজীবন—তার পেশাগত জীবনের ষাটটা বছর, সে একা। ঠিক একা নয়, বিশ্বস্ত সংগী হিসেবে ছিলো তার দু'হাতের দশটা আঙ্গুল। বিড়ালের মতো দু'টো পায়ের পাতা। পেঁচার মতো দু'টো তীক্ষ্ম চোখ। কুকুরের মতো দুটো সজাগ

কান। আর যারা ছিলো—খাঁদু, কুঞ্জ, নাদি—এরা সব ফাউ। দু'পাঁচ বছর সংগে থাকতো। শিক্ষার দিকে নজর ছিলো না, যতটা ছিলো মালের দিকে। কোনগতিকে ধরা পড়লেই, দু'এক গুঁতো খেতে না খেতেই ওলাউঠার ভেদ বমির মত সব কথা বেরিয়ে আসতো পেট থেকে। এরা সাধুর কেউ ছিলো না।

নব্বুই বছর বয়েসে, ভরদুপুরে, ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে সাধু তার ডান হাতটা দেখেছিলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। এই হাতে এক কোপে মামার মুন্ডুটা কুমড়ো কাটার মতো কেটেছিলো সে।

বোশেখ মাসের ঝাঁ ঝাঁ দুপুর। আকাশটা ঝলসে যাচ্ছে। মাথার ওপর গন্‌গনে সূর্যটা তেতে পুড়ে লাল টকটকে। মাঠঘাট জ্বলে পুড়ে খাক্।

এখন দেশ জুড়ে দুর্ভিক্ষ। দুবদা বেসিন এলাকা গেল-বছর বন্যায় ভেসে গিয়েছিল আশ্বিনে। ধান গাছের ওপর চার হাত জল ছিল তিন হপ্তা। সাপে মানুষে একগাছের ডালে বাস করেছে দিনের পর দিন। সরকারি খয়রাতি নৌকোয় নৌকোয় বিলি হয়েছে। সাধুও পেয়েছে যৎকিঞ্চিৎ। জল নেবেছিলো বহু পরে। ধান গাছগুলো পচে গিয়েছিলো। অঘ্রাণে চাষীকে কাস্তে নিয়ে মাঠে নাবতে হয়নি।

মাঘের শেষে এক ফোঁটা বৃষ্টি হয়নি। তখন থেকেই দুবদা বেসিনের লোকেরা প্রমাদ গুণছিলো।

মাঘ থেকেই চাষীদের হাল বলদ বিকোনো শুরু। তারপর ধীরে ধীরে জোতজমা, ঘটি বাটি সব কিছু। প্রথমে একবেলা ফেনা ভাত, তারপর গম, মাইলো, শাকপাতা, গুগ্‌লি, শামুক, সব। যাদের গোলায় গেল-বছরের ধান কিছু রয়েছে, তারা রাতারাতি ফেঁপেছে। নামমাত্র দামে জমিজোত, ঘটি বাটি, হাল বলদ, তাদের ঘরে গিয়ে জমা হচ্ছে নিত্যি দিন। সারা এলাকা জুড়ে একদল মানুষের সম্পদ বাড়াবার খেলা, আর একদলের বেঁচে থাকার লড়াই।

বিশ বছর আগে, যখন গায়ে বল ছিলো, দু'হাতের দশটা আঙ্গুল যখন কেনা চাকরের মতো কাজ করতো, তখন হ'লে সাধু মনে মনে হাসতো, বলতো "বাড়াও সুমুন্দির পো, যত খুশি বাড়াও। যত খুশি লুটে নাও এই মওকায়। সাধুচরণের ছিচরণ একটি রেতের জন্য তোমার আঙ্গিনায় পইড়লে আবার আগের আবেস্তায় ফিরে আসবে সব। পাহাড় ধ্বসে এক রেতেই সমতল।"

কিন্তু আজ আর তা বলতে পারে না সাধু। দু'পা না হাঁটতে জিভ বেরিয়ে পড়ে, তালু শুকিয়ে যায়, চোখে ঝাপ্‌সা দেখে, মাথা ঘুরে পড়ে যায়। সারা কোমরে বাত। অমাবস্যা পূর্ণিমাতে আরও চাগিয়ে ওঠে। পায়ের শিরাগুলো ফুলে দড়ির মতো পাকানো। পায়ে কড়া পড়েছে অসংখ্য। উঁচু নীচু জমিতে আচম্‌কা পা পড়লে যন্ত্রণায় জীবন বেরিয়ে আসার উপক্রম। আজ আর পাহাড় ধ্বসিয়ে সমতল করার ক্ষমতা রাখে না সাধু।

ধানের দাম হু-হু করে বাড়ছে। এগ্‌রা বাজারের আড়তে রাতের আঁধারে চলে যাচ্ছে ধান। সে ধান মজুত হচ্ছে অন্ধকার গুদোমে।

সরকার থেকে কন্ট্রোল দরে গম বিক্রি হচ্ছে। মাথা পিছু তিনশো গ্রাম হপ্তাপিছু। তার জন্য হাজার মানুষের ভিড়। বিশ-পঞ্চাশ জনকে বিলি করার পর সে মালও রাতের অন্ধকারে হাওয়া। সরকার থেকে খয়রাতি গম, মাইলো, ছোলা আসে ট্রাকে ট্রাকে। ডিলারেরা সে মাল বিলোয় লিস্টি ধরে। এলাকার বুড়ো-বুড়ি অন্ধ-আতুর তার ছিটে

ফোঁটা পায়। বাকিটা রাতের অন্ধকারে পাখা মেলে উড়ে যায়। কেবল সাধুর ভাগ্যে কিছুই জোটে না।

মামা শশী গুচ্ছাইতের কথা মনে পড়ে সাধুর। "এ দুনিয়ায় চোর কে নয় রে বাপ আমার? গোকুলের কৃষ্ণ ঠাকুর থেকে বৈতা বাজারের ভূপতি সাঁপুই সবাই এক একটি পাকা চোর। তোর হাতে যেমন সিঁদকাঠি, ভূপতির হাতে তেমন পারমিট। ঐ পারমিট তোরে আমারে একখান করে দিলে আর রাতে-ভিতে ঝোপে-ঝাড়ে ঘুরে বেড়াতে লাগে না। সব পোকাই সুযোগ পেলে কামড়ায়, নাম রটে শুধু হাতকাটা পোকার। সেই, কথায় বলে না, সব কাঁটাই রক্ত ঝরায়, চোর কাঁটারে গালি। দুনিয়ার সব ঠাঁই সেই একোই বিত্তান্ত, বাপ আমার।"

অজন্মার দিনে দুবদা বেসিন এলাকায় রাতের আঁধারে অনেকেই তৎপর। কেবল সাধুর রাতগুলোই বন্ধ্যা। কেবল সাধুর কোন উপায় নেই।

দারুণ রোদের তেজে আকাশটা যেন গন্‌গনে এনামেলের কড়াই। বাতাস যেন ময়াল সাপের নিঃশ্বাস। মাঠের গাছপালা, ঘাস পাতা শুকিয়ে জ্বাল্। সারা এলাকা খরার প্রকোপে ধুঁকছে। পুকুরের সব জল শুকিয়ে কাদা বেরিয়ে পড়েছে।

টেস্ট রিলিফের কাজ চলছে চারিদিকে। দুবদা বেসিন এলাকায় বিরাট উঁচু বাঁধ হচ্ছে বন্যা ঠেকাবার জন্য। জোয়ান মদ্দ, মেয়েমানুষ সব উদয়াস্ত খাটছে সেখানে। ঝাঁ ঝাঁ দুপুরে কোদাল চলছে হাজারে হাজারে। ঝুড়িতে ভরে মেয়েরা সে মাটি ফেলছে বাঁধের ওপর। দিনের শেষে শ্লিপ নিয়ে ডিলারের দোকানে গম তুলছে সবাই। চৌকা পিছু দু' কেজি গম। সাধু তাও পারে না।

শুয়ে শুয়ে ভাবছে সাধু। চোদ্দ বছর বয়েসে ওর মামা শশী গুচ্ছাইত ওকে একান্তে বলেছিলে—"বাপ আমার, দুনিয়ার রীতি আমি জানি রে। তোর চোখের সামনে সবাই খাবে, দাবে, ঘুবে বেড়াবে, আমোদ ফুর্ত্তি করবে। তোকে শুধু ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে তাকায়ে তাই দেখবে হবে। তুই তার থেকে একটুখান চাইলেই, সবাই তেড়ে আসবে। ছিনায়ে নিতে হবে, বুঝলি। দুটো হাতের দশটা আঙ্গুল অল্প বেঁকিয়ে সংসারের ঘি' টুকু তুলে নিতে হবে। সোজা আঙ্গুলে এ সংসারে ঘি ওঠে না, বাপ আমার।"

তা নিয়েছে সাধু। সারাটা জীবন দশটা আঙ্গুল অল্প বেঁকিয়ে সাধু ঘি তুলেছে দেদার। তখন সুাধুচরণের কত নাম! তার নাম যেন রূপকথার মতো সবায়ের মুখে মুখে ফেরে। রাতের আঁধারে তার দশ আঙ্গুলের কেরামতি যেন অলৌকিক কাব্য! সাঙ্গাতরা বলতো, "তোমার পায়ে সারা জেবন জোঁক হয়ে বসে থাকতে মন লাগে, কারিগর। কপাল করে এসেছিলে বটে!"

এগরা, বালিঘাই, উদয়পুর, কুঁদি, রাসন, বৈতাবাজার, পাণিপারুল—পুব এলাকা জুড়ে তখন সাধুচরণের বিশাল সাম্রাজ্য। সমগ্র এলাকা জুড়ে অন্ধকার রাতের সে মুকুটহীন সম্রাট! আজ এখানে তো, কাল দশ মাইল দূরের গাঁয়ে। আজ পূবে তো কাল পশ্চিমে।

আস্তে আস্তে সেসব দিন গেলো। সাধু এখন অথর্ব। পেট চলে কি করে? সাধু ভিক্ষে করতে লাগলো। গেরস্তরা ভয়েভক্তিতে দু'চার দানা দিয়ে সন্তুষ্ট রাখতো তাকে। কে জানে. চটিয়ে দিলে রেতের বেলায় কোন অঘটন ঘটায় সাধু নামের ভয়ানক লোকটি। বেশ চলছিলো। এবার তাও গেলো। এখন দেশে ভিক্ষাও বাড়ন্ত। যে ভিক্ষে দিতো, তার কাঁধেই ভিক্ষের ঝুলি। সাধু যায় কোথা! কাজেই সাধুর বেশীর ভাগ দিন উপবাসে

কাটে। মাঝে মাঝে অসহ্য হলে শাকপাতা খানিক সেদ্ধ করে তাই গিলে ফেলে গ্রোগ্রাসে। আবার তিন চার দিন ঢালাও উপবাস।

সাধু বাইরের পানে চোখ মেলে তাকালো। দিন দু'য়েক কিছুই পেটে পড়েনি। ক্ষিদেয় নাড়িভুঁড়িগুলো মোচড় দিয়ে উঠছে। অসংখ্য সাপ যেন কিলবিল করছে পেটের মধ্যে। এমনি শুয়ে থাকলে আজ রাতেই মরে যাবে সাধু। মরার কথা ভেবে শিউরে উঠলো সাধু। মরতে তার বড়ই ভয়।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো। সংগে সংগে মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্‌ করতে লাগলো। কান দুটো ভোঁ-ভোঁ করছে। সাধু কোন গতিকে বাইরে এলো। দুয়ারে ঠেকানো লাঠিটা বাগিয়ে ধরলো ডান হাতে। তালপাতার বোঁটা দিয়ে তৈরী জুতোজোড়াটা গলিয়ে নিল পায়ে। ছেঁড়া গামছাটার চার কোণা বেঁধে থলির মতো করে বানালো। সামনের দিকে তাকিয়ে ঠুক্‌ঠুক্‌ করে হাঁটতে লাগলো সাধু। গাঁ ছেড়ে মাঠে নেমে এলো।

খোলা মাঠের ওপর দাঁড়িয়ে সাধু আকাশের দিকে তাকালো। ঘোলাটে চোখে অন্দাজ করলো বেলা। আকাট দুপুর। নন্দীদের বাইরের পুকুরটায় জনাকতক অস্থিচর্মসার ছেলে উদোম গায়ে সাঁতার কাটছে। সামান্য জল রয়েছে পুকুরে। চার পাঁচটা বাচ্চার দৌরাত্ম্যে জলের কাদা উঠে এসেছে ওপরে। গাঁয়ের বাঁশঝাড়গুলোতে ফুল ধরেছে। বাঁশ গাছে ফুল ধরলে নাকি দুর্ভিক্ষ হয়।

আধ ঘন্টাটাক হেঁটে সাধু চৌধুরীবাঁধের কাছে এলো। একটা ন্যাড়া মাথা কেঁদ গাছের তলায় ধপাস করে বসে পড়েই জিভ বের করে হাঁফাতে লাগলো সে। চোখদুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ধু ধু করে ধুলো উড়ছে চারদিকে। সাপের মতো লক্‌লকে আগুনের হল্কা মাটির বুক থেকে উঠছে ক্রমাগত। খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকলেই চোখ ধাঁধিয়ে যায়। আলের পাশে একটা হেলে সাপ মরে কঞ্চির মতো শক্ত হয়ে গেছে। অল্প দূরে হাড় জিরজিরে কয়েকটা গরু মাটির বুক থেকে ঘাসের শিকড় তুলে তুলে চিবোচ্ছে। সাধু উঠে দাঁড়ালো।

গাঁয়ের মধ্যে ঢুকে সাধু প্রথমে যে বাড়িটা দেখলো, তাতেই ঢুকে পড়লো। ভিক্ষের কথা পরে। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। গল্‌গল্‌ করে ঘামছে সাধু। ঘাড়টা নীচের দিকে এলিয়ে দিয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস টানলো অনেকক্ষণ। হাপরের মতো সাঁ সাঁ করছে ফুসফুস। পাঁজর ঠেলে বেরিয়ে আসবে বুঝি।

খানিক পরে চোখ তুলে চাইলো সাধু। একচালার ছোট্ট ঘর। দুয়োরে একটুখানি ঢেঁকি বারান্দা। ঢেঁকিতে করে ধান ভানছে অল্প বয়সী একটি মেয়ে। সামনে ময়লা কাঁথায় একটা মাস ছয়েকের বাচ্চা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। অতিরিক্ত পরিশ্রমে মেয়েটি ঘেমে নেয়ে একসা। মাথা থেকে ঘাম গড়িয়ে কপালের সিঁদুর লেপটে একাকার। সাধু আন্দাজ করলো, খুব বেশী হ'লে বছর বিশেক মেয়েটার বয়স। বাচ্চাটা বোধহয় ওরই।

সাধু ইঙ্গিতে জল চাইলো। ঢেঁকি থামিয়ে জল আনতে গেলো মেয়েটি। সাধু ঘোলাটে চোখে একশো মানিক জ্বেলে দেখতে লাগলো আকাঁড়া চালগুলো, ঢেঁকির গর্তে। সাধু ভাবলো, এই চাল ফুটন্ত জলে ছেড়ে দিলে ভাত হয়। ফেনা ফেনা হ'য়ে সুন্দর গন্ধ ছাড়তে থাকে। তারপর নামিয়ে নিয়ে গরম, গরম সংগে একটু নুন একটা কাঁচালঙ্কা। সাধুর পেটটা দ্বিগুণ জোরে মোচড় দিয়ে উঠলো। শুকনো তালু চটচটে হয়ে গেলো নিমেষে।

সস্তা এনামেলের ঘটিতে জল এনে সামনে নামিয়ে দিল মেয়েটি। সাধু ঘটিটা তুলে ধরে ঢক্‌ঢক্‌ করে কয়েক ঢোক খেয়ে ফেললো। আ...! কি শান্তি...! ঘটিতে আরও জল ছিলো। সাধু অল্প অল্প জল ঢেলে মাথায় চাপড়াতে লাগলো। মাথায়, কপালে, চোখে, কানে অল্প অল্প জলের ছাঁট লাগিয়ে ঘটিটা নামিয়ে রাখলো।

বাচ্চাকে দুধ খাওয়াচ্ছিলো বৌটা। মাঝে মাঝে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখছিলো, সূর্য্যদেব কতটা নাবলেন।

"কোত্থিকে আসা হতিছে গো, মুরব্বির পো?" মেয়েটা আগ বাড়িয়ে শুধালো।

"আসছি মা নক্ষী, উদয়পুর থেকে। তা রোদ তো নয়, যেন রাবণের চিতে জ্বলছে। জলটুকু খেয়ে প্রাণ পেলেম, না নক্ষী।"

"কোথা যাবে গো? এই টি-টি রোদে, বুড়া মান্‌ষি বেরিয়েছ ক্যানে?"

"বেরিয়েছি কি সাধে? পেটের জ্বালা বড় জ্বালা, মা নক্ষী। তিন কুলে তো কেউ নেই, একটু মেগে যেচে না নিয়ে গেলে বাঁচবো কি করে মা? তা এখন বুঝতিছি, বেরিয়ে ঠিক করিনি। এই রোদে দু'টো বাড়ি ঘুরল্যে ভিক্ষান্ন আর পেটে যাবে না, মা নক্ষী। তার আগেই ব্রহ্মতালু ফেটে মারা যাব।" ধরে ধরে দম নিয়ে কথাগুলো বললো সাধু।

বৌটার দৃষ্টি করুণ হয়ে উঠলো। বললো, "একটুখান জিরিয়ে নাও মুরুব্বির পো, বেলা পড়লে যেও।"

সাধু বিড়বিড় করে বললো, "তাই যাই।"

আধ ঘন্টার মধ্যেই সাধু এ সংসারের অন্ধিসন্ধি সব জেনে নিলো। স্বামী-স্ত্রীর ঘর। নূতন বিয়ে। বৌয়ের বাপের বাড়ি সুবর্ণরেখার ওপার। সৎমার সংসারে লাথি ঝাঁটা খেয়ে দিন যেতো। বাবা বিয়ে দিলো, তাই বাঁচোয়া। হ্যাঁ, ছেলে ঐ একফোঁটা। ভগবান বাঁচিয়ে ফেলে বাখলেই তবে। স্বামী? স্বামী গেছে মাটি কাটার কাজে। দুবদা বেসিনে বাঁধের কাজ হচ্ছে। শ'য়ে শ'য়ে লোক খাটছে সেখানে। জোয়ান মদ্দ স্বামী, এক-দিনে তিন চৌকা মাটি কাটতে পারে। রোজগার যা হয়, নুনে ভাতে চলে যায়। সকাল বেলায় দু'সের ধান কিনে দিয়ে গেছে। সেই ধান ভেনে, ভাত রেঁধে রাখতে হবে। নইলে মানুষটা পড়ন্ত বেলায় খাবে কি?

সাধু সব মনোযোগ দিয়ে শুনলো। মাথা নেড়ে নেড়ে বললো, "গুণবতী তুমি, মা নক্ষ্মী। একাই দেখছি সংসার সামলাচ্ছ। বাহবা মানতেছি আমি।"

খানিক বাদে ঢেঁকিতে উঠলো বৌ। সাধু সরে এসে বললো, 'তুমি ঢেঁকি চালাও, মা নক্ষ্মী। আমি চালটা নেড়েচেড়ে দিই। একফোঁটা মেয়ে, হাত-পা চালিয়ে একবারে জেরবার।"

বৌ রাজি হয় না। "তুমি বুড়া মান্‌ষি, জিরোবে বলে বসলে, আমি আবার তোমায় খাটাই কেন মুরুব্বির পো?"

"কি যে বল মা! এই যে তুমি জল খাইয়ে আমার জীবন দান করলে মা নক্ষ্মী।" সাধু গড়ের পাশটিতে বসলো।

ঢেঁকি উঠছে আর পড়ছে। ধানগুলো ভেঙ্গে ভেঙ্গে লাল লাল চাল বেরিয়ে আসছে। সাধু হাত দিয়ে নাড়াতে লাগলো চালগুলো। ওপর থেকে নীচে, নীচ থেকে ওপরে। চালগুলো হাত দিয়ে নেড়েচেড়েও কত শান্তি! মোটা মোটা চাল, কেমন শক্ত, পুরষ্টু!

এই চালের ভাতের না জানি কত সোয়াদ! সাধু চালগুলোকে হাত দিয়ে কচলাতে লাগলো। চাল হ'য়ে গেলে একমুঠো চাইবে নাকি সাধু? চেয়ে কোন লাভ নেই। হা পিত্যেশ করে সাতদিন বসে থাকলেও আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে একটি দানাও গলবে না। অথচ সাধু ভালোই জানে, কোথাও দু'মুঠো চাল চুরি করে ধরা পড়—কালকের ছেলে অবধি বিচার করতে বসে যাবে।

গড়ে ধানের ভাগ কমছে, চালের ভাগ বাড়ছে। সাধু যতই দেখছে, ততই তার ক্ষুধা বেড়ে যাচ্ছে। সাধু বউটার দিকে তাকালো। ঢেঁকির ওপর পায়ের তালে তালে তার সর্ব্বাঙ্গ উঠছে নামছে। ঝরঝর করে ঘাম ঝরছে।

এই চাল হলে বৌটা বাঁধবে। শাক সেদ্ধ করবে। দিনের শেষে ক্ষুধার্ত্ত স্বামীর সামনে সেসব সামগ্রী সাজিয়ে দিয়ে সামনে বসবে। সামনে বসে বসে দেখতে থাকবে ক্ষুধার্ত্ত মানুষটার খাওয়া।

সাধু অনেক বছর পেছনে ফিরে গেলো। সাধুর বৌ যাকে প্রসব করে আঁতুড় ঘরেই মরেছিলো, সেই মেয়েটা বেঁচে থাকলে আজ এর মতোই হতো। বছর সাতেক তাকে বাঁচিয়েও রেখেছিলো সাধু। তারপর একবার ধরা পড়ে জেল খাটতে গেলো। বাড়িতে পড়ে রইলো সাত বছরের মেয়ে। পুলিশের সামনে ধুলোয় পড়ে এক'সা হয়েছিলো সে। দু'বছর পরে সাধু ফিরে এসে মেয়েকে পায়নি। তার বদলে পেয়েছে তার মৃত্যুর নানান্ রং চড়ানো গল্প। সাধু চলে যাওয়ার পরে, মেয়েটা মাস কয়েক এর বাড়ি ওর বাড়ি ফ্যানটা-আশ্‌টা চেয়ে চিন্তে খেতো। চোরের মেয়ে বলে গেরস্থের বাড়িতে ঢোকা বারণ ছিলো তার। একদিন ক্ষিদের জ্বালায় পুকুরে নেমেছিলো শালুক-ডাঁটা তুলতে। আর ওঠেনি। আজ মেয়েটা বেঁচে থাকলে এর মতোই হতো। এই রকম শক্ত সমর্থ জোয়ান ছেলের সংগে বিয়ে হোত তার। তারপর একদিন কোল জুড়ে আসতো ফুটফুটে ছেলে। সাধুর দাদু-ভাই। সাধু তাকে কোলে তুলে নাচাতো শূন্যে।

সাধু একবার ঘুমন্ত বাচ্চাটার দিকে তাকালো। অঘোরে ঘুমোচ্ছে বাচ্চাটা। সাধুর মনে সহসা অফুরন্ত স্নেহ বাঁধভাঙ্গা বন্যার মতো হু হু করে নামতে লাগলো। বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে সাধু মনে মনে উচ্চারণ করলো, "দাদু ভাই, আমার দাদু ভাই।"

পেটটায় আবার মোচড় দিয়ে উঠলো। সাধু কল্পনার সিন্দুকে কুলুপ মেরে, আবার ফিরে এলো বাস্তবে। আপাতত সাধুর সামনে চরম বাস্তব হোল ঐ সের দেড়েক চাল। মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে সাধুর ক্ষিদে শত-গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

"চোরের আবার মেয়ে—দাদুভাই!" সাধু তেতো হাসি হাসলো। "বারাঙ্গনার আবার ফুলশয্যে।" সাধু তার মামা শশী গুচ্ছাইতের কথা মনে করলো, "বাপ আমার, তুই চোর। তোর বাপ নেই, মা নেই, স্ত্রী নেই, পুত্র নেই। সারা পৃথিবীতে তুই একা। পৃথিবীতে তোর একমাত্র পরিচয়, তুই চোর। চোরের বউ, ছেলে কেউ হ'তে চায় না, বাপ আমার।"

চাল তৈরী। এবার গড় থেকে তুলে নেওয়া। সাধু বললো "ঢেঁকিটা এবার তোল মা নক্ষী, চাল হয়ে গেছে।"

দু'হাত লাগালো সাধু। গড় থেকে চালগুলো তুলতে লাগলো। ঠিকরে পড়ছে লাল লাল চাল, মুক্তোর মতো। ঢেঁকিছাঁটা চালের মিঠে গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে। সাধু তারই খানিকটা পাঠিয়ে দিলো ভেতরে, ঘ্রাণের সাথে।

দু'হাতের দশ আঙ্গুল দিয়ে চাল তুলছে সাধু। দু'হাতের দশটা আঙ্গুল। সাধুর সারা

জীবনের বিশ্বস্ত সংগী। পোষা চাকরের মতো কাজ করেছে রাতের আঁধারে। কত মানুষের দেওয়াল ছাঁদা করে মা লক্ষ্মীর পথ তৈরী করেছে। সারা ঘরের সব কপাট জানালা বন্ধ। কিন্তু সাধুর হাতের দশ আঙ্গুলের কারসাজিতে ঘরের মা লক্ষ্মী বেমালুম উধাও। ঠিক যেন গজভুক্ত কপিত্থবৎ। সাধুর দু'হাতের সেই দশ আঙ্গুল চলছে।

গড়ে আর একটিও চাল নেই। সাধুর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। তালুটা চট্‌চটে লাগছে। ঘোলাটে চোখে জ্বলছে হাজার মানিক।

গড়ের সব চাল তুলে পাশে ডাঁই করে রাখা। বৌটা ঢেঁকি তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সাধু চোখের পলকে এক কান্ড করে বসলো। বৌটা কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঘুমন্ত বাচ্চাটাকে টেনে নিয়ে শুইয়ে দিলো গড়ের ওপর।

গড়ের ওপর ঘুমন্ত বাচ্চা, ওপরে ঢেঁকির মুষল। সাধু জানে এরপর কি হবে।

আতঙ্কে, আশঙ্কায় বৌ কাঠ। পলকহীন চোখে তাকিয়ে রইলো ছেলের দিকে। কান্না নয়, নড়াচড়া কিছুই নয়। পাছে অন্যমনস্ক হ'লে মুষল পড়ে বাচ্চার ওপর, সেই আশঙ্কায় মেয়েটা অচেতন জড় পদার্থের মতো দাঁড়িয়ে রইলো, প্রাণপণে ঢেঁকি চেপে।

সাধু তাড়াহুড়ো করলো না। ধীরেসুস্থে, রয়েসয়ে চালগুলো গামছায় বাঁধলো। ঘোলাটে চোখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শেষ দানাটি পর্যন্ত তুললো মাটি থেকে। তারপর লাঠিগাছা বাগিয়ে ঠুক্ ঠুক্ করে হাঁটতে লাগলো বাড়ির দিকে।

ঘন্টা দুয়েক পরে স্বামী ফিরলো কাজের থেকে। দাওয়ায় এসে ঢেঁকি-বারান্দার দিকে নজর পড়তেই বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো। বাচ্চা তখনো অঘোরে ঘুমোচ্ছে। আর প্রাণপণে ঢেঁকি চেপে বাচ্চার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বৌ কাঠ হয়ে গিয়েছে।

ছুটে গিয়ে বাচ্চাকে গড় থেকে সরিয়ে নিলো স্বামী। সংগে সংগে একদিকে ঢেঁকির মুষল পড়লো ঠক্ করে। আর অন্যদিকে কাটা কলাগাছের মতো গড়িয়ে পড়লো বউ।

প্রায় চব্বিশ ঘন্টা পরে জ্ঞান ফিরলো। ভালো করে হুঁস হতে লাগলো আরও চার পাঁচ ঘন্টা। প্রথমে বাচ্চাটাকে কোলে বুকে চেপে হু-হু করে কাঁদল প্রাণভরে।

আরো অনেক পরে সব জানা গেল। কেমন দেখতে, কত বয়স, অন্ধিসন্ধি শুনে সবাই বুঝলো এ সাধু ছাড়া আর কারুর কাজ নয়।

জনা দশ-বারো লোক লাঠিসোটা নিয়ে তক্ষুনি ছুটলো উদয়পুরে। সাধুর ডেরায়। বাঁশ বাগানের ঝোপের মধ্যে কুঁড়ে বাড়ীটার সামনে এসে সবাই একসাথে ডাক দিল 'সাধু, এই ব্যাটা সাধু'।

ভেতর থেকে কোন উত্তর এলো না। দরজা হাঁ করে খোলা। সাধু ঘরে আছে নিশ্চয়ই। বৌটার স্বামী প্রচণ্ড আক্রোশে লাঠি বাগিয়ে ছুটে যাচ্ছিল, ধরে ফেলল সবাই। গোঁয়ার্তুমি করে লাভ নেই। দুর্জন লোক. কি ফন্দি আঁটছে ভেতরে বসে কে জানে! একা একা সামনে যেতে আছে?

পা পা করে দশ বারোজন একসংগে এগুলো সাধুর ঘরের দিকে। চিৎকার করে বলতে লাগলো—"এই সাধু, আমরা বিশ-পঁচিশ জন আছি। বদ মতলব যদি আঁটিশ পিটিয়ে হাড়েমাসে এক করে দিয়ে যাব। আমরা বিশজন, তুই একা, খেয়াল থাকে যেন সেটা।"

কিন্তু কোন উত্তর এল না। সাহসে ভর দিয়ে লোকগুলো সাধুর দরজার মুখে গিয়ে

দাঁড়ালো। ভেতরের আবছা অন্ধকারে দেখা গেল সাধু শুয়ে রয়েছে।

ঘুমোচ্ছে ব্যাটা। এই তালে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। কিছু বোঝার আগেই বেঁধে ফেলতে হবে।

বৌটার স্বামী বলল "তোমরা একটা আকাট বুড়ো লোককে এত ভয় পাচ্ছ কেন, শুনি? বাম হাত দিয়ে ওর গলাটা টিপে শেষ করে দেওয়া যায়।"

সবাই ওর বোকামীতে হাসল। নব্বই, একশো, দেড়শো, বয়েসে কি আসে যায়? বয়েস দিয়ে কি এসব শয়তানদের বিচার করলে চলে? এই তো সেদিন পাণিপারুলে দেড়শো জনকে লাঠি দিয়ে তিন ঘন্টা ঠেকিয়ে রাখল যে লোকটা তার বয়েস নাকি একশোর ওপরে। ওর নাতিরাই নাকি পাকা চোর এক-একটা।

সবাই মিলে একসংগে সাধুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়েই 'বাপরে' বলে পিছিয়ে এল দুহাত। সবার হাতই নাকে। যেন একসংগে সবার নাকেই কেউ একটা করে মোক্ষম ঘুষি মেরেছে। সবাই নাক চেপে ধরলো একসংগে।

পাশের বাড়ী থেকে আলো এনে ঘরে ঢোকা হোল নাকে কাপড় গুঁজে। সারা ঘরে মল মূত্র এবং বমি। অন্ততঃ ঘন্টা দশেক আগে ওপারে চলে গেছে সাধু।

কারণটা মালুম হোল একটু নজর দিতেই। বমিতে গোটা গোটা ভাত। মাথার কাছেই একটা এনামেলের থালা। তাতে গোটা দুয়েক আমের আঁটি ও কয়েক দানা ভাত। গতকাল চাল এনে সাধু তার অর্ধেকটাই ফুটিয়ে নিয়েছিল। সংগে ভাতে দিয়েছিল দুটো আম। খালি উপোসী পেটে আম সেদ্ধ দিয়ে তিনপো চালের ভাত বেশীক্ষণ পেটের মধ্যে থাকার সুযোগ পায় নি। অবশিষ্ট চাল দেখা গেল তখনও গামছায় বাঁধা।

পাক্কা তিরানব্বই বছর বয়সে সন্ধ্যে আটটা নাগাদ সাধু তার মক্কেলদের কাঁধে চড়ে শ্মশানে চললো।